মণীন্দ্র গুপ্ত

অক্ষয় মালবেরি

মণীন্দ্র গুপ্ত

অক্ষয় মালবেরি

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কোবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে, পিডিএফ-এ বেশীরভাগ সময় থাকে না।) ইত্যাদি প্রথমদিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

অক্ষয় মালবেরি

॥ অখণ্ড ॥

মণীন্দ্র গুপ্ত

অ ব ভা স

Complete
Akshay Malberry
By Manindra Gupta

অখন্ড সংস্করণের প্রথম প্রকাশঃ অক্টোবর ২০০৯
দ্বিতীয় মুদ্রণঃ নভেম্বর ২০১১
তৃতীয় মুদ্রণঃ সেপ্টেম্বর ২০১৪

প্রচ্ছদ ও ভিতরের ছবিঃ মনীন্দ্র গুপ্ত

প্রকাশক পার্থ চক্রবর্তী, অবভাস, কলকাতা ৮৪
বর্ণস্থাপকঃ সুদীপ দাস, বরানগর
মুদ্রকঃ D&P Graphics, Ganganagar

দেবারতিকে

সূচীপত্র

অক্ষয় মালবেরি

অক্ষয় মালবেরি – মণীন্দ্র গুপ্ত ॥ অখণ্ড

আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে নিজের জীবনকে কেউ দেখে দূরবিনে, কেউ দেখে অনুবীক্ষণের লেন্সের তলায়। মণীন্দ্র গুপ্ত দেখেছেন নিজের তৈরি এক ক্যালিডোস্কোপে। আপাত-বাস্তবের নেপথ্যে যেন চিরকাল বইছে এক ঘনগহন অন্য বাস্তবের স্রোত। তার দেখা ছায়া গোধূলি মেঘ হাওয়া জল ফড়িং সরীসৃপ পাখি গাছের মধ্যে আসে মানুষী ব্যক্তিত্ব, আর মানুষের মধ্যে দেখা দেয় গুনবতী প্রকৃতির অজ্ঞান সৌন্দর্য। জগৎপটে জীবনের এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর ভাঙা টুকরো বিন্যাসে বিন্যাসে অন্তহীন ছবির পর ছবি সাজায়। অক্ষয় মালবেরি উপন্যাস নয়, প্রচলিত আত্মজীবনীও নয়, একজন দুঃখী-না সুখী-না। মানুষের চিহ্নপত্র। কাঁচা কঞ্চির কলমে বনের সবুজ কালিতে হোগলার পাতায় লেখা–উজ্জ্বল দুরন্ত দুঃখী ক্ষণমধুর অতীত যেন স্তব্ধতা থেকে এসে আবার স্তব্ধতায় ফিরে গেছে।

.

.

.

.

প্রথম পর্ব

উৎসর্গ : দাদু, ঠাকুমা ও জন্মভূমি

ঘাসের সবুজ ভোরে লাল জুতো পায়ে আমরা শিশু
খেলার খেলনার মতো বড়ির আনন্দঝাঁপা এই

Here we go round the mulberry bush
The mulberry bush the mulberry bush
Here we go round the mulberry bush
On a cold and frosty morning.

This is the way we wash our hands
wash our hands
This is the way we wash our hands
On a cold and frosty morning.

[illegible] মালবেরি
[illegible] মালবেরি This is the way we wash our clothes
wash our clothes
This is the way we wash our clothes
[illegible] মালবেরি On a cold and frosty morning.

This is the way we go to school [illegible] মালবেরি
[illegible] মালবেরি go to school
This is the way we go to school [illegible] মালবেরি
On a cold and frosty morning. [illegible] মালবেরি
" [illegible] মালবেরি "

This is the way we come out of school
come out of school
This is the way we come out of school
On a cold and frosty morning.

Merry go round the mulberry bush
The mulberry bush the mulberry bush
Merry go round the mulberry bush
On a cold and frosty morning.
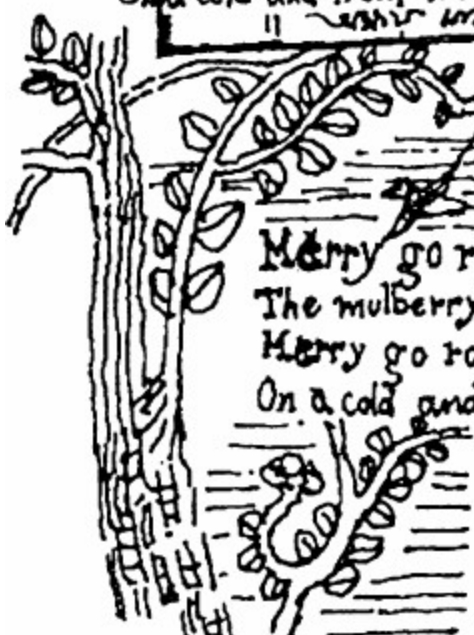
মালবেরিঝোপের চৌদিক ঘিরে নাচতে নাচতে
কখন যে পরিণত হয়েছি—কখন খেলা শেষ
চতুষ্কোণিক তাস ছুঁয়ে গেছে কখন যে চতুষ্ক পালাম
শুধু ঊষরের পোড়া মাটি—অন্ধকারের কালো—
সংসারবেলার সাক্ষী। নির্বাপিত অমৃতা যখন।

শত শরদ মানুষের আয়ু। কিন্তু দুঃখী-সুখী-ভ্রষ্টাচারী ততদিন বাঁচে না। মরণের আগে বোকাচোখে তাকিয়ে দেখে: সমস্তই অসম্পূর্ণ, তার রাকাশশী অসংলগ্ন বালি হয়ে উড়ে যায়। তবু এইটুকু জীবনের মধ্যে কত কি যে ঘটেছিল– কত মুগ্ধতা, সন্তাপ, উল্লাস, দ্রবণ! ভোলা যায় না। তবু তার উপর শান্তি নামে সময়ের শান্তি, ক্ষয়ের শান্তি। অক্ষয় মালবেরি গাছকে ঘিরে তীব্র ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ টের পাই, কখন সঙ্গীদের হাত ফসকে গেছে। প্রৌঢ় মুখের উপর ছায়া পড়ে। নিজেকে আর মানুষ বলে মনে হয় না, প্রাণী বলে মনে হয়। নিঃশ্বাস নিই তাই বেঁচে থাকি। ভিতরে একা, সুখী না, দুঃখীও না। দশদিকে অসীম শূন্য এবং চিররহস্য।

জন্ম

শরৎশেষে, কার্তিকের শুরুতে, আমাদের ভাঁড়ারের দেশে পেকে আসা ধানের উপর যখন শেষরাতে শিশির আর সন্ধ্যায় হিম জমে, যখন খালের জল স্বচ্ছ, গাছপালা গাঢ় সবুজ, আবহাওয়ায় একটু একটু শ্লথ বিষণ্নতা তখন একদিন আমার ঠাকুরদা সুখী মনে তাঁর ডালিম গাছটির পাশে হলুদ রঙের হোগলাপাতা, সবুজ রঙের বাঁশ আর বাদামী রঙের বেত দিয়ে একটি আনকোরা আঁতুড়ঘর একাহাতে বানিয়ে ফেললেন। আমি খুব পৌরাণিক আদরের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হলাম। ডাক্তার নেই, দাই নেই, ছুরি-কাঁচি নেই। শুধু একদল পাড়াগেঁয়ে অভিজ্ঞ বর্ষীয়সী যেন হুল্লোড় করে হাতে হাতে আমাকে নামিয়ে নিলেন। ডাক্তারী ছুরির বদলে আমাদের পশ্চিমপুকুরপারের নির্জন বাঁশঝাড় থেকে কেটে আনা কাঁচা বাঁশের চোচ দিয়ে আমার নাড়ী কাটা হয়েছিল, একথা জেনে নিজেকে খুব অন্য রকম লাগে। কাঁচা বাঁশের চোচ ব্লেডের চেয়েও ধারালো, তাতে টিটেনাসের বীজ না থাকলেও বনের সবুজ বিষ ছিল।

.

মা

আমাদের চেনাশোনা, ভালোবাসা হবার আগেই মা যখন মারা গেলেন তখন তাঁর বয়স উনিশ বছর, আর আমার দশ মাস। মায়ের এই অসমাপ্ত জীবন বা আমার জীবন থেকে তাঁর এই চিরঅপসরণ একটা প্রাকৃতিক ঘটনামাত্র। কিন্তু জন্মমৃত্যুর সঙ্গে স্ত্রীজাতির একটি অতি গহন যোগ আছে, অতএব পড়শী কুটুম্ব স্ত্রীলোকেরা আমাকে সামনে দাঁড় করিয়ে নিরীক্ষণ করতে করতে সখেদে বলতেন, হায়, পোড়াকপালিয়া, জন্মাইয়াই মায়রে খাইছ? অপেক্ষাকৃত তরুণীরা ভুরুতে দুঃখ এঁকে বলত, 'আহা, অর মা নাই।' কাকে খেয়েছি? কে নেই?– এসব কথায় প্রথম দিকে আমার একধরনের নির্বোধ অস্বস্তি হত। কিন্তু ক্রমাগত শুনতে শুনতে শেষে, যে নেই তার না থাকার জন্য একটা আবছা কুয়াশাভরা অপরাধ ভিতরে ছায়া ঘনিয়ে আনত। মনে হত, কোনো দুর্গম কারণে সংসারে আমি অস্বাভাবিক, এবং একা।

এই নকল দুঃখই বোধ হয় আত্মকরুণা। দুষ্টুমি করে মারধর খেলে আমি ঐ দুঃখকে খুঁজতে বেরুতাম। মুখখানা ম্লান ম্লান করে একা একা ঘুরতাম খালপাড়ে অথবা উঁচু ঢিবির উপর বিশাল শিরীষ গাছের তলায় যেখানে কেউ যায় না। সেখান থেকে দেখতাম, দিগন্তে মেঘের মধ্যে কি যেন ঘনিয়ে উঠছে। আমি মুখ নিচু করে দুঃখকে খুঁজতাম, মাটিতে কোথায় সে গেঁথে আছে ভাঙা সবুজ বোতলের টুকরো হয়ে।

অবশেষে সহজাত পুরুষসংস্কার আমাকে একদিন বলল, এই জোলো হাওয়া ভালো না। তার পর থেকে স্ত্রীলোকদের ঐসব অহেতুক বাষ্পীয় মন্তব্যের সামনে পড়লে কুমোরের ঘুরন্ত চাকায় একতাল মাটি যেমন আঙুলের চাপে টলতে টলতে শীর্ণ হয়ে ওঠে শূন্যের দিকে তেমনি কাঁচা শরীরের মধ্যে আমার স্নায়ুগুচ্ছের নাল লম্বা হয়ে হয়ে মাথা নীলের দিকে উঠত। এতকাল পরে এখন জানি, আসলে সুখও নেই, দুঃখও নেই। সংসার-সমাজের এজেন্সিগুলো আমাদের মধ্যে সুখ ও দুঃখের ধারণা জন্মিয়ে দেয়, যে ব্যথা ভোগ করার নয় সেই ব্যথা ভোগ করায়।

পরে, একটু বড় হয়ে, যেদিন মার ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম, তাঁকে একমুহূর্তেই প্রত্যাখ্যান করলাম। সোজা দাঁড়ানো একটি ছিপছিপে কিশোরী, নাকে পাথর বাঁধানো নোলক। মাতৃত্ব দূরের কথা, তার ঠোঁটে চোখে চিবুকে তখনো নারীত্বই আসে নি। এই আমার মা! তবু একসময় হয়তো তাকে আমার দরকার ছিল। কিন্তু এখন, এই পঞ্চান্ন বছর বয়সে, যদি সে আমার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ায়, হয়তো তাকে বলব বোসো, একটু কিছু খাও-বিস্কুট, সন্দেশ? পারো তো আমার কাঁচাপাকা চুলে একটু বিলি কেটে দাও। যাবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যেয়ো। তুমি গতজন্মে আমার মা ছিলে।

.

প্রথম স্মৃতি

মানুষী স্মৃতিই মানুষ। স্মৃতিই জটিলতা। মরণের পরে আমাদের যে নির্বাণ হয় না সে কেবল স্মৃতি আছে বলেই না! পুনর্জন্ম সবচেয়ে বড় ম্যাজিক ধুয়ে মুছে সব পরিষ্কার করে দেয়। জাতিস্মর হলে জন্মজন্মের দুঃখ আর জানার ভার বইতে হত। অল্প লইয়া থাকি, তাই বেঁচে থাকি। কিন্তু অনেকদিন বেঁচে থাকার ফলে আমার মধ্যে জাতিস্মর এসে যাচ্ছে। পুরনো রঙ্গমঞ্চে রঙ্গ নিজে নিজেই আবার গাঢ় হয়ে উঠছে:

জন্মের পরে আমার প্রথম স্মৃতিটি এই রকম মনে পড়ে: দিনের বেলা। দুপুর গড়িয়ে গেছে অথবা তখনও বিকেল হয় নি। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে অথবা সদ্য থেমেছে। রান্নাঘরের পাশের ঘরটিতে মেঝেয় বড় পিড়ি পেতে একগাদা কাঁথা-বালিশের প্যাকিং দিয়ে আমাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। ঘরের মধ্যে ঘন ছায়া, মাটির মেঝের সোঁদা গন্ধ, কাঁথা-বালিশের স্যাঁতা গন্ধ, বৃষ্টির ভিজে গন্ধ। শাড়িপরা কয়েক জোড়া বিশাল বিশাল পা আমার বিছানার পাশ দিয়ে বার বার আসছে যাচ্ছে, কাছে এসে এক বারও থামছে না। একজোড়া পায়ের আবার নীল পাড় সাদা জমির শাড়ি। আমি ঐ শাড়িঘেরা পায়েদের হাঁটু পর্যন্ত দেখতে পাই, তার উপরে আমার দৃষ্টি ওঠে না। আমি উঠতে পারি না, হাঁটতে পারি না, হামা দিতে পারি না,

কথা বলতে পারি না। প্রত্যেক বার ভাবছি কোনো একজোড়া পা এসে আমার কাছে থামবে, আমাকে কোলে তুলে নেবে, আমাকে একা ফেলে রাখবে না। প্রত্যেক বার আশাভঙ্গ। আমি অনেকক্ষণ ধরে ওদের নিজেদের ভিতরে কথাবার্তার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। … হঠাৎ আমার মধ্যে ক্রোধের জন্ম টের পেলাম– রক্তমাংসের পুঁটুলিটার মধ্যে বাজপাখি তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে উঠল। ক্রোধ আমার সমস্ত শরীরকে ছেয়ে ফেলছে। আমি কি করে রাগ দেখাব? … ব্যস, এইখানে এসে স্মৃতি ছিঁড়ে গেছে। তার পর গর্জন করতে গিয়ে আমি কেঁদে উঠেছিলাম কিনা, কেউ আমাকে কোলে তুলে নিয়েছিল কিনা, সে কথা আর মনে নেই। ঘটনাটা সামান্য, কিন্তু ইঙ্গিতময়। পরিত্যক্ত থাকার কষ্ট এবং অসহায় ক্রোধ- এই দ্বৈতই বোধ হয় আমার সারা জীবনের সারসংকলন।

.

ঠাকুমা ও তাঁর বন্ধুরা

এই সংসারজলধিতে পরজীবী শিশু অ্যানিমোনের মতো, যাকে আমি প্রথম আশ্রয় করলাম তিনি আমার ঠাকুমা কৃষ্ণবর্ণা, কুরূপা, কিন্তু ব্যক্তিত্বময়ী এক প্রৌঢ়া। তাঁর অযত্নের, অনটনের ছিমছাম শরীর। মস্ত কালো কপালে মস্ত সিঁদুরের ফোঁটা, পিঠের দিকে নেমে যাওয়া সরল কালো চুল, হাতে শুধু শাখা আর নোয়া, কষ্টিপাথরে কোথাও একচিলতে সোনার দাগ নেই। ঠাকুমার একমাত্র ব্যসন ছিল ফুরসত পেলেই পান এবং র তামাকপাতা তুষের আগুনে সেঁকে গুঁড়িয়ে খাওয়া। বন্ধুদের সঙ্গে এই পানের আসর জমত খুব। প্রান্তদুপুরে বন্ধুরা আসত। ছায়াচ্ছন্ন ঘরে মাটির মেঝেয় চট আর পিড়ি বিছিয়ে বসত সবাই। মধ্যিখানে থাকত ডাবরভরতি পানের গোছা, চুন, সুপুরি, খয়ের, আঁতি। একপাশে মাটির মালসায় তুষের আগুনে আস্ত তামাকপাতা কুঁকড়ে উঠে কটু গন্ধ ছড়াত। ঠাকুমা সামনের দিকে লম্বা করে পা ছড়িয়ে বসতেন। তাঁর দুই জানুর মধ্যে আমি শুয়ে, বসে, বায়নাক্কা করে এঁটুলির মতো লেগে থাকতাম। তাঁর কত যুগ আগেকার শুকিয়ে যাওয়া স্তন মুখে পুরে

টেনে টেনে মিথ্যেদুধ খেতাম। ঠাকুমা বন্ধুদের বলতেন, 'শত্তুর! শত্তুর! আমার প্রেস্রাব করতে যাবারও উপায় নাই। লগে লগে যাইবে।'

ঠাকুমার মধ্যে কোনো শ্রেণীচেতনা ছিল না। তাঁর বেশির ভাগ বন্ধুই প্রতিবেশী কামারবাড়ি, গোয়ালবাড়ির বর্ষীয়সীরা। শেষদুপুর থেকে শেষসায়াহ্ন পর্যন্ত তাদের সুখদুঃখের কথা চলত। আমি গভীর মনোযোগে প্রত্যেককে নিরীক্ষণ করতাম: সবাই প্রৌঢ়ত্বে স্নিগ্ধ, লোলস্তনী, পান এবং তামাকের গুঁড়োয় ঘন ছোপ ধরা দাঁত, তবু কত বৈচিত্র্য তাদের। উন্দি নাম্নী যুবতীর মা, রাধু ঘোষের বউ, শশী কর্মকারের দিদি, সূর্য কর্মকারের মা, মাণিক্য বুড়ী–দুঃখের এবং বয়সের আলাদা এক এক রূপ। কারো চোখের পাতা ভারী হয়ে নেমে চোখের কোলে ছায়া ফেলেছে, কারো কাঁচাপাকা চুলের গোছায় ঘেরা ধূসর অস্পষ্ট মুখখানা যেন কঠিন বট-অশ্বত্থের ঝুরি নামা মন্দিরের কবাটভাঙা দুয়ারের অন্ধকার, কারো মুখে অজস্র কাটাকুটি রেখা যেন বিকেলের নদীর চরে পাখিপক্ষীর সারা দিনের পায়ের দাগ, একজনের সামনের দাঁত ক্ষয়ে গিয়ে দুপাশের দাঁতদুটো লম্বা আর বাঁকা হয়ে এমনভাবে নিচের ঠোঁটের উপর চেপে বসেছে যেন মনে হয় সে মানবী না, প্রত্নযুগের বৃহৎদংষ্ট্রা বাঘিনী, এখন বিরক্ত, মন্থর। আর মাণিক্য বুড়ী তো প্রাচীন মাতৃকাগোষ্ঠীর একজন ঘন সাদা চুল পুরুষদের মতো ছোট করে ছাঁটা, কঠিন সোজা নাক, কঠিনভাঁজ চিবুক, রোখা সাবলীল–দেহ সে যে-কোনো

যুদ্ধে তলোয়ার হাতে এগিয়ে যেতে পারে, যদিও এখন শুধু ছাগল পোষে এবং সুদ নিয়ে টাকা ধার দেয়। ঐ দলের মধ্যে শুধু সেই পান খেত না, তামাকপাতা খেত।

আমাদের কুটুম্ব মহিলারা, কদাচিৎ হলেও, যখন আসতেন পরিপাটি সেজেই আসতেন। তাদের দেহ ও ব্যক্তিত্বে আমি একটা অচেনা রহস্যের আভাস পেতাম। আর একটা উন্মোচনও হত: আমরাও ভদ্রশ্রেণীর।

ঠাকুমার আরেকজন বন্ধু ছিল বাবুরালি-আমরালি শেখের মা। ওরা দু ভাই ঢুলি সেজে আমাদের দুর্গাপুজো, কালীপুজো, রটন্তীপুজোয় ঢোল বাজাত আর ধুনকর হয়ে শীতকালে লেপ-তোশক তৈরি করে দিত। বাবুরালির মা, যেহেতু মুসলমানী, এলে আমাদের দাওয়ার নিচে ছাঁচতলায় বসত পিঁড়ি পেতে। ঠাকুমা বসতেন দাওয়ায়। সেখান থেকেই দুই সখীতে আদানপ্রদান হত। আমি ঐ বয়সেই বুঝতে পারতাম, নেহাত ছোঁয়া নিষেধ তাই, নইলে ঠাকুমা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন।

একদিন বাবুরালির কাঁধে চেপে ঠাকুমার সঙ্গে তাদের বাড়ি গেলাম। বড় বড় গাছের অপরাহ্ণছায়ায় তাদের পাটকাঠির কুঁড়ের বাইরে বাবুরালির মা বসেছিল, বিধবা, সাদা সন্ধ্যামণির হালকা ঝোপের মতো। আমি ইতস্তত ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম- অযত্নে, বন্য গুল্ম-লতা ঘন হয়ে এগিয়ে আসছে চারদিক থেকে। ঘরের মধ্যে অন্ধকার। একটা কানাভাঙা

আমানির কলসি এক জায়গায় বসানো। হাঁস মুরগি কিছু নেই, গাছে বনের পাখি ছাড়া আর কোনো জীবজন্তু নেই। ওরা বোধ হয় জীবনেও গোমাংস খায় নি। পাবে কোত্থেকে?

ঠাকুমার সঙ্গে, এবং পরে আমি একা একা, সাঁকো পেরিয়ে কামারবাড়ি, গোয়ালবাড়ির অনেক ঘরে বহুবার গেছি। ওরা আমাদের চেয়ে বর্ধিষ্ণু, কিন্তু জান্তব। সোনারুপোর স্যাকরাদের চেয়ে লোহার কামাররা বেশি শক্তিশালী এবং বেশি জান্তব। ওদের বিয়ের পাট অতি অল্প বয়সেই চুকে যেত। বিয়ের উষা থেকে স্ত্রীলোকেরা একঘেয়ে সুরে বিয়ের গ্রাম্য গান গাইত। বিয়ের পর মেয়ে যখন প্রথম ঋতুমতী হত তখন তাকে নিয়ে রীতিমতো মেয়েলি উৎসব হত। ওরা বলত, অমুক ফল দেখেছে। ফিসফিস করে মেয়েরাই এ পাড়ায় ও পাড়ায় সেই খবর ছড়াত। আমি বুঝতে পারতাম না, ফল দেখা কি। আমাদের মেয়েরা কোনদিন ফল দেখত না। অথচ কী গভীর ব্যঞ্জনাময় এই লৌকিক শব্দটি!

ওদের কিশোরী এবং যুবতী মেয়েরা খুব চ্যাপটা করে মস্ত খোঁপা বেঁধে তাতে গোছা গোছা ঝুমকো ঝোলানো কাঁটা গুঁজে বিকেলে সাজ করত, পাছাপেড়ে শাড়ি আর ভারী ভারী গোট মল অনন্ত পরে ঝর ঝর করে এ ঘর ও ঘর করত, বিনবাতাসে হেলেদুলে খালের ঘাটে এসে পেপাষা হাঁসদের ডাকত– চৈ চৈ চৈ চৈ চৈ!

গোয়ালাদের মেয়েরা কিন্তু কামারদের তুলনায় ছিল সুকুমারী। কামার-রমণীদের দেহে ধাতুর ধার এবং কলঙ্ক, গোয়ালিনীদের শরীরে ক্ষীরের গভীর লাবণি। কিন্তু গোয়ালাদের মেয়েরাও ফল দেখত।

.

কলকাতা

মা মারা যাবার বছরখানেক পরে দিদিমা আমাকে দেখতে চাইলেন। ঠাকুমার সঙ্গে আমি সেই প্রথম কলকাতায় এলাম। সেই আধ শতাব্দী আগেকার কয়েকটি নগরদৃশ্য আজও

আমার মনে আছে। মিরজাপুর কিংবা অখিল মিস্ত্রি লেনে ছিল সেই বাড়িটা। শানবাঁধানো ছোট্ট উঠোনের একধারে বিরাট চৌবাচ্চা জলে টইটুম্বুর, তলাটা নিস্পন্দ সবুজ, রহস্যময় আমি নামলে তলিয়ে যেতে পারি। সমস্ত জায়গাটা ছালা পড়া, রোদহীন। বাড়িওলা সোনার বেনে এবং মাতাল। গভীর রাত্রে তার দোতলার মহল থেকে অপ্রকৃতিস্থ চেঁচামেচি শোনা যেত। তাকে দেখি নি। তার যুবতী বোন নীহারকে দেখেছি যখনতখন গল্প করতে নেমে আসত। প্রগাঢ় সুন্দরী এবং প্রগল্ভ। ঐ রকম চুম্বক রহস্য এর আগে দেখি নি। সে আমাকে বুকে চেপে ধরে চুমু খেলে ভিতরের পাখি ছটফট করে উঠত, কিন্তু আমি নড়তে পারতাম না। দিদিমা তার রূপের সুখ্যাতি করলে অলজ্জভাবে বলত, 'আপনার ছেলে আমার চে বড় হলে বে দিতেন বুঝি?'

ভিতর-উঠোনের বারান্দায় একটা তক্তপোশ পাতা ছিল। সেখানে আমার তরুণী ছোটমাসি পড়াশোনা করত। তার মুখে সরু দড়ির লাগাম দিয়ে আমি ঘোড়ায় চেপে ছিপটি লাগাতাম। ছোটমাসি চমৎকার মেয়ে। ঐ সংসারের দেনা-পাওনায় জড়িয়ে যাবার জন্য সে আসে নি। কয়েক বছরের মধ্যেই টাইফয়েড হয়ে মরে গেল। অনেক কাল পরে, এক দূরদেশে, ভুলে যাওয়া বাতিল জিনিসের আস্তানায় একটা স্টিল ট্রাংকের মধ্যে আমি তার লম্বা চুলের গোছা এবং গানের খাতা আবিষ্কার করেছিলাম। শুকনো চুলের গোছা হাতে নিয়ে স্তম্ভিত আমি যেন স্পষ্ট দেখলাম: ছোটমাসি দৌড়ে চলে যাচ্ছে নাগালের বাইরে– তার দীর্ঘ দীর্ঘ চুলের প্রান্ত এখনও উড়ছে ইহলোকে। ইহজগৎও স্থির পরজগৎও স্থির, মাঝখানে শুধু আমিই কাঁপি।

সন্ধ্যারাত্রে একদিন হগসাহেবের বাজারে যাওয়া হল। কী আলোর বাহার! কী অবাক করা জিনিসপত্র! একটা দোকানে মস্ত শো-উইন্ডো জুড়ে একটা মানুষপ্রমাণ আলুর পুতুল কেবল ডাইনে বাঁয়ে যান্ত্রিকভাবে মাথা নাড়ছিল। আমাকে বোঝানো হল, ওটা মাতাল পুতুল। পুতুলটা উজ্জ্বল, বিরাট এবং অস্বস্তিকর বলেই তাকে মনে আছে।

একদিন রাত্রির কলকাতায় একটা দোতলা ছাদহীন বাসে সবাই মিলে উঠেছিলাম। মাথার উপর কী সুন্দর কালো তারাভরা আকাশ, আর গ্রীষ্মের গভীর বাতাস। রাস্তায় গ্যাসের মৃদু আলোর সারি। চারদিকের সীটে সুবেশ মানুষ। শহরে যে-সুখ বাস করে এতক্ষণে ঠিক তার গন্ধটি পেলাম।

গভীর রাত্রে বাড়ির গলি দিয়ে কুলপি বরফ হেঁকে গেলেই একটি আদায় করতাম। অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে সাদা কুলপি থেকে ধোঁয়া উড়ত। মুখে দিলেই যেন জিভ পুড়ে যেত। গরম কুলপি আস্তে আস্তে শীতল হত আর গলত। খুব ঠাণ্ডার স্পর্শানুভূতি যে পোড়ানির তা মনস্তত্ত্বের বই পড়ার বহু আগেই হাতেকলমে জানা হল।

কলকাতায় এলেই গঙ্গাস্নানে যেতে হয়। একদিন দুই বেয়ান গঙ্গাস্নানে চললেন, সঙ্গে আমি। তাঁদের বুক পর্যন্ত জলে গঙ্গা ঢেউ দিচ্ছেন। আমাকে ঠাকুমা বুকে জড়িয়ে আছেন ডুব দেওয়াবেন বলে। হঠাৎ সেই অবস্থায়, আমাকে নিয়ে দুই বেয়ানে একটা প্যাকট হল: বড় বেয়ানের দেহরক্ষার পর আমি ছোট বেয়ানের কাছে হস্তান্তরিত হব। আমি তখনই আক্ষরিকভাবে ছোট বেয়ানের কাছে হস্তান্তরিত হলাম। আমাকে বুকে নিয়ে দিদিমা ভুস ভুস করে তিন বার গঙ্গায় ডুব দিয়ে ঐ মর্মে তিনসত্য করলেন। দু মিনিটে আমার পরভৃত জীবনের বীজ পত্তন হয়ে গেল। এবং যথাকালে ঐ সত্যের কথা সবারই মনে পড়েছিল।

এর পর কলকাতার স্বল্পকালীন নবাবী শেষ করে আমি আবার গ্রামের মন্থর এবং গভীর জীবনে ফিরে এলাম।

.

ছোটমা

আমার যখন আড়াই বছর বয়স তখন বাবার আবার বিয়ে হল। বাবার এই জায়গায় বিয়ের আমিই নাকি ছিলাম প্রধান ঘটক। ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকম: একজন গৌরবর্ণ,

লম্বা, প্রকটহাড় বুড়ো মানুষ প্রায়ই বিকেলের দিকে দাদুর কাছে আসছিলেন। দাওয়ায় বসে তিনি কথাবার্তা বলেন, আমি দাদুর পাশটিতে থাকি। বুড়ো মানুষটি, আমি টের পেতাম, অন্য রকম বিনীত, আমার প্রতি মনোযোগী এবং কিছু একটা নিয়ে দাদুকে ধরাধরি করছেন। আসলে কন্যাদায়গ্রস্ত ঐ ভদ্রলোক ছিলেন আমাদের চেয়েও গরিব, আর আগের পক্ষের আমার অস্তিত্বও ছিল একটি সমস্যা। দাদু ও ঠাকুমা ঠিক মত দিতে পারছিলেন না। একদিন নাকি, যখন কথাবার্তা নিষ্ফল হবার মুখে, আমি হঠাৎ উঠে গিয়ে ক্লিষ্ট লোকটিকে দাদু বলে ডেকে কোলে বসে তাঁকে আপ্যায়ন করলাম। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে নিমজ্জমান ভদ্রলোক আমার ঐ সম্বোধন এবং অভ্যর্থনাকে বিধাতারই ইঙ্গিত হিসেবে। দাঁড় করালেন। দাদু ও ঠাকুমাও আর আপত্তি করলেন না। ব্যাপারটার যেন দৈবনিষ্পত্তি হয়ে গেল। আজ আমরা পাঁচ ভাই এবং চার বোন সবাই জানি, আমাদের ডেসপট, রাগী এবং আজীবন ভাগ্যতাড়িত বাবার পক্ষে আমার ঠিক করে দেওয়া মেয়েটির চেয়ে ভালো পাত্রী আর হয় না।

একই গ্রামে, হাঁটাপথে আধ ঘণ্টা দূরে বাবার নতুন শ্বশুরবাড়ি। একদিন সন্ধ্যা উতরে যাবার পর বাবার সঙ্গে নতুন বউ এসে দাঁড়াল আমাদের বেলেমাটির রুপোলি সাদা উঠোনে। তখন উঠোনের ছ দিকে ছড়ানো ছটি বাড়ি থেকে স্ত্রীলোকেরা ও বাচ্চারা কোলাহল করে বেরিয়ে এসে ভিড় করেছে। ফিকে জ্যোৎস্নায় মস্ত সাদা উঠোন। বারান্দায় হ্যাঁজাক বাতি টাঙানো। বাড়িগুলোর পিছনে হালকা জঙ্গলে-গাছে নরম অন্ধকার অনেক দূরের জঙ্গল-জলের মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে গেছে। ঘন ছোট্ট কোলাহলের মধ্যে আকাশকে খুব স্থির আর নীরব লাগছিল। ঘরে তুলবার আগে, উঠোনেই, বড় একটা কালো পাথরের থালায় মেয়েরা কাঁচা দুধে আলতা গুলে সেই সুন্দর গোলাপী জলে নতুন বউকে দাঁড় করাল। হালকা পায়ের দুটি পাতা সেই পাথরের থালার মধ্যে ছবির মতো লাগছিল। আমাদের বড়পুকুরের জলে বিকেলে হিজলফুল আর সকালে আগের দিনের পুজোর গন্ধরাজ ভেসে থাকত- আমার এই নতুন মাকে কখনো এ ফুল কখনো ও ফুল মনে হত।

বাবার মনে বোধ হয় এই নতুন বিয়ে সম্পর্কে কোনো দুঃখ বা অন্যায়বোধ ছিল। এই স্ত্রীকে নিয়ে তিনি সারা জীবনে কোনো ফোটো তোলান নি। অথচ মৃত স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর যে যুগলে ফোটো ছিল সেটি কলকাতা থেকে বড় করে আঁকিয়ে এনে, এই বিয়ের ছ মাসের মধ্যেই, খুব প্রকট জায়গায় টাঙিয়ে রেখে গেলেন। সে ছবি কোনোদিন স্থানচ্যুত হয় নি। বছর দু-তিন পরে কাকাকে তিনি একটা স্টেশনারি দোকান করে দিয়েছিলেন আমাদের গ্রামের বাজারে। সে দোকানের সাইন বোর্ড নিজের হাতে লিখলেন: সুপ্রভা স্টোর্স। সুপ্রভা তাঁর মৃত স্ত্রীর নাম। ব্যাপারটা আমার ভালো লাগে নি। কৃতজ্ঞ শোকের চেয়ে কৃতঘ্ন শোক অনেক মানবিক। অনেক অনেক বছর পরে, একেবারে অন্য দেশে, বাবা তার শেষ দোকানটির নাম দিয়েছিলেন: শান্তি ফার্মেসি। শান্তি আমার নতুন মায়ের নাম। সাইন বোর্ডটা দেখে সত্যিই খুশি হয়েছিলাম মনের মধ্যে ফুরফুরে একটা কৌতুক খেলা করেছিল। বাবা তাঁর মৃত্যুর আগে নিশ্চয় বুঝেছিলেন, দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে তাঁর যে চারটি ছেলে এবং চারটি মেয়ে জন্মেছিল, যারা দুঃখে-কষ্টে-বিষাদে তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল, তারাই তাঁর আপন, নিঃস্বার্থ, অক্ষুণ্ণ বংশধর।

.

বাস্তু

গল্পে পড়া রাজার আসনের মতো ছোট্ট বিছানাটা শিশুদের পিঠে অনেকদিন ধরে সেঁটে থাকে। তারা হাত-পা ছোঁড়ে, পায়ের বুড়ো আঙুল টেনে এনে মুখে পোরে, কিন্তু পিঠ আলগা করতে পারে না। হয়তো কিছু না পেরেই তখন পুরুষ-শিশু উলটোমুখে এমন বেগে প্রস্রাব করে যে সেই জলধারা প্যারাবোলিক পথে তার শরীর ডিঙিয়ে, মাথা ডিঙিয়ে শিয়রের কাছে বসা মায়ের গা, দুধের বাটি ভিজিয়ে দেয়। শিশুশরীরের লীলা দেখতে দেখতে শুধু মায়া জড়ায় না, অনেক গ্রন্থিও মোচন হয়। দিনে দিনে সে উপুড় হয়, হামা টেনে মানুষের পিছে ঘোরে, টলতে টলতে দাঁড়ায়, পড়তে পড়তে হাঁটে– সব কঠিন লড়াই একা একা সে নিজে ছাড়া এইসব জয় কেউ বোঝে না। শিশুর জগৎ কুয়াশার মধ্যে কুয়াশা। তবু এইসব ক্রিয়ার

সময়ে তার ভীমের মতো উত্তেজিত মুখ দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় আচ্ছন্নতার মধ্যেও কি প্রচণ্ড ভলিশন কাজ করছে। কিন্তু তার সত্যিকারের অ্যাডভেঞ্চার ঘটে যায় সেই দিন, যেদিন সে একা একা সবার চোখ এড়িয়ে ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে উঠোনে পা দেয়। চৌকাঠ ডিঙিয়ে যেতে পোষা ছেলের অনেক সাহস লাগে। কিন্তু ভয়কে ছাপিয়ে ওঠে অন্য রকম ডাক। এই ডাকে সাড়া না দিলে কোনো শিশুর প্রাণ বাঁচে না।

আমিও একদিন দাওয়া থেকে উঠোনে নামলাম, দিনে দিনে উঠোন থেকে গাছের কাছে, গাছ থেকে বনের মধ্যে, এ বন সে বন থেকে পুকুরপাড়ে, তিনখানা পুকুরপার ঘুরে মাটির রাস্তা ধরে খালের পাড়ে গিয়ে আটকে গেলাম। আমাদের পাঁচ শো বিঘের হালকা বন এবং ঘোর জঙ্গল, পুকুর, খেতের মাঠ ও শ্মশান নিয়ে শরিকী বাড়িটা ঘিরে আছে পরিখার মতো খাল। তার জোয়ার-ভাটা-খেলা জলের উপরে বাঁশের উঁচু সাঁকো। ওপারে অন্য বাড়ি। বড়দের কোলে চেপে দূরদূরান্ত কলকাতায় যাওয়া, আর। একা পায়ে পায়ে এই নির্জন খালপাড়ে আসা– এ দুইয়ে অনেক তফাত।

কিন্তু প্রথমে বন্দনা এবং বর্ণনা করি আমাদের বাস্তুভিটেটির। এজমালি বিশাল উঠোনটার পশ্চিম দিকে আমাদের ভিটে। মাটির ভিত, বাঁশের খুঁটি, কাঠের পাটাতন, টিনের চাল। আস্ত আস্ত ত্রিশিরা হোগলাপাতা, চাছা চেরা বাঁশ ও বেতের বাঁধন দিয়ে তৈরি হালকা বেড়া। উপরে আদ্যিকালের অক্ষয় করুগেটেড শীট আর নিচে স্থাবর মাটির ভিতটি ছাড়া সমস্ত বাড়িটাই পলকা। খুঁটির পাকা বাঁশগুলো মানুষের হাত লেগে লেগে চিক্কণ এবং রক্তাভ হলদে। পাকা হোগলাপাতার বেড়া নরম এবং সোনালি বাইরে কড়া রোদ থাকলে হোগলাপাতার ফাঁপা শরীর ভেদ করে ঘরের মধ্যে আভা আসে। রাত্রে, বনের অন্ধকারে রেড ইন্ডিয়ান টিপিতে রান্নার আগুন জ্বললে বাইরে থেকে তাকে আলোভরা ফানুসের মতো দেখায়, দিনের বেলা তেমনি আমাদের ঘরের ভিতরটা। –বাড়িটা যেন দিনের মণ্ডলের মধ্যে

আছে। বেড়ার সমান্তরাল ঠাসা হোগলাপাতায় যদি কোথাও কোনো সূক্ষ্ম ফাঁক থাকত সেখান দিয়ে সূর্যের কিরণ ঢুকত তীক্ষ্ণ ব্লেডের পাতের মতো। হঠাৎ সেই কিরণের মধ্যে দেখতাম সাত রঙের কণার বিচ্ছুরণ।

ঝড়ে এই পলকা বাড়ি উড়ে যেতে পারে, একবার রাত্তিরে গিয়েছিল। সেদিন আমরা অন্ধকারে, ঝড়ে-জলে লণ্ঠন নিয়ে খুব ছুটোছুটি করেছিলাম। সমস্ত রাত ধরে বাড়িটা পাখির ছেঁড়া বাসার মতো আমাদের কয়েকটা অস্থাবর সম্পত্তি বুকে নিয়ে ভিজল। পরদিনই দাদু আর কাকা দুজন ঘরামিকে নিয়ে সকাল থেকে খেটে বিকেলের দিকে গভীর নীল আকাশের নিচে বাড়িটাকে যথাস্থানে দাঁড় করিয়ে ফেললেন।

আমি লক্ষ করতাম, বাড়িটার চারখানা কামরায় চার রকমের আলোবাতাস। পুবখোলা বারান্দার লাগোয়া, উত্তর দক্ষিণে লম্বা কামরাটায় তাজা এবং ঝকঝকে আবহাওয়া রোদ সকালে সরাসরি আসে, সাদা উঠোন থেকে প্রতিফলিত আলো দুপুরে বাদামী হয়ে ঘরে ঢোকে। বিকেলে ওদিকেই আগে ছায়া পড়ে শুষ্ক ছায়া। ঘরটায় সংসারের গন্ধ কম। ঐ সরু ঘরটা সারা দিন দাদুর, রাত দ্বিতীয় প্রহরের পরে কাকার।

এর পিছনের কামরাটা বড়, প্রায় চৌকো। এখানে হাওয়া এবং রোদ দুইই কম, ছায়া এবং আভা বেশি। এখানেই দুপুরে ঠাকুমার আড্ডা এবং সন্ধ্যা হলেই আমাদের ঢালাও গড়াবার ব্যবস্থা। এই ঘরের মেঝের মাটিতে আমি তারার দেশের, কিন্নরলোকের এবং প্রেতলোকের রং আবিষ্কার করেছিলাম। ঘটনাটা এই রকম: একদিন বাইরে খুব ছোটাছুটি ঘোরাঘুরি করে এসে সটান মেঝেতে গড়িয়ে পড়েছি। ঘরে কেউ নেই। ঠাণ্ডা মাটির স্পর্শ চমৎকার লাগছে। আমি সাপের মতো উপুড় হয়ে মাটিতে চিবুক লাগিয়ে লম্বা শুয়ে আছি। আমার নিচু চোখের দৃষ্টি জ্যামিতির স্পর্শকের মতো হাত দুয়েক দূরের মাটির সমতল আলগাভাবে ছুঁয়ে আছে। এই রকম অবস্থিতিতে চোখের ফোকাস হয় না। আমার শরীর কেমন যেন শান্ত আর মন নিস্তব্ধ হয়ে এল। আমি ঐভাবে থেকে দেখতে পাচ্ছি মাটির ধূসর শান্তি। হঠাৎ ঐ ধূসর আবছায়ার গায়ে দেখলাম, জেগে উঠছে অস্পষ্ট রঙের গুঁড়ো সিঁদুরের ধুলোর মতো ছড়িয়ে

ছড়িয়ে আছে সবুজ, খয়েরী, লাল, বেগুনী, নীল, ময়ূরকণ্ঠী। সেই অতি সূক্ষ্ম গুঁড়ো ক্রমশ নড়ছে, জায়গা পালটাচ্ছে, কখনো চক্রের মতো ঘুরছে। দেখতে দেখতে ক্রমশ মনে হতে লাগল, মেঝেটা যেন একটা ধূসরছায়া আকাশ, তার মধ্যে অসংখ্য অগণ্য নানা রঙের কণা কণা গ্রহ নক্ষত্র রছে। সেই শুরু। তার পর থেকে আমি প্রায়ই মেঝেতে ঐভাবে শুয়ে নিস্পন্দ হয়ে মাটির রং দেখতাম। এক এক দিন রং এমন ঘোর এবং তার কমবিনেশন এমন ভয়ংকর হয়ে উঠত যে আমি ভয় পেতাম। আর এক এক দিন শান্ত, নরম, আবছা যেন পরীর পাখায় ফুলের রেণু। এক এক দিন ঐ রঙের কণার মধ্যে থেকে দ্যুতি বেরুত। আবার খানিকক্ষণ পরে, মেঘ এসে যেমন তারা ঢেকে দেয় তেমনি তাদের উপর ছায়া পড়ে যেত। আমি বুঝেছিলাম, আমি ছাড়া আর কেউ ঐ রং দেখতে পায় না। সবাই অন্যমনস্কভাবে ওদের উপর দিয়ে বড় বড় পায়ের পাতা ফেলে হেঁটে যায়।

ঐ দু নম্বর ঘরের সংলগ্ন উত্তরে, পুব পশ্চিমে লম্বা তিন নম্বর ঘর। এখানে একটু মেয়েলি গন্ধ। ছোটমা, বড়মা বাড়ির দুই বউ থাকে এখানে। দুপুরে বড়মা পুরনো কাপড় টানটান করে বিছিয়ে রঙিন পাড়ের সুতোয় কথায় ফোড় দেন। পাথরের আঁতায় ডাল ভাঙেন। ঘুঘুর গায়ের বুটির মতো খোসাসুদ্ধ মুসুর ডাল ভেঙে গিয়ে আঁতার দুই পাথরের ফাঁক দিয়ে রক্তাভ চন্দনটিপের ফোয়ারা ছোটে। ছোটমা চটের উপর রঙিন সুতো দিয়ে আসন তৈরির চেষ্টা করে। পুকুরপাড়ে আর বাগানে পাখি ডাকলে এই ঘর থেকে স্পষ্ট শোনা যায়। দুপুর হেলে পড়লে আলো ছায়া হাওয়া আর পড়ন্ত রোদ এই ঘরে লতার মতো দোলে সধবা, বিধবা দুই বউ আর তাদের চার অচিন সই।

এই ঘরের পুব দিকের জানলায় শিউলি গাছ, ডালিম গাছ, আর পশ্চিমের দরজা দিয়ে নিচে নামলেই বাঁ দিকে বেলফুলের সারি, শশার মাচা, বাতাবি লেবুর গাছ। সামনের দিকে জামিরের গাছ ঝোঁপ হয়ে আছে, করমচা গাছে রত্নের মতো পাকা করমচা। তার পিছনে আরো গাছ, জিয়লের বেড়া, কলমি লতায় ভরা পশ্চিমপুকুর। পুকুরের ওপারে বড় বড় গাছের বন-বাগান।

এই ঘরের ঠিক মধ্যিখানটিতে একটা বাঁশের খুঁটি। সিঁদুরসোনালি খুঁটিটা তৈলধারার মতো পিচ্ছিল। আমি ঐ খুঁটি এক হাতে ধরে লাট্টুর মতো বনবন করে ঘুরতাম। খুঁটির পাশেই বাঁশের একটা আলগা মই। মইয়ের মাথায় পাটাতনের চৌকো ফোকর। ঐ ফোকর দিয়ে উপরে উঠলেই হাতের কাছে সারি সারি মুখবন্ধ জালার মধ্যে মুড়ি, ছাতু, মোয়া, গুড়, ঝুনো নারকেলের পাহাড় আর বাসন। সেখানে ধেড়ে ইঁদুরেরা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বাস করত। পিসতুতো ভাইয়েরা এলে, তাদের সঙ্গে রাত্রে আমিও ঐ পাটাতনে শুতে যেতাম। টিনের চালের উপর শিশির পড়ত। চাল এবং বেড়ার জোড়ের ফাঁক দিয়ে ফুরফুর করে হাওয়া আসত। ফাঁকে চোখ রেখে দেখতাম, ভাঙা চাঁদ হেলে পড়েছে। আমরা যেন এক অচল জাহাজের কেবিনে শুয়ে আছি।

তিন নম্বর ঘরের পাশেই রান্নাঘর। তার ভিত দুই সিঁড়ি নিচু, গোলপাতার ছাউনি। সে ঘরে তিনটি উনুন, পাঁজা সাজানো কাঠ, কলসিভরা জল। সেই ঘরটাই দুপুর তিনটে পর্যন্ত বাড়িটার হৃৎকেন্দ্র, যজ্ঞস্থলী।

.

আমাদের ভাঁড়ার

আমাদের গ্রামের জীবনে, চার বেলা খাবার নানান উপকরণ সংগ্রহ, রান্না করা এবং শিশুদের অনন্ত খাওয়া– এই তিনেতেই ভরে থাকত আমাদের দিনক্রিয়া, আমাদের আনন্দ, আমাদের দুঃখও। সকালবেলা দাদু কোনোদিন কাঁটায় ভরা বেত লতার জঙ্গল থেকে সবুজ একগোছা বেতের ডগা কেটে এনে নামিয়ে দিলেন রান্নাঘরে। বড়মা স্নান করতে গিয়ে ডুব দিয়ে দিয়ে তুললেন ফুলসুদ্ধ সজল শাপলা। ছোটমা আঁকশি দিয়ে পশ্চিমপুকুর থেকে টেনে টেনে নিয়ে এল কলমি আর হিঞ্চে। গিমে শাক, থানকুনি আর বিলিতি ধনেপাতা তো রান্নাঘরের ছাঁচতলায় হয়েই আছে, আমিই খুঁটে খুঁটে তুলে আনতে পারি। এসব হল হাতের কাছে পাওয়া প্রথমভোরের জিনিস।

এ ছাড়া আরো অন্য রকম জিনিস ছিল, যাদের জন্য বনেবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে কিছু খোঁজখবর রাখা দরকার। এ বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন বড়মা আর দাদু। বনের ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় কোথায় সবুজ অলংকারের মতো ঢেঁকির শাক জন্মেছে, কচি ডুমুর কবে খাওয়ার মতো ডাঁশা হল, কোথায় নতুন তেলাকুচো লতা গাছ বাইতে শুরু করেছে, ওলের ভাটারা কবে লম্বা হয়ে ফণা তুলল বনের এসব নিঃশব্দ ঘটনা কখনো বড়মার চোখ এড়াত না। দাদুর মন যদিও এসব মেয়েলি কাজে নেই তবু বনবাগানের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল আরো গভীর। তিনি চিনতেন সমস্ত ভেষজ লতাগুল্ম। ফলে সারা শীতকালটা আমাকে তাঁর তৈরি পাঁচন খেতে হত।

একবার দুর্দিনে দাদু দুপুরের পর খন্তা হাতে বেরিয়ে একটা দুর্গম জায়গা থেকে মন দেড়েক ওজনের এক বিশালকায় মেটে আলু নিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছিলেন। সেই রোমাঞ্চকর অভিযানে আমি তাঁর সঙ্গী ছিলাম। আদিম জগতে প্রাচীন শিকারীর সঙ্গে বালক যেদিন প্রথম শিকারে যায় তার কেমন লাগে, আমি একটু একটু তার স্বাদ পেয়েছিলাম সেদিন। আমাদের পশ্চিমপুকুরের পাড় দিয়ে যে শুড়িপথটা খালের দিকে গেছে সেই পথের বাঁ পাশে ঘন বন। দাদু আর আমি সেই বনে ঢুকতেই মানুষের সাড়া পেয়ে দুটো বিরাট গোসাপ হুড়মুড় করে যেন কোন্ দিকে চলে গেল। কী ঠাণ্ডা ছায়া চারদিকে! বড় বড় কড়ুই গাছ, শিরীষ গাছ, জারুল গাছ তাদের পেঁচিয়ে উঠেছে চই লতা, অনন্ত লতা, আরো কত বুনো লতা। মাটির বুক আঁকড়ে আছে অজস্র আসশ্যাওড়া, অন্যান্য ক্ষুপ আর গুল্মঝোঁপ। দাদু চারদিক একবার দেখে নিয়ে নিশ্চিত পায়ে গিয়ে বনের মধ্যে একটা জায়গায় থামলেন। সেখানে দু হাত দিয়ে ঝরা পাতা সরাতেই দেখা গেল একটা শক্ত লতা সরস কালো মাটির মধ্যে মুখ সেঁধিয়ে আছে সাপের মতো, তার ল্যাজের দিকটা বেয়ে উঠেছে পাশের গাছের উঁচু মগডালে। দাদু নীরব মনোযোগে লতাটার গোড়া বাঁচিয়ে প্রায় দু হাত বেড় জায়গা নিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলেন। আমি নারকেলের মালায় করে সেই মাটি তুলছি। মাটির সোঁদা গন্ধ, গাছপালার কবোষ্ণ গন্ধ, চারদিকের নীরবতা আর ঝিরঝিরে হাওয়া আমাদের ঘিরে আছে। বনের মধ্যে এক বুড়ো আর এক বালক—আমরা দুজনে মিলে একটা কাজের খেলা খেলছি।

মাঝে মাঝে খন্তার ধারালো ফলায় দু-একটা কেঁচো, মাটির নরম কুমুরে পোকা দু-আধখানা হয়ে যাচ্ছে। দাদু গর্ত ক্রমশ গভীর করে চলেছেন আর গর্তের মাঝখানে মাটিতে ডোবা সুবিশাল কন্দ তার কালচে বেগুনী রঙের পাঁজর, বিস্তৃত পাছা এবং শক্তিশালী উরু নিয়ে ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু মাটি আঁকড়ে থাকা সেই মহাবল কন্দকে উপড়ে তোলে কার সাধ্য! দাদু ঘেমে নেয়ে উঠলেন। গর্ত আরো গভীর ও বিস্তৃত হতে লাগল। আমার সারা গায়ে মাটি মাখামাখি হয়ে গেল। মাটির সঙ্গে ঘাম আর আনন্দ। শেষটায়, অপরাহ্ণকালে দৌড়ে গিয়ে বাড়ি থেকে মোটা দড়ি নিয়ে এলাম। দাদু সেই দড়ি কন্দের কোমরে বেঁধে খন্তায় আটকে চাড় দিলেন। চড়চড় শব্দে তার নিচের শিকড় ছিঁড়ে গেল। তার পর যখন সেই বিশাল কন্দকে টেনে উপরে তোলা হল, আমি দেখলাম, যেন কালো পাথরের তৈরি মহীরাবণ উঠল মাটি থেকে। সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে নিয়ে যখন তাকে ফেলা হল, সবাই বলল, এত বড় মেটে আলু তারা জীবনে দেখে নি। বেগুনীকালো ছালের তলায় তার দেহ খোয়া ক্ষীরের মতো সাদা, ভরাট।

এইসব বনের খাদ্য ছাড়াও ছিল আরেক রকমের খাদ্য, মাঠের। শীতকালের শিশিরে ভিজে থাকা গাঢ় সবুজ কলাই শাক আর হালকা সবুজ মটর শাকের কী স্বাদ! তা ছাড়া বড়মার ছিল কিচেন গার্ডেনের শখ। তাঁর ঝাঁপিতে মজুত থাকত শশা, কুমড়ো, লাউ, রাঙা শাক, ডেঙোডাটার বিচি। বর্ষায়, শরতে, হেমন্তে, শীতে আমাদের কত প্রাচুর্য!

এ ছাড়া, শিশুদের ছিল বনে, মাঠে, বাগানে, ভিটের এদিকে সেদিকে চিরদিনের নিজস্ব ভাণ্ডার। গ্রীষ্মের দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরে যখন বাড়িটা শুনশান তখন আমরা আঁকশি হাতে বেরুতাম। তেজী রোদ্দুরে চারদিক খাঁ খাঁ করছে, নীল আকাশের মধ্যে পৃথিবী আপন ভারে উদাস হয়ে গেছে, মেয়েরা পুকুরঘাটে কিংবা অন্দরে, বুড়োরা ঘুমিয়ে। আমরা বেতবনে গিয়ে খুঁজে খুঁজে সাদা থোপা হোপা বেতফল পাড়তাম। খোসা ছাড়িয়ে সেই গভীর চোখের তারার মতো ফল তেল হলুদ নুন মাখিয়ে দুখানা নারকেলের মালার মধ্যে বন্ধ করে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে যখন বার করতাম তখন তার স্বাদ, শুধু বলা যায়, অনির্বচনীয়। আমরা সেই

জারানো ফল, যে যার ভাগ নিয়ে, একটি একটি করে জিভ আর টাকরার মধ্যে রেখে আলতো একটু চাপ দিতাম আর আমাদের দেহমনসত্তা সুখে ভরে যেত।

রোদ্দুর একটু হেলে পড়লে, বড়পুকুরের ওপারে আমাদের নিজস্ব শ্মশানের গা ঘেঁষে যে প্রাচীন কাঁটাবোহরের গাছ, তার তলায় গিয়ে দেখতাম বোহর পেকেছে কোন ডালে। একসঙ্গে দু-তিনজন গাছে উঠে আমরা বাঁদরের মতো সেই ডালের দিকে এগোতাম যেখানে ঐ খুদে খুদে ফল লালচে হয়ে আছে। বোহরের গাছে উঠলে কাঁটায় হাত-পা ছড়ে যাবেই, আর ফলগুলোও মটরদানার চেয়ে বড় না। তবু কোন টানে অত কষ্ট করতাম? সেই কষায় স্বাদ রুক্ষ ফলের সঙ্গে মিশে ছিল বড়পুকুরের জলের আভা, শ্মশান সংলগ্ন হাওয়া, বিকেলের আলো ফল পাড়তে পাড়তে বাঁ পাশে তাকালেই দেখা যেত কর্মকারদের কালীতলা পেরিয়ে, খাল পেরিয়ে, অনেক দূর ধূসর হয়ে ছলছল করছে।

বোহর গাছের পাশেই ছিল প্রকাণ্ড গাব গাছ। ঘোর কালো তার কাণ্ড, অঘোর কালো তার শাখাপ্রশাখা। ঘন গাঢ় পাতায় তার মাথার ভিতরটা অন্ধকার করে আছে। বছরের একটা সময় সবুজ গাব পেকে হলদে হয়ে যায়। 'আমি পাকা গাবের লোভে গাছে উঠতাম। কিন্তু পাতার ঐ থমথমে অন্ধকারের মধ্যে মহা ভয় করত। গাব গাছের মাথার মধ্যে এক নিস্তব্ধ ব্যক্তিত্ব- অন্য জগৎ। আমি ভয় পেয়ে পালিয়ে আসতাম।

পশ্চিমপুকুরের পারে বাঁশঝাড়ের কাছে ছিল জামরুল গাছ। বর্ষায় জামরুল ধরত, আর বৃষ্টি হলে জল খেয়ে খেয়ে তারা টোবাটোবা হয়ে থাকত। কিন্তু সেই গাছে ছিল লাল নালশে পিঁপড়ের বাসা। জামরুলপল্লবের পাতা সূক্ষ্ম উর্ণায় জড়িয়ে জড়িয়ে তারা দশ-বারোখানা ঝুলন্ত পিঁপড়ে-গ্রাম তৈরি করেছে। সারা দিন গাছটা জুড়ে তাদের ব্যস্ত যাতায়াত যেন হাজার হাজার সান্ত্রী রাজত্ব পাহারা দিচ্ছে। ওখানে পা দেয় কার সাধ্যি! বৃষ্টির পরে দেখতাম, থোলো থোলো সাদা জামরুল রসে টসটসে হয়ে আছে। আমি চটের বস্তা গায়ে জড়িয়ে দ্রুত উঠে পড়তাম গাছে, ঝপাঝপ কয়েকটা থোলো ছিঁড়ে মাটিতে ফেলেই দুড়দাড় নেমে পড়ে গায়ের বস্তা ছুঁড়ে ফেলতাম। তাতে তখন কয়েক শো পিঁপড়ে কামড়ে আটকে আছে। আর, এত

বর্মচর্ম সত্ত্বেও বেশ কয়েকটা আমার মাংসে সাঁড়াশির দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। কালবিলম্ব না করে গায়েই তাদের ডলে মেরে ফেলতাম।

জামরুল গাছের পাশেই ছিল গোলাপজাম গাছ। তারাঝুমকোর মতো তার সাদা ফুল পাতাপল্লবের ছায়াচ্ছন্নতার মধ্যে অপরূপ লাগত। গোলাপজাম পাকলে ফলের মধ্যে তার বিচিটি আলগা হয়ে ঠনঠন করে।

ধনদিদিদের ঘরের কোণ ঘেঁষে ছিল এক সটান উঁচু কালোজাম গাছ। সেই গাছে কর্ত্রীর অনুমতি ছাড়া ওঠা যেত না। কিন্তু এক বার অনুমতি পেলে কখন নামছি তাও কেউ দেখত না। জাম খেতে খেতে জিভ বেগুনীনীল এবং পুরু হয়ে যেত। তখন ডালে হালকা ঝাঁকুনি দিয়ে গাছের তলায় অপেক্ষমাণ বালিকাদের জন্যে হরির লুট দিতাম।

কৃশ ঋতুতেও বনবাগানে ঘুরতে ঘুরতে কিছু না কিছু পাওয়া যেত। একবার বহেড়া গাছের তলায় শুকনো পাতার মধ্যে ঝরে পড়া কয়েকটা বহেড়া পাওয়া গেল শক্ত, খাবার অযোগ্য ফল। কিন্তু একজন আমাকে শেখাল, বহেড়ার মধ্যে ছোট্ট একটি বাদাম আছে– দা দিয়ে খোলাটাকে কাটলেই তাকে পাওয়া যাবে।

পশ্চিমপুকুরের পাড় দিয়ে যে পায়ে চলা পথ খালের দিকে চলে গেছে, একটু এগোলেই, তার দু দিকে দুটো বিস্তৃত কৃষিখেত। সেখানে চাষীরা চাষ দিত– বাঁ দিকের খেতে বর্ষায় পাট,

ডান দিকের খেতে শীতে মটর, কলাই। আমরা শীতের দুপুরে মটরশুঁটির লোভে সেই খেতে ঢুকতাম। মাটির উপর শুয়ে পড়লে সবুজ ফুরফুরে মটর লতা আমাদের ঢেকে দিত, কেউ আমাদের অস্তিত্ব টের পেত না। আমরা মটরশুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে প্রাণ ভরে তাদের কচি দানা খেতাম। টনটনে এবড়োখেবড়ো মাটির উপর শুয়ে সবুজ মটর লতার ফাঁক দিয়ে দেখা যেত শীতের নীল আকাশ। মটর লতার শস্পগন্ধ আর নরম রোদ আমাদের গায়ে জড়িয়ে যেত। হঠাৎ হঠাৎ কুবোপাখির কু কু কুব কুব আর শঙ্খচিলের টি টি টি টি-ই ডাক সেই ফুরফুরে জালের গায়ে অন্য সুতোর ফোঁড় দিয়ে যেন রহস্যজগতের ফুল এঁকে দিত। আমাদের সাহস ক্রমে বাড়ছিল। আমরা একটা ভাঙা কড়াই জোগাড় করে তেল নুন দেশলাই নিয়ে সেই মাঠে যেতে লাগলাম। সেই মটর লতার বনে বসেই শুটি ছাড়াই, পাতা কুড়িয়ে আগুন জ্বালি আর কড়াইতে তেল নুন দিয়ে শুটি ভেজে খাই। কেউ আমাদের দেখতে পায় না। একদিন শুটি ভেজে পেট পুরে খেয়ে সবুজ লতার তলায় মৌতাতের মতো লাগল। আমরা গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন শীতের ঠাণ্ডা কাঁপুনিতে ঘুম ভাঙল তখন দেখি, সর্বনাশ! চারদিক ঘোর অন্ধকার, মাথার উপর আকাশ তারায় ছেয়ে গেছে। আমরা রিপ ভ্যান উইংকলের মতো কতক্ষণ ঘুমিয়েছি। কিন্তু এখন বাড়ি ফিরব কি করে? বাঁ দিকে খালপাড়ের সেই বিরাট তেঁতুল গাছে জোনাকিরা ঝমঝম করছে। আমাদের শরীর ভয়ে ভারী হয়ে গেছে। তেঁতুল গাছে কিসের যেন ঝটাপটি। কে যেন কার ঘাড় মটকে রক্ত খাচ্ছে। এমন সময়, দূরে, বাড়ি থেকে আমাদের নাম ধরে ডাকাডাকি শোনা গেল। আমরা অনেকক্ষণ পরে ভাঙা গলায় সাড়া দিতে পারলাম। মিনিট কয়েক পরেই কাকা লণ্ঠন হাতে এসে আমাদের উদ্ধার করল।

আমাদের বাড়ির বেশির ভাগ আম গাছই ছিল এজমালি। ঐ গাছগুলো থেকে টুপটাপ ঝরা কচি আম, কালবৈশাখীর ঝড়ে বোঁটা ছিঁড়ে ছিটকে পড়া আঁটো আম আর গভীর রাত্রে খসে যাওয়া পাকা আমগুলোর উপর কারো স্বত্ব নেই– যে কুড়িয়ে নিতে পারে, আম তার। বোল থেকে কবে গুটি ধরেছে খেয়াল করি নি হঠাৎ একদিন বড়মা মুঠো খুলে দেখাতেন একটি সবুজ কচি আম। আগন্তুক সেই প্রথম আমটি আমাদের গ্রীষ্মের নিশান।

তার পর থেকে আমের পাতলা অম্বল, টক ডাল, ঘন চাটনি আমাদের খাদ্যতালিকায় পরিবর্তন আনত। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্র, সরষের ঝাঁঝ আর আম মিলিয়ে, মেয়েদের নিজস্ব রিয়ালের পর, টনটনে মাটির হাঁড়িতে তৈরি হত কাসুন্দি। কালবৈশাখী ছুটলে বালক-বালিকাদের সঙ্গে আমিও ছুটতাম আম কুড়োতে। বনের মধ্যে আমতলায় ঝড়ের কী বেগ! সাঁই সাঁই, কড়কড়, সোঁ সোঁ বাতাসের, বাজের, গাছের শব্দ। পাতা ছিঁড়ে উড়ে যাচ্ছে, মুচড়ে ভাঙছে বড় বড় ডাল, আমগুলো ভয়ংকর ট্রাপিজে দোল খেতে খেতে দড়ি ছিঁড়ে কোথায় যে গিয়ে পড়ছে! আমরা ঝড়ের মধ্যে হুলুস্থুল করছি। হুলুস্থুলটাই আমি বেশি করতাম। দেখছি আম ছিটকে পড়ছে, কিন্তু আমার আগেই গিয়ে কেউ সেটাকে কবজা করে নিল। খালি হাতে ফিরছি দেখে কেউ তার নিজের সম্পত্তি থেকে দু-চারটে দিয়ে দিত। তবু আমি প্রত্যেক বার প্রতিযোগিতায় যেতাম- আমের চেয়েও, ঝড়ের কেন্দ্রে, জমাট কালো মেঘের কেন্দ্রে নিজেকে পাখির পাখার মতো উড়োতে বড্ড ইচ্ছে করত।

আম পেকে ওঠার পর থেকেই বড়মা রাত্রে মাচায়-বসা-শিকারীর মতো সজাগ হয়ে যেতেন। মশারির বাইরে তাঁর মাথার কাছে লন্ঠন মিটমিট করত। গভীর রাত্রে বনের মধ্যে

বাতাস এবং গাছেরা অনেক রকম শব্দ করে। তার মধ্যে পাকা আমটি খসে পড়ার নিঃসঙ্গ শব্দটা তিনি শুনতে পেতেন। আর অদ্ভুত শব্দভেদী কান তাঁর শোনামাত্র লণ্ঠন হাতে ছুটে যেতেন ঠিক অকুস্থলে। আম আর লণ্ঠন দু হাতে নিয়ে ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়তেন। এই রকম এক এক রাত্তিরে কত যে বার! পুকুরপাড়ের আম গাছ থেকে ভারী আম ঝুপ করে জলে পড়ে কাদায় গেঁথে যেত, বড়মা তাও টের পেতেন। তাঁর গুণপনা এবং দয়ায় আমরা প্রচুর আম খেতে পেতাম। একবার মনে আছে, বিকেলবেলা রান্নাঘরে বঁটি পেতে বড়মা আম কেটে কেটে দিচ্ছেন, আমি আর আমার ছোট ভাই খাচ্ছি। খাবার পরে আঁটি গুনে দেখা গেল, ৭২ টা।

পিসতুতো ভাইয়েরা এলে, এজমালি গাছ থেকে রাত্রে ডাব চুরি করে চাঁদের আলোয় বসে খাওয়া হত। আমার মনে হত, আমরা যেন সাতভাই চোর। সকালবেলা গাছতলায় কাঁদি কাঁদি ডাবের খোলা কাটা মুণ্ডের মতো পড়ে আছে দেখে ধনদিদি তারস্বরে গালাগাল। দিতেন, শাপ দিতেন– যেন তেরাত্তির না পোয়ায়, অতিসারিয়ারা যেন কলেরা হইয়া, মরে! আমরা মুখ লুকিয়ে হাসতাম। ছোটমা আমাদের কীর্তি কি করে যেন টের পেত, কিন্তু কাউকে বলত না।

আমার পিসতুতো ভাইয়েরা বুনো ফল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করত। বনের মধ্যে ছোট ঘোট একরকম গাছে আতার বিচির মতো কালো কালো ফল ধরত। তারা আমাকে ঐ ফল খেতে শেখাল বেরিজাতীয়, বেশ মিষ্টি। তারা বলত, আগে দেখে নিবি পিঁপড়ে লাগছে কিনা। যে ফল পিঁপড়েরা খেতে পারে সে ফল মানুষরাও খেতে পারে। কিন্তু একবার বিষফল খেয়ে একজন ভিরমি গেল। ছোটপিসিমা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, মরুক, দু-একটা মরলে আমার হাড় জুড়োবে না। আমার পিসতুতো ভাইয়েরা ছিল পঙ্গপালের মতো। দু-এক মাস থেকে ওরা যখন চলে যেত তার পরে অনেক দিন আমাদের বনবাগান। গাছপালা উষর হয়ে থাকত।

বড়মা তার বাপের বাড়ির গ্রাম থেকে একটি অনবদ্য খাবার সঙ্গে করে আনতেন। তার নাম হোগলগুঁড়ি। পৃথিবীতে অমন সুখাদ্য আর আছে কিনা সন্দেহ। মিশরের প্যাপায়ারাসের মতো হোগলা গাছ জন্মায় জলাতে। জলের উপর সবুজ কিরিচের মতো তন্বী, সরল হোগলা গাছ। তার ডাঁটায় ফুল ফোটে। সূক্ষ্ম গুঁড়ো গুঁড়ো রেণুতে ভরে থাকে সেই ফুল। নৌকো বেয়ে বেয়ে লোকেরা ফুলের গা থেকে ঐ রেণু সংগ্রহ করে। সুগন্ধ হলদে রেণু রৌদ্রে শুকিয়ে নিলেই তৈরি হল সোনার গুড়োর মতো হোগলগুঁড়ি। গুড় আর নারকেলকোরা মিশিয়ে খেতে হয়।

আমরা ছাড়তাম না কিছুই। বসন্তকালে রক্তিম পলাশ আর শীতের মাঠে যেতে যেতে সাদা দ্রোণফুল তুলে তাদের অকিঞ্চিৎকর মধুও চুষতাম। সেই কণিকামাত্র মধু শুধু জিভের ডগায় মুহূর্তের মিষ্টি স্পর্শানুভূতি দিয়ে মিলিয়ে যেত। তাও কত সুখ!

চালতা ছিল মেয়েদের প্রিয়, কিন্তু আমি রহস্যময়ভাবে আকৃষ্ট হতাম চালতার ফুলে। বিরাট গাছে, উঁচুতে, জমাট টুকরো টুকরো জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া যেন স্বপ্নের দেশের ফুল। তার শুভ্রতা আর পাপড়ির গড়ন দেখতে দেখতে কোনো গভীর সৌন্দর্যের কথা অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে, নির্জন মনের মধ্যে অন্য কোনো দূর জন্মের স্মৃতি ফুটব ফুটব করেও অন্ধ হয়ে যায়। আমি আস্তে আস্তে তার পাপড়িতে হাত বোলাই।

.

ধান চাল মাছ

যুগ যুগ ধরে আমাদের সাধারণ খাদ্য ভাত, মসুর ডাল আর মাছ। শীতের পর থেকেই চালের বিশাল বিশাল নৌকো সারি বেঁধে এসে লাগত আমাদের বাজারের খালে। মাছের পেটে যেমন ডিম থাকে নৌকোগুলোর পাটাতনের নিচে খোল ভরতি থাকত চাল। এক একখানি নৌকো একাধারে চালের ভাসমান দোকান ও গুদোম এবং ব্যাপারীর বাসস্থান। ব্যাপারীরা বেশির ভাগই মুসলমান। তাদের পরনে মার্কিন কাপড়ের লুঙ্গি, গায়ে সাদা

পিরান, মাথায় চাঁদির মাপে বসানো সাদা কাপড়ের ইহুদি স্ক্যালপ ক্যাপ। দামদর করার সময় তাদের মৃদু গম্ভীর কথাবার্তা সম্ভ্রম উদ্রেক করত। আমার মনে হত, ওরা গাছের মতো অভিজ্ঞ। বিকেলের শেষে তারা ছইয়ের বাইরে পাটাতনের উপর গামছা বিছিয়ে নিয়ে নমাজ পড়ে। তখন তারা মনের মধ্যে কিছু বলে, তাদের মিশকালো দাড়ি নড়ে। খালের জলে স্তব্ধতা, আকাশে স্তব্ধতা, তার মধ্যে তাদের বার বার স্তব্ধ দাঁড়ানো এবং হাঁটু গাড়া সন্ধ্যার শান্তির লগ্নকে আরও গাঢ়তা দিত। দূর অস্তসূর্যরেখার এপারে ওপারে শান্ত আকাশের জারক রস অদৃশ্য হয়ে ছড়িয়ে আছে।

ধান কিনে চাল করলে গৃহস্থের সাশ্রয় হয়। ধান থেকে চাল করার খুঁটিনাটির মধ্যে মেয়েদের কতকালের জ্ঞান আর গৃহস্থছন্দ। দুপুরে রোদ তেতে উঠলে গোবর নিকনো চাটাই পেতে ঠাকুমা সেদ্ধ করা ভিজে ধান শুকোতে দিতেন। বড়মা-ছোটমা মাঝে মাঝে এসে উলটেপালটে দিয়ে আবার ঘরকন্নার কাজে চলে যেত। আমি দাওয়ায় বসে পাহারা দিতাম। ঝাক দিয়ে পায়রা নামত ধানে– সাদা, ময়ূরকণ্ঠী, কালো তাদের লাল ঠোঁট, রাঙা পায়ে নরম আলতা, চোখের মণি দুটো চুনিপাথর দিয়ে তৈরি, কারো কারো আবার মাথায় ঝুঁটি। তারা ধানের উপর হেঁটে হেঁটে গলা বাঁকিয়ে ধান খেত। আমার তাড়াতে মন সরে না। তবু হৈ হৈ করে উঠে হাততালি দিতাম, তারা কলকল করে উড়ে যেত। শালিকরা যত না ধান খেত তার চেয়ে ঝগড়া করত বেশি। আমার ডালিম গাছের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ত, ‘ডালিম গাছে পিরভু নাচে। পিরভু কি রকম? সে কি পাখির মতো কেউ? হলদে রং গা? সোনালি ধানের উপর দুপুরের রূপ ঝরে পড়ত। ধানের চারদিকে আমাদের বালির উঠোন ঝমক দিত। ঘুম পেলে বন্ধ চোখের পাতার বাইরেও যেন পাকা খেজুরের রং দেখা যায়। অনেক দূরে মাঠের মধ্যে দিকশূন্য সূর্য নীলপুজোর ঢাকে কাঠি দিয়েছে—চড়াচ্চড়- চড়াচ্চড়- চররররররর- চরাচর।

আমাদের ঢেঁকিঘর থাকা সত্ত্বেও, কেন জানি না, ছোটমা-বড়মা সুরেন কর্মকারের বাড়ির ঢেঁকিতে ধান ভানতে যেত। আমাদের বড়পুকুরের পুব পারে সুরাকাকার বাড়ি ঘন বনের মধ্যে নির্জন, একলা। সুরাকাকা আর তার বউ নির্বিরোধী এবং অনুগত। শুনতাম, তারা

নাকি আমাদের প্রজা। কিসের প্রজা ভগবান জানেন! ঢেঁকিতে ধান ভানতে দিয়ে কি তারা খাজনা শুধত? আমার কিন্তু খুব অদ্ভুত লাগত, অমন নির্জন বনালয়ে একজন যুবক স্যাকরা সোনারুপোর কাজ করে একা, এই কথা ভেবে।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরে বড় বড় গাছের নিবিড় ছায়ার বনপথে ধামায় ধান নিয়ে বড়মা-ছোটমার সঙ্গে আমি তাদের খোলা ঢেঁকিঘরে পৌঁছতাম। ঢেঁকিতে পাড় পড়ত ক্যাচর ধপ্ কাঁচর ধপ কাঁচর ধপ। বিজন শান্তির মধ্যে ঘুঘু ডাকত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে অস্ফুট মেয়েলি গল্পগাছা চলত। ধান ভানুনীদের ঠোঁটে কপালে ঘাম বিন্দু বিন্দু হয়ে ফুটে রেখা হয়ে গড়িয়ে নামত।

সুরাকাকার বাড়ি যেতে বনপথের একটা বিশেষ জায়গা বড় অপরূপ। আমি ঢেঁকিঘর থেকে পায়ে পায়ে সেই মায়াবী জায়গাটিতে চলে যেতাম। সেই শুড়িপথের দু দিকে উঁচু উঁচু গাছ, লতা এবং ঝোঁপ- এ রকম তো আমাদের আরো আছে। আমাকে যে-সৌন্দর্য টানত তার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট না। আমি লক্ষ করেছিলাম, ঐ জায়গাটুকুর মাটিই অন্য রকম উজ্জ্বল। তার নীরবতা ও ছায়া বড় কল্পনাপ্রবণ। সাধুরা যেখানে বাস করেন সেখানে যেমন শক্তি জমে তেমনি যে জায়গাটাকে মানুষ নিজের সম্পত্তি বলে মনে করে সেখানে ধীরে ধীরে সৌন্দর্য অবতরণ করে।

রোজকার মাছ দাদু রোজ বাজার থেকেই কিনতেন। কিন্তু আমাদের তিনটে পুকুরে প্রচুর মাছ, আর তেঁতুলতলার খাল দিয়েও দূর দূর দেশের মাছেরা এসে দূর দূর দেশে ভেসে যায়। কাকা, যেদিন ইচ্ছে হয়, ঐসব জলাশয়ে গিয়ে মাছ ধরে, একেবারে আদিম কালের কৌশলে। আমাদের দেশে লম্বা গলা, সরু পেট এক ধরনের মাটির কলসি পাওয়া যায়, যার গায়ে মনসার মূর্তি এঁকে পুজো হয়। কাকা সেই মনসার কলসির তলায় কয়েকটা ছাদা করে ভিতরে কিছু শুকনো পাতা পুরে পুকুরের যেখানে কোলাহল নেই সেই গভীর জলে ডুবিয়ে রেখে আসত। আস্তে আস্তে মাছেরা সেখানে বাস করত। একদিন তরুণ নাগপুরুষের মতো ডুবসাঁতার কেটে কাকা নিঃশব্দে হানা দিত সেই মাছের পুরীতে পুরো কলসিটিকে নিয়ে

সাঁতরে চলে আসত পাড়ে। ফুটো কলসি থেকে জল বেরিয়ে গেলে এক এক হাত লম্বা ডজনখানেক শিঙ্গি মাছ বেরিয়ে পড়ে কঁৎ কং শব্দ করত।

এ ছাড়া রাত্রে কাকা কখনোসখনো তেঁতুলতলার খালে আমাকে নিয়ে মাছ মারতে যেত। ঘুটঘুঁটে অন্ধকার জলে কাকা ধারালো দা হাতে তীক্ষ্ণ চোখে অপেক্ষা করত। আমি বুকজলে নেমে লন্ঠন উঁচিয়ে ধরতাম। কালো আকাশ, কালো জলের মধ্যে লণ্ঠনের লাল আলোর নিচে মাছের ছায়া নিঃশব্দে এসে নিথর হয়ে ভেসে থাকত। কাকা ক্ষিপ্র হাতে জলের মধ্যে দা চালিয়ে এক এক কোপে তাদের দু-আধখানা করে ফেলত। খালে বেশ ভালো জাতের বড় মাছ পেতাম আমরা।

উত্তরপশ্চিম দিকে বড়পুকুরের একটা উপসংহারের মতো অংশ ছিল। সেখানটা সবুজ কচুরিপানায় জমাট, পাড় ঘেঁষে কালো হিজল গাছ। সেখানে কেউ কখনো নামত না। একবার একটা খোসপাঁচড়ায় ঘেয়ো ছেলে সেখানে ছুঁচোতে গিয়ে পা হড়কে পড়ল। আর পড়ামাত্র মাছেরা তার ঘা ঠুকরে ঠুকরে এমন অস্থির করল যে সে মহা উত্তেজিত হয়ে এসে খবর দিল, ওখানে যত না জল তার চেয়ে মাছ বেশি। সেই দিনই বাঁশের চিক দিয়ে বড়পুকুরের সঙ্গে ঐ অংশের মুখ আটকে দেওয়া হল। পরদিন কচুরিপানা সাফ করে দেখা গেল, সত্যিই সেখানে সরপুঁটি মাছের এক অদ্ভুত বংশবিস্তার ঘটেছে। পুরো বাড়ি আর প্রতিবেশীদের জন্য প্রচুর মাছ ধরা হল- সব সরপুঁটি, বিঘতপ্রমাণ, অতিকায়। তার পরেও ঐ জায়গাটার নির্জনতা আমরা অনেকদিন ভাঙি নি, ওটা আমাদের শৌখিন ফিশারি হয়ে রইল।

মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে বাবা টিনের চমৎকার বাক্সয় ভরা বিস্কুট আর মনক্কা, খেজুর, আনার এবং বাদামের তক্তি পাঠাতেন। বাক্সের টিনের ডালা খোলামাত্র অপূর্ব গন্ধ বেরুত, দেখতাম তার মধ্যে ফালি ফালি ফিনফিনে সাদা কাগজের ফিতে-লেসের বিছানায় বিস্কুটেরা অতি আদরে খুকিপুতুলের মতো শুয়ে আছে। এইসব শখের খাবার উপহার পেয়ে নিজেকেও হঠাৎ কাঁচকড়ার পুতুলের মতো লাগত।

এজমালি বাড়ি ও জ্ঞাতিবর্গ

কাকভোরে ঘুম ভেঙে গেলে শুয়ে শুয়ে টের পেতাম বাড়িটা আস্তে আস্তে জেগে উঠছে। টের পেতাম নিঃশব্দ কি করে শব্দের মধ্যে ঢোকে, অতল কি করে উপরে ভেসে ওঠে। ঘুমভাঙা মানুষের গলার স্বর অন্ধকারে পাখির ভাষার মতো। বাসনের ঘষটানি, জলের ছচ্ছর বা ছলাৎ যেন অন্ধকারের পেটের মধ্যে নোঙর নড়ে উঠে নখ টানছে। বড়মা মশারির কোণ হঠাৎ খুলে দিলে মনে হত, শেষরাত্রের আচ্ছন্ন-নীল সুপুরি গাছের গাঢ় মাথা থেকে যেন বলতো খসে গেল।

এরই মধ্যে উঠোনে ঝাঁটপাট পড়েছে, বিছানা গুটনো হয়েছে, ঘর নিকনো প্রায় সারা। ভেজা গোবরমাটির গন্ধের সঙ্গে আমি এতক্ষণ শরৎ-উষার আধোঘুমে শিউলির গন্ধ পাচ্ছিলাম। এখন পুবের জানলার চেরা বাঁশের জালির মধ্য দিয়ে ঠাণ্ডা প্রথমবোদ এসে পড়ল। ছোটমা স্নান করে এসে উনুনের কাঠে আগুন দিয়েছে। ঘরের কোনো অদৃশ্য ফোকর দিয়ে কাঁচা কাঠের ধোঁয়া ঐ জানলাভরা কিরণের মধ্যে গিয়ে স্পষ্ট হয়ে খেলতে লাগল। প্রথম সূর্যকিরণের গায়ে জড়িয়ে ধোঁয়াদের কত রকম আঁকাবাঁকা সর্পিল ভঙ্গিমা। কখনো তারা অসম্ভব সুন্দ্র কলকা হয়ে এঁকেবেঁকে ওঠে, কখনো ডিমের কলি থেকে জেগে পেখম মেলে, কখনো ডোরাকাটা ছায়ার কোলে শুয়ে শিশুর মতো আঁকুবাকু করে পরীর ঘাগরা, জলের মৎস্যভঙ্গি, মায়াবী ঝালর, মাথার মধ্যে ঘুমের কুয়াশাদৃশ্য, আরো কত কি! সুখাসীন বাতাসে ধোঁয়াদের মন্থর রেখা জানলার ফ্রেমের মধ্যে এসে এক লাবণ্যগাথা, চলচ্চিত্রপর্যায় দেখিয়ে যেত। ধূমজ্যোতিসলিলমরুতের সন্নিপাতের কী আশ্চর্য বিভূতি! জানলা থেকে রোদ সরে গেলে আমার এই সুখের খেলা শেষ হত।

দাওয়ায় এসে দেখতাম জনহীন পুবের বাড়ির বিরাট টিনের চালের কাঁধে লালচক্ষু সূর্য। সেই রক্তবর্ণ মুখমণ্ডলে আকর্ণবিস্তৃত চৌকো চৌকো ফাঁক ফাঁক দাঁত। তিনি শব্দহীন হয়ে

কড়মড় করে টিনের চাল চিবিয়ে খাচ্ছেন।

আমি উঠোনে নেমে, দুর্গামণ্ডপ পেরিয়ে, পশ্চিমপুকুরের বাঁ পাশের রাস্তা ধরে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতাম। সেখানে গাছপালায় ঢাকা এক ছোট্ট খাড়াই পাড় ডোবার উপর একবগগা বাঁশের একখানা ছোট সাঁকো। সেটা আমার পায়খানা। সেখানে চিরছায়ার শীতলতার মধ্যে জলের পাড়ে একজোড়া ডাহুক এসে ঘুরত, একেবারে চোখের নিচে। কখনো দুটো বিরাট গোসাপ লড়তে লড়তে হুড়মুড় করে ঝোঁপ ভেঙে আচম্বিতে এসে লাফিয়ে পড়ত জলে। কী তাদের লেজের ঝাঁপট আর ফোঁসফোসানি! আমি ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়তাম। কোনোদিন একটা একলা গোসাপ গুঁড়ি মেরে নিঃশব্দে জলের দিকে এগোত। নিষ্প্রভ তার ভাবলেশহীন চোখ আর সারা শরীরে প্রাগৈতিহাসিক শীতলতা। গভীর লাল বর্ম পরা পোকা ভোঁ করে কোত্থেকে উড়ে এসে সবুজ পাতায় বসত। লতার আকর্ষী উন্মুখ হয়ে থাকত কিছু একটা আঁকড়াবার জন্যে। হঠাৎ কালো আর পাটকিলে মেশানো কুবো পাখি ডেকে উঠত কুব কুব কুব কুব কুব। আমি পুকুরের জলে বুক পর্যন্ত নেমে পরিষ্কার হয়ে বাড়ি ফিরতাম।

আমার একখানা ছোট্ট বেতের তৈরি ধামা ছিল। সক্কালবেলা নারকেলনাড়ুর সঙ্গে সেই ধামাভরতি মুড়ি চিবোতে চিবোতে চোয়াল ব্যথা হয়ে যেত। শেষে ধামা ফেলে রেখে ধনদিদিদের বাড়ি যেতাম। সেখানে দুই ভাইবোন পাঁচুকাকা আর সুবিপিসি দুই কাঁসি পান্তাভাত নিয়ে বসেছে। পোড়ানো শুকনো লঙ্কা, লেবুপাতা আর নুন দিয়ে তারা পান্তা মেখে তারিয়ে তারিয়ে খায়। তাদের জীবনযাত্রা বড় মন্থর। নাইতে খেতে দুপুর গড়িয়ে যায়, তার পর তারা মা-ছেলে-মেয়ে দু-একজন পড়শীকে নিয়ে গোধূলি পর্যন্ত দাওয়ায় বসে তাস খেলে। আমাদের অফিস-আদালতহীন বিস্তীর্ণ দেশে বহু দূরে দূরে ইস্কুলের পেটা ঘণ্টা ছাড়া ঘড়ির শব্দ নেই। এক এক দিন, তাস খেলা যেদিন আগে ভেঙে যায়, ধনদিদি সুর করে মনসামঙ্গল পড়েন। আরো একখানা মলাটছেঁড়া বই আমি এ তাসের আসরের পাশে পড়ে থাকতে দেখতাম বটতলায় ছাপা বিদ্যাসুন্দর। পি এম বাগচীর পঞ্জিকায় যে ধরনের ছবি থাকত, বিদ্যাসুন্দরেও সেই রকমের কিছু ছবি ছিল।

ধনদিদিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি উত্তরের বাড়ি যেতাম। এই বাড়িটা এক মেয়েরাজ্য। প্রৌঢ় ছোড়দাদু ছাড়া সেখানে আর কেউ পুরুষ নেই। বাড়ির সব মেয়ে আত্মা যেন ঝেঁটিয়ে গিয়ে ঐ ঘরে জন্ম নিয়েছে। কাঠের পরিচ্ছন্ন খুঁটি, চৌকাঠ, ফ্রেমে বাঁধানো টিনের বেড়া আর কারুকার্য তোলা কাঠের দরজা নিয়ে তাদের সুন্দর প্ল্যানড বাড়ি। পুরোটাই যেন এক অন্দরমহল সব সময় একদল ভোমরা কাজে এবং গুঞ্জনে ব্যস্ত। আমি ঐ বাড়িতে যেতাম নতুন অচেনা কিছু পাবার আশায়। ছোড়দাদুর স্ত্রী, অনন্তযৌবনা ছোট্টখাট্ট ছোড়দিদি, যাকে আমরা সবাই ছোট বলে ডাকতাম, সারা বাড়ির মধ্যে ছিল সবচেয়ে বড় ঝগড়াটি। উত্তরের ঘর থেকে দক্ষিণের বড়পুকুরে মুখ ধুতে, চান করতে, জল আনতে, কাপড় কাঁচতে কত বার যে সে যাতায়াত করত তার ঠিক নেই। আর যত বার যেত সারা পথটা খরখর করে একা একা ঝগড়া করত। ভাসুরঠাকুরদের দেখলে, ঘোমটা টেনে, ঘোমটার মধ্যেই ঝগড়া করত। ঝগড়া করতে করতে তার গলার মাঝখানটা ফুলে উঠে শেষটায় গলগণ্ড হয়ে গেল। বাড়ির অন্য বউঝিরা ছোটর ঝগড়া শুনে হাসত।

আমার সঙ্গে কিন্তু ছোটর ভাব ছিল। যেহেতু সম্পর্কে নাতি হই অতএব মেজাজে থাকলে বেশ ঠাট্টা-ইয়ারকি করত। আমি ছোটমার কাছ থেকে রসিকতার উত্তরে প্রতিরসিকতা শিখে ছোটকে এসে বলে যেতাম। হেসে উঠে ছোট আর একটা রসিকতা করত। আমি আবার ছোটমার কাছে ছুটতাম উত্তর আনতে। এইভাবে আমি বেশ গ্রাম্য রসিক হয়ে উঠছিলাম।

কিন্তু এ সবই বাহ্য। আমি তাদের বাড়ি যেতাম অন্য এক নিগূঢ় টানে। সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো অনেক উজ্জ্বল রঙিন ছবি টাঙানো ছিল তাদের ঘরে। ঠায় দাঁড়িয়ে সেই সব ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতাম। আমি দেখতাম, ছবি: একটা অন্য জগৎ। আমার কোনো গুরু ছিল না, ছবিই আমাকে ছবি দেখা শিখিয়েছিল।

উত্তরের ঘর থেকে একদৌড়ে চলে যেতাম উঠোনের শেষ সীমা ছাড়িয়ে দক্ষিণের ঘরে। সেখানে একজন আছে, যে আমাকে বুকের দুধ নিজের ছেলের সঙ্গে ভাগাভাগি করে

খাইয়েছে। তাকে আমি ঐ ঘরের মা বলে ডাকি।

বড়দাদুকে আমি জন্ম থেকে দেখে আসছি ধৃতরাষ্ট্রের মতো বৃদ্ধ কোমর বেঁকে গেছে, চোখের ভুরু ঝুলে পড়েছে, তবু শরীরে অমিত শক্তি। উনি, শোনা যায়, কলকাতায় পুলিশে কাজ করতেন এবং সেই সুবাদে রোজ একটি করে পাঁঠার মাথা ভেট পেতেন। পাঁঠার মগজ খেয়েই তাঁর এই শক্তি। তাঁর দেহে বস্ত্রখণ্ড বলতে সারা বছর একখানা বিবর্ণ হেটো লুঙ্গি, শুধু মাঘের শীত যখন বাঘের মতো আমাদের গ্রামে ঘোরে তখন তাঁর গায়ে ওঠে বেঢপ এক গেঞ্জির উপর খাকি একটা পুলিশী। শার্ট। বড়দাদু রোজ পরিষ্কার করে গোঁফদাড়ি চাছেন এবং কালো চুল লম্বা হয়ে যখন দাঁড়কাকের ঘাড়ের রোঁয়ার মতো গজায় তখন নিজেই একদিন মুঠো করে ধরে কাঁচি দিয়ে কচাকচ কেটে ঝামেলা মেটান। সকালবেলা গুড়ক গুড়ক করে হুঁকো খেতে খেতে খোলামেলা বাগানে বসে প্রাতঃকৃত্য করেন কে দেখল না দেখল তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। তার পর কোদাল কুপিয়ে ডেঙোডাটা, কুমড়োবীজ লাগান, আগাছা নিড়োন। বাঁকানো কোমর নিয়ে সারা দিন ঠুকঠাক করে এটা সেটা করেন। দুপুরে ভাত ডাল তরকারি ডিম মাছ ভাজাভুজি, যা কিছু সেদিন রান্না হয়েছে, সব একটা কানাউঁচু থালায় একসঙ্গে চটকে তাতে খানিকটা দই ঢেলে দিয়ে সেই দলা দলা প্রেতপিণ্ড দন্তহীন মুখে গোগ্রাসে গেলেন। তাঁর কোনো কাজে কোনো লাবণ্য নেই, ভালোবাসা নেই। বিকেলে তামাক খেতে খেতে আমার সমবয়সী পুত্র গদা এবং তখনকার মতো কনিষ্ঠ পুত্র ফুচুকে পড়ান। গদা অঙ্ক কষতে কষতে সরে পড়লে ক্ষীণদৃষ্টি ধৃতরাষ্ট্র অনেকক্ষণ পরে টের পান এবং খড়ম হাতে নিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হা রা মজা দা বলে হুংকার দেন।

বড়দাদু কারো সঙ্গে মেশেন না, বড়দাদুর সঙ্গেও কেউ মেশে না। আমি তাঁকে কোনোদিন হাসতে দেখি নি। আধবোজা মাইঅপিক চোখ কুঁচকে তাকান তিনি। কিন্তু টের পাই, তাঁর আপাতঅদৃশ্য চোখের মণির অনেক পিছনে যেন একজোড়া কপিশ চোখ জ্বলে।

একটা জগদ্দল লোহার সিন্দুকের পাশে তাঁর ঘরজোড়া তক্তপোশটা একটির পর একটি শিশুসন্তানের কথাকানি আর প্রস্রাবের নোনা গন্ধে সব সময় ন্যাতাজোবড়া। পর পর দুই স্ত্রী ছেলেমেয়ে রেখে মারা যাবার পর তিনি পেনশন নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে তৃতীয় বার বিয়ে করেন। এই তৃতীয়া স্ত্রীই আমার. ঐ ঘরের মা।

হাসিমুখ, জলাশয়ের মতো শিথিল যুবতী ঐ ঘরের মার কাছে তাঁকে শুয়ে থাকতে দেখলে আমার কেমন একটা সংকটের অনুভূতি হত– বার বার মনে হত, মারা যাবার পরে এই বৃদ্ধ তৃতীয় বার সংসার করছেন।

ঐ ঘরের মার সঙ্গে আমার বেশির ভাগই দেখা হত রান্নাঘরে। তখন আমি আর তার দুধ খাই না। আমাকে দেখলেই তিনি কোনোদিন হাতে দুটো ডালের বড়া গুঁজে দেন, কোনোদিন আধখানা ডিম মুখে পুরে দেন, বলেন, তড়াতড়ি খা। যেদিন পিঠে পায়েস কিংবা মাংস রাঁধেন, আঁচলের আড়ালে একটি ভরা বাটি এনে আমাদের রান্নাঘরে ছোটমার কাছে দিয়ে যান। পরে পুকুরঘাটে কিংবা পথে দেখা হলে জিজ্ঞেস করেন, খাইছস?

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি দূরে চলে যাচ্ছিলাম, তবু গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি এলে যখন গদার সঙ্গে খেলতে খেলতে আমার মারামারি বেধে যেত– আমি প্রচণ্ড হয়ে তার গলা টিপে ধরতাম, ছোটমা এসে আমাকে ছাড়াত– তখনও দেখতাম ঐ ঘরের মা আমার দিকে আলগা সুখের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তাকে দেখে দুঃখে ও লজ্জায় আমি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে হাসতে হাসতে বলতেন, বড় হইছস, অ্যাঁ বড় হইছস!

আমাদের ভিটের মুখোমুখি, উঠোনের ওপারে পুবের ভিটে বছরে ন মাসই জনহীন পড়ে থাকত। বালিহাঁসেরা যেমন হিমে আসে। গরমে যায় তেমনি ঐ বাড়ির কর্তা সোদাদু পরিজনদের নিয়ে শরতে আসতেন, নবান্ন শেষ করে চলে যেতেন। শরতে যখন খালের জল তেতুলতলা পর্যন্ত ছাপিয়ে চলে আসে, দুর্গামণ্ডপে একমেটে হওয়া মুণ্ডহীন প্রতিমা নিঃসঙ্গ দিন কাটায় তখন একদিন কেউ হৈ হৈ করে খবর আনে, সোদাদুর এসে পড়েছেন। আমরা মহানন্দে খালের পাড়ে দৌড়ই সেখানে কোন বিদেশ থেকে দুখানা নৌকো এসে লগি

পুঁতেছে। মাঝিরা মাথায় বাক্সবোঁচকা তুলছে, সোনাদাপুরা কয়েকজন নেমে পড়েছেন, তাঁর নাতি সদানন্দ হাঁটুজলে ছপছপ করে পা ফেলছে, নাতন লীলাদি ছইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখে বাসী মুখে সুখের হাসি হাসছে। আমরা লাফিয়ে নৌকোর গলুই ধরে পাটাতনে উঠতাম, নিজেরা দুলে দুলে নৌকো দুটোকে দোলাতাম।

সোনাদাদু বড় আনন্দময় পুরুষ। তাঁর সাদা ঝোলা গোঁফের তলায় সর্বদা ঈষৎ হাসির আলো আমাদের নির্ভয় করে রাখে। তবু তাঁর চিলের পাখার মতো গায়ের রং, রক্তিম চোখ, লম্বা মেদহীন শরীর দেখে আমার কেন যেন রামায়ণের সম্পাতি পাখির কথা মনে পড়ে। মনে হয়, এই ব্যক্তি কর্কশ পাহাড়চূড়ায় বাস করেন, ডানা ছড়িয়ে অনেক উঁচুতে ওড়েন এবং বিকেলে সূর্য যখন অস্তমান তখন ন্যাড়া পাহাড়ে বসে শূন্যতা ও নিজেকে উপভোগ করেন।

কিন্তু আসলে তা নয়, সোনাদাদু পাখি নন, মানুষ তিনি আসার পর থেকেই পুজোর সব কাজকর্ম, জোগাড়যন্ত্রের ভার তাঁর। উপোস করে তিনি দুর্গাপুজোর তন্ত্রধারক হন, আবার পাঠাকে নাইয়ে এনে বলির ব্যবস্থাও করেন। কালীপুজো, রটন্তীপুজোর উপচার নিখুঁতভাবে জোগাড় করেন, গভীর রাত্রে পুজো শেষ হলে প্রসাদী মাংসের ভাগ ঘরে ঘরে পাঠিয়ে তবে তাঁর জলগ্রহণ। বিকেলবেলা পুবের ঘরের তিন দিক খোলা বারান্দায় বাড়িসুদ্ধ লোকের গল্প জমে। উদাসীনতা এবং চাঞ্চল্য, তগতি এবং লঘুতা একইসঙ্গে সোনাদাদুর মধ্যে ভাসে এবং ডোবে। বোধ হয় এই রকম মানুষকেই সাত্ত্বিক প্রকৃতির বলে।

রাঙাদাদুর ঘরটি ছিল জংলা বাগানের আড়ালে, বাড়ির একটেরেতে। ঘরটির মতো রাঙাদাও খুব গোপন মানুষ। বহুকাল আগে তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন– ছেলে কলকাতায়। চাকরি করে, মেয়ে দূরে শ্বশুরবাড়িতে গিন্নী। রাঙাদাদু একলা থাকেন, নিজেই রান্না করে খান। কি রাঁধেন কে জানে? আমি অনেকদিন দুপুরবেলা তাঁর ঘরে গেছি, কখনো তাঁকে রাঁধতে দেখি নি, খেতে দেখি নি। ফরসা, গোঁফদাড়ি পরিষ্কার করে কামানো, চুনের মতো সাদা কদমছাঁট চুল, নিকেলের গোল চশমা, তামাক খান না বলে ঠোঁট দুটি রাঙা, সাদা ছোট ছোট

নিখুঁত দাঁত, পরিষ্কার সাদা ধুতি সাদা ফতুয়া পরে রাঙাদাদু তার ভারী। খাটে ধবধবে বিছানায় সুরুল কুঠিতে রবীন্দ্রনাথের মতো আধশোয়া হয়ে থাকেন। তাঁর খাটের চারখানা পায়া সিংহের চারখানা থাবাওয়ালা নখ-বার-করা পা। হোগলাপাতার বেড়ার ফাঁক দিয়ে রৌদ্রের লাল আভা এসে পড়েছে তার বিছানায়। হোগলা বেড়ার পার্টিশন দেওয়া পাশের ছোট ঘরে দুটো-একটা হাঁড়িকুড়ি, শূন্য উনুন, দুধ থেকে মাখম তোলার একটা বোতলের মধ্যে যন্ত্র, খাটের তলায় পিতলের পানের বাটা। এই রিক্ততাটুকু নিয়ে একটি চুন, শণ আর মোমের তৈরি পুতুল যেন জতুগৃহের মধ্যে গোপনে জ্বলছে। রাঙাদাদু মুখ তুলে তাকিয়ে একটু হাসতেন। যে বাড়িতে ভাড়ার শূন্য সেখানে বেড়াল যেমন ছুঁকছুঁক করে শুঁকেটুকে বেরিয়ে যায় আমিও তেমনি কথা না বলে ঘুরেফিরে বেরিয়ে আসতাম।

ছটি ভিটে নিয়ে আমাদের বাড়ি। আমি সকালবেলাতেই তিনটি পরিভ্রমণ করে নিজেদের ঘরে ফিরে আসতাম। ঘরে আমার অনেক কাজ।

.

আমার খেলা

খেলনা বলতে আমার ছিল পোড়া মাটির একটা গৌরাঙ্গ, একটা নাশপাতি, কাঠের একটা রং ওঠা বউ, আর কাঠেরই উপর গালার রং করা একটা চকচকে বল যার এক গোলার্ধ লাল অন্য গোলার্ধ সবুজ, একটা রবারের আঁকাবাঁকা সাপ এবং স্প্রিংয়ে কাজ করে এমন একটা বন্দুক। এইসব নকল জিনিসের চেয়ে একটা মুশকিলআসানের অষ্টাবক্র লাঠি কিংবা ভাঙা একটুকরো রঙিন কাঁচও ভালো খেলনা। সুতরাং আমার খেলনা ও খেলা আমি নিজেই বানিয়ে নিতে লাগলাম।

মায়ের বিয়েতে উপহার পাওয়া এবং অন্যভাবে এসে পড়া কয়েকখানা বই দেরাজের একটা খোপে জমে ছিল। আমি ঠাকুমাকে ধরে সেইসব বই হাত করেছিলাম। সকালবেলা পাড়া বেরিয়ে এসে দরজার পাশে সযত্নে একখানা চট পেতে সেই বইগুলো একটি একটি

করে সাজিয়ে রাখতাম, যেভাবে এখনকার ফুটপাথের ম্যাগাজিন স্টলগুলো সাজায়। তার পর তাদের সামনে রেখে দোকানদার সেজে বাবু হয়ে বসে থাকতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আমার দোকানে কেউ খদ্দের আসে না। তখন দোকানটাকে আর একটু মনোহারী করার জন্য মাঝে মাঝে বইদের জায়গা পালটে দিই। শেষে, একলা বসে থাকতে থাকতে এক-একখানা বই তুলে নিয়ে পাতা উলটে উলটে নিজেই ছবি দেখতে থাকি। কিছু কিছু ছবির অর্থ বুঝি না মনে হয়, তাদের মধ্যে যেন একটা ঘটনার রহস্য লুকিয়ে আছে পাশের অক্ষরগুলোর গুপ্ত সংকেতে সেই ঘটনা বলা আছে কিন্তু তখনও আমি অ আ ক খ জানি না। তবে বহুকাল ধরে ঐ দোকান করতে করতে বই কিভাবে নাড়াচাড়া করতে হয় খুব ভালো করে শিখেছিলাম আমার হাতে পাতার একটি কোণও মচকাত না, সাদা কাগজে ময়লা আঙুলের একটু দাগও পড়ত না।

এও এক ইঙ্গিত। আমি জ্ঞানে অনুরক্ত হলাম না, শিক্ষায় আগ্রহী হলাম না, অথচ অকালে, অক্ষরপরিচয়ের আগেই পুস্তকপ্রেমী হয়ে গেলাম। এ হল বিদ্যার তামসিকতা। এই কৃপণ ভালোবাসার শোধ সারা জীবন ধরে দিতে হল।

দাদুর দেরাজের খোপগুলোয় কত যে অদ্ভুত জিনিসের বাসা! ঘরে কেউ না থাকলে আমি ডিঙি মেরে গোল গোল হাতল ধরে দেরাজের গা বেয়ে উঠি, অনেক কসরত করে তার উপরের টানা খুলি। খোলামাত্র একটা প্রাচীন গন্ধ যেন ডানা ঝাঁপটায়। আমি সেই গহ্বরের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে যা নাগালে আসে বার করে আনি। একদিন তার মধ্য থেকে বেরুল সুন্দর একটা কাপড়ের পুঁটুলি। সেই পুটুলিতে ছিল কালো আর বাদামী দুই প্রস্থ দাবার ঘুঁটি– পালিশ করা সেই অদ্ভুত আকৃতির কাঠেরা কি করে রাজা মন্ত্রী ঘোড়া গজ নৌকো সৈন্য হল! আকৃতি ও পরিচয় মিলিয়ে তারা এক প্রহেলিকা।

এ ছাড়া দেরাজ ঘেঁটে পেয়েছিলাম কুমিরের দাঁত, শুয়োরের দাঁত, কমলারঙের অদ্ভুত এক শামুকের খোলা, সমুদ্রের ফেনা। আর ছিল গাছ লতা গুল্ম ওষধি সম্পর্কে চিত্রসংবলিত বিশাল দু খণ্ড বই। সেই বই দুখানা নিয়ে আমার অনেক সময় কেটে যেত।

দুপুর ঘন হয়ে রৌদ্র যখন মধ্যআকাশে স্রোতের ফেনার মতো জমাট বেঁধেছে তখন স্নানে যাবার বেলা। স্নানে যাবার আগে দাদু নিজে বেশ করে তেল মাখতেন, তার পর আমাকে আচারের জলপাইটির মতো তেলে ডুবিয়ে টিপে টিপে নরম করতেন। সরষের তেলের তীব্র ঝাঁঝে আমি ছটফটিয়ে উঠতাম। সব শেষে হুঁকো এবং বাঁশের লাঠিটির গায়ে তেলের হাত বুলিয়ে আমাকে নিয়ে বড়পুকুরে যেতেন। স্নান করে ফিরবার পথেই খিদেয় পেট চন করে উঠত।

.

সাপ

মধ্যাহ্নভোজনের পর দাদু তামাকটামাক খেয়ে অল্প একটু ঘুমোতেন। দাদুর পাশে শুয়ে আমারও ঘুমোবার কথা। কোনো কোনো দিন পি এম বাগচীর পঞ্জিকায় বৃহৎ লাল মূলা, রাক্ষুসে বাঁধাকপি, অনঙ্গ বটিকার শাড়ি-উড়ে-যাওয়া পরী, রথের জগন্নাথ, জামাইষষ্ঠীর খেতে বসা জামাই ইত্যাদির ছবি দেখতে দেখতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখে ঘুম নেমে আসত। কিন্তু যেদিন দেখতাম দাদু নিজেই আগে ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাঁর লম্বা দাড়িগোঁফের মধ্যে লুকনো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে নিঃশ্বাসের হাওয়া বেরুচ্ছে আর ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ শব্দ হচ্ছে। সেদিন আস্তে আস্তে উঠে একলাফে উঠোনে পড়েই আমি হাওয়া।

একদিন, এই রকম পালিয়ে, পুবের পুকুরের পাশ দিয়ে, উত্তরের ঘরের পিছনে যে গভীর ছোট ডোবা, সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছি। তখন বর্ষার শেষ। গাছের পাতা সবুজ মরকতের মতো চিক্কণ, দ্যুতিময়। আঙুল দিয়ে ছুঁলে লতার আঁকড়াবার আকুলতা যেন হাত জড়িয়ে ধরে। একটা ঝুঁকে পড়া গাছের অদ্ভুত আঁকাবাঁকা ডালের খানিকটা টলটলে জলের মধ্যে ডুবে আছে সেখানে উড়ন্ত নীল আকাশ আর উড়ো সাদা মেঘের ছবি যেন জলের মধ্যে নীল ময়ূর আর সাদা ময়ূরীর নাচ। তন্ময় হয়ে এইসব দেখছি, এমন সময় ঝোপের ভিতর থেকে একটা কালো মসৃণ গাছের ডাল খুব ধীরে ধীরে অলসভাবে এগোতে এগোতে জলে

ডোবা ডালটার অন্য প্রান্ত ধরে ফেলল। সেখানে সে কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে রইল, তার পর নিজেকে অদ্ভুতভাবে বাঁকিয়ে ডালটাকে একটা প্যাঁচ দিয়ে বাকি শরীরটা আস্তে আস্তে ঝুলিয়ে দিল জলের দিকে, চেরা জিভ দিয়ে যেন জলের গা কয়েক বার চেটে নিল সে, আবার নিজেকে ঢেউয়ের মতো তুলে নিল সেই ডালের উপর, প্যাঁচটা খুলল, ধীরে ধীরে আবার বাদামী ডালের উপর একটা কুচকুচে কালো ডাল হয়ে মন্থরভাবে এগুতে লাগল।

ততক্ষণে বুঝে গেছি, একটা বুনো জাতসাপের চার হাত দূরে আমি দাঁড়িয়ে আছি, নিথর। কিন্তু আশ্চর্য, ভয়ের চেয়ে তার সাবলীল শরীর এবং অলস গতির অদ্ভুত সুন্দর রূপ আমাকে যেন জাদু করে রেখেছে। ঐ ডালটা থেকে আরেক ডালে যেতে যেতে সে কয়েক বার জীবন্ত লতার মতো শরীর এলাল। তার পর ক্রমশ অন্য পাড়ের ঝোপের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

তার কথা কাউকে বলি নি। কিন্তু সাপধরারা কি করে যেন টের পেল। একদিন তাদের দু-তিনজনের একটা দল এসে ছোড়দাদুকে বলল, ‘কর্তা, আপনাগো বাড়িতে কালসাপ আছে, আমরা ধরমু। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সেই ডোবার পাড়ের জঙ্গল থেকে তারা তাকে ধরে নিয়ে এল আমাদের উঠোনে। ছোট্ট লাঠি গলায় চেপে তার বিষদাঁত কামাল। শেষে তাকে নিয়ে খেলা দেখাল। খা, খা, বকিলারে খা! খা, খা, কিরপৈণ্যারে খা! বলে তার মুখের

কাছে সাপুড়ে মুঠো করে হাত ঘোরায় আর প্রচণ্ড ক্রোধে সে ছোবল মারে, হাতুড়ির মতো তার লক্ষ্যভ্রষ্ট ফণা আছড়ে পড়ে উঠোনের ধুলোয়। আমি দেখলাম, তার নাকের ডগায় ধুলো আর রক্তের ফোঁটা।

.

আমাদের ক্ষত্রিয় জীবনমৃত্যু

এই সময়ে আমার মানুষের শরীরের পরিণাম এবং পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা হচ্ছিল। আমাদের সময়ে বয়স্কদের জীবনস্রোত থেকে শিশুদের সরিয়ে রাখার কোনো চেষ্টা ছিল না। তারা অসহায় ফেনার মতো স্রোতের ঘূর্ণিতে পড়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেত, কিংবা স্রোত মন্থর হলে আপন সুখে ভেসে ভেসে দিনরাত্রির মধ্যে দিয়ে এগোত। আদরের দিন খুব তাড়াতাড়ি শেষ হলে প্রকৃতির নিয়মেই তারা এসে যেত জীবনের কঠোরতা ও বিপন্নতার মুখে। ছেলে মানুষ করার ব্যাপারে ন্যাকামো ও আদিখ্যেতা বর্জন এবং অবহেলা ও উদাসীনতা প্রদর্শন যেন ধর্মীয় নিষ্ঠায় পালন করা হত। তখন বালকদের নাম হত পাঁচু, গদা, ভাসা, ফেলা, আদাড়ি, তিনকড়ি, বাঘা, ভোম্বল, ঘোঁতা, খোঁদনা।

এই অনাদর বা অকোমলতার ফলে আমরা খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠতাম, অর্থাৎ আমাদের নির্ভরশীলতা ও নালিশের মনোভাব মুছে যেত। কঠোরতার সামনে উদাসীনতা আর কৌতুকের পরীক্ষা দিতে হত আমৃত্যু।

ছোড়দাদুর মা ছিলেন বাড়ির সবচেয়ে প্রাচীন ব্যক্তি। একদিন তিনি রোগশয্যায় শুলেন, ধীরে ধীরে সবাই বুঝল এই শয্যাই তাঁর মৃত্যুশয্যা। দেখতাম, তিনি আলোবাতাসময় ছোট লম্বা ঘরটিতে শুয়ে আছেন। ধবধবে থান পরা। ফরসা চেহারাটি ছোট্ট পাটকাঠির মতো ভঙ্গুর হয়ে গেছে। ক্ষীণ স্বরে কথা বললে তাঁর করুণ পাতলা জিভটি মুখের মধ্যে নড়ে। তার স্বাস্থ্যবান যুবক দৌহিত্রেরা তাঁকে দেখতে আসত, উচ্চ উচ্চ হেসে বলত, “কি বুড়ি, মরবা কবে? তোমার শ্রাদ্ধে আস্তা একখান খাসি আর দশ গণ্ডা রসগোল্লা খামু’। বৃদ্ধার মুখে

ক্ষীণ হাসি দেখা দিত, ‘তোরা আগে বিয়া কর, তোগো পোলাপান হউক, হ্যাগো কান্ধে চাপমু তয় তো যামু’। আসন্ন মৃত্যুর নিষ্ঠুরতা এইসব উত্তর-প্রত্যুত্তরের কৌতুকভানের সামনে এসে ক্ষণকালের জন্যও যেন থমকে যেত।

একদিন রাত্রির তৃতীয় প্রহরে বৃদ্ধা মারা গেলেন। বাড়ির শ্মশানে দোলমঞ্চের পাশে তাঁকে চিতায় শুইয়ে আগুন দেওয়া হল। হরি-ই-ই বলল, হরি-ই-ই বলল, হরি হরি বলো বলে সবাই উচ্চৈঃস্বরে যেমনি ধ্বনি দিচ্ছে, আগুনও তেমনি লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে উঠছে। কোথায় শোক? বেশ একটা কাজ চলছে যেন একজনের দীর্ঘ জীবনের চিরকালের মতো কাজ। স্ত্রীলোকেরা ছাড়া আমরা বাড়িসুদ্ধ আবালবৃদ্ধ ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখছি। বনের মধ্যে করাত দিয়ে যেন একটা গাছ কাটা চলছে। হঠাৎ বৃদ্ধার মাথাটা ফটাস করে ফেটে গেল দেখলাম, টপটপ করে ঘি গড়িয়ে পড়ছে আর আগুন সেই ফাটলে নেচে নেচে ঢুকে যাচ্ছে।

প্রাচীনরা কেউ কেউ, দিন শেষ হয়ে আসছে টের পেলে, সুস্থ দেহ থাকতে থাকতেই প্রায়শ্চিত্ত করতেন। আমার দাদুও করেছিলেন। অনুষ্ঠানটি অনেকটা পুজো এবং শ্রাদ্ধের মাঝামাঝি। সারা দিন পুরুতঠাকুর দাদুকে মন্ত্রট পড়ালেন, পুজোআচ্চা করালেন। গাঢ় অপরাহ্নে অনুষ্ঠান সারা হলে দাদু আর পুরুতঠাকুর দাওয়ায় বসলেন, বাড়ির সব বৃদ্ধরা এসে দাদুর পাশে বসলেন। সবাই নির্বাক। আমার মনে হচ্ছিল যেন মহাভারতের বুড়োরা এক সভায় বসেছেন। তাঁদের পিছনে হোগলার বেড়ার গায়ে ছায়া পড়েছে। দাদু এমনভাবে তাকিয়ে ছিলেন যেন তার সামনে আমরাও সব ছায়া হয়ে গেছি।

মরণের সময় আমাদের দেশের মানুষ ঘরে থাকে না। তার ভিতরের প্রাণীই বোধ হয় তাকে বোঝায়, এখন সে আশ্চর্য একটা দরজার সামনে সেই দরজা দিয়ে বেরিয়েই আর কোনো ছোট বাড়ি নয়, যেন আকাশের মধ্যে তার গতি হয়। যাদের চেতনা থাকে তারা নিজেরাই বলে, ‘ওরে, আমারে এবার বাইর কর’। জোয়ান ছেলেরা তৈরীই থাকে, অভিজ্ঞ প্রবীণদের ইশারা পেয়ে মুমূর্ষুকে তারা ঘরের বাইরে খোলা আকাশের তলায় ধুলোর উঠোনে এনে শুইয়ে দেয়। এতক্ষণ ঘরের মধ্যে যে বিচ্ছেদ মর্ম ছিঁড়ে দিচ্ছিল, খোলা আকাশের

ভোজবাজিতে মুহূর্তে তা যেন অনেকখানি অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়। একজন ধূলিশয়ান মানুষকে ঘিরে কয়েকজন ঝুঁকে পড়া মানুষের উৎকণ্ঠিত ব্যথা এবং সেই বিমর্ষ জোনাকিপুঞ্জটির উপরে স্তব্ধ নীল আকাশ, গভীর সঞ্চালিত বাতাস, টুকরো মেঘের ভেসে যাওয়া বোধ হয় জীবনের সবচেয়ে অর্থময় ছবি।

আমার দাদুকে গভীর রাত্রির আকাশের তলায় বার করা হয়েছিল। এখানে ওখানে টুকরো টুকরো মলিন লণ্ঠনের আলো, বাড়িগুলো অপচ্ছায়ার মতো কালো, কালো আকাশ তারায় ভরা। সোঁ সোঁ হাওয়া বইছে। মনে হচ্ছে যেন আকাশ পর্যন্ত একটা হাওয়ার পথ তৈরি হচ্ছে। বায়ু অনিলে মেশে। এই নখরযুক্ত, আত্মাকে প্রবল বেগে টেনে নেওয়া হাওয়াই কি সেই অনিল?

.

বাবা

বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্কের মধ্যে জন্ম থেকেই কোনো গৰহবৈগুণ্য ছিল। তাকে আমি এইভাবে চিনতাম: একজন শক্তসমর্থ লোক যে বছরে এক বার মাসখানেকের জন্য আমাদের বাড়িতে আসে, সঙ্গে আনে নতুন জামাকাপড়, জিনিসপত্র। সে ভালো ভালো বাজার করে, আমাদের ঘরে শোয়। বাড়ির সবাই তাকে সমীহ করে, ছোটমা ভয় করে, কাকা দূরে দূরে থাকে, বড়মা আর ঠাকুমা খুশি হন, দাদু কয়েক দিনের জন্য আমার কাছ থেকে নিজেকে একটু দূরে সরিয়ে নেন। লোকটা বাড়ির সব কিছু জানতে চায়, বুঝতে চায়, তদারক করতে চায়। আমাকে দুপুরবেলা তার পাশে শুতে হয়। তার খুব কড়া নজর, অতি গম্ভীর শাসনভরা গলার স্বর। সে নিজে খুব চাঁচাছোলা পরিষ্কার, অন্যেরও অগোছালো এলানো ভাব একেবারে বরদাস্ত করে না। আমাদের সুখের স্বর্গে সে চাপা অস্বস্তি নিয়ে আসে। সে একমাত্র সদয় বড়মার উপর, একমাত্র হাসিঠাট্টা করে ঘোটর সঙ্গে, একমাত্র

বিনীত সোনাদাদুর কাছে। আমার ভয়ংকর রাগ হত, সবাই কেন তাকে ভয় পাবে! এমন কে সে!

তবু লোকটাকে আমার সারা দিনে দু বার মাত্র অপছন্দ হত না। এক বার, যখন সে দুপুরে খেতে বসে শেষপাতে দুধভাতের সঙ্গে প্রচুর আমকাঁঠালের রস গুলে, নিজে না খেয়ে, বাটি ভরে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে হাসিমুখে তাকাত। আর এক বার, সন্ধ্যার সময় সে যখন আমাকে সঙ্গে নিয়ে বড়পুকুরের পাড়ে গিয়ে বসত। পুকুরের ডান ধারে দক্ষিণপশ্চিম কোণে বেতবন আর বড় বড় গাছের ফাঁকে মেঘের গাঢ় বেগুনী পাথরে তখন কে যেন মকরধ্বজ মেড়েছে। হঠাৎ সেই ঘষা, দগদগে লালের মধ্যে আগুনের এক শয়ান মূর্তি ভেসে যাচ্ছে, চলেছে দক্ষিণের দিকে। খানিক পরেই সব অন্ধকার। পুকুরের বাঁ পাড়ে হিজল গাছে জোনাকিরা ঘুরছে। জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে মোলায়েম হাওয়া আসছে। সে আস্তে আস্তে গান ধরত–

এমন মধুমাখা হরির নাম নিতাই কোথা পেয়েছে।
সেই নাম শুনে হৃদয় বীণে আপনি বেজে উঠেছে।

তার গানের গলা গম্ভীর-মধুর। অন্ধকারে সে হয়তো নিজেকে ভুলে গেছে।

একদিন বিকেলে বাবার প্রচণ্ড তর্জন শুনে ঘুম ভেঙে গেল। ভয়ে ভয়ে গিয়ে দেখি, দাদু আর ঠাকুমার সঙ্গে বাবা বিশ্রীভাবে ঝগড়া করছে। খঙ্গ হাতে বৃদ্ধ দ্রোণের প্রতি ধাবমান ধৃষ্টদ্যুম্নের মতো তার চোখের তারা রাগে ঘুরছে। দাদু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ঠাকুমা চিৎকার করে কি যেন বলছেন। বাবা মর্মান্তিক ভাষায় তাঁকে হতবাক করে দিল। ঠাকুমার দু চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। ছোটমা আর বড়মা ত্রিসীমানায় নেই। দাদুর সেই স্তব্ধ মূর্তির দিকে তাকিয়ে আমার বুক মুচড়ে উঠল- অন্ধের মতো ক্রোধ ফুঁসে উঠল সারা শরীর জুড়ে ক্ষমতা থাকলে আমি তৎক্ষণাৎ বাবার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টুটি ছিঁড়ে ফেলতাম। কিন্তু শুধু অসহায় হয়ে উঠোনের একপাশে দাঁড়িয়ে দেখলাম, ঠাকুমা দাদুকে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে নেমে পশ্চিমপুকুরের দিকে চলে যাচ্ছেন। সেদিন রাত্রে বুড়োবুড়ী না খেয়ে তাঁদের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। কাকা বাড়ি এসে ভাবভঙ্গি দেখে আবার কোথায় যেন মিলিয়ে

গেল। যেন কিছুই হয় নি ভাব দেখিয়ে বাবা একাই খেতে বসল। আমাকেও তার পাশে বসে খেতে হল। সে রাত্রে আমাকে ঠাকুমা দাদুর কাছে শুতে দেওয়া হল না।

পরের দিন দুপুরবেলা ঘুরেটুরে এসে দেখি, আমাদের দু নম্বর আর তিন নম্বর ঘরের মাঝখানের দরজাটা নতুন একটা বেড়া দিয়ে পুরো আটকে দেওয়া হয়েছে। ঐ দিকটা দাদু আর ঠাকুমার, এই দিকটা বাবার। ঐ দিকে আমার যাওয়া নিষেধ। আমি বুকে শুয়ে, বেড়ার নিচের সরু ফাঁকে চোখ লাগিয়ে দেখি, ঠাকুমা কি করছেন। তাঁদের সঙ্গে আমার উঠোনে, পথে, পুকুরপাড়ে দেখা হয়, তাঁরা আমার দিকে তাকান না। তাদের শরীর ধুলো পড়া মলিন পাতার মতো কাঁপে।

দু দিনে পৃথিবী আমার কাছে তেতো হয়ে উঠল। হাওয়ায় যেন শুকনো ধারালো বালি উড়ছে। খেতে বসলে ভাতে সেই বালি, ঘুমোলে গলার মধ্যে সেই বালি। তিন দিনের দিন আমি আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে বললাম, বাবা মরে যাক, মরে যাক, মরে যাক। সারা বাড়ি সেই কথা শুনল। বড়মা আমার মুখ চেপে ধরলেন।

আর সেই দিনই রাত্রে বাবার জ্বর হল। দু-তিন দিনে সেই জ্বর ঘোরালো হয়ে বাবা ভুল বকতে লাগল। ঠাকুমা পাছদুয়ার দিয়ে এসে বাবার কাছে বসলেন। দাদু কবিরাজমশায়কে ডাকতে গেলেন। কাকা কোত্থেকে উদয় হয়ে পকেট থেকে ছুরি বার করে বাঁধনটাধন কেটে পার্টিশনের বেড়া খুলে বাইরে ফেলে দিল।

সপ্তাহখানেক পরে, বাবা যেদিন ভালো হয়ে উঠে ভাত খেল সেদিন ঠাকুমা আমাকে খুব প্রাণভরে বকলেন। শিশুদের অভিশাপ বড় সাংঘাতিক জিনিস। ঐসব বলার পরেই বাবার অসুখ হওয়া দেখে আমি নিজেই ভয়ে আর লজ্জায় লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। এখন, অসুখ সেরে যেতে আমার অপরাধ চলে গেল, বাড়িটাও আবার ঠিকঠাক হয়ে গেল।

কিন্তু সেই থেকে, ঠাকুমার কথায় আমি মনের মধ্যে এক অসম্ভব ক্ষমতা বয়ে বেড়াতে লাগলাম: আমি যাকে মরে যাক বলব, সে মরে যাবে। কয়েকদিন খুব কষ্ট করে কাটাতে হল,

কাউকে যেন মরে যাক না বলে ফেলি। ঐ ক্ষমতা পাথরের মতো ভারী, কিছুদিন বয়ে বেড়াবার পরে, শেষে একদিন তার কথা ভুলে গেলাম।

.

কাকা

আমার কাকা ইস্কুলের পড়াটাও শেষ করল না। ফিঙে পাখিরা কখনো লেখাপড়া করে? পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের কাকা ফিঙে পাখির মতোই কালো, ফিঙে পাখির মতোই সাহসী, ফিঙে পাখির মতোই ক্ষিপ্র, প্রাণসার। জীবনের সঙ্গে তার বাঁধন বড় আলগা। যত বার তাকে কাজে ঢোকাবার চেষ্টা হয়েছে তত বারই সে নিরুপদ্রবে পিছলে বেরিয়ে এসেছে। দুপুরে সে সুটসাট কখন এসে খেয়ে যায়, রাত্রে কখন এসে ভাত চায়, ছোটমা ছাড়া কেউ জানে না। সারা দুপুর সে কামার আর গোয়ালা বন্ধুদের নিয়ে বড়পুকুরের পাড়ে প্রাচীন পলাশ গাছটার ছায়ায় হোগলা বিছিয়ে তাস খেলে। আমি পলাশের ডালে বসে দেখি, চারজন যুবক নিমগ্ন হয়ে আছে একগুচ্ছ তাস সম্বল করে। পুকুরের জলে যখন খুব হাওয়া দেয়, তখন হাঁসেরা সাঁতার না দিয়েও ভেসে যায়, তারা সেই রকম সময়ের জলে ভেসে ভেসে যাচ্ছে।

কাকা সেবাশ্রমে গিয়ে প্যারালাল বারে পিকক করে, দূর দূর গ্রামে হাডুডু খেলতে যায়, যাত্রা শুনতে যায়, বাজারে গিয়ে দোকানদার বন্ধুদের সঙ্গে দই-চিড়ের ফলার লাগায়, বুক পকেটে একটা ব্ল্যাক বার্ড পেন খুঁজে শৌখিনতা করে, কদাচিৎ পকেট থেকে পাসিং শো বার করে টানে। তার জীবনযাত্রা এবং মনোভঙ্গি এতই পদ্মপাতায় জলের মতো কিংবা বনের এলোমেলো বাতাসের মতো যে আমরা কিছুই বুঝতে পারতাম না। একবার সে কি যেন একটা জিনিস বাড়িতে এনে খুব সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখল। মাঝে মাঝে সেটা গোপনে বার করে দেখে। আমিও একদিন, যখন সে বাড়ি নেই, লুকিয়ে সেটা বার করলাম: চামড়ার খাপে ঢোকানো অদ্ভুত একটা ছুরি, অসম্ভব ধারালো তার লম্বা ফলা।

কাকাকে যখন কোনো কাজেই ঢোকানো গেল না তখন বাবা তাকে একটা মনোহারী দোকান করে দিলেন। আমাদের গ্রামের বাজারে বেশ ভালো একটা ঘর নিয়ে সেই দোকানের পত্তন হল। কলকাতা থেকে নৌকো করে জিনিসপত্র আনা হল। এক এক দিন দাদুর সঙ্গে আমিও সেই দোকানে যাই। বেশ লাগে। এক একটা জিনিসের এক এক রকম গন্ধ বিস্কুট, খেলনা, আলতা, কর্পূর, হিং, বোতাম, শ্লেট, পেনসিল, কাগজ, খাতা, ফটকিরি, রজন, কুঁতে, বচ, লবঙ্গ, জাফরান, গিলা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, জায়ফল, জয়ত্রী, আভাং, খয়ের, চন্দন, কত রকমের জিনিস- সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত গন্ধ সেই দোকানে। দোকান বড় চমৎকার জাদুঘর। কিন্তু আমি আর কাকা শুধু গন্ধ শুঁকেই খুশি থাকি নি বলে সেই দোকান বছরখানেকের মধ্যেই উঠে গেল।

দোকান উঠে গেল বটে, কিন্তু বাজারে কাকার একটি আড্ডা এবং আস্তানা হল।

একদিন চৈত্রের নিমসন্ধ্যাবেলা, দোয়েল চড়ুইরা যখন উঠোনের ধুলোয় খেলেটেলে ফিরে গেছে, কাকার বন্ধুরা বাড়িতে খবর দিয়ে গেল, কাকা বাজারের দোলপুজোয় ফাটাবার জন্য বোমা তৈরি করছিল, একটা বোমা তার হাতের মধ্যেই ফেটে গিয়ে পুরো হাতের পাতাটা উড়িয়ে দিয়েছে। বন্ধুরা তাকে এখনই নৌকো করে নিয়ে যাচ্ছে শহরে, ডাক্তারের কাছে। শহর আমাদের গ্রাম থেকে একরাত্রির পথ।

দিন সাতেক পরে বন্ধুরা কাকাকে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে এল। শহরের হাসপাতালে তার বাঁ হাতটা কনুইয়ের নিচ থেকে কেটে বাদ দিয়েছে। এখন রোজ সকালে গ্রামের ডাক্তার এসে ঘা ধুয়ে ক্ষতের মধ্যে গজ পুরে পুরে ব্যান্ডেজ করে দিয়ে যায়। গজ পোরার সময় কাকা কাটা পাঁঠার মতো দাপায়। আর তখন, অত বড় একটা খোলা ঘায়ের বীভৎসতা দেখতে লোকেরা মাছির মতো ভিড় করে আসে। এইভাবে এক মাস হয়ে গেল কিন্তু সেই ঘা আর কমে না। তখন ঠাকুমার মনে পড়ল ছ মাস আগে ঘটে যাওয়া সেই কু-ঘটনার কথা।

আমাদের দেশে ঘরে ঘরে শ্রাবণসংক্রান্তিতে মনসাপুজো হয়। মহেঞ্জোদাড়োর সীলে যে রকম লম্বাটে কলসি আঁকা আছে ঠিক সেই রকম চেহারার কলসির গায়ে কুমোররা মনসার

পট আঁকে আমরা বলি মনসার ঘট। পুজো হয়ে গেলে এক বছরের জন্য ঘটটিকে সাবধানে সরিয়ে রাখা হয়, যেন কোনক্রমে সেটি না ভাঙে। মনসার ঘট ভাঙা খুব দুর্লক্ষণ।

মাস ছয়েক আগে আমি একদিন দুপুরে চুপিচুপি মই বেয়ে পাটাতনে উঠে খুঁজে খুঁজে দেখছিলাম কোন কলসিতে গুড় আর মোয়া আছে। সেখানে দু-তিন বছরের মনসার ঘট রাখা ছিল। আমার হাতে লেগে তার একটা পাটাতনের উপর থেকে গড়িয়ে মেঝেয় পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ঠাকুমা খাচ্ছিলেন, শব্দ শুনে ছুটে এসে দেখেন, এই কাণ্ড! সবাই খুব ভয় পেয়ে গেল কি হবে কে জানে! ঠাকুমা বলতে লাগলেন, বিষহরি, রক্ষা কর! বিষহরি, রক্ষা কর! এত দিনে সেই ঘটনা ঘটল! মা মনসার কোপ থেকে কাকাকে এখন কে বাঁচাবে!

আমাদের গ্রামের মনসাবাড়ি খুব প্রসিদ্ধ। মনসামঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ওই মনসা। ছোটমাকে বাপের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে আমি কতবার গেছি সেই মন্দিরে। চকমিলানো মন্দিরের মধ্যে পিতলের প্রমাণসই মূর্তি, পিতলের হাঁস, ফণাধরা সাপ। মূর্তির সামনে এবড়োখেবড়ো পিরামিডের মতো প্রতীক-পাথর- তার সারা গায়ে তেল-সিঁদুরের মোটা পলেস্তারা। ঠাণ্ডা ছায়ার মধ্যে মনসাদেবী রূপে আর গরলে জেগে আছেন।

মন্দিরের পাশেই ঘাটলা বাঁধানো দিঘি। কালো থমথমে জল। চাঁদিনী রাতে জলের তলা থেকে নাকি হাঁস আর সাপ উঠে খেলা করে। সেই কথা মনে করে আর গভীর কালো জল দেখে আমি দিঘিতে কোনোদিন নামতে সাহস করি নি। এখন কাকার জন্য ঠাকুমা সেই দিঘিতে স্নান করে মন্দিরে এসে হত্যা দিলেন, এবং অনাহারে তিন দিন তিন রাত্রি মনসার পায়ের কাছে পড়ে থেকে চার দিনের দিন ভোরে আবার ঐ দিঘিতে ডুব দিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। মা বিষহরি তাঁকে ওষুধ বলে দিয়েছেন। ভিজে কাপড়ে ঠাকুমা আমাদের বাড়ির জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন, একা। লোকচক্ষুর আড়ালে কোনো বন্য গুল্মের একরাশ পাতা তুলে এনে নিজেই শিলে বাটলেন। তার পর কাকার ব্যান্ডেজ খুলে ফেলে সেই

বীভৎস ঘা আর হলদে হয়ে যাওয়া হাড়ের উপর মোটা করে প্রলেপ দিলেন। সেই দিন থেকে ডাক্তারের গজ ভরার বদলে ঠাকুমাই মনসার ওষুধ দিয়ে কাকার চিকিৎসা করতে লাগলেন। সাত দিনের মধ্যে ক্ষত মাংসে ভরে উঠল, চোদ্দ দিনের মধ্যে কাটা হাড়ের উপর নতুন চামড়া ঘিরে এসে জুড়ে গেল।

তার পরেও ঠাকুমা ঐ পাতা-বাটা দিয়ে অনেকের বড় বড় ক্ষত সারিয়েছেন। কিন্তু কিসের সে পাতা কেউ জানে না। ছোটমা লুকিয়ে ঠাকুমার পিছনে পিছনে জঙ্গলে গিয়ে কতবার দেখার চেষ্টা করেছে, কিন্তু একবারও কিছু বুঝতে পারে নি।

সেরে ওঠার পর কাকা আবার আগেকার মতো হয়ে গেল। দেড়খানা হাত নিয়ে আবার সে দূর দূর গ্রামে হাডুডু খেলার নেমন্তন্নে যেতে লাগল। ফিরে এসে হাসতে হাসতে বলত, দুখানা হাতের চেয়ে দেড়খানা হাত আরো ভয়ংকর। কাকা সত্যিই পদ্মপাতায় জল- যতক্ষণ টলটল করে ততক্ষণ ভারি সুন্দর। একদিন সে সত্যি সত্যিই পদ্মপাতায় জলের মতো চলে গেল।

.

দাদু ও হাতে খড়ি

দাদুর দীর্ঘ ঋজু শরীরটি বৃদ্ধ কিন্নরের মতো, কিন্তু পাকা দাড়িগোঁফে ঢাকা মুখটি ফকিরের মতো। ছোট সাদা চুলের নিচে পিতলহলুদ কপাল, রক্তাভ চোখ এবং সূক্ষ্ম লাল শিরাফুট নাকটি ছাড়া তাঁর সম্পূর্ণ মুখখানা কেমন আমি জানি না। দাদুর কাছে গেলেই দা-কাটা তামাকের পুরুষগন্ধ পাওয়া যায়। নিম্নাঙ্গে সামান্য একখানা ধুতি, অর্ধেক খুট কাঁধের উপর এই চিরাচরিত পরিচ্ছদে, নির্বিকার খালি গায়ে দাদু যখন আমাকে নিয়ে কোনো লম্বা পথ ধরে হাঁটতেন তখন মনে হত আমরা দুজন মুক্তপুরুষ। বংশলতার রক্ত ক্ষীরের মতো গাঢ় হয়ে উঠত, বিশল্যকরণীর সবুজ রসে আমাদের কাঁচের ধমনী টলটল করত।

দাদু জীবনে চাকরি বা ব্যবসা বা ভিক্ষা কিছুই করেন নি। অর্থোপার্জনে তাঁর বিন্দুমাত্র মন ছিল না। তেল নুন লকড়ি কোত্থেকে আসত কে জানে। ছাত্রাবস্থায় পড়াশুনো কদ্দূর করেছিলেন সেও এক রহস্য। নিজের সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নীরব। মনে হয়, স্মৃতিসঙ্গহীন এবং আশা-তাড়নাহীন এক সময়াতীত দেশে বাস করতেন তিনি।

শুনেছি, বিয়ের পর যখন তাঁর চারটি ছেলেমেয়ে জন্মে গেছে, তখন একদিন তিনি সম্পূর্ণ অকারণে গৃহত্যাগ করেছিলেন। সহায়-সম্বলহীন ঠাকুমা বিপদে পড়ে পিত্রালয়ে আশ্রয় নেন। কিন্তু দাদু একদিন যেমন হঠাৎ চলে গিয়েছিলেন তেমনি দীর্ঘ চার বছর পরে আরেক দিন হঠাৎ ফিরে এলেন এবং সসন্তান স্ত্রীকে নিয়ে আবার যথাপূর্বং সংসার করতে লাগলেন। দাদু কেন যে চলে গিয়েছিলেন এবং এই চার বছর কোথায় ছিলেন, কি করেছেন, কেউ জানে না।

দুখানা ধুতিতে দাদুর এক বছর চলে যায়, একজোড়া চটিজুতোয় দু বছর আর একটা ফ্লানেলের পাঞ্জাবি ও একখানা আলপাকার চাদরে চলে গেল পুরো একজীবনের বার্ধক্যের শীত। সকালবেলা প্রাতঃপরিচ্ছন্নতার পরে কুড়ি-পঁচিশ দানা কাঁচা চাল চিবিয়ে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খান– এই তার নিত্য ব্রেকফাস্ট।

দাদু তাঁর দিন দিয়েছিলেন পরিক্রমারত সূর্যকে, আর রাত মুদিত সন্ধ্যাকে। প্রায় সারা দিনই অব্যর্থ হাতে এটা-সেটা করেন কিন্তু সন্ধ্যা হলেই তাঁর ডানা দুটি বুজে যায়। দাদুর যা কাজ বাজার করা, ধান-চাল কেনা, নেশার জন্য তামাক মাখা, বাগান দেখা, বেড়া বাঁধা, চিঠি লেখা, ঋতুবিশেষে পাঁচন বানানো উঠন্ত বেলার রোদ আর পড়ন্ত বেলার ছায়ার সঙ্গে পায়ে পায়ে চলে। তাঁর কাছে কাজ, নেশা ও বাতিকের কোনো আলাদা ভাগ নেই, সবই সমান গুরুত্বপূর্ণ। রিয়ালের গভীর প্রতীতিতে এসব সম্পন্ন করেন তিনি। অমাবস্যা-পূর্ণিমার নিশিপালন তার কাছে পাবণ, ঘরের জন্য নকশাদার বেড়া বানানো তাঁর মহা বাতিক।

তামাক খাওয়াটা তাঁর নেশা, কিন্তু তামাক তৈরি করাটা এক অনুষ্ঠান। নিজের হাতে বেছে বেছে তিনি বাজার থেকে শুকনো তামাকপাতা কেনেন। ছোট্ট দিবানিদ্রার শেষে, কসাইদের মাংস কাটার কায়দায়, কাঠের কুঁদোর উপরে তামাকপাতা রেখে দা দিয়ে তাদের কুচি কুচি করেন, শেষে সেই পাতলা কুচো তামাক কুলোয় রেখে চিটেগুড় দিয়ে ঘষে ঘষে ডলে ডলে মাখেন, মাখতে মাখতে জলের ছিটে দিয়ে চিটেগুড়ের আঠালো কামড়ানো ভাবটা ছাড়ান। তৈরী তামাক মাটির বয়ামে টাইট করে রেখে সরঞ্জামগুলো নিখুঁত যত্নে তুলে রাখবার পর পর্ব শেষ।

তাঁর হাতে দা যেন কথা বলে। ঝাড়ের থেকে পাকা বাঁশ, ঝোপের থেকে পাকা বেত কেটে এনে পুকুরের জলে ডুবিয়ে তিনি সীজন করেন। সীজড় বাঁশ ফালা ফালা করে চেরেন, চাঁছেন। ধারালো দায়ের মুখে লাগিয়ে বেতের গা থেকে পাতলা ফিতে বার করেন। তার পর স্বর্ণাভ হোগলাপাতা মাপমতন কেটে বাঁশের ফ্রেমের খোপে খোপে নানা ছন্দে বসিয়ে যেন বিমূর্ত শিল্প বানান।

দাদু যখন আস্ত বাঁশ ফালি করেন তখন মাঝেমধ্যে বংশলোচন পাওয়া যায়- সাদা একটা চকচকে বস্তু, হৃদরোগের মহৌষধ।

চার বছর বয়সে আমার হাতে খড়ি হলে দাদুর আর একটা কাজ বাড়ল। হাতে খড়ি হবার পরের দিনই একতাড়া তালপাতা এনে দিলেন। সকালে বিকেলে ডালিম গাছের নিচে সেই তালপাতার তাড়া আর চার-পাঁচটা কঞ্চির কলম নিয়ে বসি, কাঠকয়লা শ্লেটপাথরে ঘষে ঘষে কালি তৈরি করি। দাদু বাঁশ চাঁছতে চাঁছতে আমার অ আ ক খ লেখা দেখেন। কঞ্চির কলম কিভাবে মুঠো করে ধরতে হয় শেখান, চটের আসনের উপর আমার বসার ভঙ্গি ঠিক করে দেন, যেন এও এক অনুষ্ঠান। সোনালি তালপাতা কালো কালির অ আ ক খ-তে ভরতি হয়ে গেলে একটুকরো ভেজা ন্যাকড়া চেপে বুলিয়ে। নিলেই মুহূর্তে পরিষ্কার।

খালের জলে মাছ আটকাবার জন্যে কিছু দূর দূর যেমন বাঁশের চিক খাড়া করে বসিয়ে দেওয়া হয়, লেখাপড়া আরম্ভ করার পর আমার জীবনেও তেমনি হালকা নিয়মের দুটো-একটা বেড়া পড়ল। চিকের ফাঁক দিয়ে খালের জল বয়ে যায় ঠিকই, শুধু আটকা পড়ে মাছ। আমারও জীবন বয়ে যেতে লাগল, আটকা পড়ল নির্দোষ নিশ্চিন্ত। এখন সায়ংকালে পা ধুয়ে চটি পরি। দাওয়ায় দাদুর পাশে বসি। পুব থেকে পশ্চিমে কাক, ডাকতে ডাকতে বাড়ি ফেরে, পশ্চিম থেকে পুবে বাদুড় নীরবে উড়ে যায় আমি গুনি এক দুই তিন চার পাঁচ. .. কোনো কোনো দিন তিরিশ-পঁয়ত্রিশটা। আকাশ কোলাহল। আর আলোর উলটো দিকে ধীরে ধীরে ঘোরে– কোমল ফুলের মতো ফোটে একটা তারা, দুটো তারা, সাতটা তারা…

হঠাৎ রত্নসুপ্তির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে অগণ্য তারায় আকাশ ভরে যায়। আমি একটু একটু করে নীরবতা শিখি।

পড়তে শেখার পরে স্বর্গ, নরক আর মর্ত্যপৃথিবী আমাকে মহা চিন্তায় ফেলল। ছোটদের ঘরে একটা ছবি ছিল: ‘মানুষের দশ অবস্থা জন্ম থেকে মরণ, মায়ের কোল থেকে চিতাগ্নি পর্যন্ত। দশটা ছবির নিচে দশ রকমের বর্ণনা লেখা। একই মানুষ কি রকম ধাপে ধাপে বদলে যাচ্ছে। আমি দেখলাম একটা অবস্থাও সুখের না। আমার সামনে পরিণতির প্রহেলিকা। ঐ ছবিটার কাছে আমি বিষণ্ন বিমূঢ় হয়ে থাকতাম।

ক্ষীরোদ কর্মকারদের বাড়িতে টাঙানো ছিল আরো এক সারি ছবি– সব কখানাই অভিশপ্ত পৃথিবীর- দশমহাবিদ্যা, বৃষকেতুর আত্মোৎসর্গ, সীতাহরণ, অনন্ত শয্যায় নারায়ণ, বৈতরণীজলে প্রেতাত্মার দল, মোষের পিঠে যম। মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে একখানা ছবির সামনে এসে আমি আটকে গেলাম। ছবিটা নরকদৃশ্যের বারোখানা ছবির নিচে বারো পাপের নাম, আর ছবিতে তার নির্দিষ্ট শাস্তি আঁকা। ছবির সমস্ত স্ত্রীপুরুষ ন্যাংটো, যমদূতেরা গাঢ় নীল রঙের, ভয়ংকর। অনেক পাপই আমার কাছে দুর্বোধ, কিন্তু একপাশে মিথ্যাবাদীকে দেখছি দুটো যমদূত তার মাথায় করাত বসিয়ে কাটছে। মিথ্যাবাদী হাত জোড় করে আছে, তার ন্যাংটো চেহারাটা বালকের মতো। আমি ভয়ে শীতল হয়ে গেলাম আমি তো অনেক মিথ্যে কথা বলেছি, মরণের পরে আমাকে ঐভাবে কাটবে? এর পরে যখনই ঐ ছবির কথা মনে পড়ত তখনই ভয়ে আমার হাত-পা শিথিল হয়ে যেত। এখনো আমি ঐ শাস্তির কথা বিশ্বাস করি, কিন্তু ভয় আর পাই না, কেননা ইহজগতেই ঐ করাতেরও চেয়ে কষ্টদায়ক করাতে কাটা পড়ার ব্যথা আমার জানা হয়ে গেছে।

এই সময়ে বর্ণপরিচয়, আদর্শলিপি, বোধোদয়, হাসিরাশি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য বই ঠুকরে ঠুকরে পড়তে শুরু করলাম। আমার দোকানের কথা আগেই বলেছি। এখন দেখলাম সেখানে আছে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, অর্ধকালী, মেজো বউ, রাজা হাম্বীর, শিশুরঞ্জন রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত, সাবিত্রী সত্যবান, হিতোপদেশ, কবিতা কৌস্তুভ. ... আমার

মুশকিল হল শব্দের অর্থ নিয়ে। আমি অর্ধেক কথাই বুঝি না। ব্রহ্মানন্দ মানে কি? কেশবচন্দ্র মানে কি? হৃদয়বত্তা মানে কি? বিরহ মানে কি? হাম্বীর আবার কোন ধরনের নাম! আমার সবচেয়ে ভালো লাগত অধকালী বইটা অতি বিস্ময়কর কাহিনী, সঙ্গে রঙিন সব ছবি: এক জমিদার ছেলের বিয়ে দিয়েছেন, সেই বউ অর্ধেক মানবী অর্ধেক দেবী। একদিন বউ পরিবেশন করছে। ঘোমটা সরে যেতে জমিদার দেখেন ফরসা বউয়ের কালো রং, মুখের অর্ধেক ত্রিনয়নী কালীর।

আমি একলা বালক, প্রকৃতি আর বই আমার দুই সঙ্গী হয়ে উঠল। দিনে দিনে প্রকৃতি আমার অবচেতনে ঢুকতে থাকল আর বই আমার চেতনাকে বহু দূরে দূরে অনির্দেশ্য। দেশে আকর্ষণ করে নিয়ে গেল। এই দুই টানই এত সুখের যে কাছের সমস্যার দিকে আমার চোখ আর কোনোদিন ফুটল না।

আমি বড়পুকুরের ওপারে প্রাচীন রেইন ট্রি গাছের গোড়াটিতে বসে বই পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি: জগৎ।

বই ও ছবিতে যেখানে প্রকৃতি বা অতিপ্রকৃতির কথা থাকত সেসব অংশ আমাকে স্বতঃআকর্ষণ করে আবিষ্ট করে ফেলত। পঞ্চভূত- আকাশ বাতাস আলো মাটি জল খেলতে খেলতে যে কিআরেকুয়েরো বানায় তা দেখা বা শোনা মাত্র আমার শরীরের নির্জন পঞ্চভূতে তার আবেগ শুরু হত। যেমন একদিন এক জায়গায় নদীর কথা পড়লাম :

পাহাড়ের ‘পরে। পাথরের ঘরে
আমার জনমস্থান,
বিজনে যেথায় বায়ু বহে যায়
বহিয়া বিহগগান।

আমি তখনো পাহাড় দেখি নি। কিন্তু পড়ামাত্র উঁচু জনমানবহীন বিজনদেশে দীর্ঘ সরল গাছপালার মধ্যে দিয়ে বাতাস বয়ে যেতে লাগল। তার উদাসীন অলস মর্মর আমি

কতভাবে শুনতে পেলাম, বাতাসের অদৃশ্য নীল ঋজু রেখা দেখতে পেলাম... পাতা উড়ে উড়ে পড়ছে। তার পর আরো অনুপুঙ্খ... আরো অনুপুঙ্খ। এই সুখ ইন্দ্রিয়নির্ভর নয়, ইন্দ্রিয়াতীতও নয়। পঞ্চেন্দ্রিয়ের গভীরে আরো পঞ্চেন্দ্রিয় আছে সেখানে এসে এই সুখ মৃদু ঢেউ দেয়।

পড়তে শেখার আগে, আরো কম বয়সে, আমি আরো একবার এই রকম বাতাসের শব্দ শুনেছিলাম। বসন্ত ধোপার কাঁধে চেপে তাদের বাড়ি যাচ্ছিলাম, পথে বেলা তপ্ত হয়ে উঠল। বসন্ত এক নির্জন মাঠে একটা তাল গাছের নিচে আমাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে ছায়ায় বসল। আমারও ক্লান্তি লাগছিল, এমন সময় শুনলাম উঁচুতে তালের পাতার মধ্য দিয়ে হাওয়া বইছে, থেমে থেমে বাতাসে তালের পাতার শব্দ উঠছে। সামান্য শব্দ, কিন্তু আমার সমস্ত চেতনা উৎকর্ণ হয়ে যেন অন্য কিছু শুনতে লাগল। তালের মগডালে। বাতাসের সেই শব্দ কোনো উপমায় বা ক্রিয়াপদেই প্রকাশ করা যাবে না। যদি কাউকে নিয়ে গিয়ে সেই ঝা ঝা তেপান্তরে আবার সেই শব্দ বাজিয়ে শোনানো যায় তবে সে হয়তো টের পাবে দূর শূন্যের পুরুষ বাতাসের স্রোত– দূর শূন্য থেকে অদৃশ্য কর্ড ধরে পুরুষ বাতাস কেমন করে পৃথিবীর কাছে ফিরে ফিরে আসে। বাতাসের করতালি, মাতলামো, উচ্ছ্বাস এসব ভাসমান সস্তা শব্দে কি করে বোঝানো যাবে সেই অনির্বচনীয় গভীরকে। এইসব আচম্বিত শব্দ আর পলকদৃশ্য হঠাৎ হঠাৎ জানিয়ে দেয়, এই পৃথিবী কিসের মমর!

সেই বয়সে, এসব আমি স্পষ্ট করে বুঝি না, শুধু বোধের গোধূলিতে দ্বিতীয়ার চাঁদের ধূসর সোনার আবছামতো রেখায় কত লেখা পড়ে। মন সুখ আর বিষাদে দু ভাগ হয়ে চিরে যায়। অনুভূতির চাপে আমি জলের মধ্যে মাছের মতো স্থির হয়ে ডুবতে থাকি, আবার কখনো আঁকুবাকু করে উঠি মহামৎস্যের মতো ঘাই মারতে চাই অনন্তে।

কয়েক বছর পরে এক সংখ্যা প্রবাসীতে আবিষ্কার করলাম বীরেশ্বর সেনের একখানা ছবি: একজন দীর্ঘদেহী লোক খালি গায়ে সূর্য-ডুবে যাওয়া আকাশের সামনে দু হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে, তার পায়ের নিচে সায়ংসন্ধ্যায় কালো-সবুজ উপত্যকা, জনহীন নিচু

পাহাড়ের ঢেউ। লোকটির শুধু পিছনটা দেখা যাচ্ছে অতি ঋজু শরীর, লম্বা দুই বাহু চল্লিশ ডিগ্রিতে টানটান হয়ে যেন আকাশ স্পর্শ করছে। ছবির নিচে লেখা: কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। আমি তখন সংস্কৃত জানি না, অর্থ বুঝতে পারছি না, কিন্তু লোকটাকে ঠিক বুঝতে পারছি। সে ঠিক আমার মতো, অনির্বচনীয়ের সামনে দাঁড়িয়ে নিথর, তার হাত ঘাই মারছে অনন্তে।

প্রকৃতি, বই আর ছবি আমাকে এইভাবে ভাবাতে লাগল। কিন্তু বয়সের ধর্ম যাবে কোথায়! সন্ধের পর লণ্ঠনের আলোয় বাধ্যতামূলক পড়া আমার ভালো লাগে না। পিসতুতো ভাইয়েরা এলে রাত্তিরের পড়ার ফাঁকে ফাঁকে বেশ দুষ্টুমি জমে উঠত। তারা আসত অন্তত মাসখানেকের জন্যে, বইপত্তর সঙ্গে করে। দাদু বিছানায় বসে থাকতেন, তাঁর সামনে আমরা চট পেতে লণ্ঠনের আলোয় যার যার পড়া করতাম। কাজকর্মে পিসিমা বা ছোটমা লণ্ঠনটা নিয়ে গেলেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে তারা চেঁচিয়ে উঠত:

অন্ধকারে মহাঘোরে
যে যারে ভেঙ্গাইতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে বিতিকিচ্ছিরি মুখ করে পরস্পরকে আপ্রাণ ভেংচি কাটা শুরু হত। কিন্তু অন্ধকারে তো সেই ভেংচি দেখা যায় না। অতএব পরে আমাদের চিমটি কাটা শুরু হল। অন্ধকারে কে কাকে চিমটি কাটছে ধরা যায় না।

পিসতুতো ভাইয়েরা চলে গেলে আবার আমার নিঃসঙ্গ পড়াশোনা। এই সময় একটা ঘটনা ঘটল যা আজ ভাবলে হাসিও পায় অবাকও লাগে। উত্তরের ঘরের মনুপিসির কাছ থেকে একটা ভূতপেত্নীর বই এনেছিলাম। বইটা নীল কালিতে ছাপা আর ভূতপেত্নীদের ভয়ংকর ভয়ংকর ছবিতে ঠাসা মামদো, শাঁকচুনি, ব্রহ্মদৈত্য, গোভূত, আরো অনেক রকম। আমি বইটা নিয়ে রোজ দুপুরে আমার রেইন ট্রি গাছের গোড়ায় গিয়ে বসি, আর ফিরি বিকেলে। ছাপা বইয়ের কথা একটাও অবিশ্বাস করি না, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবি দেখি, আর ভয়ের সুখে শিরশির করি। বই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কালো ঝাঁকড়া গাব গাছটার দিকে

কেবল আমার দৃষ্টি যায়। কয়েক দিন এই রকম চলল আর ক্রমশ আমার ভয় বাড়তে লাগল। বইটাতে একটা গল্প ছিল– ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ এক নাপিতকে দুপুরে মাঠের পথ থেকে ধরে নিয়ে গেছে ভূতেরা, তাকে দিয়ে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াবে, শেষে তারই ঘাড় মটকে রক্ত খাবে। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে যায়। সারা দিন ভূতপেত্নীর কথা ভাবি, চেহারা ভাবি, সন্ধের পরে আর ঘরের বাইরে উঠোনে নামতে চাই না। কিন্তু কাউকে কিছু বলি না, বইটাও পড়া ছাড়ি না। গভীর রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে যেতে লাগল। দাদু, ঠাকুমা আর আমি পাশাপাশি শুই। আমি ঠাকুমার ঘুমন্ত স্তনে হাত দিই, মনে হয় পেত্নীর স্তনে হাত দিয়েছি। মশারির গা ঘেঁষে অন্ধকারে সব কিম্ভুতকিমাকার অপদেবতা দাঁড়িয়ে আছে। কোন্ গাছ থেকে দু-তিনটে জোনাকি এসেছে ঘরে। দূরে অন্ধকার পথে ফেউ ডাকছে। সারা বাড়ি ঘুমে অচেতন। অন্য গ্রাম থেকে কুড়িয়ে আনা কাকার ভূতের গল্প ঠিক এই সময়ে মনে পড়ে: কলেরায় সেই গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে। বাড়িতে আসা ছেলেকে পেত্নী মা ঘর থেকে লম্বা হাত বাড়িয়ে ঝোঁপ থেকে জামির এনে দিল। হেলে পালাতে পালাতে শুনতে পায়, মা অট্টহাসি হাসতে হাসতে বলছে: যা, বড় বাঁচা বেঁচে গেলি! পাশের অন্ধকার ঘরে কি বড়মা এখন ঘুমোচ্ছে, না কি লম্বা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে পুকুরপাড়ের জামিরের ঝোপে? কাউকে বিশ্বাস নেই।

আমি দিনে দিনে শুকিয়ে যেতে লাগলাম। সন্ধে হলেই চমকে চমকে উঠি। ঠাকুমা আর দাদু আমাকে নিয়ে ভাবনায় পড়লেন। এইভাবে মাস দুয়েক চলার পরে একদিন সকালে দাওয়ায় বসে আছি, এমন সময় এক বুড়ো ভিখিরি ভিক্ষে করতে এসে আমাকে একনজর দেখে জিজ্ঞেস করল, ‘ও মনু, তুমি ভয় পাইছ? ঠাকুমা ঘরেই ছিলেন, বেরিয়ে এলেন। ভিখিরি বলল, “মা ঠাইরেন, এই পোলা ভয় পাইছে। একখান পান আনেন, আমি ঝাড়ফুক জানি, সারিয়া যাইবে। কি ঘটে দেখবার জন্য সবাই ভিড় করে এল। ভিখিরি পিঠে-বুকে হাত বুলিয়ে বিড়বিড় করে কিছু বলতে বলতে কয়েক বার আমার সারা গায়ে ফুঁ দিল। তার ফুঁ বড় আরামের শরীর যেন হালকা হয়ে যায়। তার পর পান পাতায় শুধু আঙুল দিয়ে কি

লিখে, মুড়ে আমাকে দিল। আমি চিবিয়ে পানপাতাটা খেয়ে ফেললাম। ব্যস, আর কিছু ঘটল না। কিন্তু সেই দিন থেকে আমার ‘ভয় ভূতের কর্পূরের মতো ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

দুষ্টুমি করলে দাদু মারতেন না, শুধু হাত দুটো গামছা দিয়ে বেঁধে বাঁশের আড়ায় আমাকে ঝুলিয়ে রাখতেন। প্রথম মনে হত, ঝোলাক গে, কি আর হবে, বেশ দুলব। কিন্তু খানিকক্ষণ যেতে না যেতেই শরীর যেন ভারী হতে থাকত, হাত যেন ছিঁড়ে যেত। আমি পরিত্রাহি চেঁচাতাম। চেঁচানি শুনে ঠাকুমা এসে আমাকে আড়া থেকে নামাতেন। তার পর হাতবাঁধা অবস্থায় আমাকে পুকুরের দিকে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে যেতে তর্জন। করতেন- ‘আমি অরে বড় করছি, আমিই আইজ অরে মারিয়া ফ্যালামু। রাগে তাঁর কালো রং বেগুনী হয়ে গেছে। মারবার জন্যে ঠাকুমা পুকুরের জলে আমার মাথা ডুবিয়ে চেপে ধরতেন, আবার তুলতেন, আবার ডোবাতেন। জল খেয়ে খেয়ে আমার হেঁচকি উঠত। মাথা ডুবিয়ে ধরলে জলের মধ্যে পড়ন্ত রোদের সৌধ দেখা যেত– ভঙ্গুর কমলারং। ঠাকুমা গর্জন করতেন, ‘তোরে আইজ মারিয়াই ফ্যালামু’।

আমি সেই বয়সেও বুঝতে পারতাম, বুড়ো বুড়ী প্রতিযোগিতায় নেমেছে। হেঁচকি তুলে কাঁদতে কাঁদতেও ভিতরে একটা মজা লাগত- দেখি কে জেতে? রাজায় রানীতে যুদ্ধ, উলুখড়ের প্রাণ যায়! শেষটায় ছোটমা এসে ঠাকুমার কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিত। রানী কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নয়, তখনও গজগজ করে চলেছে। রাজা মান বাঁচাতে ডালিম গাছের তলায় গিয়ে বাঁশ চাঁছতে লেগেছে। আমি চিরঞ্জীব উলুখড়, জলটল খেয়ে আবার ঠিক হয়ে গেছি।

ঠাকুমা আমাকে কখনো খেলা দেন নি। কিন্তু অতি শৈশবে দাদু আমাকে নিয়ে ঘুঘু সই করতেন। দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে বিছানায় শুলে আমি পায়ে পায়ে তাঁর কাছে গিয়ে বলতাম- ‘দাদু, ঘুঘু সই কর। দাদু চিত হয়ে শুয়ে আমাকে লম্বা দুই পায়ের উপর তুলে নিয়ে দোলাতেন আর তালে তালে ছড়া বলতেন:

ঘুঘু সই, ঘুঘু সই,
তোর পুত কই?
আম গাছে।
কি কাজ করে?
পিঁড়ি চাঁছে।
কার পিড়ি?
ছোট বউর পিড়ি।
ছোট বউ কই?
ঘাটে গেছে।
ঘাট কই?
ডাহুক খাইছে।
ডাহুক কই?
তারাবনে গেছে।
তারাবন কই?
পুড়িয়া গেছে।
ছাই মাডি কই?
ধোপায় নিছে।

তারাবন আমি চিনি। ধনদিদিদের বাড়ির পিছনে ডোবার পশ্চিমপাড় জুড়ে চিরসবুজ তারাবন। নলখাগড়াজাতীয় সেই ফাঁপা গাছেরা এত ঘন হয়ে বন বানিয়েছে যে তার মধ্যে সাপ ছাড়া কেউ ঢুকতে পারে না। তাদের শিকড়ের কাছে জল, ভিতরে গভীর অন্ধকার, পাতায় চাকলা চাকলা সবুজ রোদ্দুর। সেই তারাবন আগুনে পুড়ে গেল?

তার পরই আমি অপেক্ষা করতাম ছড়াটা সেইখানে কখন আসে–

ধোপা কই?
হাটে গেছে।
হাট কই?
ভাঙিয়া গেছে।

দাদু আমার বুকে-পেটে তাঁর জোড়া-পায়ের পাতা লাগিয়ে পা দুটো নব্বই ডিগ্রিতে লম্বা করে দিতেন। আমি হাত-পা ছেড়ে উঁচুতে ঝুলতাম। তার পরই

বুড়ি লো বুড়ি!
কী লো?
হাঁড়িপাতিলগুলা সরালো।
ক্যা লো?
তাল গাছটা পড়ল– টিপপুস!

দাদু আমাকে উঁচু থেকে পাশের কোলবালিশের উপরে ফেলে দিতেন- ধুপ্পুস! পড়ল, পড়ল, তালগাছসুদ্ধ ভাদ্র মাসের তাল পড়ল!

.

ছোট ভাই

আমার যখন বছর চারেক বয়স তখন ছোটমার প্রথম সন্তান হল। সে আমার ছোট ভাই। আমি যতটুকু আদরযত্ন পেয়েছিলাম সে তার ছিটেফোঁটাও পেল না। তার চেহারা রুগ্ন শিশু কালকেতুর মতন– কালমেঘপাতার মতো রং, ড্যাবড্যাবা দুই চোখ নাটাফলের চেয়েও বড়, কিন্তু রোগা শরীরে গায়ের চামড়া কুঁচকোনো। তার গলায় কালো কারে বাঁধা কয়েকটা জালের কাঠি আর অনেকগুলো মাদুলি। আমাদের দাওয়ার একদিকে কিছু দিনের জন্য ছাগলের খোয়াড় করা হয়েছিল। সে হামাগুড়ি দিয়ে দাওয়া থেকে পড়ে যায় বলে তাকে

প্রায়ই কোমরে দড়ি বেঁধে সেই খোঁয়াড়ে রাখা হত। সেখানে সে ছোট ছোট নখে মাটি খুঁটে মুখে দিত। তার শরীরে ক্রমশ ধূসর ছায়া পড়ছিল। দেড়-দু বছর। বয়সেই সে একটা বড় রকমের অসুখে পড়ল। পেটটা অস্বাভাবিক ফোলা, মাথাটা শরীরের তুলনায় অনেক বড়, হাতপাগুলো কাঠি কাঠি শুনলাম তার শরীরে নাকি জল হয়েছে। অনেক দিন চিকিৎসা করে যখন কবিরাজ কিছুই করতে পারলেন না তখন সবার সঙ্গে পরামর্শ করে পটপটি নামে একটা ভীষণ ওষুধ তাকে খাওয়ালেন। পটপটি খেলে রোগী আর একফোঁটাও জল খেতে পাবে না, ভাতটাত সব বন্ধ, তার পথ্য তখন শুধু রোদে শুকোনো দুধে সেদ্ধ মানকচু, যাকে কবিরাজী ভাষায় বলে মানমণ্ড।

একরত্তি ছেলেটা একফোঁটা জলের জন্য হা হা করে ঘরময় ঘোরে। তার নাগাল থেকে সমস্ত জলের কলসি, ঘটি সরিয়ে রাখা হয়। আমরা ভাত খেতে বসলে সে কুকুরছানার মতো এমো করুণ চোখে বসে থাকে। কিন্তু আশ্চর্য, কখনো সে খাবার জন্য কাঁদে না বা বায়না ধরে না। আমরা তার সামনে অপরাধীর মতো খাই। আমাদের খাওয়া হয়ে গেলে সে নিরাশ হয়ে উঠে চলে যায়।

এই রকম সপ্তাহ দুয়েক চলল। তার পরে একদিন গভীর রাত্রে সজাগ-ঘুম বড়মা শুনতে পেলেন, রান্নাঘরে কিসের যেন খুটখাট শব্দ। কোনো মানুষ বা জন্তু যেন সেই অন্ধকার ঘরে ঢুকেছে। বড়মা ফিসফিস করে ছোটমাকে জাগালেন, ঠাকুমা উঠলেন, কাকা উঠল। তার পর সবাই লণ্ঠন আর লাঠি নিয়ে অতর্কিতে রান্নাঘরে গিয়ে দেখে, আমার ছোটভাই পান্তা করে রাখা ভাতের হাঁড়িটা নামিয়েছে, আর হাঁড়ির মধ্যে দু হাত ঢুকিয়ে সেই জলসুদ্ধ ভাত চোরের মতো নিঃশব্দে খাচ্ছে।

অসুখে ভুগে ভুগে এবং অবহেলায় আমার ছোটভাইয়ের তেমন পুষ্টি এবং তেজ হল না। তার চার-পাঁচ বছর বয়স হয়ে গেল অথচ একটা ভালো নাম রাখার কথা পর্যন্ত মনে পড়ল না কারো। এদিকে বাবা বাড়ি এলেই তাকে নিয়ে পড়াতে বসেন। হঠাৎ অতু পড়াশোনা তার মাথায় ঢোকে না। পড়াশোনা থাকে মাথার মধ্যে। সুতরাং সে এক একটা

পড়া পারে না, আর বাবা তার মাথায় এত জোরে থাবড়া মারেন যে সে কাত হয়ে পড়ে যায়। সে কাঁদে না, কিন্তু ব্যথায় তার ঠোঁট কাঁপে। এ তো গেল দিনের কথা। রাত্রে পড়তে বসে যখন সে পারে না তখন দু-চার ঘা দেবার পর বিরক্ত হয়ে বাবা তাকে দরজার বাইরে অন্ধকারে বার করে দেন। সেখানে সে জন্তুর মতো বসে থাকে, একলা অন্ধকারে তার কতখানি ভয় করে কে জানে! এই রকম কয়েকদিন চলার পর একদিন যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল বাবা তাকে চোরের মার দিয়ে ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে বার করে দিলেন। আমি কাছে বসে প্যারীচরণ সরকারের সেকেন্ড বুক মুখস্থ করছিলাম, আমার বুকের ভিতরটা হঠাৎ মুচড়ে উঠল, প্যারীচরণ সরকারের বই খং খং করে একটা খোনা শব্দ করে কাঁসার বাসনের মতো ভেঙে গেল। চোখে জল এবং মাথায় আগুন নিয়ে আমি একটানে দরজা খুলে বাইরে এলাম। যথেষ্ট হয়েছে, আমার গলা থেকে গর্জন বেরুল, "তোমাদের বাড়িতে আর না, আমি এক্ষুনি ওকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। বাইরে থেকে শুনলাম, বাবা গম্ভীর গলায় ছোটমাকে বলছেন, "দরজাটা বন্ধ করে দাও।

হিম বাতাস হি হি করছে। চারদিকে কেমন ঘোলা অন্ধকার। কাকাকে পেলে সে কোথাও একটা আস্তানা ঠিক খুঁজে দিতে পারত। কিন্তু কোথায় সে।

আমি ছোটভাইয়ের হাত ধরে ঐ ঘরের মার রান্নাঘরে গিয়ে উঁকি দিলাম। ঐ ঘরের মা সব জানতেন। আমাদের টেনে নিয়ে আঁচলের তলায় একবার জড়িয়ে ধরে ছেড়ে দিলেন। সে রাত্রে ঐ ঘরের মার কাছে আমরা ভাত খেলাম। তাঁদের ছোট ঘরটায় শুলাম। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, কাল কোথায় যাব? খুব চিন্তা হতে লাগল। কাল সকালে হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে চলে যাব? কেউ বাড়িতে আমাদের ডেকে নিয়ে চিরজীবনের মতো নিশ্চয় থাকতে দেবে।

পরদিন সক্কালবেলা, তখনও ঘুম ভাঙে নি, বড়মা আর ছোটমা এসে আমাদের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

কিন্তু এত মারধর খেয়েও আমার ছোটভাইয়ের লেখাপড়া শেষ পর্যন্ত বেশি দূর এগোল না। বাবা চিরদিন সংসারের জোয়াল একলা টানছিলেন, এইবার, অতি অল্প বয়সে তাকেও সেই জোয়ালে নিজের পাশে জুতে নিলেন। বাচ্চা বাছুরটা কিছু না বুঝেশুনেই বোঝা টানতে শুরু করল। আর আমি? আমি, খাইদাই পাখিটি, বনের দিকে আঁখিটি।

.

দুর্গাপুজো

একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি, বর্ষার শেষে আকাশ জল হল হঠাৎ অন্যরকম হয়ে গেছে। শরদাগমে প্রথম বদলায় আকাশ, পরে ক্রমান্বয়ে জল স্থল। আকাশ নিষ্কলঙ্ক নীল কখনো মনে হয় হাত বাড়ালেই সেই নীল নবনী হাতে মাখামাখি হয়ে যাবে, কখনো মনে হয় বাঁশের সঙ্গে বাঁশ বেঁধেও ছোঁয়া যাবে না সুদূর ঐ নীলের স্রোত। কখনো ভোজরাজার শিবিরের সাদা তাঁবুর মতো উজ্জ্বল মেঘ দিগ্বলয় থেকে শূন্যে ওঠে, কখনো মেঘ কোঁকড়ানো চুলের মতো যোজন যোজন উঁচুতে কিছুক্ষণ থেকে, মাছের ঝাঁকের মতো দীর্ঘরেখায় একটা যাত্রার ভঙ্গি আনে, শেষে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিলিয়ে যায়।

আকাশ থেকে যেন কেউ নির্মলি ফেলেছে জলে। মাঠের মাটিতে, পুকুরের পাঁকে শাপলা, পদ্ম, শালুক এতদিন কোথায় ঘুমিয়েছিল– লঘু স্বচ্ছ জলে রাতারাতি তারা মৃণাল জাগায়, পাতা ছড়ায়। আমি তেঁতুলতলার খালের সাঁকোয় উঠে মধ্যিখানের খুঁটির দু দিকে পা ঝুলিয়ে বসে ঝুঁকে পড়ে দেখতাম, দশ-বারো ফুট নিচে খালের জল স্বচ্ছ হয়ে চলেছে দক্ষিণে। স্পষ্ট করে তাকালে দেখা যায় জলের অতি হালকা বেগুনী রঙের স্রোত, আর আবছা করে তাকালে দেখা যায় জলতলে স্থাণু নীল গভীর আকাশ, অস্রোত সাদা মেঘ। জলে টাটকিনা মাছের ঝাঁক যায় মনে হয় আকাশে ভেসে যাচ্ছে মাছের ঝাঁক ঐ তো মেঘের গায়ের উপর দিয়ে সাঁতরে চলে গেল! খালের পাড়ে ডুবে থাকা জলজ গুল্মের সবুজ লম্বা লম্বা পাতা কত রকম আঁকাবাঁকা হয়ে দোলে।

এতদিন ঘন ছায়ায়, বৃষ্টিধারায় মাটি ম্লান দুঃখিত হয়ে ছিল। এখন সেও জেগে উঠছে। রাস্তায় আর কাদা নেই, পিছল শ্যাওলা নেই। বনে পচা ডালপালার গন্ধ ক্রমশ উবে যাচ্ছে। পাতার বুকের দিক এখন সিল্কের মতো, পিঠের দিক ভেলভেটের মতো। এখন বনের মধ্যে বালক রোদ্দুর সারা দিন ঘুরে বেড়ায়, ডালের ফাঁক দিয়ে পাতার ফুটো দিয়ে তীরধনুকের কত রকম চাঁদমারি করে।

পরিত্যক্ত, প্রতিমাহীন দুর্গামণ্ডপ এতদিন অগোচরে ধূলিম্লান হয়ে ছিল তার তালকাঠের মোটা মোটা আড়ায় কাক এসে বসত, পায়রা বকম বকম করত, শুধু মাঝে মাঝে আমরা ছেলেরা বাইরে খেলতে খেলতে ঝড়বৃষ্টি এলে সেখানে আশ্রয় নিতাম। এখন এই ভরা ভাদ্রে একদিন কার্তিক কুমোর নৌকো করে এসে হাজির হয়, খড় আর পাটের সুতলি দিয়ে সেখানে বাঁশের কাঠামোর উপরে শক্ত করে প্রতিমার বেনা বানিয়ে রেখে যায়। বিকেলবেলা ছায়াভরা দুর্গামণ্ডপে গিয়ে আচমকা দেখি দশ হাত ছড়িয়ে মুণ্ডহীন খড়ের দুর্গা দাঁড়িয়ে আছেন। দু পাশে কিশোরীশরীর উড়ন্ত পরীর মতো জয়া বিজয়া, তারাও মুণ্ডহীন।

কার্তিক, সেও নির্মুণ্ড। শুধু গণেশ, সিংহ আর অসুরের পুরো কাঠামো খড়ে বোনা মুখের এক অদ্ভুত আদল- মুখ হাঁ করা সিংহকে দেখাচ্ছে ঠিক চার পা-ওয়ালা। একটা সীলমাছের মতো। তাদের সবার গায়ে খড়ের সোনালি আভা। দুর্গা, জয়া, বিজয়ার কী সরু কোমর! জনহীন নীরবতার মধ্যে সেই খড়ের মূর্তিরা শান্ত হয়ে শূলে বসে আছে। আমি সারা বিকেল তাদের কাছে থেকে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে যাই। খোলা দুর্গামণ্ডপে যখন চারদিক থেকে গভীর রাত ঢুকে আসে তখন সেই অন্ধকারে তারা কি করে?

কয়েকদিন পরে বুড়ো কার্তিক কুমোর আবার আসে দু-তিনজন শাগরেদ নিয়ে। শাগরেদরা পাট আর তুষ মিশিয়ে পা দিয়ে মাটি ছানে, খড়ের প্রতিমার গায়ে মাটি চাপায়। বুড়ো কারিগর কার্তিক তার রোগা আশ্চর্য হাতে বাঁশের কাটিম ধরে চটপট প্রতিমার গা থেকে বাড়তি মাটি কেটে, চেঁছে বুকের খাঁজ, পেটের ভাঁজ, উরু ও হাতের সন্ধি বার করে আনে। বুড়ো ওস্তাদের বিদ্যে অবাক হয়ে দেখতে দেখতে একসময় তারা কাজ শেষ করে

চলে যায়। আমি একলা দাঁড়িয়ে দেখি ভিজে, নরম, কবন্ধ প্রতিমা যেন নীল জলাশয় থেকে উঠেছে। আমি গণেশের কোমল খুঁড়ে হাত দিই, সিংহের হাঁ মুখে। ভয়ে ভয়ে আঙুল ঢোকাই ভিজে, বিষণ্ন, যেন পরিত্যক্ত সাপের গর্ত।

একমেটে হবার পর রোজ দুপুরে গিয়ে দেখি, আস্তে আস্তে ভিজে মাটিতে টান। ধরেছে, মাটি শুকোচ্ছে আর ফাট ধরছে। একদিন দেখি, শক্ত প্রতিমার বুকের ফাটল বেয়ে সারি দিয়ে পিঁপড়েরা চলেছে তুষের কুঁড়ো খেতে। বাড়ি থেকে দৌড়ে এসে বাঁক ঘুরে সামনে দাঁড়াতেই বুকটা ধক করে ওঠে– কী সব গভীর, অসমাপ্ত মানুষী মূর্তি! দেখতে দেখতে, একটু একটু করে তাদের অস্তিত্ব সয়ে আসে।

প্রথম-মাটি শুকিয়ে ঝুনো হয়ে যাবার পর আবার একদিন কুমোরেরা আসে। নতুন মাখমের মতো মাটি ছানা হয়। প্রতিমার গায়ে দ্বিতীয় বার মাটি চাপানো হয়, ফাটলগুলো মাটির প্রলেপে বুজিয়ে পাতলা কাদায় ভেজানো ন্যাকড়ার পট্টি সেঁটে দেওয়া হয়। বুড়োর হাতের ধারালো কাটিম প্রতিমার শরীরকে আরো নিখুঁত করে তোলে। ওস্তাদ বুড়ো দুর্গা, জয়া, বিজয়ার গলার উপর ছাঁচের মুখ জুড়ে দেয়। প্রমাণসই ধুতি কাদাজলে ডুবিয়ে প্রতিমাকে কুঁচি দিয়ে শাড়ি পরায়। মাটি গোল গোল করে পাকিয়ে নিয়ে নুলো হাতগুলোয় পটাপট আঙুল বসায়। মাটির লেচি ছাঁচে ফেলে চাপ দিয়ে দিয়ে নিমেষে গয়না গড়ে। দক্ষ হাতে দু-তিন রকম কাটিম দিয়ে অসুর আর সিংহের মুখে, চোখে, নাকের ফুটোয় হিংসা আর দর্প, শক্তি আর ব্যথা ফোটাঁয়। প্রহর কেটে যায়, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে এইসব দেখি। কুমোরেরা চলে গেলেও নড়তে চাই না। প্রতিমার মধ্যে সুখী প্রাণ এসে গেছে, আমি তার সঙ্গ পাই। কিন্তু আগেকার সেই মুণ্ডহীন, নুলো দুর্গা জয়া বিজয়া এবং লেপাপোঁছা মাথার সিংহ গণেশ অসুর যে অপ্রাকৃত অস্তিত্ব নিয়ে আমাকে ধাক্কা দিত তা এখন অনেক হালকা এবং নরম হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ হতে যাওয়া প্রতিমার মুখে এখন হাসি, শরতের আকাশ থেকে তার সারা গায়ে উৎসবের হাওয়া এসে লেগেছে।

দোমেটে হয়ে শুকিয়ে যাবার পর একদিন কারিগর এসে তার গায়ে দ্রুতহাতে দু পোঁচ খড়ি লাগিয়ে যেত। তার পর পুজোর মাত্র দিন তিনেক যখন বাকি তখন একদিন কার্তিক কুমোর চার-পাঁচ জন শাগরেদ, গোটা দুই টিনের ট্রাংক আর পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে নৌকোয় এসে হাজির। ট্রাংক খুলে বেরুত কত রকমের সরঞ্জাম চাকা চাকা রং, গুঁড়ো গুঁড়ো রং, ছাগলের ঘাড়ের লোমের নানা মাপের তুলি, চুল, রাংতা, গর্জন তেল, আরো কত কি।

এখন মণ্ডপে অন্য আবহাওয়া এতদিনকার নির্জন, আমার একলার মেটে প্রতিমাকে এখন এতগুলো লোক মিলে সাজাচ্ছে– সমস্ত বাড়িটার অন্তঃশীল উৎসবের আশাভরা জলধারা এইখানে এসে রঙের আর আনন্দের ফোয়ারায় যেন মুখ খুলে দিয়েছে। ঘরে ঘরে প্রবাসী বাবা কাকারা, পিসি পিসেমশায়রা সব ফিরে আসছে, তারা আমাদের জন্য সাধ্যমতো নতুন জামাকাপড়ের বাণ্ডিল এনেছে নতুন উজানজলে যেন সুখ ভেসে এসেছে। তবু আমাদের মন পড়ে আছে মণ্ডপে যেখানে কুমোরেরা তেঁতুলবিচি সেদ্ধ করে তার সাদা পাতলা আঠায় বাটিতে বাটিতে রং গুলছে। কী তাজা সেইসব দিশি রং! দুর্গার গায়ে হলদে পাখির গাঢ় হলুদ, অসুরের গায়ে পাতালশৈবালের ঘন সবুজ, বিজয়ার গায়ে গোলাপী দোপাটির কুসুমরাগ, জয়ার গায়ে শ্বেতপদ্মের আভা, শাড়ি আর কাঁচুলির কাঁচা সবুজ, গভীর বেগুনী, ঘোর লাল, অপরাজিতা নীল– মূর্তির উপর কুমোরেরা তুলিতে ভরে এইসব রঙের পোঁচ দেয় আর আমি অবাক হয়ে দেখি, সাদা জমি যেন রঙের বিদ্যুতে ভরে উঠছে। সারি সারি মাটির সরায়, এনামেল বাটিতে কুমোরদের আঙুলে গোলা ঐ রং আমাকে জাগিয়ে দেয়– রঙের ঘন লাবণ্যের মধ্যে ক্রুরতা, পেলবতা, তেজ, অন্ধকার যেন পাত্রে পাত্রে আদিবীজ টৈটুম্বুর হয়ে আছে। আমি পাগলের মতো বুড়ো কার্তিক কুমোরকে মিনতি করি, কারিগরমশায়, জয়ার শাড়িতে ঐ বেগুনী রংটা দাও। আমি কি অবচেতনায় চাই ঐ গভীর স্তন মোহের অন্ধকারে ডুবে থাকুক। 'কারিগরমশায়, সাপের গায়ে ঐ গোলাপী রংটা দাও- আমি কি কল্পনা করি ঐ সাপ দুর্গার জঠর থেকে বেরিয়ে এসেছে, পিচ্ছিল, সদ্যনির্মোকহীন! গাঢ় গোলাপীতেই সব চেয়ে তীব্র বিষ! কার্তিক কুমোর কখনো কখনো আমার কথা রাখে, কখনো কখনো ধমক দেয়।

আস্তে আস্তে প্রতিমা রঙে রঙে ভরন্ত হয়ে ওঠে। আমাদের হাত থেকে সে বড়দের হাতে চলে যায়। আমরা এখন তাকে দেখতে পাই, ছুঁতে পাই না। কোমল ন্যাকড়ায় তার মুখ মাজা হয়, গর্জনতেলে সে চকচক করে। নকুলকাকারা পাত পাত রঙিন রাংতা কেটে আর শোলার সাজ দিয়ে তার চালচিত্র সাজায়। কিন্তু এত করার পরে আমার মনে হত সে যেন বড়দের দামী পুতুল হয়ে গেছে। রং পড়ার আগেকার, শুধু মাটির সেই এবড়োখেবড়ো মূর্তিগুলোর মধ্যে, নির্জন মণ্ডপে আমি যে অদ্ভুত অস্তিত্ব টের পেতাম, যাদের গায়ে পিঁপড়ে উঠত, ভোমরা বাসা করত, সেই বিশাল আধিদৈবিক অদৃশ্য হয়ে গেছে।

পুজোর কদিন নৈবেদ্য, প্রসাদ, নতুন কাপড়, ঢোল, কাঁসি, পাঁঠাবলি, রক্ত, পটকা, ফুলঝুরি, চটপটি, পেট্রোম্যাক্সের আলো, আরতির ধোঁয়া, হৈ চৈ, এইসব নিয়ে একটা ঘূর্ণির মধ্যে দিন শেষ হত। রাত্রে ঢোল কাঁসি থেমে গেলে শুক্লপক্ষের কাঁচা জ্যোৎস্নায় আমার হঠাৎ বিষণ্ন লাগত। আমি লন্ঠন নিয়ে বড়পুকুরের ঘাটে গিয়ে দেখতাম কালো জলে ডোবা ঘাটের পইঠায় নিথর হয়ে স্নিগ্ধ শামুকেরা সেঁটে আছে।

.

লক্ষ্মীপুজো

লক্ষ্মীপুজোর কোজাগরী রাত্রে আমি বড় বিষন্ন হতাম। দুর্গাপুজো যত আনন্দের লক্ষ্মীপুজো তত হতাশার। আমি শুনেছিলাম, পুজোর শেষে গভীর রাত্রে লক্ষ্মীদেবী বাড়ি বাড়ি ঘোরেন, তখন তাকে ধরতে পারলে টাকাপয়সার অভাব থাকে না। টাকাপয়সা! এমনিতে মনে পড়ে না, কিন্তু এই কথায় খেয়াল হত, আমাদের টাকাপয়সার বড় অভাব। আমার মন খারাপ হয়ে যেত। বিশাল চাঁদ উঠেছে পুবের ঘরের টিনের চালের উপর দিয়ে। ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীর পুজো হচ্ছে, সবাই সেখানে ভক্তি নিয়ে বসে আছে। আমি ভিতরে না গিয়ে একা দাওয়ায় বসে থাকতাম। পুরুতঠাকুর পুজো শেষ করে চলে গেলেন, তখনও আমি বসে আছি। ফুটফুট করছে আমাদের উঠোন। চাঁদের আলোয়, মাটির দাওয়ায়

আলপনা ফুটে আছে স্পষ্ট হয়ে। আকাশ, বাতাস, দশদিক বড় নিথর, নীরব আর শীতল। জ্যোৎস্নাধূসর গাছপালার পল্লবের উপরটায় আলো পিছলে যাচ্ছে, ভিতরে ভিতরে কালো ছায়া। বসে থেকে থেকে স্পষ্টই বুঝি, সব মিথ্যে কথা– সোনার গয়না পরা, বালুচরী শাড়ি পরা সেই দেবীকিশোরী কখনোই আসবেন না আমাদের বাড়িতে। আর যদি বা আসেন, তেঁতুলতলা দিয়ে আসতে আসতে তাঁর পায়ে ধুলো লেগে যাবে, পশ্চিমপুকুরপাড়ের রাস্তায় অন্ধকারে তাঁর গয়না হারিয়ে যাবে, আমাদের বাড়ির দরজায় যখন পৌঁছবেন তখন তার শাড়ি ছোটমার শাড়ির মতো ময়লা।

.

বাইচ

পুজোর আগে, ভাদ্রসংক্রান্তিতে যখন আমাদের খালে নতুন জলের ভরা জোয়ার তখন বাইচ হয়। সেদিন অপরাহ্নে আমরা গুড় দিয়ে মাখা ভাজা চালের ছাতুর বড় বড় ডেলা হাতে নিয়ে খেতে খেতে বাজারের খালে বাইচ দেখতে যেতাম। খালের দুই পাড় লোকে লোকারণ্য– তার মধ্য দিয়ে কাঁসর ঝাঁঝর পিটিয়ে উদ্দণ্ড গান করতে করতে নৌকোগুলো চোখের নিমেষে হুসহুস করে চলে যেত। বাইচের ছিপ নৌকো অন্য রকম- সরু, বিশ তিরিশ হাত লম্বা, সামনের গলুই ভাইকিং নৌকোর মতো বাঁকা হয়ে সাত-আট হাত উঁচু হয়ে গেছে। আলকাতরা, মেটে তেল আর গাবের আঠায় মাজা তাদের শরীর কুচকুচে কালো, তাতে আবার গলুইয়ের দু পাশে পিতলের চোখ আর রিভেট বসানো, মেটে সিঁদুরে আঁকা ভয়ংকর সব কারুকার্য। প্রতিযোগীরা নৌকোগুলোর মতোই কালো, বলিষ্ঠ এবং সুঠাম। তাদের হাঁটুর উপর ধুতি মালকোঁচা মারা, মাথার বাবরি চুলে আর কোমরে লাল গামছার ফেটি বাঁধা। এক এক নৌকোয় তারা পঁচিশ-তিরিশ জন প্রচণ্ড শক্তিতে অতি দ্রুত বৈঠা টানছে। সরু খালে পর পর নৌকো, কে কার আগে যায়! উত্তেজনায় লোকারণ্য হৈ হৈ করে ওঠে। সমস্ত জায়গাটা রণহুংকার, উত্তেজনা, ঝাঁঝ কাঁসরের আওয়াজ, পুরুষালি রঙ্গভঙ্গি এবং পলকে চলে যাবার ব্যগ্রতায় উন্মথিত। আমার অবাক লাগছিল, লম্বা গলা উঁচিয়ে

পাখনাওলা প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মতো নৌকোগুলো কিভাবে অকস্মাৎ উদয় হয়ে মুহূর্তে কত দূর চলে যায়! একটার পিছনে আর একটা প্রাণী তাড়া করেছে।

সূর্য ডুবে গেলে বাড়ি ফিরতাম। কারা জিতল কে জানে? কর্মকারদের কালীতলা পেরুতে পেরুতে জংলা আগাছা থেকে বুনো গন্ধের ভাপ উঠত। কেমন ছায়াছায়া শান্ত ভাব। বুড়োরা বলত, ভাদ্রসংক্রান্তিতে শীতের জন্ম। সুরাকাকার বাড়ির পাশের অন্ধকারমাখা বনপথ দিয়ে যেতে যেতে মনে হত দুর্গম ঐ ঘন ঝোপের মধ্যে এই সন্ধ্যায় সাপের ডিমের মতো কোনো ডিম ফেটে গেছে। হঠাৎ উপরে তাকিয়ে দেখতাম গাছের পাতা, জোনাকি আর তারার সঙ্গে কালো জলে মাথার উপরে ছায়াপথ।

.

নবান্ন

নবান্নের মতো অমন অবিমিশ্র সুখের উৎসব আর হয় না। হেমন্তের শেষে, কার্তিকপুজোর দিন আমরা বালক-বালিকারা কাকভোরে উঠে শীতে কাঁপতে কাঁপতে চাদর সোয়েটার যা হোক কিছু চাপিয়ে দৌড়ে যেতাম মণ্ডপে। মণ্ডপ এখন আমাদের। সেখানে পাতার আগুন জ্বেলে আমরা গোল হয়ে বসে আগুন পোহাতাম আর সুর করে চেঁচাতাম:

কাউয়া কো কো কো।
আমাগো বাড়ি তোমাগো নেমন্তন্ন।
কাউয়া কো কো কো।
আমাগো বাড়ি আইজকে শুভ নবান্ন।

আমাদের ঘিরে আছে হিম ঊষা। দূরে বড়পুকুরের জলের উপর কুয়াশা। টুপটুপ করে শিশির পড়ছে গাছের তলা শিশিরে ভেজা, শিশিরের অজস্র বিন্দু জমেছে ঝোপের মাথায়,

মাকড়সার জালে। ঝোপের মধ্যে পাতলা অন্ধকারে চাক চাক কুয়াশা। কথা বললে আমাদের মুখ থেকে কুয়াশা বেরোয়। হঠাৎ মনে হয় পৃথিবী বড় সচ্ছিদ্র।

ক্রমশ ধোঁয়ায় আমাদের চোখ লাল হয়ে যেত, আগুনের তাপে শরীর গরম হয়ে উঠত, চেঁচিয়ে গলা ভাঙত। অনেকক্ষণ পরে সূর্য যখন উঠে গেছে, রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে, তখন আমাদের মধ্যে কেউ বলত, এত্তিবারে কাউয়ারা নিশ্চয় নেমন্তন্ন পাইয়া গেছে। চল বাড়ি যাই।

ততক্ষণে আমাদের এজমালি উঠোনে সাদা চাঁদোয়া টাঙানো হয়েছে। মাটি নিকিয়ে সেখানে সারি দিয়ে পিঁড়ি পাতা হয়েছে। পুরো বাড়ির পুরুষেরা এবং শিশুরা একসঙ্গে বসে নবান্ন করবে। ঘরে ঘরে নতুন সুগন্ধ ধবধবে সাদা চাল শেষরাতে ভিজিয়ে রাখা হয়েছিল, এখন শিল-নোড়ায় বাটা হচ্ছে, এতক্ষণ ধরে যে নারকেল কুরিয়ে তূপ করা হয়েছিল তাও বাটা হচ্ছে। গতরাত্রেই চাকা চাকা মিছরি ভেজানো হয়েছিল সেই মিছরির জলে ঐ চাল-বাটা, নারকেল-বাটা, ডাবের জল, গন্ধরাজ লেবুর রস মিশিয়ে কলসিতে কলসিতে স্ত্রীলোকেরা তৈরি করছে নবান্ন।

নবান্নয় বসার আগে চাল কলা পিণ্ডের মতো পাকিয়ে কলা গাছের খোলায় করে আমরা দিয়ে আসতাম বড়পুকুরের ওপারে শ্মশানের কাছে। সেই যে সকালে অত তারস্বরে চেঁচিয়ে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল- এ সব সেই কাকেঁদের জন্য। আমরা খানিক দূরে গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতাম, কাকেরা খায় কিনা। কিন্তু আশ্চর্য, একটা কাকেরও দেখা নেই। অপেক্ষা করে করে তখন আমরা আবার মণ্ডপে ফিরে আসতাম। সেখান থেকে লক্ষ রাখতাম। কিন্তু কোথায় কাক! খানিকক্ষণ পরে অধৈর্য হয়ে আবার গিয়ে দেখি, আরো আশ্চর্য খোলা সাফ, কারা যেন এসে চেটেপুটে খেয়ে গেছে। কারা খেল? কাক, কুকুর কাউকে আমরা ওদিকপানে যেতে দেখি নি। সে যা হোক, ব্যাপারটা চেপে গিয়ে আমরা নবান্নের চাঁদোয়ার তলায় বড়দের খবর দিতাম, কাকেরা নেমন্তন্ন খেয়ে গেছে।

তখন একে একে প্রবীণেরা হাতে পাত্র নিয়ে এসে বয়স অনুসারে পর পর বসতেন, যুবকেরা বসত, সব শেষে আমরা, গেলাস, বাটি যা পেয়েছি তাই নিয়ে। আমাদের বালকদের দিকের হট্টগোল আস্তে আস্তে মৃদু হতে হতে বুড়োদের দিকে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে দীর্ঘ সারির প্রথমে সেখানে বসে আছেন আমার দাদু। ঐখান থেকে পরিবেশন শুরু হবে।

রাঙাদাদুর ঘর বাদ দিয়ে বাড়ির সব ঘর থেকে বউ-ঝিরা বড় বড় পিতলের কলসি ভরে নবান্ন এনে ইতিমধ্যে একপাশে দাঁড়িয়েছে। প্রথা অনুযায়ী সব চেয়ে বড় বউটি আগে পরিবেশন করবে, তার পরে মেজো, সেজো ইত্যাদি। কর্তারা প্রত্যেকেরটা খেয়ে মনে রাখবেন কারটা কেমন হল। মুখে কোনো রায় না দিলেও যার বানানো নবান্ন তাঁরা আরেক বার চাইবেন, বোঝা যাবে তারটিই এবার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। সেদিন সেই বউয়ের ভারি গর্ব। ছোট ঝগড়াটি হলে কি হবে, প্রতিবছর সেই ফার্স্ট হত।

আমরা অত তারতম্য বুঝতাম না, প্রত্যেকের কাছ থেকে বাটি গেলাস ভরে ভরে নিয়ে চুমুকে চুমুকে শেষ করতাম। আহা এমন অনবদ্য জিনিস আর হয় না। ছোট, ঐ ঘরের মা এবং লীলাদির মা আমাদের আরো দাও, আরো দাও’ শুনে যথাক্রমে সগর্বে, হাসতে হাসতে এবং নীরবে তাঁদের দ্বিতীয় কলসি নিয়ে আসতেন। ইতিমধ্যে বয়স্করা আমাদের লোলুপতায় যেন নীরব সায় দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হতেন। তাঁরা নিজেরাও এক এক জন ছ-সাত পাত্র খেয়েছেন। বড়রা চলে গেলে যুবারা নানা রঙ্গ করত। আমরা রঙ্গের ধার ধারি না, আমরা চাই কলসি কলসি খেতে। কিন্তু হায়, আমাদের সমুদ্রগ্রাসী জিভের ইচ্ছের সঙ্গে পেটের ছোট্ট খোলটার কোনো সামঞ্জস্য নেই। সবসুদ্ধ আট-ন গেলাস খাবার। পরে আর পারতাম না। স্পষ্ট টের পেতাম গলা পর্যন্ত সেই মধুর সুগন্ধ পানীয় টলটল করছে, পেট বেলুনের মতো ফুলে উঠেছে, একটু দৌড়লেই এখন সেখানে জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ পাওয়া যাবে।

এবেলা আর খাওয়াদাওয়ার চিন্তা নেই। বড় সুন্দর আবহাওয়া। আমি আস্তে আস্তে চলে যাই বড়পুকুরের ওপারে বিশাল রেইন ট্রি গাছটার তলায় সেই অতিকায় প্রাচীন গাছের গায়ে

ফাটা ফাটা মোটা বাকল শোলার মতো নরম। প্যান্টের বেল্ট আলগা করে তার গোড়ায় হেলান দিয়ে বসি। ঘুম পায়। দুপুর গড়িয়ে যায়, অপরাহ্ন হেলে পড়ে। পুকুরের জল থেকে যেন ঠাণ্ডা হাই উঠছে। মাছ ঘাই মারে। দিন শেষ হল।

.

মুনশিবাড়ি

মেজোপিসিমার বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে মাইল দেড়েক দূর। বাজারের সফেন হো হো হৈ হৈ যেখানে বড় খালের পাড়ের রাস্তায় এসে বাতাসে মিলিয়ে গেছে সেখানে কালো রঙের কাঠের পুল। পুল পেরিয়ে নির্জন সরু রাস্তা। সেই রাস্তায় খানিক দূর এগিয়ে গেলে এক নবরত্ন মঠ- কার চিতা কে জানে কিন্তু মঠটা সাংঘাতিক উঁচু, চারদিকে ভাঁটফুলের জঙ্গল, ইটের কারুকার্য এখন ধূসর। মঠের মধ্যে ঢুকে আ- আ- আ- করে চিৎকার করলে অন্য গলায় প্রতিধ্বনি ওঠে: হা আ ম হা আ। সেই মঠ ছাড়িয়ে গেলে আবার একটা পঞ্চরত্ন মঠ, পলেস্তারাখসা, অতি পুরনো। তার পর খানিকটা রাস্তা একেবারে নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন। নিচে নেমে যাওয়া ঘন গাছপালা ঝোঁপঝাড়ের মধ্য দিয়ে কলকল করে খালের জল বইছে। খালের দু পাড়ে কাদায় পায়ের দাগ গর্ত গর্ত হয়ে আছে, যেন হাড়ের পা নিয়ে সেখানে কেউ হেঁটে গেছে। পথের পাশে প্রাচীন শটিবন নীল হয়ে আছে। জায়গাটায় পা দিলেই গা ছমছম করে ওঠে। ছায়া আর ভয় হঠাৎ একঝাক পাতিকাকড়ার মতো আদুড় গায়ে ছড়িয়ে গিয়ে দাঁড়া দিয়ে পিঠের চামড়া আর ঘাড় কামড়ে ধরে। শেষে বাঁয়ে ঘুরে আর একটা কাঠের পুল পেরুলেই ফাঁকা ঐ তো মেজোপিসিমার বাড়ি দেখা যায়।

মেজোপিসিমার বাড়ি প্রায়ই যেতাম। আর ঐ গা ছমছম করা জায়গাটায় পৌঁছলেই আমার ভাবান্তর হত। মনে হত, এই জায়গাটায় অনেক কিছু ঘটে যা কেউ দেখতে পায় না।

এই রকম আশঙ্কাভরা অনুভূতি হত মুনশিবাড়িতে গেলে। কিন্তু সে ভয়ের জাত আলাদা। হয়তো তা ঠিক ভয়ও না, অন্য এক জগতের অনুভূতি। আমাদের বাড়ির পিছন

দিকের পথ দিয়ে গেলে দু-তিনখানা বাড়ির পর মুনশিবাড়ি। প্রথম সেখানে গিয়েছিলাম গদার সঙ্গে।

প্রত্যেক ফুলের পাপড়ির কেন্দ্রে একটা সূক্ষ্ম ফুটো আছে, সেই ফুটো গিয়ে শেষ হয়েছে বোঁটার প্রান্তে। ঐ পথটুকু জাদুপথ। কেউ যদি অতি সূক্ষ্ম হয়ে ছুঁচের মতো ঐ পথের এক মুখ দিয়ে ঢুকে অন্য মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে তবে সে পৌঁছবে এক অন্য রাজ্যে। এক এক ফুলের পথের শেষে এক এক রাজ্য। শিউলিফুলের ফুটো দিয়ে বেরুলে পাওয়া যাবে সাদা মেঘের দেশ। লাল সন্ধ্যামণির ফুটোর ওপারে আছে খুব সুন্দরী, আবছায়ায় চলাফেরা করা মেয়েদের দেশ। জ্যোৎস্নায় ফোঁটা হাসনুহানা ফুলের সূক্ষ্ম পথটুকু পেরুলেই ঝাড়লণ্ঠন নিবে আসা এক চাঁদিনী জলসার দেশ। আর গ্রীষ্মের তাপে শুকিয়ে মুচমুচে হয়ে যাওয়া স্বর্ণচাঁপার ফুটো দিয়ে বেরুলেই মুনশিবাড়ি।

এক এক রাজ্যের দরজায় এক এক রকম হাওয়া পাহারা দেয়। আমি আর গদা মুনশিবাড়ির সামনে আসতেই হাওয়া এলোপাতাড়ি বয়ে একগাদা শুকনো পাতা উড়িয়ে নিয়ে গেল।

হঠাৎ সামনে দেখি, এক জনহীন পরিত্যক্ত ভাঙা দালানের দেশ। শুকনো গাছের ডালে মাকড়সার জাল হাওয়ার দমকে দমকে দুলছে। আমার ছোট্ট জীবনে এত ইটের বাড়ি একসঙ্গে দেখি নি। কিন্তু সব ধ্বংসস্তূপ। দেয়াল ভেঙে ভেঙে পড়েছে, ছাদের অংশ ভেঙে পড়ে মেঝে খোলা চাতাল হয়ে আছে। আর সেই চাতালে চুনসুরকির ফাঁকফোকরে গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য পাথরকুচি গাছ। একটির পর একটি বিচিত্র আকৃতির ধ্বংসস্তূপ, কিন্তু চাতালগুলো সব অতি পরিচ্ছন্ন। উঠোন-আঙিনা-ভরা ঘাস মরা শ্যামাপোকার মতো বিবর্ণ। আমরা চাতালে চাতালে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। পড়ন্ত অপরাহ্ন লম্বা লম্বা ছায়া ফেলেছে। কয়েকটা চাতালে সাপের শুকনো খোলস বাতাসে সরসর করে নড়ছে। ন্যাড়া কড়ি-বরগা ছাদ থেকে লম্বা হয়ে এগিয়ে আছে। নীল আকাশে সাইরাস মেঘ, স্থির।

এই দালানগুলোর কোন মালিক নেই, এই দেশের কোনো সীমানা নেই। আমি আর গদা কয়াফড়িঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা উদ্ভট চিন্তা এল এই সেই দেশ যেখানে মুসাফির এসে বোঁচকা নামিয়ে বসে, একা একা হাড়ের পাশা খেলে, তার পর বোঁচকাটি রেখে শেষবেলার রোদে খানিকক্ষণ কাঁচের গুঁড়োর মতো ঝাপসা হয়ে থেকে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। মাথায় চিন্তাটা ঢোকামাত্র বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

কিন্তু রাস্তা চিনে নেবার পর মুনশিবাড়ি আমি প্রায়ই যেতাম। ভাঙা ছাদ, ধসে পড়া দেয়াল, বিক্ষিপ্ত ইটের পাঁজা এবং পাথরকুচি ও আকন্দ গাছে সমাচ্ছন্ন ফাটা চাতালগুলো যেন দিনমানেও নিশি ডাকে।

একদিন বিকেলে একা একা সেই নিস্তব্ধ দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি এমন সময় ইটের পাজার পাশে বনঝিঙের ফুল ফুটে উঠল– আকাশে তাকিয়ে দেখি, নরম একখানা মেঘে আবীরের লাল লেগেছে, দূরে আরেকখানা মেঘ তখনো সাদা। এইবার বাড়ি ফিরতে হয় কিন্তু হঠাৎ আমার মাথার উপরে শূন্যে কোত্থেকে কয়েক শো লাল ফড়িং এসে চক্রাকারে উড়তে লাগল। একসঙ্গে এত লাল রঙের ফড়িং আমি কোনোদিন দেখি নি। নীলাভ আকাশে অনেক উঁচুতে লাল মেঘ, আর ঠিক তারই নিচে পৃথিবীর কাছাকাছি অগণন লাল ফড়িঙের ওড়া- এর তাৎপর্য কি, ভাবতে ভাবতে মেঘ পাঁশুটে হয়ে গেল, ফড়িঙেরা লুকিয়ে পড়ল– আমি ছাড়া সেই অবিশ্বাস্য কয়েক মিনিটের জোয়ার আর কেউ দেখতে পেল না।

মুনশিবাড়িতে ভাঙা দালানের শরীরী ছায়া দেখে দেখে বাস্তব আর অলীকের ভেদাভেদে আমার সন্দেহ জন্মাচ্ছিল বাজপাখি যখন ভাঙা কার্নিসের কিনারায় এসে বসে তখন ছায়াকার্নিস স্পষ্ট বেঁকে গিয়ে কাঁপে। চাতালে যখন হাঁটি– আমার নিজের ছায়াকে দেখি পা-বাঁকা বামন। ইঁটের পাঁজার ছায়া দেয়ালে পড়ে দৃঢ় এক রাজার মতন, তার চোখটি পর্যন্ত পাথরকুচিপাতায় আঁকা নিষ্ঠুর সবুজ। দীর্ঘ রোদ্দুরে তারা অতি ধীরে নড়াচড়া করে। পাল্লাহীন দরজা দিয়ে মহলের পর মহল পেরিয়ে গেলে শেষ কুঠুরির অন্ধকারে বসে আছে যক, গুপ্তঘরে ছায়া পরতে পরতে অন্ধকার হয়ে যায় সেখানে একটুকরো রোদ্দুর প্রজাপতি হয়ে ওড়ে।

জনহীন ঐ পোড়ো ভিটেগুলোয় ফকির, পরী, বাদশা, রাহী, কত কি দেখা যায়, উদ্ভট সব কার্যকলাপ মানুষের ছেড়ে যাওয়া বাড়িতে ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান তিন কাল এসে একসঙ্গে ঢোকে, কোনো পারম্পর্য থাকে না।

.

কার্তিককাকার বউ

ধনদিদির বড় ছেলে কার্তিককাকা কলকাতায় কাজ করত। বেঁটে কার্তিকের মতো তার নধর ফরসা চেহারা। শুধু মুখে সামান্য কঠোর ছাপ। তার বিয়েতে আমরা চার-পাঁচখানা নৌকো করে বরযাত্রী গিয়েছিলাম। মাইল তিনেক দূরে সেই কনের বাড়ি। জীবনে এই প্রথম আমার বিয়ের আসরে যাওয়া। বেরসিক যুবাদের রুক্ষ ঠাট্টা-ইয়ারকি আর আধভরা কলসির মতো বয়স্কদের বিচক্ষণতার গম্ভীর প্রদর্শনী শেষ হলে খেতে খেতে দুপুর গড়িয়ে গেল। ভোজের পরে খোলা নৌকোয় বাড়ি ফেরার জলযাত্রাটা বড় আনন্দের হয়েছিল।

পরদিন সাঁঝবেলায় কার্তিককাকা বউ নিয়ে এল ছায়াঘন বাঁশবনের সতেজ হালকা কঞ্চির মতো তার ছোট্ট ছিপছিপে দেহ, কালোসবুজ রং। রক্তাভ ঠোঁটের আড়ালে মা কালীর মতো সুন্দর দাঁত। সোনার মাকড়ি দুটো তার ঐ রং আর সুন্দর দাঁতের হাসির সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছিল।

আমি প্রথম কয়েকদিন তার কাছাকাছি ঘুরলাম। তার শাড়িতে, গায়ে আর নতুন কেনা বাক্সে যেন সৌরভের বাসা। তার নরম হাতের পাতায় বাপের বাড়ির সুখের সর মাখানো, চোখে একটু অপরিচিত ভয়। আমি তাকে লক্ষ করতাম বলেই বুঝলাম তার খুব দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি তার হাতের কোমল লালিমা মুছে গিয়ে রান্নার হলুদ ছোপ লাগল, নখে পাঁশুটে ফাট ধরল। তার টকটকে লাল শাড়ি ক্রমশ ধূসর লাল আর আঁচলে ময়লার দাগ।

কার্তিককাকা মাসখানেক পরে কলকাতায় চলে গেল। তার পর থেকে সে দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বনজঙ্গলে গাছের আড়ালে ঘুরে বেড়ায়। তার মুখে ক্লিষ্টতার ছাপ, সারা। গায়ে খড়ি ওঠা রুক্ষতা। আমি লক্ষ করতাম সে গাছের আড়ালে গিয়ে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে ঘসঘস করে উরু চুলকোয়, বার বার প্রস্রাব করতে বসে, কোমরের কাপড় আলগা করে উবু হয়ে নিজের শরীরে কি যেন দেখে। তার মুখ তখন দিকভ্রষ্ট কাতর প্রাণীর।

ছোটমার সঙ্গে এই নতুন কাকিমার কিছুটা মনের কথা হত। একদিন ছোটমা চুপিচুপি ঐ ঘরের মাকে নতুন কাকিমা সম্বন্ধে কি কি সব বলল। আমি তার থেকে শুধু উদ্ধার করতে পারলাম, তার নাকি খারাপ অসুখ হয়েছে। সব অসুখই তো খারাপ, তবু খারাপ অসুখ কথাটা রহস্যময় লাগল।

ক্রমশ দেখলাম নতুন কাকিমা কাপড়চোপড় ঢিলে করে আঁচল লুটিয়ে যেন ঠাণ্ডা একটু ছায়ার খোঁজে আরো গভীর বনে ঢোকে। আর সে চুল বাঁধে না। শ্মশানপারের বনের মধ্যে তাকে প্রেতিনীর মতো লাগে। আড়ালে দাঁড়িয়ে সে নিজের খসখসে উরু চুলকোয় যেন খেতে না পাওয়া বিড়ালী গাছের বাকল আঁচড়াচ্ছে। তার সবুজ চোখ জ্বলজ্বল করে। হয়তো সে নিজেও তখন বোঝে নি তার সিফিলিস হয়েছে শহরের আদাড় থেকে এসে হুলো বেড়ালটা তার মধ্যে বিষ ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে।

.

নৌকাযাত্রা, মাঝি

ধনদিদির বড় মেয়ে লাবিপিসি ছিল ডিম্ববতী মরালীর মতো দীর্ঘঅবয়ব সুন্দরী। তার বিয়ে হয়েছিল এক দূর গ্রামে। একবার নৌকো করে আমরা তার শ্বশুরবাড়িতে গেলাম। বাড়ির বউঝিরা যখন কোথাও যায় তখন বড়পুকুরের ঘাটে এসে নৌকো লাগে। পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে যেখানে হিজল গাছের অন্ধকার সেখানে ছোট খালের খাঁড়ির মুখ। বাড়ির

পুকুরঘাট থেকে সেই জলপথ ধরে বড় খালে পড়ে নদী-বিল-হাওড় হয়ে পৃথিবীর যে কোনো দেশে যাওয়া যায়।

লাবিপিসির নৌকো চলল সারা রাত্তির। আমি মেয়েদের মধ্যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে টের পাচ্ছিলাম নৌকোর দুলুনি, জলের কলকল, মাঝে মাঝে দুই পাড় থেকে ঝুঁকে পড়া ডালপালায় লেগে নৌকোর ছইয়ের ছররর শব্দ। ছইয়ের আর্চ করা সরু পথটুকু দিয়ে দেখা যায় ঘোর অন্ধকার আকাশে তারা। অন্ধকারে পৃথিবীর পথ নীরব সুড়ঙ্গের মতো, তার তলায় অফুরান জলধারা।

পরদিন ভোরে মেয়েদের উদ্ভাসিত কথাবার্তার মধ্যে যখন ঘুম ভাঙল তখন বাইরে এসে দেখি, নদী। ভোরের নদীজল অফুরন্ত রৌপ্যবাদামী। চারদিক জুড়ে সমান মাপের ছোট ছোট ঢেউ, যেন নদীর পুতুলেরা হাত তুলে তুলে সাঁতরাচ্ছে, ডুবছে। পুরো নদী কী জীবন্ত, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ধীরে ধীরে নৌকো ঘাটে বাঁধা নৌবহরের পাশে এসে ভিড়ল।

সেদিন সন্ধ্যায় লাবিপিসিদের বাড়ি মুকুন্দ দাসের যাত্রা হল। পালার নাম মনে নেই, শুধু মনে আছে ধবধবে সাদা পোশাকের উপর চওড়া লাল বনাতের ফেট্টি পৈতের মতো পরা, পায়ে কালো হান্টিং বুট দুজন ইংরেজ বাঙালিদের উপর চাবুক চালাচ্ছে। আর, আমার ভাগ্য, মাত্র দু হাতের দূরত্বে আমি স্বয়ং মুকুন্দ দাসকে দেখলাম- গেরুয়া লুঙ্গি, আজানুলম্বিত গেরুয়া পাঞ্জাবি এবং গেরুয়া পাগড়ি পরা, বুকে সম্ভবত মেডেলের সাতলহরী, পাকা গোঁফ দু পাশে ঝোলা, দশাসই চেহারার প্রৌঢ় সাজঘর থেকে গান গাইতে গাইতে ধেয়ে চলেছেন মঞ্চের দিকে। তাঁর গলার স্বর গম্ভীর, উঁচু, ক্রোধান্বিত এবং ঈষৎ ধরা।

আমাদের দেশে এস্কর্টকে বলে চলনদার বা চরণদার। বাপের বাড়ি বা শ্বশুরবাড়ি থেকে কাকা ভাইপো দেওর বা পুরনো ভৃত্য নিয়ে যাবার জন্য এলে বউঝিদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে যেত, তারা বলত, ‘চরণদার আইছে। তারা গুছিয়েগাছিয়ে পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে চলনদারের সঙ্গে চেপে বসত নৌকোয়।

বালকবয়সে নৌকোয় কোনো দীর্ঘ পথে যেতে হলে আমারও চলনদার লাগত। সেইসব জলযাত্রা যেমন সুখের তেমনি বিপদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যদি বা সামলানো যায়, ডাকাতের ভয় এড়ানো যায় না। কিন্তু আতঙ্ক তো বিশেষ বিশেষ জায়গায়, আর সুখ তো সারা পথে। শরতের জলপথ, শীতের জলপথ, গ্রীষ্মের জলপথ- সে একই জলপথ, তবু কত আলাদা তার রূপ। নৌকোয় যেতে যেতে ভোরে, রাত্রে, বিকেলে আমি পৃথিবীর গোপন গলার কত পটমঞ্জরীর গান শুনেছি।

একদিন অপরাহ্ন নির্জন। অচেনা জায়গায় খালের বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল, ভাটায়। জল সরে গিয়ে পৃথিবীর একটু কাদার পিঠ ভেসে উঠেছে ভাটার টান তার উপর কোমল কত রেখা এঁকে রেখেছে, আর জলের কোলে শেষ রেখাঁটি চিকচিকে সোনালি। সেই কাদায় ধূসর কয়েকটা কাদাখোঁচা চঞ্চল হয়ে পোকা খুঁজছে। ব্যাপারটা কিছু নয়, কিন্তু সেই অপাপবিদ্ধ নির্জনতা এবং ঘুমে ডোবা গোধূলি-আলোর মধ্যে পদচিহ্নহীন নতুন কাদায় কয়েকটা ছোট পাখির প্রাণমন ডুবিয়ে খাবার খোঁজা যখন আর একটা বাঁক ঘুরতেই মিলিয়ে গেল তখন মনে হল আমার ঘুমন্ত প্রাণের কোনো অবোধ পিপাসা রেখে এলাম ঐখানে।

আর-একদিন, সেদিনও ভাটা, দুজন মাঝি লগি ঠেলতে না পেরে নৌকোয় লম্বা দড়ি বেঁধে গুণ টানতে গেল। তখন সূর্যাস্ত হচ্ছে। আমি নৌকো থেকে দেখছি খালের খাড়া উঁচু

পাড়ের গা ঘেঁষে শুধু আকাশ সেখানে মেঘ ফেটে গিয়ে গভীর আগুন ছড়িয়ে গেল, আর সেই আরক্ত আগুনমেঘের মধ্যে দুজন মাঝির ঝুঁকে পড়া সিলুএট পায়ে পায়ে চলে যাচ্ছে। খাড়া পাড়ের জন্য খেত মাঠ গাছ কিছু দেখা যায় না, শুধু আকাশ।

মানুষ কোথায় যায়? এই কঠিন প্রশ্নের উত্তরে আমার মনে এখনো কেবল সেই ছবিটা আসে: লাল মেঘের মধ্যে দুজন মাঝি গুণ টেনে চলেছে।

বিলের মধ্য দিয়ে একবার নৌকো যাচ্ছিল, তখন ধানের ঋতু। দিগন্তবিসারী জলের মধ্যে দু-মানুষ-সমান সবুজ ধান গাছ আমাদের নৌকো ঢেকে দিচ্ছিল। তলায় গভীর জল বোঝা যায় না, যেন ধানবনের উপর দিয়েই সরসর করে চলেছে নৌকো। ধানের ধারালো পাতা দু দিকে নুয়ে পড়ে, গায়ে এসে লাগে। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ন্ত পোকা ঝাঁপিয়ে আসে, গা শিরশির করে। ভয় পেয়ে মাঝিকে জিজ্ঞেস করলাম, ও মাঝি, এখানে সাপ আছে নাকি? মাঝি এক পায়ের বুড়ো আঙুলের গোড়ায় পুরো শরীরের ভর দিয়ে লগি আঁকড়ে নৌকো বাইছিল, আমার প্রশ্ন শুনে দ্বিতীয় ইন্দ্রনাথের মতো তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিল ‘হাপ? হ্যাঁ তো দুই-চাইরখান থাকপেই। আশ্চর্য, মাঝির বলার ভঙ্গিতে আমার কিন্তু ভয় কেটে গেল।

আমার তখন তের-চোদ্দ বয়স। বাবার সঙ্গে এক সুদূর শহর থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। ট্রেন, স্টিমারের লম্বা পাড়ির শেষে আমাদের বিশাল নদী, দীর্ঘ খালের দেশ। নদীর ঘাটে অগুনতি কেরায়া নৌকোর বহর, সেখান থেকে নদীপথে অনেক দূর গিয়ে যখন খালের খাঁড়িতে ঢুকলাম তখন শেষদুপুর। মাঝি বলল, রাত আটটার আগে জোয়ার আসবে না, এবং এখন ভাটার খালে নৌকো চালানো অসম্ভব। অতক্ষণ বসে থাকা! বাবা বললেন, “চল, হেঁটেই যাব। সেখান থেকে বাড়ি বাইশ-তেইশ মাইল। মাঝি সাবধান করে দিল, অমুক অমুক জায়গায় ডাকাতের ভয়, যেন নিশ্চয় আমরা সন্ধ্যার আগে সেসব জায়গা পেরিয়ে যাই।

প্রথমটা ভারি চমৎকার লাগল- ফুরফুরে দুপুরে অজানা জায়গা দেখতে দেখতে নিরিবিলি রাস্তায় হাঁটা। কিন্তু মাইল পাঁচেক যেতে না যেতে ক্লান্তি এল, হাতের সুটকেস বার

বার হাঁটুতে ঠুকে যেতে লাগল। সন্ধ্যার আগে দূরে দেখা গেল বিরাট এক বট গাছ, ঐখানেই ডাকাতি হয়। আমি বাবার পিছু পিছু এগোচ্ছি আর পাখির চধুর মতো দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে দেখছি গাছের আড়ালে কোথাও ডাকাত থানা পেতে আছে কিনা। গাছটা বিশাল, কিন্তু লক্ষ করলাম, শকুন পড়লে যে রকম হয়, তার পাতাগুলো তেমনি মনমরা। কিছুই ঘটল না, আমরা নিঃসাড়ে সেই বটতলা পেরিয়ে গেলাম।

পথেই সন্ধ্যা হল, পথেই রাত্রি ঘিরল। আমার ধূলিধূসর পা আর হাঁটতে চাইছে না। অন্ধকারে আমি সুটকেসটা মুটের মতো মাথায় চাপিয়ে নিলাম। নিঃসীম আকাশের তলায় বকুলফুলের মতো হাওয়া দিচ্ছে, তারার গা থেকে পাখি বটফল ফেলছে- আমরা কিছু না বুঝে আরো দুটো ভয়ের জায়গা পেরিয়ে গেলাম। প্রথম প্রহরের শেয়াল ডাকলে বাবা বললেন, এই গ্রামে উত্তমীপিসির বাড়ি, চল একটু জিরিয়ে নিবি। উত্তমীপিসি আমাকে ঠাণ্ডা জল দিলেন, আধ ঘণ্টার মধ্যে ভাত আর ডিমসেদ্ধ করে দিলেন। খেয়েদেয়ে আবার হাঁটা। মানুষজন সব বাড়ি ফিরে গেছে। পৃথিবী থেকে আকাশে উঠেছে কালো, নীল আর নীলপ্রভ তিন স্তর অন্ধকার যেন বামন অবতারের বিরাট তিন পায়ের তলার ছায়া, ছায়া, ছায়া। তারও উপরে বলকা দুধের ফেনার মতো তারার দল পুব থেকে পশ্চিমে চলেছে। আমরা সেই তারার আলোর উদ্ভট জ্যোৎস্নায় হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে রাত তিন প্রহরে বাড়ি পৌঁছলাম।

কয়েকদিন পরে ইতিহাস বইয়ে পড়লাম আকবর না শের শা না কি বাবর দিনে চল্লিশ মাইল হাঁটতে পারতেন। আমি তেইশ মাইল হেঁটেছিলাম।

নৌকোর মাঝিদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুইই ছিল। দুয়েরই চূড়ান্ত কষ্টসহিষ্ণু শরীর, হাত কাঁধ আর বুকের পেশী যেন লোহার তার পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে তৈরি, হাতের তেলোর চামড়া পাথরের মতো। জলের সঙ্গে সারা জীবন বাস করে বুড়ো মাঝিদের মুখে জলের মুখের মতোই কোঁচকানো সরল দাগ। সরু গলুইয়ে দাঁড়িয়ে মাঝি যখন লগি ঠেলে তখন বোঝা যায় তার শক্তিমান শরীরের লঘুতা আর স্থিতিস্থাপকতা- এক পায়ের বুড়ো আঙুলের

গোড়ায় ভর রেখে সে উড়ন্ত ভাস্কর্যের আকার নেয়, দুই হাত এবং সমস্ত শরীর যেন পেঁচিয়ে যায় লম্বা লগির সঙ্গে, নিজের চেয়ে তিন-চারগুণ লম্বা লগিটাকে জলের বুকে গেঁথে, চাপ দিয়ে প্রায় বাঁকিয়ে, সে নৌকো বায়। অবিরাম বেয়ে যায় বারো ঘণ্টা, চোদ্দ ঘণ্টা, সারা রাত। রোদে ঘাম হয় বলে ওরা পছন্দ করে রাত। সন্ধ্যারাত্রে পেটপুরে খেয়ে ওরা নৌকো ছাড়ে। ভাড়া ঠিক করার সময় বলে- 'অ্যাকসন্ধ্যা খাওন আর অ্যাকটা ট্যাহা দেবেন। এক টাকা! কও কি মাঝির পো?– 'আইচ্ছা, না হয় বারো গণ্ডা পয়হা দেবেন। সন্ধ্যারাত্রে এসে মাঝি আমাদের দাওয়ায় বসে লণ্ঠনের আলোয় পেট পুরে ভাত খেয়ে বাক্সবিছানা নিয়ে চলে যায়। তার পর এক কলকে তামাক খেয়ে ছাড়ে নৌকো। এখন সে-ই অভিভাবক, সে-ই ক্যাপ্টেন। পুরো জেলার খাল-বিল-নদীর ম্যাপ তার নখদর্পণে। আমাদের দেশের দিকচিহ্নহীন বিলের মধ্যে আঁধার রাতে কি করে যে সে দিক ঠিক করে, মাঝনদীতে দুই তীর যখন নীল পেনসিলের দুটি দুর্নিরীক্ষ ধূসর রেখা তখন সে কি করে ঠিক ঘাটটির হদিশ পায়, এ এক রহস্য। আমরা রাত্রে ছইয়ের নিচে ঘুমোই। তখন মাঝি আর জল মুখোমুখি, একা।

.

কাঠুরে

মাঝিদের চেয়ে আরো নিঃসম্বল খাটুয়ে লোক ছিল কাঠুরেরা। মাঝিদের তো তাও একখানা নৌকো ছিল, তাদের কী ছিল, একখানা কুড়ুল ছাড়া? তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে খবর নিত, জ্বালানির জন্য গাছ কাটতে হবে কিনা। আমাদের বাড়ি আসত ছোলেমান, ছাব্বিশ সাতাশ বছরের যুবা। দাদু তাকে বনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে দেখেশুনে পূর্ণবয়স্ক কোনো গাছ বেছে দিতেন। ছোলেমান গাছে উঠে উঁচু কোনো মোটা ডালে দড়ি বাঁধত, তার পর নেমে এসে টানা দিত অন্য গাছের গুঁড়িতে, যে দিকে সে গাছটাকে ফেলতে চায়। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম শিকড় ঘেঁষে গোড়ায় প্রথম কোপ পড়লে নিজের মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত গাছ নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমশ চাকলা চাকলা হাড় কেটে কেটে ছিটকে পড়ে। সেই কাঁচা হাড়ে একটা সপ্রাণ গন্ধ। গাব হিজল কড়ই রেইন ট্রি এক এক গাছের হাড়

এক এক রঙের। আঁধার ভরা গাছেদের হাড় রক্তিমাভ, আলোভরা গাছেদের হাড় ঈষৎ নীলাভ কিংবা হলদেটে। মাটির গর্ভে কোথায় রং থাকে গাছ জানে, সে তাকে ঠিক পছন্দমতো শুষে নিয়েছিল।

তিন ভাগ মতো কাটার পরে গাছ সামান্য কেঁপে কেঁপে উঠত, তার পর একটু একটু টলত। একেবারে শেষে, হঠাৎ কড়মড় মড়াৎ করে একটা কঠিন দাঁতে-দাঁত ঘষার মতো শব্দ হত। বনের মধ্যে বাতাস ও অন্য গাছেদের মুখে চড়চাপড় মেরে ডালপালাসুদ্ধ সে ঘটোৎকচের মতো মুখ থুবড়ে পড়ত মাটিতে। তার পড়ার বিরাট হুলুস্থুলুতে আমার আনন্দ হত। কিন্তু পরে যখন দেখতাম জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল, একজন গাছ কমল, তখন মনটায় হঠাৎ কেমন কামড় লাগত সামনের বর্ষায় সে আর সারা গা জলে ভিজিয়ে নাইবে না।

ছোলেমান বনের মধ্যেই তার ডালপালা কেটে গুঁড়ি এবং মোটা মোটা শাখা আড় বরাবর টুকরো করত। তার পর গড়িয়ে গড়িয়ে পুরো গাছটাকে এনে ফেলত উঠোনে। আমি পাতাসুদ্ধ ডালপালাগুলো টানতে টানতে নিয়ে আসতাম। এখন ওদের লম্বালম্বি চেলা করা হবে। সকাল থেকে অবিরাম কুডুল চালিয়ে ছোলেমানের ফরসা পিঠে দরদর করে ঘাম বইছে। মধ্যদুপুরে সে দু হাত আঁজলা করে হাঁক পাড়ত, ‘দ্যান, মা ঠাইরেন, অ্যাক কোশ ত্যাল দ্যান। এত্তখানি তেল মাথায় গায়ে থাবড়াতে থাবড়াতে সে পুকুরে যেত। উঠোনে বসে তিনজনের ভাত একা খেত। তার পর আবার কাঠ চেলা করতে লাগত। তার কুড়লে অসম্ভব জোর, সন্ধ্যা হবার আগেই সে পুরো গাছটাকে চেলা করে ফেলেছে। দ্যান, মা ঠাইরেন, জল খাইতে দ্যান। হাসিমুখে সে গামছায় আধসেরখানেক মুড়ি বেঁধে, নগদ আট আনা পয়সা নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে তেঁতুলতলার পথ দিয়ে চলে যেতঐদিকে কোথায় যেন তার বাড়ি।

আড়াই-তিন ফুট ব্যাসের একটা আস্ত গাছকে একা এক দিনে চেলাকাঠ বানানো যে কী অমানুষিক কাজ সেকথা আমি তখন বুঝতাম না, বোধ হয় আট আনার কাঠুরে ছোলেমান

নিজেও বুঝত না।

.

ঠাকুমার ওষুধ

অম্বলের ব্যথায় ভুগে ভুগে ঠাকুমার শরীরটা খারাপ হয়ে আসছিল। চিকিৎসা করেও কিছু উন্নতি হল না। হয়তো তেমন চিকিৎসাই হয় নি। ঠাকুমা বলতেন, “শরীলে শূলব্যথার মতো কষ্ট হয়। এমন সময় একটা অদ্ভুত ওষুধের খবর এল সাপের দেওয়া ওষুধ, অনেক দূর গ্রামে এক বুড়ীর কাছে নাকি সেই ধন্বন্তরি ওষুধ আছে। আমরা কয়েকদিন ধরে সেই ওষুধের রোমাঞ্চকর ঘটনা শুনলাম।

ঠাকুমার মতোই একজন অম্বলের রোগী বড় কষ্ট পাচ্ছিল। যখন ব্যথা উঠত তখন সে ডাক ছেড়ে কাঁদত। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে একদিন সে ঠিক করল, এ প্রাণ আর রাখবে না। মরবার জন্য বাড়ি ছেড়ে এক ঘোর জঙ্গলে ঢুকে হারাউদ্দেশ্যে চলতে লাগল- বাঘ, সাপ যে-কেউ তাকে খেয়ে নিক, এই কষ্টের জীবনের শেষ হোক। অথচ বাড়ির দিকে তার কত মায়া– সেখানে তার বুড়ো আছে; ছেলে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনী আছে। এইসব মনে করে সে কাঁদছে আর পথ চলছে।

সন্ধ্যার মুখে সে এক ঐরান জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়ল। তখন জঙ্গলের মাথায় এক বিশাল লাল মেঘ এসে গাছের ডালে ডালে রাঙা আভা আর তলায় তলায় আন্ধার ফেলেছে। সূর্য ডুবুডুবু। কোথাও জনমানব নেই। হঠাৎ তার সামনে পথ আটকে দাঁড়াল বিশাল ফণা তুলে এক বিরাট সাপ মহানাগ। কোথা যাস তুই? অম্বলের রোগী বলল, “আমি মরতে চলেছি, তোমার ছোবলেই আমার মরণ হোক। সাপ বলল, “কেন তুই মরতে চাস, তোর কিসের দুঃখ? তখন সে আনুপূর্বিক সব বলল। শুনে সাপের দয়া হল, ‘শোন, আমি তোকে অক্ষয় ওষুধ দিচ্ছি, এই ওষুধ নিয়ে তুই বাড়ি ফিরে যা, তোর রোগ সেরে যাবে। এই বলে সাপ ওয়াক করে গলার মধ্য থেকে একটা নরম অদ্ভুত বস্তু উগরে পাতার

উপর ফেলে দিল। বুড়ী বাড়ি ফিরে এসে সেই অক্ষয় ওষুধ জলে ভিজিয়ে রাখল। পরদিন দেখে সেই বস্তুটি একটির বদলে দুটি হয়ে আছে। সে একটি খেল, আরেকটিকে আবার জলে ভিজিয়ে রাখল। পরদিন আবার একটির বদলে দেখে দুটি হয়ে আছে। এই রকম রোজ। সেই অক্ষয় ওষুধ কয়েকদিন খেয়ে সে ব্যাধিমুক্ত হল।

এই কাহিনী আমাদের বাড়িতে খুব উত্তেজনা আনল। শেষে একদিন সেই দূর গ্রামে গিয়ে কাকা সেই বুড়ীর কাছ থেকে ওষুধটা নিয়ে এল। আমরা সবাই দেখলাম, কাঁচের জলভরা বয়ামের মধ্যে ইঞ্চি ছয়েক ব্যাসের একটা বার্ট সায়ানা রঙের জেলির মতো জিনিস ভাসছে, যেন একটা বড়সড় মালপোয়া। সেই মালপোয়া বা জেলি রোদ্দুরের মধ্যে ধরলে তার থেকে কেমন একটা স্বচ্ছ আভা বেরোয়। সেদিন আমাদের বাড়িতে ঐ ওষুধের গল্পই একমাত্র কথা।

পরদিন সত্যিই অবাক কাণ্ড! ঐ জেলিখানা বয়ামের জলের মধ্যে একটির বদলে দুটি হয়ে আছে- হুবহু একই মাপ, একই রং, একই আকৃতি, একটির উপর আরেকটি যেন সেঁটে আছে। ঠাকুমা সাপের দেবতা মনসাকে স্মরণ করে উপরের জেলিখানা তুলে ভক্তিভরে খেয়ে ফেললেন, নিচের জেলখানা জলে ভেসে রইল। পরদিন আবার সেই একই কাণ্ড। ঠাকুমা বেশ কিছুদিন সেই জেলি খেলেন। রোগ কিন্তু সারল না। রোগ না সারলেও অক্ষয় ওষুধ অক্ষয়ই রইল।

এতদিন পরে ভেবে ভেবে আজ আমার মনে হয় জিনিসটা বোধ হয় চোখমুখপায়ুহীন কোনো আদিম স্তরের প্রাণী, যার বেঁচে থাকার জন্য জল দরকার, এবং যার প্রজনন এবং বৃদ্ধি ঘটে এক রাত্রের মধ্যেই। জিনিসটা রহস্যময় সন্দেহ নেই।

.

অ্যাডভেঞ্চার শরতে

একবার, তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি, পুজোর ছুটিতে আমাদের উপত্যকা-শহর থেকে গ্রামে ফিরে এসেছি, আমার মাথায় একটা অ্যাডভেঞ্চারের প্ল্যান এল। শুধু শেষশরৎআকাশের উজ্জ্বল নীলিমা নয়, খগেন মিত্তিরের ভোম্বোল সর্দার আর হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বিমল, কুমারও আমাকে ক্রমাগত ওসকাচ্ছিল। পুজোর অবসানে ছুটির মন্থর দিন কাটাতে কাটাতে মনে হল এককাপড়ে বেরিয়ে কয়েকদিন গ্রামের পর গ্রাম ঠিকঠিকানাহীন ঘুরে আসি। কিন্তু ভোম্বোলের মতো আমার সাহস নেই, অতএব পুবের ঘরের সদানন্দকে সঙ্গী হবার জন্য জপালাম। দুজনে পরামর্শ করে ঠিক হল আমরা খুব ভোরে বেরুব, যেতে যেতে যখন দুপুর হবে তখন পোটলা খুলে খাবার বার করে খাব। তার পর হাঁটতে হাঁটতে যেখানে সন্ধ্যা হবে সেখানেই রাতের আস্তানা। পরদিন ভোরে আবার হাঁটা।

খাবারের কথায় সদা স্পষ্ট জানিয়ে দিল, সে ওসব দিতে পারবে না, আর পয়সাই। বা তার কোথায়? আমি দেখলাম এই সামান্য কারণেই বুঝি প্ল্যান ভেস্তে যায়, অগত্যা ছোটমাকে গিয়ে ধরলাম। ছোটমা পরদিন শেষরাতে উঠে একতাড়া পরোটা আর আলুভাজা বানিয়ে কাগজে মুড়ে দিল। আমরা সেই রসদ আর আড়ং-খরচের জন্য পাওয়া নগদ দেড়টি টাকা নিয়ে পথে নামলাম। চাঁদসী গ্রাম ছাড়াবার পর মনে হল, অভিভাবকদের অনেক দূরে ফেলে এসেছি, এখন আমরা সাবালক। চার হাতে পায়ে জ্যামুক্ত তীরের স্বাধীনতা আর দশ দিকে পাখি ওড়ার নীল হাওয়া।

ঝোলার পরোটার দিকে মন ছোঁচা বেড়ালের মতো অনেকক্ষণ ছোঁকছোঁক করে ঘুরছিল। এইবার খালের পাড়ে একটা গাছের নিচে ঝোলা খুলে দুজনে মুখোমুখি বসলাম। আমাদের সামনে অনেকগুলো দুরূহ কৃচ্ছতার দিনরাত্রি। হিসেবী পিঁপড়ের মতো অর্ধেক খেয়ে বাকি অর্ধেক রেখে দিলাম রাতের জন্য। নিজের ভার নিজে নিলে যেন দৃষ্টি খুলে যায়। এই শরৎদুপুরে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে, তেইশ ডিগ্রি অক্ষাংশের তিন মাইল উত্তরে আর নব্বই ডিগ্রি পূর্বদ্রাঘিমার নয় মাইল পুবের বিশেষ কাটাকুটিতে বসে এই যে আমরা দুটো ছেলে ক্ষুধার্ত পাকস্থলীতে খাবার দিচ্ছি এইটুকুই প্রাণমনজীবনের সর্বার ইন্ধন।

খেয়েদেয়ে আলোয় উপচনো পৃথিবীতে আমরা হাঁটতে লাগলাম। বেলে মাটির রাস্তা এখন সুরস, আকাশ নির্মল, বাতাস তেজোময়। যত দূর চোখ যায় উঁচু রাস্তার দু পাশে ধানের খেত, মাঝে মাঝে গাছপালার আড়ালে গ্রাম।

যেতে যেতে এক জায়গায় সবুজ ধানখেতের ফাঁকে দেখা গেল, অনেক দূরে যেন এক নদী, তার সাদা জল স্পষ্ট। এখানে নদী আসবে কোত্থেকে? অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে আরো এগিয়ে মনে হল, নদীর সাদা জল যেন বাতাসে দুলছে। বিভ্রম ভাঙল একেবারে কাছে গিয়ে নদী না, কাশবন। ধানখেতের মধ্যে রাস্তার আড়াআড়ি দীর্ঘ বিস্তার নিয়ে এক ঘন কাশবন সেখানে ফুল ফুটেছে।

বেলা ঢলে পড়লে সদানন্দ খুঁতখুঁত শুরু করল। এভাবে পাগলের মতো রাস্তা হেঁটে কী লাভ, তার চেয়ে বাড়ি ফেরা ভালো। আমি তার কথায় কান দিলাম না, আজকের রাত পথে কাটাবই। হালে জোতা অনিচ্ছুক গরু যেমন বসে পড়ে তেমনি ইচ্ছে করে সদা পিছিয়ে পড়তে লাগল। সন্ধ্যার মুখে দূরে একটা মঠের চুড়ো দেখা গেল। আমি সদার হাত শক্ত করে ধরে সেই দিকে এগোলাম, আজকের রাতে ওখানেই থাকব।

রাস্তার বাঁ দিকে একটা শুড়িপথ চলে গেছে। সেই পথে খানিকটা এগিয়ে ছোট ছোট ঝোঁপঝাড়ের মধ্যে চৌরস জমির উপর মঠ। ধারেকাছে কোনো লোকালয় নেই। মঠের মধ্যে শুকনো ঘাস-কুটো, ছাগলের নাদি। আমি ঝোঁপ থেকে ডাল ভেঙে এনে মঠের ভিতরটা ঝাঁট দিলাম। সদা বলল, এখানে রাত্রে থাকলে আর জ্যান্ত ফিরতে হবে না। এই রকম মঠে, অনেকে দেখেছে, রাত্তিরবেলা তিনখানা কাঁচা বাঁশ এসে দরজা আটকে দাঁড়ায়।

মঠের মোটা দেয়ালের ছোট্ট খুপরিটার মধ্যে প্রদোষের অন্ধকার জমে উঠেছে। সদার দুর্বোধ কথায় কেমন যেন অতিলৌকিক গন্ধ! আমি ভয় পেয়ে একটা মাটির ঢেলা এনে পাল্লাহীন দরজার মাথায় বড় করে লিখলাম: রাম।

সন্ধ্যা ঘোর হয়ে উঠল, হঠাৎ চতুর্দিকে শেয়াল ডেকে হঠাৎই থেমে গেল। মঠের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছি, আমাদের কারো মুখে কথা নেই। ঝোলা খুলে অন্ধকারে ইঁদুরের মতো পরোটা আলুভাজা শেষ করলাম। একটু দূরে নিঃসীম মাঠে হাঁটু পর্যন্ত কাদাজলে ডোবা ধান গাছেরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিকেলে দেখছিলাম তাদের ভিতরে অল্প জলে কোচবকেরা নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করছিল। মনে হয়েছিল ঐ সবুজ তোরণের মধ্যে বকের শান্তি। এখন ঐ খোলা, নির্বাক, অন্ধ মাঠের মধ্যে সেই ধান গাছদের ভয় করছে না? তাদের গা বেয়ে শামুক উঠছে, সাপ কিলবিল করে চলে যাচ্ছে, কই মাছেরা লাফিয়ে লাফিয়ে ফুল ছিঁড়ে খাচ্ছে। মুখ ফেরানো আকাশের নিচে গতিশক্তিহীন তৃণজীবনের দুঃখ আর ভয় আমার মধ্যে এসে ঢুকল।

ভোরে ঘুম ভাঙলে দেখি মনের কোথাও ভয়ের লেশমাত্র নেই। পৃথিবী যেন সাবানের বুদবুদ। কিন্তু খুব হয়েছে! সদা আর অমি হাসিমুখে বাড়ির পথ ধরলাম। পথে পেট ভরে চার আনার জিলিপি খেয়ে, এক আনার বাতাসা চার পকেটে বোঝাই করে নিশ্চিন্তে হাঁটতে লাগলাম। মনে একটু ক্ষোভ- অ্যাডভেঞ্চারটা হল না।

.

অ্যাডভেঞ্চার: বর্ষায়

এর দু বছর পর গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি এসেছি। খবর পেয়ে ছোটপিসিমা আর সেজোপিসিমার চার ছেলেমেয়ে তাদের দুই দূর গ্রামের বাড়ি থেকে একসঙ্গে এসে হাজির। আমরা সবাই দু-এক বছরের ছোট বড়। সেজোপিসিমার মেয়ে একটি পাক্কা টমবয়– সে গাছকোমর বেঁধে আমাদের আগে আগে গাছে উঠে যায়, মারামারি বাঁধলে দঙ্গলে লড়ে। তার নাকে নোলক, কিন্তু মাথাটি ন্যাড়া।

এক বাড়ির মজা যথেষ্ট না, সুতরাং ঠিক হল আমাদের দলটা এবার ছোটপিসিমার বাড়ি হয়ে সেজোপিসিমার বাড়ি যাবে।

সকালবেলা ফেনসা ভাত খেয়ে আমরা চার ভাই এক বোন বেরুলাম। আমাদের মধ্যেকার আনন্দ দিগন্ত পর্যন্ত বাতাসের সঙ্গে হু হু করে ছুটে চলেছে, শূন্যে রামধনুর মতো আমাদের ফুর্তি ঠিকরোচ্ছে। আমাদের প্রত্যেকের শরীর লঘু, পাখির মতো শিস দিতে পারি, চাইলে উড়তেও বোধ হয় পারি। আমরা যত রকম সম্ভব মজা করতে করতে পথ চলতে লাগলাম। মাটির উঁচু পথের দু পাশে নানা উচ্চতার পাটখেত। গ্রীষ্মের রোদ কড়া হতে পারছে না- পাটখেতের নীল হাওয়া এসে তাপ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পড়ন্ত বেলায় আমরা অশ্বিনীকুমার দত্তের গ্রাম বাটাজোড় ছাড়ালাম, সন্ধ্যার আগেই পৌঁছলাম ছোটপিসিমার বাড়ি।

ছোটপিসিমা বিধবা হয়ে তখন একা একা ভিটে আগলান, ছেলেদের আগলান। কিন্তু তাঁর প্রাণশক্তি প্রচুর দিনে খলবল করে কাজ করেন, রাতে লণ্ঠন জ্বালিয়ে পাহারা দেন। চোর, ডাকাত, প্রতিবেশী এবং সন্তানেরা কেউ তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না।

ছোটপিসিমার কাছে দু দিন নানারকম খেয়ে, তিন দিনের দিন আমাদের দলটা চলল সেজোপিসিমার বাড়ির দিকে। তাঁদের গ্রামের নাম চন্দ্রহার।

বেশ হৈ হৈ করে পথ চলছিলাম। অপরাহ্নে হঠাৎ মেঘ উঠল যেন নীল ঘাস দিয়ে বোনা পাখির বাসা। বাতাস আর বিদ্যুৎ তার মধ্যে এসে ঘোঁট পাকাতে লাগল। তার পর পুটপাট করে বৃষ্টি নামল। আমাদের পাঁচজনের তাপ্পিমারা একটামাত্র ছাতা, সেটাও হাওয়ার দমকে উলটে গেল। বৃষ্টি ঝেপে এলে পথের পাশে গাছতলায় দাঁড়াই, কমে গেলে আবার হাঁটি– এইভাবে থেমে থেমে চলতে চলতে শেষে বিরক্ত হয়ে বেপরোয়া বৃষ্টির মধ্যেই হাঁটতে লাগলাম। মাঠে মাঠে জল দাঁড়িয়ে গেছে, ছোট ছোট স্রোত এসে পড়ছে খালে, দূরে দেখা যায় পাটখেতের উপর বৃষ্টি ঘুরুপাক খাচ্ছে, জলের ছায়া কত দূর পর্যন্ত আমাদের ঘিরে আছে।

সন্ধ্যার মুখে পিসিমাদের বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখি মাঠের জল একটা টুবুটুবু ভরা পুকুরের সঙ্গে এক হয়ে গেছে, আর সেই গোড়ালিডোবা ছিপছিপে জলের পথ ধরে পুকুরের আধ হাত লম্বা পুরনো কই মাছেরা সার বেঁধে মাঠ পেরিয়ে চলেছে দেশান্তরে। আমরা কালক্ষেপ না করে দেড়-দুই কুড়ি কই সেই উলটনো ছাতার মধ্যে ভরে ফেললাম।

সেজোপিসিমার বাড়ি দু দিন কাটল, তিন দিন কাটল, কিন্তু সেই নাগাড়ে বৃষ্টি আর থামে না। এই জলের মধ্যে পিসি ছাড়বে না, এদিকে আমার মন ছটফট করছে নিজের বাড়ির জন্য। এক পিসতুতো ভাই একটা তুক বলল, একশোটা পুর কাগজে লিখে পোড়ালে নাকি বৃষ্টি থেমে যায়। আমি কাশীপুর, চাঁদপুর, ফতেপুর, বদরপুর, শিবপুর, অনুরাধাপুর পৃথিবীর যত পুর আছে লিখে পোড়ালাম। কিন্তু কিছু হল না। তখন আর এক পিসতুতো ভাই একটা ব্যাং মেরে উঠোনে চিত করে ফেলে রাখল। কিন্তু তাতেও বৃষ্টি ধরল না। আমি থেকে থেকে আকাশ দেখি: অশেষ মেঘ। মন ব্যাকুল হয়ে উঠছে। শেষে দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর বৃষ্টি যেই একটু ধরেছে আমি সবচেয়ে ছোট ভাইটাকে বলে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

পথঘাট জলে ভেজা, বাতাসে জলকণা। এক্ষুনি আবার বৃষ্টি আসবে। আমি হনহন করে পা চালালাম। পথ একেবারে জনহীন, একটা গরু-বাছুর পর্যন্ত নেই। দিগন্ত পর্যন্ত দু দিকে শুধু

পাটখেত। মাইল দুয়েক যেতে না যেতে বৃষ্টি এল, আমি না থেমে চলতে লাগলাম, এখনো অন্তত দশ ক্রোশ অচেনা পথ পাড়ি দিতে হবে।

মাঠের বৃষ্টি বড় বিশাল। অনাবৃত পৃথিবীকে নিরাশ্রয় পেয়ে তার বল দুর্ধর্ষ। বাতাসের বেগ জলের রেখাকে থুড়ে থুড়ে ধোঁয়া করে দিচ্ছে। পিঠের উপরে বৃষ্টি আমাকে তার পেরেকগাথা থ্যাবড়া হাতে চড়ের পর চড় মারছে। কিন্তু ভালোই হল ঝড়ের ধাক্কা আমাকে তিনগুণ বেগে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল সামনে– শরীরটাকে শুধু খাড়া রাখতে পারলেই হল, পা বিনা আয়াসে অতি দ্রুত মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায়।

কিন্তু সমস্ত বাঙলা দেশ জুড়ে বৃষ্টি নেমেছে নাকি! বাতাসের গর্জনের সঙ্গে চারদিকে বাজ ডাকছে কড় কড় কড় কড় বৃষ্টির শরজাল ভেদ করে ব্রহ্মশির অস্ত্র পড়ছে- একটা ছুটে এসে আমার গলার নলীটা কেটে দিলেই হয়ে যায়। আমি চোখের সামনে দেখলাম জমাট নীল আগুনের বলথান্ডার এদিক ওদিক পাটখেতে পড়ে ব্রাহ্মণের কাটা মাথা থেকে সাদা ধোঁয়ার শিখা ওঠাচ্ছে। আমি ছাড়া এই বাঙলা দেশের মাঠে কেউ নেই।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি আর হাওয়ার দমকে আমার শরীরে এবার ঠাণ্ডার কাঁপুনি ধরল। আমি প্রায় দৌড়তে লাগলাম। এমন সময় দেখি সামনে চাঁদসীর লোহার পুল। আষাঢ়ান্ত বেলার তখনো খানিকটা বাকি আছে। বৃষ্টিও একটু ধরে এল। বৃষ্টি থেমে যাওয়া হাওয়ায় আমি ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে হাঁটতে লাগলাম। বাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন মেঘলোকে রক্তহীন শেষ সূর্যাস্তলেখা।

বড়মা ছোটমা আমাকে ঐ ঝড়জলের মধ্যে দেখে অবাক। তাড়াতাড়ি গা-মাথা মুছে, শুকনো কাপড় পরে, পুরু কাঁথার মধ্যে সেঁধিয়ে গেলাম শরীর গরম করতে।

.

দাদু ও ঠাকুমার মৃত্যু

দাদু যখন মারা গেলেন তখন আমি সাত পেরিয়েছি। সেদিন সন্ধ্যার পর খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ আমাকে কেউ জাগিয়ে দিল– শেষ দেখা দেখে নিতে হয়। অন্ধকার রাত্রে উঠোনে দাদুর চারদিকে বাড়ির লোকেরা ঘিরে আছে আমি সরে এসে একা দাঁড়িয়ে রইলাম।

বাবা, কাকা কেউ বাড়ি নেই। একটু পরেই আমার খোঁজ পড়ল, রাতের মধ্যেই দাহ শুরু করতে হবে, জ্ঞাতি কাকারা আমাকে নিয়ে চলল পুবপুকুরের ওপারের বনে। তারা সেই আঁধার রাত্রে কুড়ল চালিয়ে আম গাছ কাটতে লাগল, আমি লন্ঠন ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম আমার মনে ভয় চিন্তা দুঃখ কিছুই নেই- আশ্চর্য, আমি তখনো আম গাছের ডাল দেখছি, কাকাদের অনুচ্চ গলার কথাবার্তা শুনছি, লন্ঠন উঁচিয়ে ধরছি।

গাছ কেটে বাড়ি ফিরে এসে তারা কাঁচা বাঁশ, নতুন হোগলা আর নতুন কাপড় দিয়ে চালি বানাল। তার পর রাত আড়াই প্রহরে দাদুকে সেই শয্যায় শুইয়ে কাঁধে তুলে হরিধ্বনি দিয়ে চলল শ্মশানে। স্ত্রীলোকেরা একঝাঁক উলুধ্বনির মতো শব্দে কেঁদে উঠল। বাবা, কাকা বাড়িতে নেই, আমি একা বংশের ছেলে, আমি দাদুর সঙ্গে সঙ্গে চললাম।

শ্মশানের পাশে দাদুকে শোয়ানো হলে কেউ আমাকে বলল, তাঁর সারা গায়ে তেল মাখিয়ে দিতে। দাদুর সর্বাঙ্গ আমার চেনা, যেভাবে আমাকে তেল মাখাতেন আমিও সেই রকম করে তাঁকে টিপে টিপে তেল মাখিয়ে দিতে লাগলাম। কেউ একজন কলসি করে জল ঢেলে দিল, আমি হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তাঁকে স্নান করালাম। নতুন কাপড় পরিয়ে তাঁকে চিতায় শোয়ানো হল। আমি জ্বলন্ত একগোছা পাটকাঠি তাঁর মুখে ধরলাম চড়াৎ করে দাড়িগোঁফে আগুন লেগে গেল। সবাই উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি দিয়ে চিতা ধরিয়ে দিল। আমার আর কিছু করণীয় নেই।... মুখ ফিরিয়ে দেখলাম পুকুরের ওপারে এসে ছোটমারা দাঁড়িয়ে আছে- হঠাৎ যেন সমস্ত পটভূমি উলটে গেল– মনে হল, পুড়তে থাকা দাদুসমেত আমরাই জীবিতের দল- ওরা, ঐ ওপারে সারি বেঁধে দাঁড়ানো মেয়েরা পরলোকের মানুষ, দুঃখময় তাদের ময়লা চেহারা এপারে কত আগুন, ঐপারে অন্ধকার, ছায়া।

আগুনভরা চিতার মধ্যে, কাঠের ফাঁকে দেখছি, দাদুর গায়ে অসম্ভব বড় বড় ফোঁসকা পড়ছে। পাটকাঠি দিয়ে গেলে দেব কিনা ভাবতে ভাবতে আগুনই তাদের গেলে দিল জল বেরিয়ে বেরিয়ে চিতা নিভবার অবস্থা। দাদুর ডুপসি হয়েছিল।

শ্মশান থেকে বাড়ি ফিরে দেখি, সকালেই অকালছায়া পড়েছে, যেন কান্নার কষ শুকিয়ে জমে আছে বাড়িটায়, ক্লান্ত বাসী জিনিসপত্র এখানে ওখানে ছড়ানো।

কিন্তু দু দিনের মধ্যে খবর পেয়ে বাবা কাকা পিসিমা পিসেমশায়রা এসে পড়লেন তখন বর্ষার অন্তে মেঘ ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেমন নীলাকাশ বেরিয়ে পড়ে তেমনি শোক ছিঁড়ে ছিঁড়ে উৎসব দেখা দিতে লাগল। দাওয়ায় বসে বাবা, ছোড়দাদু আর পিসেমশায়রা পুরুতঠাকুরের সঙ্গে শ্রাদ্ধের ফর্দ করেন, নিমন্ত্রিতের লিস্টি বানান। নতুন ঘটি কলসি বিছানা ছাতা ইত্যাদি কেনা হয়। পাশাপাশি পাঁচ-ছটা উনুনে হবিষ্য সেদ্ধ হয়।

ঠাকুমা কিন্তু একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। যেন তিনি ম্যাটমেটে লাল পাড় শাড়ি আর মোটা মোটা সাদা শাখার জোরেই এতদিন হাঁকডাক করতেন, সংসার শাসন করতেন– এখন শাখা ভেঙে, থান পরার পরে একেবারে নির্বাক হয়ে গেছেন। এখন যে যা করতে বলছে তাই করছেন, বাকি সময় কাদায় ভেজা অনাথ বেড়ালছানার মতো ঘরের অন্ধকার কোণটিতে বসে থাকেন, আর নিযুত রাত্রে নিস্তব্ধ স্বরে চমক ভেঙে বলেন, ঐ, ঐ, ঐ দ্যাখ, দরজার ফাঁক দিয়া বুড়া আমারে ডাকে। দাদুর মৃত্যুর চোদ্দ দিনের মধ্যে ঠাকুমা মারা গেলেন।

সেদিন সকালেই সবাই বুঝতে পেরেছিল, ঠাকুমা মারা যাবেন। ছোটপিসিমা তাড়াতাড়ি করে ছোটদের গরম ভাত খাইয়ে দিল। আমরা গোগ্রাসে খেয়ে আঁচিয়ে এসে দেখি ঠাকুমাকে ধরাধরি করে বার করে গোসাঁইঘরের আঙিনায় এনে শোয়ানো হচ্ছে। বাড়িসুদ্ধ স্ত্রীলোকেরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। ভিড় ফাঁক করে আমিও কাছে গিয়ে ঠাকুমার মরে যাওয়া দেখতে লাগলাম। কিছু বুঝলাম না। হঠাৎ ছোটপিসিমা ডুকরে কেঁদে উঠল, তার পর ছোটমা, বড়মা, সেজোপিসিমা। আর সবাই চোখ মুছতে লাগল। তখন সকাল আটটা-

নটা। সকালে শোক কেমন যেন ঘনায় না, উড়ে উড়ে যায়। পুবের ঘরের পিছনের জঙ্গল থেকে পাখি ডাকছে। আকাশ ঘন নীল, ফুরফুরে লম্বা চলে-যাওয়া সাদা মেঘ। সব যেন আলগা, কিছু দানা বাঁধে না।

ঠাকুমাকে তুলে মণ্ডপে শুইয়ে দিয়ে কাকারা আম গাছ কাটতে গেল, যাবার সময় আমাকে বলে গেল ঠাকুমাকে ছুঁয়ে বসে থাকতে। পিসিমাদের অনেক কাজ, তারা বাড়িতে ছুটোছুটি করছে। আমি একা ঠাকুমাকে দেখছি আদুড় বুকের হালকা স্তন দু দিকে নেতিয়ে পড়েছে, টিপে টিপে দেখছি শরীর শক্ত হয়ে যাচ্ছে, হাত আর ভাঁজ করা যায় না, ঠোঁটের কোনায় চার-পাঁচটা পিঁপড়ে লেগেছে, লাইন দিয়ে আসছে আরো পিঁপড়ে। আমি এক হাতে তাকে ছুঁয়ে আরেক হাতে পিঁপড়ে মারতে লাগলাম।

.

তার পর

ঠাকুমার শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে আত্মীয়েরা একে একে চলে যেতে লাগলেন। কদিন পর বাবাও চলে গেলেন। বাড়িতে রইলাম শুধু বড়মা ছোটমা কাকা আমি আর আমার ছোট ভাই। লক্ষ্মীছাড়া বাড়িতে এখন কেবল খিদে পায়, কিন্তু সময়মতো খেতে পাই না। একা একা স্নান করি, তেল মাখতে ইচ্ছে করে না। সন্ধ্যায় পা ধুই না, সকালে রাত্রে পড়তেও বসি না। অফুরন্ত স্বাধীনতা, কিন্তু বড় কষ্টে যেন দিন কাটছে। ক্রমশ আমার মেজাজ রুক্ষ হয়ে উঠল।

পাটাতনের উপর মেটে জালাগুলোয় হাত ঢুকিয়ে দেখি, সব ফাঁকা ঠনঠন করছে। রাত্রে মনে হয়, লণ্ঠনের আলো অমন কেন?- চিমনিতে যেন কতকালের কালি পড়ে আছে, খানিক পরে শিখা দপদপ করে তেল নেই নাকি!

এখন মাঝে মাঝে আমাকে বাজারে যেতে হয় মুদির জিনিস কিনি, মাছ কিনি, তরকারি কিনি। উমাকাকার কামারশাল থেকে বাজার শুরু, আর শেষ হয়েছে গিয়ে পোস্ট অফিসে। মাঝখানে দুধের হাট, তরকারির হাট, মুদি-ময়রা-বস্ত্রালয়-মনোহারী দোকান। সারি বাঁধা পাতা পান, পাতা তামাকের দোকান, তার পর মেছোহাটা, হাঁড়ি কলসির আড়ত। এমনকি গাঁজা-আফিম, দরজি, ঔষধালয়ও। দুপুর পর্যন্ত অসম্ভব ভিড়, হো হো হৈ হৈ। একদিন দেখি দুধের হাটে দুধের ধারা বয়ে পিছনের দিঘিতে গিয়ে পড়ছে দুধওয়ালারা জল মিশিয়েছিল বলে সব দুধ খদ্দেররা মাটিতে ঢেলে দিয়েছে।

বিকেলে বাজারের একেবারে অন্য চেহারা যেন ঘুমের দেশের বাজারের উপর রূপকথার দেশের আলো এসে পড়েছে। লোকজন নেই, দু-পাঁচখানা মুদি মনোহারী দোকান শুধু ঝাঁপ খুলে রেখেছে। দোকানঘরের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় পিছনের খালের জল। হাটের কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে লম্বা চালাঘরের ফাঁকা রোয়াকে শুয়ে আছে। এই ঘুমের দেশে শুধু অনন্ত ময়রা উবু হয়ে বসে পাটির উপর বাতাসা কাটছে। হাঁড়িতে সে কাঠি ঘুরোয়, আর হাঁড়ির ফুটো দিয়ে মোহরের মতো বাতাসা পড়ে। গরম বাতাসা চমৎকার খেতে। আমি আধ পয়সার বাতাসা কিনি।

একদিন সন্ধ্যায় বাজারের শেষ মাথায় একজন মাঝবয়সী লোক ঢোল বাজাচ্ছিল। তার পরনে ময়লা ধুতি আর ফতুয়া, বুকে বিব-এর মতো ঝোলানো কালো কাপড়ে পঁচিশ-তিরিশখানা মেডেল আঁটা। অদ্ভুত তার বাজনা- মেঘের মতো গুরুগুরু দিয়ে শুরু হল, তার পর অতি দ্রুত টরররর শব্দে বৃষ্টির ফোঁটা ঝেপে এল, কখনো দুধের মধ্যে মন্থনদণ্ড পাক দিচ্ছে, কখনো গভীর রাত্রে আমের মুকুল ঝরে পড়ছে। প্রতিটি বোলে বাতাস চূর্ণ করে যেন ফুলঝুরির মতো কিছু একটা জেগে উঠছে, অথচ ঢোলের চামড়ায় তার প্রত্যেকটা আঘাত অতি স্পষ্ট, বিচ্ছিন্ন এবং পুরুষালি। গলায় ঢোল বেঁধে লোকটি দুলে দুলে বাজাচ্ছে, অল্প কয়েকজন দোকানী ঘিরে দাঁড়িয়ে শুনছে। সন্ধ্যা হয়ে গেলে একজন লণ্ঠন উঁচু করে ধরল, দোকানীরা এক আনা দু আনা করে দিল। শুনলাম লোকটির নাম ক্ষীরোদ নট্ট।

বিকেলের বাজার থেকে কখনো কখনো গোয়ালবাড়ি হয়ে ঘুরপথে বাড়ি ফিরতাম। তখন তাদের বাড়ির উঠোনে রাধু ঘোষের ছেলে প্রহ্লাদকাকা আর বিশাকাকা দুধ ময়– বিশাল মাটির মটকিতে ক্যানেস্তারা করে মন মন গরম দুধ তাদের বোনেরা ঢেলে দেয় আর বাঁশের চরকিতে দড়ি পেঁচিয়ে তারা দু ভাই দু দিক থেকে টানে। মটকির মধ্যে চরকি ঘুরুর ঘুরুর গম্ভীর ভাঙা গলায় শব্দ করে পাক খায়। উঁকি দিয়ে দেখি, দুধ থেকে কখন চাকা চাকা মাখম ভেসে উঠেছে। ঘোষের ছেলেদের বুক আর কাঁধের পেশী চমৎকার। দুধ মইতে মইতে তাদের দরদর ধারায় ঘাম ঝরে। এক এক মটকি থেকে এক এক বালতি মাখম ওঠে। আমাকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাদের একজন চড়াৎ করে কলা গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে একখাবলা মাখম তুলে দিয়ে বলে, 'খাও'।

সকালবেলা ভিড়ের বাজারে যেতে আমার ভালো লাগে না, কিন্তু কাকা নিপাত্তা থাকলে যেতেই হয়। দু আনা দিয়ে বাজারের সেরা ইলিশটাকে কিনে এনে শুনি ও রকম মাছ নাকি চার পয়সার বেশি হয় না, বেগুন কিনেও ঠকি, লাউ কিনে আরো ঠকি।

সেদিন শিঙ্গি মাছ কিনেছিলাম, খালুইয়ের ফাঁক দিয়ে তারা পায়ে কাঁটা বিঁধিয়ে দিল। বাজার থেকে ফেরার পথ কামারবাড়ির মধ্য দিয়ে। শশী কর্মকারের বাড়ির শেষে পর পর দুখানা একবাঁশের সাঁকো, তার পর আমাদের তেঁতুলতলা। প্রথম সাঁকোটা খুব উঁচু, খালের কচুরিপানায় ঠাসা একটা নিঃস্রোত বাড়তি অংশের উপর। সেখানটা গাছ গাছালির ছায়ায় অন্ধকার। পুঁটুলিবাঁধা ঠোঙা আর খালুই হাতে নিয়ে সাঁকোর মাঝখানে যখন পৌঁছেছি, হঠাৎ পা হড়কে গেল- তের-চোদ্দ ফুট নিচে পড়তে কতটুকু সময় লাগে? কিন্তু ঐ দ্রুত মুহূর্তেই বুঝলাম, হাতপাহীন লোষ্ট্রের মতো আর আমার অতীত ভবিষ্যৎ কিছু নেই। ঘন কচুরিপানার স্তর ভেদ করে জলের নিচে অন্ধ মাটিতে শাবলের মতো গেঁথে গিয়ে পরক্ষণেই বুদ্ধি ফিরে এল– আমি সাঁতার জানি না, যে করে হোক এক্ষুনি আমাকে পাড়ে পৌঁছতে হবে! আমি হাঁকড়েপাকড়ে, মাটি আঁকড়ে, জল আঁকড়ে, কচুরিপানার জটা মাথায় নিয়ে, যেন যুদ্ধ করে, সত্যিই শেষে পাড়ে উঠলাম।

তখন আশেপাশে কোথাও মানুষজন নেই। জিরাফের মতো দুটো বাঁশের সাঁকো, তাদের হাঁটুর নিচে অদৃশ্য জলে সাপের মতো হিলহিলে ঘন কচুরিপানার দাম আর খাড়া আঁকাবাঁকা বড় বড় গাছে জায়গাটা যেন একটা আধিভৌতিক দেশের ছবি! কিন্তু আমার ভয় হল না, যেন আমি জানি ঐ সবুজকালো জলের নীল কাদায় আমাকে কেউ শুইয়ে রাখতে পারবে না। আমি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে চললাম এবং ভেজা জামা-প্যান্ট ছেড়ে, নতুন করে পয়সা নিয়ে আবার বাজারে গেলাম সওদা করতে।

একদিকে দায়িত্বচেতনা, অন্যদিকে নির্দয়তা- এই দুয়ের মধ্যে পড়ে আমার ভিতর কাঠিন্য আসছিল। ফসল কেটে নেওয়া খড়ের মধ্যে যেমন শুকনো দুঃখ জন্মায় বুঝদার বালকদের বুকেও সেই রকম কোনো শীর্ণ রুক্ষ মনোকষ্ট জাগে।

আমি অস্থির এবং বেহাল হয়ে বনজঙ্গলে ঘুরি। কিন্তু গাছের কাছে আর সেই শান্তি পাই না। মেঘ বাতাস আলো দৃকপাত না করে আমার ময়লা গায়ের উপর দিয়ে উড়ে যায়। শস্য ঢেলে ফেলার পর শেষ দানাটিও ঝেড়ে নেবার জন্য যেমন থলে উলটে দেওয়া হয়, আমাকেও কে যেন তেমনি উলটে দিয়েছে।

বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে একদিন হয়তো আমি গোসাপের বিষ্ঠা কিংবা সাংঘাতিক কোনো গরল মাড়িয়েছিলাম তিন-চার দিন দুটো পায়ের পাতাই খুব চুলকোল, শেষে চামড়া ফেটে ফেটে দাগড়া দাগড়া ঘা দেখা দিল। সারা দিন সেই পা নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াই, ঘা থেকে যখন রস গড়ায় আমি ধুলো ছুঁড়ে চাপা দিই। কিন্তু সন্ধ্যা হলেই ব্যথা আর চুলকনি অসহ্য হয়ে ওঠে। রোজ সন্ধ্যায় ছোটমা আমাকে তুষের আগুনের একটা মালসা এনে দেয়, তাতে পা সেঁকে একটু আরাম পাই। আজকাল রাত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পা সেঁকাই আমার কাজ।

এই রকম সেঁকতে সেঁকতে একদিন আগুনভরা মালসাটা পায়ের উপর উলটে গেল। পুরো দুই পায়ের পাতা পুড়ে যাবার যন্ত্রণায় আমি সারা রাত ধরে চেঁচালাম। বড়মা নারকেল তেল আর চুন ফেটিয়ে পোড়া জায়গায় লাগাতে লাগলেন, হাওয়া করতে লাগলেন। শেষরাত্রে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। পোড়া ঘা গরলের ঘাকে চাপা দিয়ে দিল। বড়মা ধুনোর

গুঁড়ো আর নারকেল তেল মিশিয়ে আবার মলম বানালেন। এখন আমি রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দুই পোড়া পায়ে সেই মলম লাগাই।

জলের স্রোতে ভাসা শৈবাল যেমন ভাটার টানে টানে উপড়ে যায় তেমনি জন্ম থেকে গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আমার আট বছরের মূল এইবার কষ্টে কষ্টে ছিঁড়ে যেতে লাগল, কিংবা এমনও হতে পারে, আমি বড় হচ্ছিলাম, এই জীবনের ধূসর শুকনো বাতাস বা গ্রামের বিষাদাচ্ছন্ন কুহেলিকায় ক্লান্ত হয়ে আমি অন্য কোথাও উড়ে যেতে চাইছিলাম।

দুপুরবেলা গায়ের জামাটাকে পোঁটলা পাকিয়ে মাথার নিচে দিয়ে নিঃসঙ্গ রেইন ট্রি গাছের তলায় শুয়ে থাকি, শিকড়ের উপর পিঁপড়েদের যাওয়া আসা দেখি, শোনের জঙ্গল থেকে শেয়াল বেজি উঁকি দিয়ে যায়, আমি হিসেব করি, কিসের হিসেব তাও স্পষ্ট নয়।

রাত্রে, যে চাঁদের সঙ্গে আমার এত ভালোবাসা আমি দৌড়লে আকাশে যে আমার সঙ্গে ছুটত, যার পূর্ণিমায় আমরা ফুটফুটে উঠোনে হাডুডু খেলতাম– তার দিকে তাকিয়ে, সে যে কত দূরের, এই বিষণ্ন কথাটাই কেবল মনে হয়।

.

চলে যাওয়া

বড়মা ও ছোটমাকে আর গ্রাহ্য করি না। আমার শিকড় ছিঁড়ে যাচ্ছিল বলেই দৌরাত্মও বাড়ছিল। এমন সময় সবারই মনে পড়ল আট বছর বয়স হয়েছে অথচ আমি স্কুলে পড়ি না, মনে পড়ল আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে দিদিমা ঠাকুমার সেই প্যাক্ট।

মাসখানেকের মধ্যেই জানা গেল, আমার তদবধি অপরিচিত দিদিমা-দাদামশায়ের সংসারে আমি থাকতে যাচ্ছি। সেখানেই আমি স্কুলে ভরতি হব। আমার মনে হল, বেশ হয়েছে, চলে গিয়েই আমি শোধ নেব। কার উপরে শোধ? আগুন জল ক্ষুধার দেবতার উপর?

তার পর কয়েকটা দ্রুত সংক্ষিপ্ত দিন। আমাকে ওরই মধ্যে একটু ভালোমন্দ খাওয়ানো হল। জন্মভূমি ছেড়ে যেতে গিয়ে আমি একটুও কাঁদলাম না, একটুও হাসলাম না, অনেকখানি অভিমান আর কিছুটা তালগোল পাকানো চিন্তা নিয়ে আমি দিদিমার পাঠানো চলনদারের সঙ্গে চললাম এক দূর অনিশ্চিত শহরের উদ্দেশে। সেখানে হয়তো অজানা দেশের সুখের উপকূল।

.

ইপাব নির্মাণে ▸▸ @bongboi।

দ্বিতীয় পর্ব

উৎসর্গ

পার্থপ্রিয় বসু ও কুশল গুপ্তকে

জলযান

রাতের বেলা আলো ঝলমল স্টীমারঘাটের জেটি আর বার্জ পেরিয়ে একফালি অন্ধকার জলের উপর পাতা তক্তার পোর্টেবল সাঁকো দিয়ে স্টীমারে উঠেই বুঝলাম, এ একটা বিস্ময়কর অচেনা বাড়ি। মোটা তক্তা আর লোহার পাতের মেঝে, রেলিং লাগানো সরু সরু সিঁড়ি, একতলা দোতলার ডেক, কেবিন, তেতলার সারেংসাহেবের ছোট্ট রঙিন চিলেকোঠা, বাটলারদের রসুইখানা, ডাকের সর্টারবাবুর খুপরি, রহস্যময় এঞ্জিনের পাতালঘর, চারদিকে চলে যাওয়া মোটা সরু আঁকাবাঁকা পাইপলাইন, এখানে ওখানে টিমটিমে আলো, দড়ি লাগানো ছোট ছোট ঘণ্টা টিং টিং করে বাজে, একজায়গায় একগাদা টিউবের সঙ্গে লাগানো ঘড়ির মতো নানান গেজ মিটার ইনডিকেটর, এখানে ওখানে বাঁকাচোরা আলো আর আবছায়া, ছোট শতরঞ্জি পেতে টিনের প্যাটরা বা পুঁটুলি মাথার নিচে দিয়ে ঘুমন্ত মানুষ, অন্ধকারে বসে বিড়িফোকা মানুষ, নিবে থাকা অন্ধকার সার্চলাইট, তার কাছাকাছি ঘুমন্ত মুরগির খাঁচা, খালাসিদের ডেরা, দু পাশে নিথর দুই প্রপেলার। এই নিয়ে রাতের থেমে থাকা স্টীমার।

সেই মিটারের ঘড়িগুলোর কাছাকাছি একটু ফাঁকা জায়গা পেয়ে গোপালমামা আমাদের দুটো ছোট ছোট বিছানা পেতে ফেলল। আমি বসে বসে ঐ অদ্ভুত ঘড়িদের দেখি। তেল, রং, কয়লা, তাপ, উষ্ণ বাষ্প আর পেঁয়াজরসুনের রান্নার ভূগর্ভ গন্ধের সঙ্গে মেশে নদীর সপ্রাণ সজল বাতাসের গন্ধ। সুদূর বাতাসের গন্ধ মাঝে মাঝে সব গন্ধকেই উড়িয়ে নিয়ে যায়।

রাতের তৃতীয় প্রহরে স্টীমারের পাতালঘর থেকে ভুটভাট ঝকঝক হুড়হুড় গুড়গুড় আওয়াজ আসতে লাগল। তক্তার সাঁকো তুলে ফেলা হল। ঘড়ঘড় করে নোঙর ভোলার শব্দ হল। স্টীমার পোতাশ্রয় থেকে বেরিয়ে চলল। এখন বড় নদীতে রাতের অন্ধকারে, খালাসিরা সার্চলাইট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছায়াপথের মতো আলো ফেলে। জলের পোকা স্থলের পোকা উড়ে আসে। দলছাড়া রাতের হাঁস বা ঘুমপাওয়া মেয়েদের ভাঙা ভাঙা গম্ভীর গলার স্বরের মতো মাঝে মাঝে স্টীমারের ভোঁ শোনা যায়।

ভোরবেলা লোকেরা কী ব্যস্ত! তোয়ালে গামছা দাঁতের মাজন নিয়ে কলের কো ভিড় করেছে। আমি রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে নদী দেখি। স্টীমারের সামনে জল ফেনি হয়ে দু ভাগে ভাগ হয়ে পিছনে ছুটে চলেছে। সামনেই পড়ে আছে দৈত্যাকৃতি নোঙর তার ফলায় তখনও নদীর বুকের কাদা। নোঙরের মোটা শিকল পাশেই স্তূপ করা ইতস্তত ছড়ানো চার-পাঁচটা ক্যাপস্ট্যান, তাতে তারের মোটা দড়ি, হেম্পের কাছি জড়ানো, দু পাশে, চাকাঘরের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় প্রপেলার ঘুরছে ঘুরন্ত প্রপেলারের ভিজে ব্লেডে মুহূর্তের জলবিন্দুর সঙ্গে ছেঁড়া শৈবাল, কুচো চিংড়ি উঠে আসছে। একতলায় চলে গেলে সেখানে অনেকখানি জায়গায় মেঝে নেই, সেই বিরাট গর্তে যাতে কেউ পড়ে না যায় তাই চারদিকে রেলিং। রেলিঙে ভর দিয়ে অবাক হয়ে দেখি, নিচের পাতালে বয়লারের গনগনে আগুনে কয়লা দিচ্ছে একজন মাল্লা। আর দৈত্যের ঢেঁকির মতো তালে তালে উঠছে পড়ছে স্টীম এঞ্জিনের জোড়া জোড়া হাতপা।

বেলা বাড়লে দোতলার রেলিঙের সারি সারি লাইফ বয়ের পাশে দাঁড়িয়ে দেখি রৌদ্রে ঝকঝক করছে নদীজল। পদ্মা মেঘনা- সাদা জল কাজল জল গায়ে গা লাগিয়ে চলেছে। এখন আর ওপার দেখা যায় না। শুশুক ভুস করে লাফিয়ে উঠে কালো পিঠ দেখিয়ে আবার জলে পড়ে।

কীর্তনখোলা-পদ্মা-মেঘনার রাত্রি আর দিনের জলস্রোত পাড়ি দিয়ে স্টীমার যেখানে আমাকে পৌঁছে দিল সেই তিন-দিকে-নদী জায়গাটার নাম চাঁদপুর। চাঁদপুরে দাদামশায়ের একটা অফিস ছিল, সেখানে মাঝে মাঝেই তাঁকে আসতে হয়। এবারে এসে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সন্ধেবেলা চাঁদপুর থেকে আমাদের ট্রেন ছাড়ল। ট্রেনেও দাদুর কাজ থাকে। আমি জানলার পাশে বসে চাঁদনীরাতের আবছা বন, পাহাড়, পতিত জমি, জলজমা খানাখন্দ দেখতে দেখতে চললাম। মাঝে মাঝে ট্রেন আধঘুমন্ত স্টেশন পেরুচ্ছে- লাকশাম, আখাউড়া, কুলাউড়া। পৃথিবী বড় রহস্যময়, অপরিচিত। বালকদেরও রাত্রের ঘুম কেড়ে নেয়।

নতুন দেশ

স্টেশনে নেমে দাদুর সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে যেতে যেতে দেখি, এ একটা নতুন দেশ। অল্প কোঁকড়ানো চুলের মতো ঘাসে ঢাকা এখানকার ভূমি একটু ঢেউ খেলানো। মনে হয়, মাটির নিচে পাথর আছে তাই এমন। খুব বেশি গাছে লতায় ঝোপে জায়গাটা জংলা হয়ে যায় নি। বড় বড় গাছের জটলা এবং ছোট ছোট মাঠ বেশ মিলেমিশে থাকায় জায়গাটাকে উপবনের মতো লাগে। বাড়িগুলো একতলা কাঠের ফ্রেম, টিনের চাল আর ইকড়ের বেড়ায় খুব হালকাভাবে তৈরি। ভূমিকম্পে পুকুর যখন বাটিভরতি জলের মতো এদিক ওদিক হতে থাকে তখনও এসব বাড়ির কোনো ক্ষতি হয় না। ইকড় হচ্ছে এক জাতের নলখাগড়া। ইকড়ের বেড়াতে গোবর মাটি বালি সিমেন্টের পলেস্তারা লেপে, খটখটে করে শুকিয়ে নিয়ে চুনকাম করা হয়। অতএব সব বাড়িরই দেয়াল ধবধবে সাদা, দরজা জানলা সিলিং বাদামী আর চাল লাল বা দস্তা রঙের। বৃষ্টির শেষে বিকেলে, ঝকঝকে টিনের উপর শুয়ে, ঝেপে আসা পেয়ারা গাছ থেকে ডঁশা পেয়ারাটি তুলে নেওয়া যায়। ভেজা পেয়ারাপাতার ফাঁকে নীল আকাশটি দেখতে দেখতে আনমনে পেয়ারায় কামড় দেওয়া যায়। কোনো কোনো বাড়ি ঘিরে কাঁটামেহেদির ছাঁটা বেড়া– যেগুলো অযত্নে আছাটা সেগুলো আরো সুন্দর, ডাল লম্বা হয়ে ছোট ছোট হালকা বেগুনী ফুল আর গাঢ় কমলা রঙের থোলো থোলো ফলে এদিক ওদিক নুইয়ে পড়েছে। বাড়িগুলো রাস্তার পাশে সার বাঁধা। আমাদের পাড়ায় আবার রাস্তার এক পাড়ে বাড়ি, অন্য পাড় ফাঁকা সেদিকে শিমুল গাছ, মাঠ, পুকুর, আর একটা অদ্ভুত জিনিস- একটা প্রায় একশো ফুট উঁচু লোহার সটান দাঁড়ানো মই। তার দুই পা মাটিতে সিমেন্টে গাঁথা, মাথা তারের শক্ত দড়িতে বেঁধে চারদিকে টার্নবাকল লাগিয়ে টানা দেওয়া। ওটা ওখানে কেন, কি জন্য কে জানে। ঐ লম্বা মইয়ের ওদিকে মুসলমান ছেলেদের মাদ্রাসা। সেখানে জালালি কবুতরদের সাতপুরুষের আড্ডা।

অনেকখানি পাকা রাস্তা, তার পর লাল ল্যাটেরাইট নুড়ির পথে চলে ঘোড়ার গাড়িটা বাড়ির দরজায় এসে থামল। তখনও সকাল শেষ হয়ে যায় নি। পাড়াটা শান্ত। দক্ষিণমুখো এগারোটি সারিবদ্ধ বাড়ির উপর পুবের রোদ্দুর তখনও কোনাচে হয়ে আছে। দাদুর বাড়িটি প্রথম পরিচয়ে বেশ সুশ্রী ও সুখকর। বৈঠকখানাঘর দিয়ে ঢুকেই বড় একটি উঠোন। উঠোনের বাঁ দিকে রান্না ও ভাঁড়ার ঘর, ডান দিকে গোপালমামার ঘর, শেষ প্রান্তে শোবার ও থাকার বড় ঘর। এই আলাদা চারটি ঘরের ফাঁকে ফাঁকে চারটি বাগান। বৈঠকখানাঘরের ডান দিকের ছোট বাগানটা শুধু গোলাপের। সেখানে বড় বড় গোলাপ ফোটে, কিন্তু গাছের এলোমেলো লম্বা ডাল কাঁটায় কাঁটায় আটকে জড়াজড়ি করে থাকার ফলে ঢোকা কঠিন। বাঁ দিকের বাগানে পাতাবাহার, জবা আর স্থলপদ্ম। সে বাগানে নীলুদের বাড়ির ছায়া পড়ে থাকে। গোপালমামার ঘরটি ছোট, কুটির স্টাইলের, বর্ষাকালে তরুলতা বেয়ে উঠে সে কুটির ঢেকে যায়। সেই ঘরেরই ডাইনে বাঁয়ে বাকি দুটো বাগান। ছোট বাগানটার দক্ষিণ দিকে শুধু দোলনচাপার বন। বর্ষায়, যখন বিকেলবেলায় দোলনচাপা ফোটে তখন বাগানে ঢুকলে গাছের পাতায় লেগে থাকা বৃষ্টিজলে গা-মুখ ভিজে যায়। ফুলের মিষ্টি গন্ধ সেখানে ফোঁটা ফোঁটা জলে ভিজে আটকে থাকে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঘোরে। কিন্তু ঢুকবে কে সেখানে। হিলহিলে জোকগুলো দ্রুত পাতা বেয়ে বেয়ে এসে শরীরে সেঁটে যায়।

অন্য বাগানটা বেশ বড়। কিন্তু সেখানে একমাত্র শোভা বড় রোয়াল গাছটা। রোয়াল ফল স্তবকে স্তবকে সোনালি হয়ে পেকে যখন ঝুরি নামিয়ে দোলে তখন একটা গাছেই বাগান আলো হয়ে যায়। কিন্তু সে ফল টিয়াও খায় না, বাদুড়ও ছোঁয় না।

বড় ঘরের পিছনে ডোবা। ডোবার পশ্চিমপাড়ের ঢালুতে শীতের সকালে দু-তিনটে ঢোঁড়া সাপ রোদ পোহায়। ডোবার গায়ে বিশাল কুল গাছ আকাশ ঢেকে রেখেছে। শীতের সময় প্রচুর কুল ফলে রাত্রে বাদুড় এসে খায়, আর কিছু আমাদের জন্য মাটিতে ঝরিয়ে রেখে যায়। ডোবার অগ্নিকোণে এক বাতাবিলেবুর গাছ। শরতের শুরুতে তার ফুলের গন্ধ সন্ধে থেকে গাছের মাথায় ঘনিয়ে থাকে, যত রাত হয় সেই গন্ধ তত যেন পাখা মেলে। আমি ওদিকে গেলে পাই, আর জোনাকিরা সারা রাত সেই গন্ধ শুঁকে শুঁকে উড়ে বেড়ায়। হেমন্তে

বাতাবি এত রসালো হয়ে পেকে ওঠে যে তার নিচের দিকটা একটু ফেটে যায়। আমি দুপুরবেলা গাছে বসে বসে একটা পরিপুষ্ট বাতাবি বেছে নিয়ে সেই ফাটে আঙুল ঢুকিয়ে ছিঁড়ে ফেলতাম। তার পরে একটু একটু করে পুরো বাতাবিটা বিনা নুন-চিনিতেই নিঃশেষে খেয়ে নেমে আসতাম। বাতাবি গাছের পরে বিশাল ঝুপসি একটা আম গাছ। সে আমে বুনো গন্ধ। তার পর পায়খানা। ডোবার ওপারে বাড়ির সীমানায় একটা বড় চালতা গাছ, কলা গাছের ঝাড়। এই হল দাদুর বাড়ি। গোপালমামা খুব পরিচ্ছন্ন করে রাখে। আর দিদিমাও বেঁধেবেড়ে, ভাঁড়ার গুছিয়ে খুব সুশৃঙ্খলভাবে চালান। বাড়িটাকে এবং বাড়ির মধ্যেকার দিদিমাকে আমার ভালো লাগল।

এর মধ্যে পাশের বাড়ির ছেলে দুলালদা এসে হাজির। সে আমাকে নদীর পাড়ে জাহাজঘাটা দেখাতে নিয়ে চলল। নদীতীর পাঁচ মিনিটের পথ। তখন নদী বয়ে চলেছে শান্ত গতিতে, জল মোটামুটি স্বচ্ছ। ওপারে বহুদূরে বরাইল পাহাড় নীল হয়ে আছে। অনেকখানি উন্মুক্ত আকাশ। কে জানত, ঐখানে সেদিন থেকে একটু একটু করে আট বছরের মনখারাপ, মনভালো জমা রেখে আসব। এ জন্মের আটটা বছর অন্তত একটা জায়গায় থেকে গেল।

.

দিদিমা

কলতলায় চৌবাচ্চাভরা টলটলে জল ধরা ছিল। স্নান করে খেয়েদেয়ে দিদিমার পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। বিকেলে দু-একজন প্রতিবেশিনী এসে গল্প করে গেলেন। সন্ধে হল। লোক নেই, হৈ চৈ নেই। রাত্রে খেতে বসে বুঝলাম দিদিমার রান্নার স্বাদ খুব ভালো। এবং আরও একটা কথা: আমি তখনও বেশ ছোট, কারণ বড়দের জলের গ্লাস ধরতে গিয়ে কিছুতেই এক হাতে বেড় পাচ্ছি না।

দু দিন পরে দাদু ট্যুরে গেলেন। বাড়িতে শুধু দিদিমা আর আমি আর গোপালমামা। একরাত্রে দিগন্তে বোধিসত্ত্বের স্বপ্নে দেখা হাতির দাঁতের মতো চাঁদ উঠল। বারান্দায় শুয়ে দিদিমা একটা অদ্ভুত গল্প বললেন–

"এখানে পাহাড়-বন থেকে বিশাল বিশাল গাছ কেটে, তাদের মোটা মোটা গুঁড়িতে নম্বর দেগে নদীপথে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এই নদীতে জোয়ারভাটা নেই- জলস্রোত শুধু একদিকে চলে। অতএব সেই কাঠ কুমিরের মতো, ঘড়িয়ালের মতো মাইলের পর মাইল ভাসতে ভাসতে আসে। এইভাবে নদীপথে কাঠ পাঠানোয় খরচ প্রায় নেই ট্রেনের মাশুল, লরি ভাড়া কিছুই লাগে না। শুধু যেখানে ভাসানো হয় সেখানে পোষা হাতিরা আছে, তারা ঐ ভারী গুঁড়িগুলোকে শুড়ে করে তুলে নিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। আবার যে ঘাটে নদী থেকে কাঠ তোলা হবে সেখানেও হাতিরা আছে তারা জলে নেমে গিয়ে শুড়ে পেঁচিয়ে খুঁড়িগুলো উপরে তুলে আনে। আমাদের এই জাহাজঘাটাতেও প্রত্যেক বছর হাতিরা নদী থেকে কাঠ তোলে।

তখন আমি বউমানুষ। উনি বদলি হয়ে এখানে এসেছেন। তখনকার কথা। একদিন তিন-চারটে হাতি নদী থেকে কাঠ তুলছিল। এ দিকের পাড়টা তো অতখানি উঁচু, শীতের সময় জল আরও নিচে নেমে গেছে। পাড়ের মাটি নরম, জলের কিনারায় তলতলে কাদা। ধাপ কেটে কেটে দেওয়া হয়েছে। হাতিরা ভারী শরীর নিয়ে সাবধানে নামছে, কাঠের গুঁড়ি নিয়ে আরও সাবধানে উঠে আসছে। সারা দিন এইভাবে তারা খাটছিল- খাটতে খাটতে বোধ হয় হাঁপিয়ে পড়েছিল, তাই বিকেলের দিকে একটু অসাবধান হয়ে গেছে। একটা হাতি শুড় বাড়িয়ে কাঠ জড়িয়ে ধরতে জলে একটু নিচে নেমে এসেছে। তার হাঁটু পর্যন্ত তলতলে কাদায় ডুবে গেছে। হঠাৎ সে উঠতে গিয়ে দেখল, পা তুলতে পারছে না। সে যত চেষ্টা করে পা তত ডুবে যায়। কিছুক্ষণ পরে সে যেন বুঝতে পারল, কী ঘটতে যাচ্ছে- সে পাগলের মতো উঠতে চেষ্টা করল। সে যতই দাপাদাপি করছে ততই ডুবে যাচ্ছে। এইভাবে তার চারটে পা-ই পুরো কাদায় ঢুকে গিয়ে পেটও এসে কাদায় ঠেকল। হাতিটা এখন আর নড়তে

পারছে না। তখন সন্ধে পেরিয়ে গেছে। তার মাহুত কাছে দাঁড়িয়ে শুড়ে হাত বুলিয়ে দিল। কলা গাছ টুকরো করে, ছাতু গুড় তাল পাকিয়ে খাওয়াল। অন্য হাতিরা উপরে দাঁড়িয়ে ছিল, মাহুতেরা তাদের ফিরিয়ে নিয়ে। চলে গেল। অনেকক্ষণ পরে তার মাহুতও চলে গেল। সে, কাদায় চার পা গাঁথা, জলের মধ্যে পেট নিয়ে রাত্রির মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল।

পরদিন ভোরে মাহুতেরা এবং হাতির মালিক মোটা শিকল নিয়ে এল। সারা দিন ধরে সেই ডোবা হাতিকে শিকলে বেঁধে অন্য হাতি দিয়ে টেনে তোলার চেষ্টা হল। চারটে ট্রাক নিয়ে এল, মোটা কাছি নিয়ে এল। কিছুতেই কিছু হল না। সারা শহরের লোক দেখতে এল নদীর পাড়ে। আবার বিকেল হল। সেদিন হাতিকে খাওয়ানো গেল। সে তার মরণকে দেখতে পেয়েছে। টানাহ্যাঁচড়ায় ওঠা দূরে থাক, তার পেটের খানিকটা সেদিন কাদায় ডুবে গেছে। রাত্রে সবাই বাড়ি ফিরে গেল। হাতি একলা নদীতে দাঁড়িয়ে ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করতে লাগল। পাড়ার লোকেরা বিছানায় শুয়ে শুনতে পেল। পরদিন হাতি আরও ডুবে গেল। সে নিজের শরীরের ভারেই এখন ডুবছে। সেদিনও সে কিছুই খেল না। পরদিন থেকে তার দুই ছোট ছোট চোখে সমানে জল গড়াচ্ছে নিঃশব্দ কান্না। সে আর চিৎকার করছে না। সে বুঝতে পেরেছে। লোকেরা এসে দেখে দেখে যাচ্ছে। আমরাও দেখতে গেলাম। সেই সন্ধেবেলায় সে অস্পষ্ট হয়ে গেছে তার পিঠ জলে ডুবে গেছে। ক্রমশ তার চোখসমেত, বিশাল কানসমেত মাথাটি ডুবে যাবে। সবাই বলছে, সে শুড় ভাসিয়ে রাখবে, তার পর দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে। সে রাত্রে মাহুত আর বাড়ি ফিরল না, নদীপাড়েই বসে রইল। সারা রাত নাকি হাতি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখবে বনের স্বপ্ন, বাচ্চা বয়সের স্বপ্ন, মৃত্যুর পর সে যেখানে যাবে সেখানকার স্বপ্ন।

শীতের ভোর হল। নদীতে কুয়াশা। মাহুত চাদর মুড়ি দিয়ে বসেছিল। এইবার ওর চোখ জলে ডুবে যাবে। এক চা-বাগিচার সাহেবের কাছে খবর গেছে। সে এসে পর

পর কপালে দুটো গুলি করে হাতিটাকে মেরে ফেলল। পাঁচ দিন হাতিটা ঐখানে দাঁড়িয়েছিল। তার পরও তার শরীর ডুবে যেতে লাগল।”

গল্প শেষ হলে আমি চুপ করে রইলাম। আমার মনে হল, এত বছর ধরে হাতিটা ডুবে চলেছে। এখনও ডুবছে– তার বিরাট কঙ্কাল সাদা হয়ে নিচে নামছে। শেষে, পৃথিবীর মাঝখানে গিয়ে আটকাবে, রত্নের মতো জ্বলজ্বল করবে।

দিদিমাকে দেখে সাধারণ মনে হলেও তিনি মোটেই তা নন। তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেন, প্রচুর খাটেন, রাত্রে গভীর ঘুমে তাঁর নাক ডাকে, কিন্তু ছোট ছোট মায়োপিক চোখে সব দিকে দৃষ্টি রাখেন। সংসারটা তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র, আত্মম্ভরিতার বিচরণভূমিও বটে।

দিদিমা শ্যামলা, মধ্যউচ্চ, মোটাসোটা, পদস্থ চাকুরের স্ত্রী। দাদু থেকে শুরু করে দিদিমার বাড়িতে সবাই মাঝারি উচ্চতার এতে তাঁর কর্তৃত্বের সুবিধা হয়েছিল। ছেলেমেয়ে বা কর্তা লম্বাচওড়া হলে কি হত বলা যায় না।

দিদিমা বাংলা ভাষাটা অত্যন্ত ভালো জানতেন। প্রবাসী, ভারতবর্ষের গ্রাহক ছিলেন। মেঘনাদবধ কাব্য, রৈবতক, বৃত্রসংহার তার মুখস্থ। দুপুরে শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে আবৃত্তি করতেন–

কি কহিলি, বাসন্তি? পর্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানবনন্দিনী আমি; রক্ষঃ-কুল-বধ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?

পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে,
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?

এই আবৃত্তির উচ্চাবচ স্বর যেতে যেতে তৃতীয় সর্গের অনেক ভিতরে চলে যেত। মনে হত, স্বয়ং মাইকেল বা দানবরমণীরাই বুঝি তাঁকে ভর করেছে।

দিদিমা গিন্নীদের সাধারণ সাজের সঙ্গে, আরামের জন্য, রোদচশমা আর ভেলভেটের নাগরা পরতেন। কয়লার গুঁড়ো অনেক জমে গেলে গোপালমামা মাঠ থেকে গোবর কুড়িয়ে এনে পাহাড় করত। সকালের চা-জলখাবার খেয়ে দিদিমা তাঁর রোদচশমা আর নাগরা পরে কাজে লাগতেন। গোপালমামা কোদাল চালিয়ে কয়লার গুঁড়ো, মাটি, গোবর একত্র করে মাখত। দিদিমা হাতে নাচিয়ে নাচিয়ে গোল করে সারা উঠোন ভরে গুল দিতেন। শীতের টনটনে রোদে বিকেলবেলা অথবা পরের দিন সব শুকিয়ে যেত। গোবরের ক্ষারে আর কয়লা-মাটির ঘষায় দিদিমার সোনার চুড়ির গোছা স্নানের পরে ঝিকমিক করত।

এইভাবে যা সাশ্রয় হত অন্যভাবে তা আবার খরচ হয়ে যেত। বিজয়ার রাতে সব বাড়িতেই নারকেলের মিষ্টি আর নাড়ু দিত। দিদিমার বন্দোবস্ত অন্য রকম। দশমীর রাত্রে উঠোনে একটি জোরালো বাতি জ্বালানো হত। সেখানে পাশাপাশি দুটো বিশাল পিতলের গামলায় কানায় কানায় ভরা রসগোল্লা আর পানতুয়া। ঐখান থেকেই প্লেটে করে গৃহতদের দেওয়া হত। সাদা ফেনি বাতাসার ধামার মতো শুক্লা চাঁদ তাড়াতাড়িই মধ্যগগনে ওঠে সেই চাঁদ আর তার নিচে সাদা কালো মিঠাই ভরতি দুটি গোল গামলা একটি জ্যামিতিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করত।

খাওয়া এবং খাওয়ানোর দিকে দিদিমার একটা ঝোঁক ছিল। দাদু নিয়মিত ট্যুরে যেতেন। আর ট্যুরে গেলে দিদিমার ফরমাস অনুযায়ী নানা জায়গা থেকে উৎকৃষ্ট খাদ্যগুলি কিছু কিছু নিয়ে আসতেন। শীতের দিনে দু-তিন হাঁড়ি পাতক্ষীর, খোয়াক্ষীর, কলসিভরা নলেন গুড়, ছাতকের কমলালেবু, গ্রীষ্মের দিনে গোয়ালন্দের বিশাল তরমুজ, বর্ষায় জলঢুবের আনারস।

দাদু পেটরোগা, মাসিমা মামা খেতে চায় না। সুতরাং এই খাদ্যসম্ভারকে সম্ভাষণ জানাতে বাকি থাকছি শুধু দিদিমা আর আমি।

পুনশ্চ: কিছু দিন গেলে বাড়িটা শোলক-বলা কাজলাদিদির মতো আর তেমন শান্ত মধুর থাকল না। মাসিমা শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে এল। মামা অন্যত্র পড়ত, বছর দেড়েক পরে সেও ফিরে এসে ক্লাস টেনে ভরতি হল। দুই আপন ছেলেমেয়েকে কাছে পাওয়া দিদিমাকে নিয়ে বাড়িটা এবার পালটাতে শুরু করল।

.

উপত্যকা

উপত্যকাটিকে কাছে দূরে ঘিরে আছে টিলা বন চা-বাগান। সেইসব বনে শেয়াল বেজি উল্লুক বাঁদরদের সঙ্গে হাতি বাঘ ভাল্লুক ময়ালও ছিল।

ময়ালের একটা গল্প শুনতাম। দূরের এক জংলা গায়ের স্কুলে একটি দুষ্টু বালককে মাস্টারমশাই ছুটির পরে পাশের ঘরে আটকে রেখেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ছেলেটা পরিত্রাহি চেঁচাতে শুরু করল আমারে সাপে ধরিল, সাপে ধরিল। আমারে খাই ফেলিল। ছুটির পরে তখন স্কুলে কেউ নেই। মাস্টারমশাই ভাবছেন, শয়তান ছেলেটা দুষ্টুমি করে চেঁচাচ্ছে। খানিক পরে চেঁচামেচি বন্ধ হল। বাড়ি ফেরার আগে মাস্টারমশাই পাশের ঘরের দরজা খুলে দেখেন– ছেলেটা নেই, তার বদলে বিরাট এক ময়াল পেট ফুলিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে।

এবার আমার স্বচক্ষে দেখা ময়ালের গল্পটি বলছি। একদিন দুজন লোক বনের মধ্যে দেখতে পেল একটা ময়াল নিথর হয়ে পড়ে আছে। সে মাঝারি মাপের একটা হরিণ গিলে এখন আর নড়তে পারছে না। লোকদুটো বেতের ফাস গলায় পরিয়ে তাকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে কাছারিতে, সবাইকে দেখাবে।

আমরা টিফিনের সময় গিয়ে দেখি, বারো ফুটের মতো লম্বা পাইথনের মাঝখানটা অস্বাভাবিক ফোলা, স্পষ্ট বোঝা যায়, হরিণের আস্ত শরীরটা ঐখানেই লম্বা হয়ে আছে। সাপের মাথাটা ছোট। কিন্তু জীবজন্তু গেলবার সময় চোয়াল বড় হয়ে ফাঁক হয়ে যায়। তার চোখ দুটো কড়ির মতো, নিশ্চল। কষ থেকে রক্ত ঝরছে। অত দূর থেকে বেতের ফাস গলায় দিয়ে তাকে টানতে টানতে আনা হয়েছে। তার হাড়গুলো নিশ্চয় এতক্ষণে খুলে গেছে। ঐ লোক দুটি কয়েকটা টাকা বকশিশ পাবে, আর তার চমৎকার চামড়াখানা কমিশনার সাহেবের বাংলোর দেয়ালে অমর হয়ে থাকবে।

একবার শীতের সময়ে বনের লোকেরা একজোড়া বাঘ মেরে দেখাতে নিয়ে এল। শীতের সকালটি বেশ ঠাণ্ডা- তারা পাড়ায় পাড়ায় বাঘ দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। দুটি বাঘই মাঝারি মাপের, মুখ দেখে মনে হয় কমবয়সী, বেশ মোটাসোটা, বলিষ্ঠ চারটি থাবা, হলদে না হয়ে বরং সাদার দিকে রং। বোধ হয় দুই ভাই।

শহর থেকে ট্রেনে গিয়ে, তার পরেও খানিকটা হেঁটে ঘাঘরা ফলস। শীতের দিনে আমরা সেখানে বনভোজনে যেতাম। ছোট একটি স্রোতস্বতীর মতো চওড়া ঝরনা। শ্যাওলায় পিছল মস্ত মস্ত পাথরের উপর দিয়ে জলধারা শব্দ করে ফেনায় ভেঙে বয়ে চলেছে। আমরা অতি সাবধানে পা টিপে টিপে ওপারে যাই। সেখানে ঝরনার কিনারা থেকে দশ পনেরো ফুট দূরেই টিলা সেখানে শীতের ম্রিয়মাণ বন, নলখাগড়া, সরু বাঁশের ঝাড় উপরে উঠে গেছে। বাতাস ঝিরঝির করে বইছে। ঝরনার পাড় শক্ত হলে কি হবে, টিলার গোড়ার মাটি ভেজা ভেজা, নরম। কিছু দূর গিয়ে সেই ঘাসহীন নরম মাটিতে বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গেল। আমরা খুব সোরগোল করলাম যাতে বাঘ দূরে থাকে। খেয়েদেয়ে, বিকেলের রোদ পড়ে যাবার আগেই ফেরার পথ ধরা হল। পিছনে ফিরে দেখি, টিলার মাথায় গাছপালায় শীতবিকেলের রোদ, চারদিক কী চুপচাপ, ঘাঘরার জলের মৃদু ঝরঝর শব্দ। এই রকম সময়ে কোথাও চলে যেতে, কিছু ছেড়ে যেতে মনে কেমন যেন কষ্ট হয়।

মাঘ ফাল্গুনে, নদীর ভাটিতে কখনো কখনো দুধপাতিলের দিকে গিয়েছি। সেখানে টিলা আর গাঁ মিলেমিশে অসংগত কিন্তু বেশ মজার উঁচুনিচু তৈরি করেছে যেন পাশাপাশি তিনতলা চারতলা দোতলা পাঁচতলা। সরু পথের এক দিকে গাছপালা নিয়ে টিলা উপরের দিকে উঠেছে, আর অন্য দিকে চোখের সামনে হঠাৎ অনেক নিচে নেমে মেটে ঘরের বাঁকাতেড়া আঙিনা। পাখির চোখে দেখা যাচ্ছে, কোথাও এতটুকু স্যাঁতসেঁতেভাব নেই, শীতের মিষ্টি রোদে পেকে বাড়িটাও যেন মিষ্টি হয়ে আছে। সরু পথের এ মোড়ে সে মোড়ে বুনো কুলের ছোট্ট গাছ ভরে কুল পেকেছে। খাবার কেউ নেই। পথের পাশের বড় বড় ঘাসের গোছা এখন বাদামী হয়ে আছে। কয়েক মাস পরে বর্ষায় আবার সবুজ হবে।

কাঠলিছড়া চা-বাগান অনেক দূরে। চুয়ামাসিমার স্বামী সেখানে বাগানের ডাক্তার। সেখানে অনেকগুলো ছড়া বা অগভীর জলস্রোত আছে। কতগুলোতে শুধু পায়ের পাতা ডোবে, কতগুলোতে জল গুলফ পর্যন্ত, কতগুলোতে হাঁটু পর্যন্ত। গাছের ছায়ার তলায় তলায় লাল নুড়ির পথে বয়ে চলেছে এই জলের ধারা।

কাঠলিছড়ায় গিয়ে আমি আর সুনু জায়গাটা একটু দেখেশুনে বেড়াচ্ছিলাম। পথে ঐ রকম হাত দুয়েক চওড়া, মাত্র পায়ের পাতা ডোবা একটা ছড়া পড়ল। এবার একটা মজার ঘটনা ঘটল যেই আমরা ঐ ছড়ায় দুই পা দিয়েছি অমনি দুজনেই জলের মধ্যে পপাত। ঐটুকু তো জল, স্বচ্ছ কাঁচের পাতের মতো তিরতির করে বইছে, দেখে কিছু বোঝা যায় না তার স্রোতের শক্তি। জল তো নয়, যেন পালিশ শানে সিল্কের কাপড় পাতা- যেই পা দিয়েছি, হুস করে কেউ সেটা আচমকা টেনে নিল।

পরের দিন রাতে সূচীভেদ্য অন্ধকারে আমরা যখন গাড়ি করে ফিরছি হঠাৎ একটা জায়গায় তীব্র পচা গন্ধ পাওয়া গেল। হরেশঠাকুর চেঁচিয়ে উঠলেন টাইগার! টাইগার! খানিকক্ষণ পরে দেখি, সেই ঘন অন্ধকারে একটি লোক, এক হাতে একটি সরু লাঠি, অন্য হাতে লণ্ঠন, হনহন করে চলেছে। সে জায়গাটায় এত পুঞ্জ পুঞ্জ জোনাকি যে মনে হয় লোকটি যেন জোনাকির ঢেউয়ের মধ্যে ডুবতে ডুবতে ভাসতে ভাসতে চলেছে।

ঈশান না বায়ু, কোন কোণ থেকে হাওয়া আসত জানি না। বর্ষা সমাগমের আগে কদিন ধরে বিকেলে পশ্চিম দিগন্তে ঘন নীল মেঘ ওঠে। হু হু করে তারা আকাশ ছেয়ে দেয়। সেই কালো মেঘের ভাঁজে ভাঁজে নিঃশব্দ বিদ্যুৎ ম্যাগনিসিয়াম তারের মতো জ্বলে। আমি ছুটে এসে আমাদের রাস্তার শেষে দাঁড়াই। মুসলমান হস্টেলের সামনে, মাঠের পাশে এই জায়গাটায় ভাবা যায় না হাওয়ার কী জোর! আমি ধুতিটি পতাকার মতো ওড়াই। পতপত ফতফত করে পুরো ধুতিটা বাতাসের টানে উড়ে যেতে চায়। আমি এদিক ওদিক ঘুরে কাপড় ওড়াই। আমার অসম্ভব আনন্দ হয়। অনেককাল পরে অবহট্‌ঠ কবিতায় পড়ি–

সো মহ কন্তা
দূর দিগন্তা।
পাউস আএ
চেলু দুলাএ।
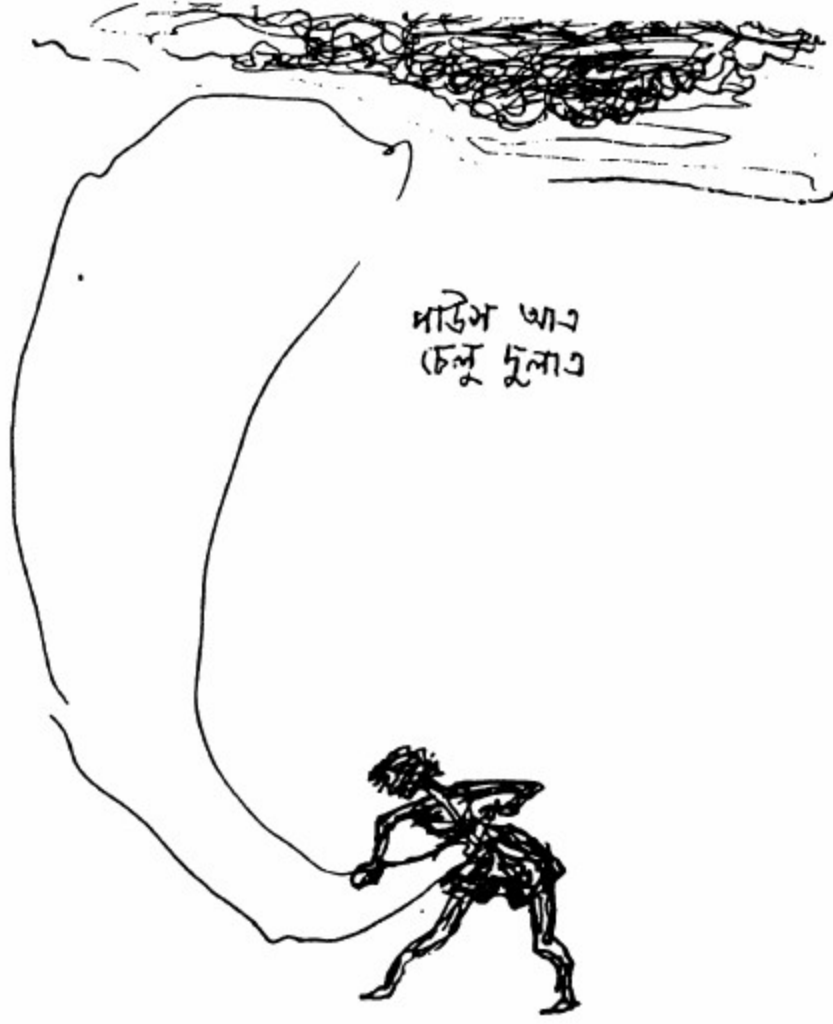
প্রাবৃষ আসছে, কাপড় ওড়ানো হবে। হাজার বছর আগে আমারই মতো কেউ ছিল, যে পাউস এলে চেলু দোলাত।

.

নরসিংহ স্কুল

আমি অসময়ে এসেছি। তখন গভর্নমেন্ট স্কুলে ছাত্র ভরতি শেষ। সুতরাং এ বছরটার জন্যে গরিব মলিন চেহারার নরসিংহ হাই স্কুলে ভরতি হতে হল।

বাড়ি থেকে ইস্কুল তিন মিনিটের পথ। তারকাঁটা ও জংলা ঝোপে ঘেরা বেশ বড়সড় একটা অযত্নের কম্পাউন্ড। একটা ধ্যাধধেড়ে লোহার ফটক। বিবর্ণ লাল রঙের টিনের চাল ও নিচু মেঝের তিন সারি লম্বা বাড়ি। এই বাড়িগুলোকে পার্টিশনে ভাগ করে করে অজস্র খোলামেলা ক্লাসঘর, হেডমাস্টারের ঘর, অফিস, লাইব্রেরি করা হয়েছে। ব্যাপারটা খুব সাদামাটা, অথচ কোথাও কোনো অভাব বা অসুবিধে নেই। স্কুলের তিন দিকে রাস্তা একদিকে রাস্তার ওপারে সাহেবদের ক্লাব, অন্যদিকের পথটা খুব নিরিবিলি, বড় বড় গাছে ছায়া করা, সেই গাছের ফাঁকে দেখা যায় ট্রেজারি বন্দুকধারী গোর্খা সৈন্যেরা দিনরাত পাহারা দেয়। আরেকটা পথ শহরের খেলার মাঠ হয়ে স্টেশনের দিকে গেছে।

হেডমাস্টারমশাইয়ের কালো-সাদা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, পরনে গলার বোতাম বন্ধ সাদা টুইলের শার্ট আর ধুতি। কাঁচের আলমারিতে অনেক ইংরেজি বই, কিছু দেয়াল ম্যাপ এবং বিরাট একটি গ্লোবে সাজানো তাঁর কামরাটি বেশ সম্ভ্রম উদ্রেককারী।

ক্লাস থ্রিতে সবাই নতুন ছেলে। মাস্টারমশাই রেজিস্টারে আমার নাম তুলে রোল নম্বর বলে দিলেন। কড়া মাস্টারমশায়রা, যাঁরা ছেলেদের আপন হতে চান না, নাম ধরে না ডেকে রোল নম্বর ধরে সম্বোধন করেন। এই প্রথম আমি সমবয়সী অচেনা বালকসমাজের সামনে একা। যতই বিবর্ণ হোক, আমি টের পাচ্ছিলাম, এই হল সেই প্রতিষ্ঠান যেখানে খাতাপত্রে আমার নাম বয়েস ইহজন্মের মতো তোলা হয়ে গেল। আমি গুটি গুটি গিয়ে শেষ বেঞ্চে রোগা, কালো, হাফপ্যান্ট হাফশার্ট পরা একটা ছেলেকে পছন্দ করে তার পাশে বসে পড়লাম।

নরসিংহ স্কুলে আমার কোনো অসুবিধে হল না। এখানে সাজপোশাকের পূর্ণ নৈরাজ্য। বেশির ভাগ ছেলেই মধ্যবিত্ত বা গরিব পরিবারের। তারা হাফপ্যান্ট বা ধুতি এমনকি (মুসলমান হলে) লুঙ্গির উপরে শার্ট পরে, খালি পায়ে স্কুলে আসে। এই যদৃচ্ছ চলাফেরা আমার পক্ষে সুবিধাজনক হল। প্রথমদিকে একটু ব্যবধান ছিল ভাষার। এরা সব কাছাড়ি সিলেটি বলে, আর আমি বরিশালি ছাড়া কিছু জানি না। আমি বুঝেছিলাম এক্ষেত্রে

গোঁয়ারতুমি করলে চলবে না। অতএব অবিলম্বে আমি স্থানীয় ভাষা শিখে নিলাম। এমনই শিখলাম যে বাড়িতেও খুলনাইয়া দাদু-দিদিমার সঙ্গে সেই ভাষায় কথা বলি।

.

টমাস

প্রথম দিনই বেছে নিয়ে যে রোগা কালোকোলো ছেলেটার পাশে গিয়ে বসেছিলাম তার নাম টমাস। টমাস সাজপোশাকে একেবারেই দলছাড়া। তার খাকি হাফপ্যান্টের মধ্যে গোঁজা সাদা হাফশার্ট। পায়ে কালো মোজা, কালো নটি বয় জুতো, মাথায় একটি খাকি রঙের সোলা টুপি। তার পাতলা চুল পরিপাটি আঁচড়ানো। গলায় কালো কারে লটকানো একটি রুপোর ক্রস। সে ব্যাগে ভরে বই আনে। সে যেন একটি খ্রীষ্টান নীলমণি, তার মা যশোদা তাকে সাজিয়েগুজিয়ে আদর করে স্কুলের গোঠে পাঠিয়েছে। টমাসের পাশে বসে মহানন্দ দাস। তার বিশাল দেহ, মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা, গায়ে ছিটের হাফশার্ট, খালি পা। কে বলবে সেও টমাসের মতোই খ্রীষ্টান। শহর ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে একই টিলার উপরে তাদের দুজনেরই বাড়ি। মহানন্দ কি তবে বলরামের অবতার?

কপটী কানাই ঐ টমাস একদিন আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে বিপদে ফেলল।

চাঁদপুর থেকে ট্রেনে খানিকটা এগোবার পরই নিসর্গ পালটে যেতে থাকে- পথের ধুলোয় রং লাগে, মাটি থেকে হঠাৎ পাথরের ঢেউ, পাথরের চাতাল উঁকি দেয়, মাইলের পর মাইল পৃথিবী জনহীন হয়ে আছে। পুববাংলার নদীতীরের দিগন্তলীন ধান বা পাট খেতের নিরবচ্ছিন্ন নীলাভ সবুজ এখন ক্রমশ বাদামীহলদে, ছোপ ধোপ সবুজ বা ছাড়া ছাড়া ধূসর। কোথাও কোথাও খাদে জল চলে যাবার দাগ, কোথাও জল আটকে আছে নিচু জমিতে। ঠকঠক ঠকঠক শব্দ করে ট্রেন যায় যেতে যেতে দেখি, বেত মুলিবাঁশ আর লতার নিচ্ছিদ্র জঙ্গলে আবার ঢেকে গেল পাহাড়ের সানু এবং পাদমূল। চাঁদপুর থেকে আখাউড়া হয়ে মাছিমপুর পর্যন্ত কেবল এই অতুলনীয় নীরব সৌন্দর্য।

বনপাহাড়ের সৌন্দর্য যে এমন হয় আমার জানা ছিল না। সেই তৃষ্ণা মনে লেগেই ছিল। কথায় কথায় টমাস তা বুঝতে পেরে আমাকে লোভ দেখাল সে জানাল, তার বাড়ি শহর ছাড়িয়ে আরও মাইল দুয়েক দূরে ছোট একটা টিলার উপর। শহরের সঙ্গে সঙ্গে পাকা রাস্তাও শেষ, কিন্তু তার পরেও কাঁচা রাস্তা রয়েছে বনের মধ্য দিয়ে। সেই বুনো পথ দিয়ে সে রোজ স্কুলে আসে, ফিরে যায়। টমাস তার মতো করে বর্ণনা দিলেও আমি আমার মতো করে সেই পথ যেন দেখতে পেলাম। ঠিক হল, শনিবারে আমরা একসঙ্গে ঐ পথে তাদের বাড়ি যাব।

শনিবারে আধ ঘণ্টার মতো হাঁটার পর দেখলাম শহরের সীমা শেষ হল, আর সেই একই রাস্তা ধীরে ধীরে চলল ছাড়া ছাড়া পল্লী, ছোট ছোট মাঠ আর বনের গা ঘেঁষে। বিকেলের সূর্যের আলো এসে পড়েছে বনের নানারকম গাছের নানারকম পাতার গায়ে আমি মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে টমাসের সঙ্গে চললাম। কোথায় রাস্তা বাঁক নিয়েছে, কখন রাস্তা দু ভাগ হয়ে গেল, কখন রাস্তা বনের মধ্যে ঢুকল এসব কিছুই খেয়াল করলাম না। পথটি সম্পূর্ণ জনহীন। মানুষ তো নেইই, বরং টমাসের সোলার হ্যাট, টাই, গ্যালেস লাগানো প্যান্ট দেখতে যে দু-চারটে কাঠবেরালি ছুটে এসেছিল তারাও মুহূর্তমধ্যে অন্য গাছে লুকিয়ে পড়ল। ঝোপেঝাড়ে কিছু কিছু পাখি ছিল বটে, কিন্তু তারাও উদাসীন, নিজেদের মধ্যে শিস দেওয়া ডাকাডাকি করা ছাড়া অন্য কিছুতে তাদের মন নেই।

টমাসের বাড়ি পৌঁছতে বিকেল হল। জায়গাটা সত্যি অন্য রকম। টিলার উপরে পাশাপাশি তিনটি বাড়ি কাঠের ফ্রেমে ইকড়ের হালকা বেড়া, নতুন লাল রং করা করুগেটেড শিটের চাল। টিলার গোড়া থেকে ধাপ কেটে কেটে বাড়ির চাতাল পর্যন্ত আনা হয়েছে।

টমাস আমাকে অপেক্ষা করতে বলে লাফিয়ে উঠে গিয়ে বাড়ির মধ্যে মিলিয়ে গেল। আমি টিলার নিচে দাঁড়িয়ে আছি তো আছিই। দু-চারটে মুরগি এদিক ওদিক চরে বেড়াচ্ছে। বিকেল ম্লান হয়ে আসছে। টমাসের ফিরে আসার নাম নেই। অচেনা খ্রীষ্টান পল্লী। কোথাও

কোনো লোকজন নেই, সাড়াশব্দ নেই। টমাসের নাম ধরে ডাকাডাকি করতে আমার সংকোচ হল। নেমতন্ন রাখা হল, এখন তাহলে মানে মানে ফিরে যাই। এমন সময় পাশের বাড়িটি থেকে মহানন্দের হাসিহাসি মুখ দেখা গেল। এ কি চেনা দেওয়ার হাসি, না কি ধরে ফেলার হাসি! আমি আর না তাকিয়ে ফেরার পথ ধরলাম। বনের মধ্যে দ্রুত ছায়া পড়ে আসছে। আকাশে তখনো বিকেলের আলো, কিন্তু বনের মধ্যে সন্ধ্যা নামল। ঘোর অন্ধকার হবার আগে বনের মধ্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার। এমন সময় দেখি রাস্তা তিন ভাগে ভাগ হয়ে তিন দিকে চলে গেছে। আমি কিছুতেই মনে করতে পারলাম না, কোন্ রাস্তা দিয়ে এসেছিলাম। একটা রাস্তা তো নিশ্চয় গেছে আমাদের শহরের দিকে। বাকি দুটো কোথায় গেছে? লুসাই পাহাড়ের দিকে? লংগাই নদীর পাড়ে? চা-বাগানের দিকে? না কি অন্য কোথাও? আমার মাথা গুলিয়ে গেল। বুক ধকধক করতে লাগল। আমি কোনো বিচার না করে অন্ধের মতো একেবারে ডান দিকের রাস্তাটা ধরলাম। মনে একটা সূক্ষ্ম হিসেব ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে যদি আমাদের শহরের কোনো চিহ্ন না দেখি তো আবার ফিরে এসে বাকি দুটোয় চেষ্টা করব।

তখন পথে ভালো রকম অন্ধকার নেমে এসেছে। কিছুদূর যাবার পর পথ আবার দু ভাগে ভাগ হল, আমি আবার ডান দিকের রাস্তা ধরলাম। আমার কান্না পেল আমাকে বোধ হয় ডান দিকের ভূতে পেয়েছে। কতক্ষণ হেঁটেছি জানি না। একসময়ে দেখি বনের বাইরে বেরিয়ে এসেছি। মাথার উপর তারাদের মধ্যে যেন ঝড় বইছে। আমি টমাসের বিশ্বাসঘাতকতা ভুলে, বাড়িতে লাঞ্ছনার কথা ভুলে, রাতের অন্ধকার ভুলে হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎই একটা ছবি মনে পড়ল, এক নতুন দেশে একটা একা কুকুর রাত্রে, শীতে, ন্যাংটো দৌড়ে চলেছে- সেটলমেন্টে ঢুকতে না পেরে তার চোখ পরের দিন দুপুর থেকে বিষণ্ন উগ্র পিঙ্গল।

যা হোক, ঘুরপথে ঘুরে ঘুরে নাজেহাল হয়ে আমি সেই রাত্রেই বাড়ি ফিরেছিলাম।

সোমবার স্কুলে যথারীতি টমাসের সঙ্গে দেখা। তার নিষ্পাপ মুখে কোথাও কোনো নষ্টামির চিহ্ন নেই। আমার ইচ্ছে করছিল খ্রীষ্টানটার টাই ধরে এক হ্যাঁচকা টানে মাটিতে

শুইয়ে ফেলি। কিন্তু আমি ওর দিকে দৃষ্টিপাতও করলাম না, এবং আশ্চর্য, সেও আমার দিকে তাকাল না। ক্রমশ আমার মনে সন্দেহ হতে লাগল, টমাস কি সত্যিই ঐ বাড়িটাতে বাস করত? সেখানে কি সত্যিসত্যিই ওর মা বাবা আছেন? কিন্তু সেদিনের ব্যাপারটা কোনো ভুতুড়ে ঘটনা নয়। মহানন্দ সাক্ষী।

.

গ্রীষ্মের ছুটির আগের দিন

যেহেতু জায়গাটা উপত্যকা অতএব গ্রীষ্ম বর্ষা শীত এই তিনটে ঋতুই এখানে খুব প্রবল। ঐ তীব্র ঋতুগুলির ফাঁকে স্নিগ্ধ, বিধুর, মধুর হয়ে দেখা দিত গৌণ ঋতু শরৎ হেমন্ত বসন্ত। মাথার উপর খোলা আকাশ, কাছে নদী, অনতিদূরে বনাকীর্ণ টিলা তবু সারাটা গ্রীষ্ম জুড়ে ভ্যাপসা গরম। ক্লাসে ক্লাসে কয়েকদিন টানা পাংখা চলবার পর, এক মাসেরও বেশি সময়ের জন্য গ্রীষ্মের ছুটি হত। ছুটির আগের দিন আমার এক মধুর অভিজ্ঞতা হল। সেদিন ভোরের স্কুল পড়াশোনা নেই, শুধু হাজিরা দেওয়া আর হৈ-হুঁল্লোড় করে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে ছুটি হয়ে যাওয়া। স্কুলে পৌঁছে দেখি, ক্লাসঘরগুলো এবং বাইরের টানা বারান্দা ও গেট রঙিন কাগজের শিকলি আর নিশান দিয়ে উৎসবের সাজে সাজানো। বিদায়ের দিনে দরজায় দরজায় ওয়েলকাম, স্বাগতম নানা ছাঁদে নানা রঙে লিখে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। সব ক্লাসেই কয়েকজন উৎসাহী ছেলে থাকে খুব ভোরে এসে তারাই এসব করেছে। আমি ছাড়া, সবাই এসেছে কিছু কিছু নিয়ে ফুলের মালা, বিস্কুটের মালা, রঙিন কাগজের মালা, ফুলের তোড়া, ফুলসুদ্ধ ভাঙা ডাল। সারা শহরের বাগান আজ কুসুমশূন্য। নিচু ক্লাসের মাস্টারমশাইরা তাঁদের একটি-দুটি অপোগণ্ড সন্তানকেও আজ নিয়ে এসেছেন। ক্লাসে ঢুকে তাদের টেবিলের উপর বসিয়ে দিয়ে নিজে চেয়ারে বসলেন। বাচ্চাদের মায়েরা আজ ভোরে তাদের কাজল পরিয়ে, চুলটুল আঁচড়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। এতক্ষণে সে কাজল চোখে গালে লেপটালেপটি। কেউ জামাপ্যান্টের বোতাম খুলে ভুঁড়িটি, নুনুটি বার করে বসে আছে, কারো দুধদাঁত পড়ে যাওয়া মুখে অনাবিল খুশির হাসি। ছেলেরা তাদের অভ্যর্থনায়

ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আড়াল থেকে নানাবিধ লোভনীয় বস্তু দেখিয়ে উচাটন করে তুলল। মাস্টারমশাই আজ দেখেও দেখছেন না। নাম ডাকা হয়ে গেলে এক একজন করে ছাত্র গিয়ে মাস্টারমশাইকে মালা পরায়, নমস্কার করে, আর বাকিরা তুমুল শব্দে হাততালি দেয়। জবাফুলের মালা, হলুদ ঘণ্টাফুলের মালা, আকন্দফুলের মালা ছেলেদের হাতে গাঁথা এই মালাগুলোর কোনো ছিরিছাঁদ না থাকলেও হর্ষে, হাততালিতে ও আসন্ন ছুটির বিভায় দৃশ্যগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু বিস্কুটের মালাগুলো ফুলমালার মতো তত অবিমিশ্র আধ্যাত্মিক নয় বলেই হয়তো সেগুলো পরাবার সময় আমাদের সরল দরিদ্র মাস্টারমশাইদের মুখে স্পষ্ট খুশির হাসি দেখতে পেলাম। টেবিলে বসা শিশুরা এবার চঞ্চল হয়ে হাত বাড়ায়, আর সারা ক্লাসে তুমুল করতালি। আজ এসব কথা মনে পড়লে মন ছলছলিয়ে ওঠে।

ওরই মধ্যে দপ্তরীর হাতে নোটিস আসত: স্কুল অমুক তারিখ থেকে তমুক তারিখ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এবং অমুক তারিখে পুনরায় খুলবে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে হিসেব করলাম, এক মাসের উপর আর কদিন ফাউ হল। এর পর স্যারের কিছু মামুলি উপদেশ হল। ভোরের আমেজ কেটে গিয়ে গরম টের পাওয়া যাচ্ছে, রোদ ক্রমশ কড়া হয়ে উঠছে। স্যাব তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। অর্থাৎ ছুটি হয়ে গেল। কেউ একজন চকের টুকরো কুড়িয়ে বোর্ডে লিখল: 9.7. 1933– আবার দেখা হইবে। চলে যাবার মুহূর্তে এই ‘আবার দেখা হইবে!’ বালকদের মায়ামমতাহীন পা যেন ছুটির দেশে ঢুকবার মুখে হালকা একটু থতমত খেল!

.

গভর্নমেন্ট স্কুল

কিন্তু মলিন টানা পাংখা এবং সস্তা কাঠের বেঞ্চ-হাইবেঞ্চের নিরপরাধ স্কুলটি ছেড়ে পরের বছরই আমি গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে গিয়ে ভরতি হলাম। এ স্কুলের চাকচিক্যই আলাদা। এখানে ঝকঝকে কাঁচের বড় বড় দরজা, জানলা, উঁচু ছাদ থেকে ইলেকট্রিক পাখা ঝুলছে।

প্রত্যেকের ডেসকের দোয়াতে দপ্তরী নিয়ম করে ঘন কালি দিয়ে যায়। মুসলমান টিচাররা থ্রী পিস স্যুট পরে স্কুলে আসেন। হেডমাস্টারমশাইয়ের ট্রাউজার্স ও গলাবন্ধ কোট।

এই স্কুলে আমার সাতটি বছর, অর্থাৎ পুরো কৈশোর কাটল। কিন্তু এই বিদ্যালয় কতটুকু জড়িয়ে আছে আমার জীবনের সঙ্গে? এতগুলো সহপাঠীর একজনও আমার চিরজীবনের সখা হল না। শিক্ষকদের কারো সঙ্গে আমার আচার্য-শিষ্যের বন্ধন হল না। স্কুলের টুর্নামেন্টে কোনোদিন খেলতে গেলাম না, স্কুল লাইব্রেরি থেকে বই ধার নিলাম না, প্রত্যেক বছর লাল রিবনে বাঁধা যে তাড়াতাড়া বই ভালো ছেলেরা প্রাইজ পেত তার এক-আধখানাও কোনোদিন কপালে জুটল না। ছাত্র হিসেবে পুরনো রেকর্ডে আমার নাম থাকার কথা। ঐটুকু ছাড়া অত বড় স্কুল কমপ্লেক্সে কোনো ডেসকে, কোনো দেয়ালের কোনায় বা কারো মনে আমার কোনো চিহ্ন নেই।

শুধু স্কুলে কেন, ঐ শহরেও আমাকে কারো মনে নেই। খুব দুর্বৃত্ত বা খুব ভালো না হলে কেউ মনে রাখে না।

ঐ উপত্যকার সঙ্গে যে আমার বন্ধন হল না তার আসল কারণ এখন বুঝি আমি ওখানে ছিলাম পরবাসী, পরভৃত। আর সেদিক থেকে, এই জীবনের শেষে, মনে হয়, এই পৃথিবীতেই আমি পরবাসী এবং পরভৃত।

তবু পাশে বসা ছেলেদের সঙ্গে ঐ বয়সে একরকম আলগা বন্ধুত্ব হবেই। কিছুদিন আমার এ পাশে দেবব্রত পুরকায়স্থ আর ও পাশে সুশান্ত দাস বসেছিল। ফরসা, লম্বা, পলকা দেবব্রত ধুতি আর শার্ট পরে আসত। তার নীল চোখের দৃষ্টি ঐ বয়সেই কৃপালু আর নির্লিপ্ত। সে রোজ সকালবেলায় খবরের কাগজ পড়ে। সুশান্তর চোখদুটো কাঁচের গুলির মতো গোল, তার ক্ষিপ্র শরীর এখনি যেন একটা কোন্দল বাঁধাবার জন্য তৈরি। সুশান্ত কালো হাফপ্যান্টের সঙ্গে হলদে পাঞ্জাবি পরে। দেবব্রতর হাত ছিল ভিজে ভিজে, হিমশীতল। সুশান্তর আঙুল আস্ত সুপুরির মতো শক্ত।

মণিপুরী এবং তোখা ছেলেরা সাধারণত একটু বেশি বয়সে পড়তে আসত। তাছাড়া ছাত্রবৃত্তি পাশ করে, নর্মাল স্কুলে না গিয়ে যারা এখানে ক্লাস ফাইভে এসে ভরতি হত তাদের গোঁফের রেখা তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রসন্নও ছাত্রবৃত্তি পাশ করে এসেছিল। ময়লা গায়ের রং, ময়লা ধুতি, নীল ডোরা শার্ট, জবজবে করে মাথায় তেল মাখা প্রসন্ন মুখে মুখে সব অঙ্ক কষে ফেলত। বাংলাতেও সে দারুণ। কিন্তু ইংরেজি কিচ্ছু জানে না। লতা যেমন আকর্ষী পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে গাছকে বেঁধে বেঁধে গভীর বনে ঢোকে, লেখাপড়ার অধ্যবসায়ে সেও সেই রকম। কেন জানি না, তার অর্ধেক বয়সী আমাকে সে গুরু বানাল। সে খেলতে যায় না, টিফিনে ডেক ছেড়ে ওঠে না। সারা দিন সে ইংরেজি হাতের লেখা লেখে, শব্দার্থ মুখস্থ করে, আমাকে ধরে ছোট ছোট বাক্য বানাতে শেখে। দূরের কোনো গ্রাম থেকে সে আসে। বোধ হয় সে রাত জাগে- নিশি পোয়ানো লণ্ঠনের চিমনির মতো তার চোখের তলায় কালি। পরীক্ষার পরে দেখা গেল ইংরেজিতে সে আমাদের সমান সমান হয়ে গেছে।

আর এক সহপাঠী নৃপেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীকে আমি একদিন নতুন ভূমিকায় আবিষ্কার করলাম। সেদিন দিদিমা শনিপুজোর জোগাড় করেছেন। সন্ধের পর অন্ধকারে নৃপেন গুটি গুটি একেবারে নতুন বেশে ভোল পালটে এসে উপস্থিত। জানা গেল সে এই বাড়ির ক্রিয়াকর্মের পুরুত রামমণি ঠাকুরমশাইয়ের ভাইপো। জ্যাঠামশাই আসতে পারেন নি বলে ভাইপো এসেছে। নৃপেন খাটো করে ধুতি পরেছে, খালি গায়ে পাতলা উড়ুনি, মোটা একগোছা সাদা পইতে যেন ইচ্ছাকৃতভাবে পরিস্ফুট। সে আমার দিকে ঘেঁষলই না। ঘটির জলে হাতপা ধুয়ে, কাঁধের গামছায় পরিপাটি করে মুছে সে বেশ জুত করে আসনে বসল। দিদিমা সব এগিয়ে দিতে লাগলেন- সে ঘণ্টা বাজাল, পুজো করল, সংস্কৃতে মন্ত্র পড়ল, শনির পাঁচালি পড়ল। অবশেষে গামছায় চালকলা বেঁধে, তাঁকে দক্ষিণা গুঁজে উঠে দাঁড়ালে দিদিমা মাসিমা ভক্তিভরে তাকে প্রণাম করলেন। আমি বাক্যহীন হয়ে শুধু ব্যাপারটা দেখছি। এইবার আমার পালা। দিদিমা বললেন প্রণাম কর, ঠাকুরমশাইকে প্রণাম কর।

আমি বললাম- আরে তোমরা কি পাগল হলে? নৃপেনকে প্রণাম করছ! ও তো আমাদের ক্লাসের ছেলে। দিদিমা বললেন- তা হোক, প্রণাম কর। নৃপেন বলল- থাক থাক।

মণিপুরী ছেলে জগৎ সিং, পুরো নাম জগৎমোহন সিংহ, ছিল আমাদের ক্লাস সিক্সের ফার্স্ট বয়। জগৎ বসত ক্লাসের প্রথম সীটটিতে। আমি কেউ নই, জগৎ আমার বন্ধুও না, তবু কিছুদিন জাতের পাশের সীটে বসেছিলাম। জগতের ষোল-সতেরো বছর বয়স, রং কালো, ভরন্ত চেহারা, গলায় তুলসীর মালা, নির্বিরোধী শান্ত স্বভাব। আমি হয়তো শান্তির ও লেখাপড়ায় উন্নতির আশায় জগতের পাশে বসতাম। জগৎ ধুতি আর টুইলের সাদা শার্ট পরে আসত। ঐ একটিই তার জামা। রবিবারে কাঁচত সোমবারে জামাটি বেশ পরিষ্কার ও প্রফুল্ল থাকত, বুধবার থেকে ক্রমশ ময়লা হত, ঘামের হলদে দাগ লাগত। শনিবারে জামাটা একেবারে মলিন। জগতের গায়ে বুধবার থেকে শনিবার পর্যন্ত কেমন ডালভাতের গন্ধ। নিরামিষাশী জগতের ব্যক্তিত্বে ঐ গন্ধ একটা চরিত্র দিত।

জগৎ চিরদিন ফার্স্ট বয় থাকতে পারে নি। ক্লাস এইটে আবুবক্কর তার জায়গাটি কেড়ে নিল। আবু ছিল যত্নশীল, সন্দেহপরায়ণ এবং ছদ্মবেশী। আবুর পোশাক, লুঙ্গি, পাজামা, শার্ট যাই হোক ছিল অতি পরিচ্ছন্ন, যেন সূর্যকরে ধৌত, উপরন্তু সে সর্বদা মাথায় পরত একটি মলমলের টুপি। শুক্রবার দুপুরের নমাজ সেরে আবু আসত বিধর্মী সহপাঠীদের জন্য এক নিস্তব্ধ অবহেলা নিয়ে।

এতদিনে আবু নিশ্চয় বাংলাদেশে গিয়ে একটা কেউকেটা হয়েছে। আর জগৎ? সে বোধ হয় সেই নদী উপত্যকার কোনো গ্রামে বাংলার মাস্টার হয়ে তার শান্ত জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য পুরুষের ভাগ্য কে বলতে পারে। হতে পারে আবুবক্কর নাসায় বিজ্ঞানী, আর বিয়ে করে জগৎ জলঢুবে আনারস বাগানের মালিক।

আবুল কালাম ছিল নরম স্বভাবের ছেলে। স্পষ্ট অক্ষরে সে আলাদা আলাদা খাতায় প্রশ্নের উত্তর তৈরি করে লিখে রাখত। পরীক্ষার আগে আমি তার ইংরেজি আর ইতিহাসের খাতা বাড়িতে এনে টুকে নিই। টুকতে টুকতে আমার হাতের লেখা আবুলের লেখার ছাদ

ধরল। আবুলের ফরসা সুকুমার চেহারা। ধুতি আর শার্টের সঙ্গে সে কালো লোমশ একটি আস্ট্রাখান টুপি পরে আসত।

কামালের মুখে সব সময় পেঁয়াজরসুনের বিজাতীয় গন্ধ, কিন্তু সে ছিল সবচেয়ে কম মুসলমান। কামাল আমারই বয়সী, আমারই মতো হাফপ্যান্ট আর হাফশার্ট পরা, আমারই মতো পড়াশোনায় খারাপ। কামালের বাবা অবাঙালি, মা বাঙালি। সেন্ট্রাল রোডে ওদের বেকারি ছিল। একটা ট্যাক্সিও ছিল ওদের। একই জায়গায় দোকান, বেকারি, গ্যারাজ এবং সংসার। বেশ ম্লেচ্ছ এবং আধুনিক ধরনের জীবন ছিল ওদের।

আরেকজন ছেলে, ধনেশ্বর পরিধা, যেন অজ্ঞাতবাসে থেকে থেকে হঠাৎ একদিন এসে হাজির– তার সঙ্গে ক্লাসের অন্য ছেলেদের স্বভাবচরিত্রের কোনো মিল নেই। তার বাবা প্লান্টারদের ক্লাবের কেয়ারটেকার বা গ্লামার বা ককটেল তৈরির ওস্তাদ কিছু একটা হবেন। বিশাল চেহারার এলোমেলো ধনেশ্বর যেন পথ ভুলে ইস্কুলে এসে পড়েছে। এখানে তার মন বসা অসম্ভব। এক-আধ ঘন্টা ক্লাসে ঘোরাঘুরি করে সে ক্লাবে চলে যায়। সাহেবরা যা যা খায় তাই খায়। মাঝে মাঝে ইস্কুলে একগাদা পুরনো টেনিস বল, পোলোর বল নিয়ে আসে। কিছুদিন পরে আর সে এল না।

এই উপাস্ত্য ছেলেদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল শ্রেণীসচেতন উন্নতিশীল বাড়ির সন্তানেরা। উকিল, পুলিশকর্তা, অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন, আন্দামানের কাঠব্যবসায়ী, ওষুধের দোকানী, সরকারি কর্মচারী, চা-বাগানের অংশীদার, অর্থকরী আরও অন্যান্য পেশার মানুষদের প্রতিপাল্য কিশোরগণ সবাই প্রায় এক রকম। তারা সাপনালার জলের ধারে বা গাছের নিচে আড্ডা দেয়, সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে গড়িমসি করে, রেস্তরায় খায়, ফ্যাশনেবল মেয়েদের দেখে আঁকুবাঁকু করে, তাদের বাড়ির কাছে দাঁড়ায় বা না থাকতে পেরে শেষে চিঠি দেয়। ঐ দুই ধরনের ছেলেদের কোনো দলেই আমি ছিলাম না। আমার না ছিল আত্মবিশ্বাস, না অঢেল পয়সা।

শিববাড়ি

মধুরবন্ধ, ফাটকবাজারের দিক থেকে বাঁক নিয়ে জাহাজঘাটায় বরাক উত্তর বাহিনী হয়ে চলে গেছে তার পর আর তাকে স্পষ্ট দেখি না, মনে হয় বুঝি উঁচু পাড় ও গাছপালার আড়ালে বাঁ দিকে ঘুরল সে। আসলে সে সেখান থেকে গেছে মধুরামুখ, দুধপাতিলের দিকে।

জাহাজঘাটে দাঁড়িয়ে ভাটির দিকে তাকালে প্রথমেই চোখে পড়ে বহু দূরে আকাশে লম্বা হয়ে অর্ধোঙ্খিত ভেসে আছে বরাইল পাহাড়। সারা বছর সেই পাহাড় তার আকাশপটের সঙ্গে রং মিলিয়ে ধূসর আর বামন হয়ে মিশে থাকে। কিন্তু বর্ষাকালে সাত দিন দশ দিন চোদ্দ দিনের অঝোর বৃষ্টির পরে ক্ষান্তবৰ্ষণ কোনো বিকেলে দেখি, পাহাড় যেন উঠে বসেছে, তার গায়ের রোম অপরাজিতার মতো নীল, আমাদের অনেক কাছে চলে এসেছে। সে, বর্ষায় তার বুকের যে জায়গাটা অনেকখানি পাথর-জঙ্গল সমেত ধসে গেছে সেখানে দেখা যায় মাটির নরম বাদামী রং। পাহাড়ের ঘাড়ে গলায় যে মেঘ ঘন হয়ে জমে আছে সেই নতুন মেঘের রং আর ঐ বুকভাঙা আনকোরা মাটির রং এত দূর থেকে প্রায় একই রকম দেখায়।

ঐ উত্তর দিকে, শহর শেষ হবার পরেও মাইল তিনেক রাস্তা হাঁটলে শিববাড়ি। আর্যপট্টি পেরিয়ে ল্যাটেরাইট নুড়ির রক্তাভ রাস্তা ক্রমশ ধূসর ধুলোর পথ হয়ে গেছে। ঝোঁপঝাড় নির্জনতা পার্শ্ববর্তী প্রাচীন আম বট অশ্বত্থ গাছ রাস্তার উপর এসে পড়েছে। বুনো আকন্দ আর পাহাড়ী ধুতরোর ঝোঁপ ঘন হয়ে বন হয়েছে তার তলায় কীটপতঙ্গগুলো সবাই অল্পবিস্তর নেশাড়। যেতে যেতে হাঁটু পর্যন্ত পা যখন ধুলোর রেণুতে ভরে গেছে, জলতেষ্টা পেয়েছে, তখন দেখতাম সেই পায়ে চলা পথ ঢুকে গেছে শিববাড়ির হাতায়।

অনেকখানি জঙ্গলাকীর্ণ জায়গা নিয়ে শিববাড়ি। মন্দিরহীন, মার্জনাহীন, শ্রীহীন এক বন্য দেবালয়। এলোমেলো গাছপালার মধ্যে একটি ছোট পুকুর, তার অনতিদূরে উদম খোলা একটা বড় চালাঘর। সেই চালার এক প্রান্তে একটু খুপরিমতো করা, সেখানে কষ্টিপাথরের

এক বিশাল শিবলিঙ্গ, বাকি জায়গাটায় এখানে ওখানে নির্বাপিত, প্রায়নির্বাপিত দু-তিনটে ধুনি। দড়িতে কালো কর্কশ কম্বল, এক-আধখানা সাদা বা গেরুয়া ছেঁড়া কাপড় আর কপনির ফালি ঝুলছে। খুঁটির পেরেকে টাঙানো রয়েছে দরিয়ার নারকেলের ভিক্ষাপাত্র আর মোষের শিঙের শিঙা। আর কোনো তৈজসপত্র নেই।

মাটির মেঝেয় সরু চাটাই পেতে দিনের বেলাতেও আধশোয়া হয়ে ঝিমোয় দু একজন রুক্ষ চেহারার বলিষ্ঠ লোক। ঝাঁকড়া চুল আর ঝুপসি দাড়িতে তাদের মাথাগুলো বিরাট। তাদের পরনে শুধু একফালি কৌপীন, কেউ কেউ আবার ধুনির ছাই মেখে ধূসর হয়ে বসে আছে। এরাই শিববাড়ির সাধু। আমার মনে হত এরাই শিবের চেলা, অনুচর, দ্বারপাল, দেহরক্ষী– হয়তো এমন হতে পারে, কৈলাস থেকে ডাক এলে এরা কাউকে না বলে-কয়ে একদিন সেখানে চলে যাবে। পাথরের নিস্তব্ধ শিবলিঙ্গটি ছাড়া আর সবই যেন আজ আছে, কাল থাকবে না- ক্ষণস্থায়ী, তবু কোথাও তাদের ছটফটানি নেই।

এই সাধুরা সবাই পশ্চিমা, হিন্দিভাষী। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন খুব বলিষ্ঠ। দু মাসে হয়তো এক দিন তিনি ভিক্ষে নিতে আসতেন আমাদের পাড়ায়। বিকেলবেলায় যখন ছায়া হেলে পড়েছে তখন উঠোনে এসে এক বার সজোরে শিঙায় ফুঁ দিতেন। মুখে কোনো কথা নেই, ভিক্ষে নিয়ে নীরবে চলে যেতেন।

যে চার-পাঁচজন সাধু শিববাড়িতে থাকতেন ভাও গিরি ছিলেন তাঁদের প্রধান। ভাও গিরি কদাচিৎ পাড়ায় এলেও বাড়িতে ঢুকতেন না। আমাদের বাড়ির সামনে রাস্তার ধারের শিমুল গাছটার নিচে তার বেঁটে কাঠের আসার উপর শরীরের ভর রেখে বসতেন। শিথিল একটা হাসি মুখে লেগে থাকত। তাঁর শরীরে কোথাও যেন কোনো জোড় নেই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে লিগামেন্টের বাঁধন নেই, হাওয়া পড়ে গেলে গাছের মর্মর যেমন নিস্তেজ হয়ে যায় তাঁর স্বর ও কথা বলার ভঙ্গি সেই রকম আড়োআড়ো ছাড়োছাড়ো।

ভাও গিরি ছিলেন অতি রূপবান ও সুগঠন পুরুষ। ধুনির তাপ, কঠোর জীবন ও মধ্যবয়স তাঁর সোনার মতো দেহবর্ণকে সামান্য ম্লান করেছে। তার পাতলা দাড়ি, মাথার লম্বা জটা, ঈষৎ ঢুলুঢুলু চোখ, প্রাণসার শরীর আমি খুব নিরীক্ষণ করে দেখতাম। ভাও গিরির মধ্যে একটা ভাব খুব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠত, সে ভাব নির্ভেজাল বৈরাগ্যের। ভাও গিরি গাঁজাটাজা খেতেন নিশ্চয়। কে জানে, হয়তো তারই ফল এই সর্বাঙ্গীণ নিরাসক্তি। আজও ভাও গিরিকে ভাবলে আমার নন্দলালের শিবের কথা মনে আসে না, মনে পড়ে প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের শিব।

ভিক্ষা দেবার ভার আমার উপর ছিল বলে সাধু, বৈষ্ণব, ভিখিরিদের সঙ্গে আমার একটু চিন-পরিচয় ছিল। আমি শিববাড়ির সেই চালাঘরে ঢুকলে সাধুরা ভ্রূক্ষেপ করতেন না ধুনির পাশে বৃহৎ এক একটা কাঠের গুঁড়ির মতোই অচঞ্চল পড়ে থাকতেন। আসলে ঐ সাধুদের চেয়ে শিববাড়ি এবং পথের নির্জনতা আমার অনেক বেশি ভালো লাগত। দিন দিন মানুষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যত অসহজ হচ্ছিল আমার কল্পনাও ততই দিবাস্বপ্নের মধ্যে প্রবেশ করছিল। এইভাবে, লোকালয় থেকে অনেক দূরে এক সমাজপরিত্যক্ত শিববাড়ি, এক

নিভে যাওয়া যজ্ঞকুণ্ড এবং নিজেকে নিয়ে ইচ্ছাপূরণের এক অধজগৎ তৈরি হল। আর, এরই ফলে সেখানে আমি একদিন পাশুপত অস্ত্র পেলাম।

একদিন শিববাড়ির উদাসীরা বহুকাল ঔদাসীন্যে আচ্ছন্ন থাকার পর যেন কোনো স্পৃহায় চঞ্চল হয়ে উঠল। শোনা গেল শিববাড়িতে বিরাট যজ্ঞ হবে। কিভাবে কি হল কে জানে। দেখা গেল কাশী থেকে জটাজুটধারী রামায়ণের মুনিঋষিদের একটি দল শিববাড়িতে এসে পৌঁছেছেন। তাঁরা হিন্দি আর সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষায় বাক্যালাপ করেন না। ঘি মাখানো ডালরুটি ছাড়া কিছু খান না। ন্যাংটো ছোট ছেলেদের মা ঠাকুমা যেমন আদর করে নানারকম ঘুনসি পরিয়ে দেয় কারো ঘুনসিতে একটা ফুটো পয়সা, কারো ঘুনসিতে একটা ছ্যাদা কড়ি, কারো ঘুনসি লাল, কারো কালো, কারো ঘুনসিতে রঙিন পুঁতি, কারো বা জালের কাঠি– এই সাধুদেরও দেখছি সেই রকম- কারো কোমরে সরু বেতের চিরস্থায়ী ডোর, কারো ডোর গাছের ছালের আঁশ থেকে বুননো, কারো বা ডোর সাদামাটা কাপড়ের। এসব ডোর কি গুরু তাঁদের আদর করে পরিয়ে দিয়েছেন, না কি নিজেরাই যে যেমন পারেন কোমরে বেঁধে নিয়েছেন।

শূন্যের মধ্যে যজ্ঞের আগুন অদৃশ্য হয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশলাই নয়, চকমকি নয়, এই মুনিঋষিরা যজ্ঞকুণ্ডে বেল আর ডুমুর কাঠ সাজিয়ে কাঠে কাঠে ঘষে সেই আগুনকে ধরে আনলেন। এই একটি অদ্ভুত কর্মেই শহরবাসীর তাক লেগে গেল।

শিববাড়ির সাধুরা ভিক্ষে করে খায় অথচ যজ্ঞে মন মন ঘি পোড়ানো হল। কেউ কেউ বলল, এরও দরকার আছে। যজ্ঞের ধোঁয়া আকাশে উঠে পৃথিবীকে পবিত্র করে, পাপ নাশ করে, মেঘ তৈরি করে বৃষ্টি ঝরায়। কিন্তু চেরাপুঞ্জির প্রতিবেশী আমাদের এই শহরে কি আরও বৃষ্টির দরকার ছিল?

যজ্ঞ শেষ হলে সবাই চলে গেল। শিববাড়ি আবার ঘুমিয়ে পড়ল। এখন, যখন সেখানে যাই দেখি যজ্ঞকুণ্ডের তলদেশ পুরু ধূসর শান্ত ছাইয়ে ঢেকে আছে। একদিন বিকেলে আমি সেই চৌকো গর্তে নেমে পড়লাম। আমার কি জানি কেন বিশ্বাস হয়েছিল সেই যজ্ঞে তৈরি

হয়েছে কোনো অলৌকিক অস্ত্র এখন সেটি গুপ্তধনের মতো লুকিয়ে আছে ঐ ছাইয়ের নিচে। হাঁসের পায়ের মতো আমার পাতলা পায়ের পাতার নিচে যজ্ঞের ছাই কতকালের ঠাণ্ডা আর নরম। ছাই ঘেঁটে ঘেঁটে দেখতে লাগলাম, কোথায় সেই পাশুপত অস্ত্র। খুঁজে খুঁজে এক হাত পুরু ছাই উলটেপালটে সত্যিই অবশেষে পাওয়া গেল এক অদ্ভুতদর্শন দশ ইঞ্চি লম্বা ছোরা। তার ফলা বাঁট সমস্তটাই আস্ত একখণ্ড কাঁচের তেড়াবাঁকা, সুতীক্ষ যজ্ঞের ঘন ঘোর আগুনে গলে গলে তৈরি হয়েছে- যজ্ঞের আগুনেরই মতো রং, শুধু খাঁজকাটা বাঁটের দিকটা একটু নীলচে। আমি ছোরাটা কোমরের বেটে গুঁজে যজ্ঞকুণ্ড থেকে উঠে এলাম। এখন এটা আমার।

শিববাড়ি থেকে বাড়ি ফেরার পথে সবুজ আগাছাভরা মাঠ, কিছুটা জঙ্গল। সমস্তটাই বড় নির্জন। হঠাৎ কি খেয়াল হল– আমি ছোরাটাকে ফলার দিকে দু আঙুলে ধরে আকাশের মধ্যে ছুঁড়ে দিলাম। আশ্চর্য ব্যাপার আমি স্পষ্ট দেখলাম, আকাশে উঠে সেটা ময়ূরের মতো নীল সবুজ হলদে পেখম মেলে খানিকক্ষণ ভাসল, ভেসে ভেসে চক্কর মারল। তার পর হঠাৎ ডানা মুড়ে সোঁ করে যেন উড়ে গিয়ে বিঁধল একটা গাছের গুঁড়িতে। দৌড়ে গিয়ে দেখি, ছোরার প্রায় অর্ধেকটাই বিঁধে গেছে সেই গাছে। আর গাছের বাকল গরুর গায়ের চামড়ার মতো কেঁপে কেঁপে শিউরে উঠছে। আমার হাতে এ অস্ত্র এল কি পৃথিবীর রাজ্য জয় করবার জন্যে? ইস্কুলে, খেলার মাঠে, বাজারে দুষ্টের দমনের জন্যে?

আমি ভাবতে ভাবতে চলেছি, আর আমার পায়ের তলায় পৃথিবীটা যেন অলক্ষ্যে সংকুচিত হয়ে ছোট হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে তার বর্তুলতা স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি যেন এক বিশাল মাঠের উঁচু ঢেউয়ের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি একটা আকাশে ওঠা গম্বুজের একটা ভাসমান ফানুসের একটা দশ নম্বরী বলের একটা মার্বেলের একটা কুঁচবিচির শেষে শূন্যকশার উপর দাঁড়িয়ে ভেসে চলেছি। তখন বিকেলও পড়ন্ত দশদিকে অসীম শূন্যের মধ্যে কোথায় পৃথিবী! কোথায় আমাদের বাড়ি, গাছপালা, রাস্তা, বরাক নদী! শূন্যের মধ্যে সমুদ্রের মতো গেরুয়া আলোয় যেন জোয়ার। রক্তবর্ণ সম্পূর্ণ সূর্য নিচের দিকে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু অস্তে নামার কোনো পাট নেই। আমি নিজের দিকে তাকিয়ে কোথাও আমাকে দেখতে পেলাম না একটা অসম্ভব লম্বা পেঁজা তুলোর ছায়া যেন ছোরাটা মুঠোয় ধরে আছে।

যখন বাড়ি পৌঁছলাম তখন সন্ধে হয়ে গেছে। অভয়াচরণ ভট্টাচার্য পাঠশালার চৌকিদার তার আঙিনার অন্ধকারে ঢং ঢং করে কাঁসর পেটাচ্ছে আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নাম করছে রাধে রাধে গোবিন্দ। আমি ছোরাটা পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে লুকিয়ে রেখে হাতপা ধুতে গেলাম। পড়তে বসতে হবে। কিন্তু মাথার ভিতরটা যেন গোলমেলে হয়ে গেছে। বার বার বাইরে এসে আকাশ দেখছি। ঝকমক করছে তারা।

পরদিন যখন মনে পড়ল, ড্রয়ার খুলে দেখি সেখানে ছোরার কোনো চিহ্ন নেই। অন্য সব কিছুই তো ঠিক আছে। তবে? এ হল দিবাস্বপ্ন। এ হল ইচ্ছার স্বপ্ন।

ভাও গিরির গল্পের একটা সংশয়াচ্ছন্ন শেষ আছে। দশ-বারো বছর পরে কলকাতায় বসে খবর শুনেছিলাম- ভাও গিরি নাকি মার খেয়েছেন। আমার আর খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল না। কিন্তু এখনও যখন মনে পড়ে, ভাবি কেন? কি হয়েছিল? সন্ন্যাসীর যৌন পতন? জমিজায়গা নিয়ে কলহ'? উনি কি ওখানেই আছেন, না কি অপমানিত হয়ে চলে গেছেন? এতদিনে তিনি প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, হয়তো বা মৃত।

.

স্বামী পুরুষাত্মানন্দ

শহর ছাড়িয়ে এক প্রান্তে যেমন ছিল শিববাড়ি তেমনি অন্য প্রান্তে ছিল রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম। সেখানে বিনা চাঁদায় গল্পের বই পড়তে পাওয়া যেত। মিশনের পথে ঢেউ খেলানো মাঠ, মাঠের শেষে গোখা সৈন্যদের পল্টন, তার পরে পোড়ো জংলা জমি, অবশেষে মিশনের আশ্রম। তখনও সীমানার কোনো বেড়া নেই, কিন্তু বাঁশের একটা আগলখোলা

গেট আছে। শীতের বিকেলে আশ্রমে ঢুকে দেখতাম, অনেকটা জমিতে বাঁধাকপির চাষ হয়েছে। ছেলেরা ইস্কুল থেকে ফিরে জল দিচ্ছে।

এই আশ্রমে একজন সন্ন্যাসী, একজন ব্রহ্মচারী আর বারো-তেরোজন ছেলে। একটি ঠাকুরঘর, একটি গোশালা, একটি লাইব্রেরি আর একটি খড়ের চালের ব্যারাক বাড়ি।

রামকৃষ্ণ মিশনের অবস্থাও তখন প্রায় শিববাড়ির মতোই। কিন্তু শিববাড়িটি ক্রমশ মাটিতে নুয়ে পড়বে, আর এই আশ্রম উন্নতিশীল। ষাট বছর পরে আজ সেখানে নিশ্চয় ইটের পাঁচিল, লোহার গেট বসেছে। বিনিম্নাদায় আর সেখানে গল্পের বই পাওয়া যায় না। আবাসিক ছেলেরা পরীক্ষায় দারুণ ফল করছে। যাক গে, আমি ষাট বছর আগেকার কথাই বলি।

এই আশ্রমে সারা দিন কত রকমের কাজ। মহারাজ ছিলেন হরফন মৌলা না জানতেন হেন কাজ নেই। দান ও ভিক্ষায় পাওয়া সামান্য অর্থ আর বাকিটা কায়িক পরিশ্রম, এই দিয়েই তিনি গড়ে তুলতে চাইছিলেন একটা কিছু। কি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল– লোকসেবা? মঠের নির্দেশে প্রতিষ্ঠান গড়া? না কি কাজের খেলায় মজে গিয়ে তপস্যায় ফাঁকি দেওয়া?

মহারাজ অর্থাৎ স্বামী পুরুষাত্মানন্দের প্রৌঢ় শরীরটি খর্ব হলেও অত্যন্ত সুগঠিত। বোঝা যায়, যৌবনে তিনি জিমনাস্ট ছিলেন। বহুদিন অনুশীলনের অভাবে আর উদাসীনতায় পেশিগুলি এখন শ্লথ হয়ে আছে তবু কাজ করতে করতে চাড় পড়লে তারা মাছের মতো লাফিয়ে ওঠে। গায়ের রং ময়লা, রোদে পোড়া। দাড়িগোঁফসমেত সম্পূর্ণ মাথাটি মাসে এক বার করে মুণ্ডন করেন। তখন তাঁকে মোটেই ভালো দেখায় না। কিন্তু অন্য সময় সেটি অতিশয় তৃণাঙ্কুর উদগত পাথরটিবির মতো দেখায় এবং দেখে আমার মায়া জন্মায়।

মহারাজ যেমন পূর্বাশ্রমের কথা বলতেন না তেমনি আধ্যাত্মিক উপদেশও দিতেন না। আমি লাইব্রেরি থেকে ইলিয়াড, ওডিসি নিয়েছি, নর্স ও টিউটনদের পুরাণকাহিনী ‘সোনার তাল’ নিয়েছি, টমকাকার কুটির নিয়েছি, তিনি কখনো জিজ্ঞেস করেন নি। ঠাকুর স্বামীজীর

বই কেন নিচ্ছি না। ব্রহ্মচারীদাদা বরং সুযোগ পেলেই লোকসংগ্রহের চেষ্টা করতেন, ভবিষ্যতে আমি সাধু হব কিনা ঘুরিয়েফিরিয়ে জানতে চাইতেন। ঐসব কথায় আমার অস্বস্তি হত। তাঁকে এড়িয়ে চলতাম। মহারাজ কিন্তু অন্য রকম। কে সাধু হবে না হবে তাতে তার কোনো আগ্রহ নেই। তিনি সন্ন্যাসী, আড়কাঠি নন। তাছাড়া দীর্ঘকালের সন্ন্যাসজীবন হয়তো তাঁকে চিনিয়েছিল ঐ জীবনের গোপন দুঃখ। সেই দুঃখ আরও একটা ছেলে ভোগ করুক, তা চান নি তিনি।

মহারাজের নিরাভরণ খুপরিতে ছিল একটা তক্তপোশ, একটা কাঁচা কাঠের টেবিল, একটা কেঠো চেয়ার। তাঁর লুঙ্গি, কপনি, ঢিলে গেঞ্জি ঝুলত বেড়ার গায়ে, ব্র্যাকেটে। টেবিলের উপর কালির দোয়াত, নিবের কলম, নিকেলের চশমা। ড্রয়ারে হিসেবের পাতলা খাতা। সেই সস্তার দিনেও মহারে কঠোর দারিদ্র্য সহজেই টের পেতাম। কিন্তু তিনি কি দারিদ্র্য ঘোচাবার চেষ্টা করেছেন। শহরের সঙ্গে, দাতাদের সঙ্গে তাঁর চটপটে শরীর এবং দ্রুতগতি সাইকেলটি নিয়ে যাবতীয় যোগাযোগ রাখতেন ব্রহ্মচারীদাদা। মহারাজ তাহলে করতেনটা কি?

একবার কালীপুজোর তিন দিন আগে আশ্রমে গিয়ে দেখি, মহারাজ প্রতিমা বানাচ্ছেন। হঠাৎই নাকি ঠিক হয়েছে আশ্রমে এবার কালীপুজো হবে। আমি ছেলেবেলা থেকে খোদ কুমোরদের অনেক দেবমূর্তি গড়তে দেখেছি, এবার মহারাজের কারিগরি দেখতে লাগলাম। দুটো ছেলে মাটি ছানছে আর মহারাজ আধুনিক ভাস্করদের কায়দায় বাঁশ দিয়ে মূর্তির একটি মোটামুটি কাঠামো খাড়া করে তাতে মাটি চাপাচ্ছেন। মূর্তিটি ফুট চারেকের বেশি উঁচু হবে না। কিন্তু কালীর পায়ের তলায় শায়িত শিব এক নিরেট মাটির পেডিল এবং কাঠামোয় খড় না দেবার ফলে কালীও নিরেট হয়ে যে ওজন নিয়ে দাঁড়াবে তাতে আর তাকে নাড়াচাড়া করা যাবে না। মহারাজের কাজ দেখে বুঝতে পারছিলাম, তিনি আনাড়ী, কিন্তু মনোমতো কাজ পেয়ে ছোট ছেলেদের মতো মশগুল হয়ে আছেন। কাঁচা নরম মাটির পিণ্ড তার নিজের ভার সামলাতে না পারায় মা কালীর উদর ও স্তনের অনেকখানি খসে পড়ল। আমার মনে হল খোঁদা-বোঁচা মা কালীর পেট থেকে এইবার ছানাপোনা বেরিয়ে পড়বে।

মহারাজ একটু পেছিয়ে এসে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তার পর আবার মাটি চাপিয়ে ন্যাকড়ার পট্টি মূর্তির বুকে পেটে বেঁধে দিলেন। দেবীর দেহের কনটুর এবার অনেক অনুগ্র এবং বিতত দেখাল। মহারাজ বোধ হয় কালীর মধ্যে মহামাতৃকাকে দেখে সন্তুষ্ট হলেন।

পরদিন বিকেলে গিয়ে দেখি, মাটির কাজ শেষ। মহারাজ সত্যি সত্যি এক অন্য রকম কালীমূর্তি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। বুক পেট থ্যাবড়া-থোবড়া যেন ঐ কোলে উঠলে শিশু আরাম পাবে, গরম পাবে। মুখখানা তখনও পুরো ভেজা কিন্তু সে মুখ স্পষ্টতই এক আনাড়ী বালকের বানানো, যেন কোলে শোয়া বাচ্চার দৃষ্টিতে দেখা তার মায়ের মুখ। ভিজে মাটিতে রং দেওয়া নিয়ে তেমন সমস্যা হল না, কারণ এ তো সরস্বতী বা জগদ্ধাত্রীর রং নয়, কালীর রং। আর শিব আগেই খানিকটা শুকিয়ে গিয়েছিলেন।

পুজোর পরদিন গিয়ে দেখি আশ্রম চুপচাপ। সবাই কাল সারা রাত জেগেছে, আজ তাই বিকেলে আলসেমি করছে। চাদর টাঙানো সামিয়ানার নিচে মহারাজের কালী শীতের পরিপূর্ণ দুপুরে বেশ একা একা দাঁড়িয়ে আছে। মহারাজ নানা রকম রং দিয়ে তাকে যেন বালিকা সাজিয়ে দিয়েছেন। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে নানা দিক দেখছিল। কে জানে মন কালী কেমন।

সবাই বলল, কাল গভীর রাতে পুজো খুব জমেছিল। অমাবস্যার রাতে, নির্জন খোলা জায়গায় মা কালী ভক্তদের হাত ছাড়িয়ে অনেকদিন পরে দূরে দূরে খুব ঘুরেছিলেন। সেবার আশ্রমের বাগানে বাঘের মাথার মতো বিরাট বাঁধাকপি আর টুকটুকে লাল টম্যাটো হল প্রচুর। নিজেদের তৈরি এই খাদ্যভাণ্ডার দেখে মহারাজ প্রস্তাব করলেন- এবার ভালো করে ঠাকুরের জন্মতিথির উৎসব করা যাক।

ছেলেরাই খেটেখুটে বাঁশ আর খড় দিয়ে আদিবাসী কমিউনিটি গৃহের মতো প্রশস্ত একটি ঘর বানাল। এখানে তিন দিন ধরে দরিদ্রসেবা, ধর্মকথা, গানবাজনা হবে। মহারাজ আমাদের

অবাক করে দিয়ে বাঁশের মই, তার, হোল্ডার, প্লায়ার্স ইত্যাদি নিয়ে একাই ঐ ঘরের এবং প্রাঙ্গণের ওয়্যারিং করে আলো জ্বালিয়ে দিলেন।

উৎসবের দিন দূর থেকে দেখতে পেলাম, ঢুকবার মুখেই খুব লম্বা একটা বাঁশ পুঁতে তার ডগায় গেরুয়া এক তিনকোনা নিশান উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। উঁচু আকাশের অনন্ত নীলের মধ্যে সন্ন্যাসীর সেই লম্বা নিশান পতপত করে উড়ছে। আমি মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম- এক একটা ছোটখাটো প্রতীক মনের রং কেমন পালটে দেয়।

সিলেট শিলং থেকে কয়েকজন মহারাজ এসেছিলেন। তাঁদের চেহারায় বেশ চাকচিক্য পরিষ্কার কামানো মাথা-মুখ, জামাকাপড় পরিপাটি। আমাদের মহারাজ এঁদের ঔজ্জ্বল্যের আড়ালে আরামে লুকিয়ে পড়লেন।

সাধুর জীবন অতি কঠোর, শম দম জপ ধ্যান তাকে আরও শুষ্ক করে তোলে। এরই মধ্যে নিজের ভাবের গান গেয়ে সাধু নিজেকে একটু ভিজিয়ে রাখে। অতএব শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্তী সব সাধুরই নিজের নিজের গান আছে। এমনকি ছাইমাখা সাধুরাও পথের আড্ডায় চিমটে বাজিয়ে গান গায়। এখানেও ঠাকুরের জন্মোৎসবে সন্ধেবেলা এক ঢালাও গানের আসর বসল। আমাদের শহরে এত যে ভালো সব যুবক গাইয়ে ছিল জানতাম না। রাত বাড়তে লাগল আর শ্যামাসংগীত, ব্রহ্মসংগীত, হিন্দি ভজন আর ধ্রুপদী গানের স্রোত বইতে লাগল। তারায় ভরা আকাশের নিচে, গভীর রাতের হিমেল বাতাসের মধ্যে, শহর থেকে দূরে সেই আদিবাসী কমিউনিটি হাউসের মতো দরাজ ছাউনিতে মানুষের আত্মার সাধনা এবং বেদনা কতভাবে বিস্তারিত হতে লাগল। এই আসরে ঠাকুর-স্বামীজীকে নিয়ে লেখা গান কিছুটা অপ্রস্তুত শোনাল। গানের আপনহারা অনাসক্তির মধ্যে কোনো পুণ্য উদ্দেশ্যও এক ব্যর্থতা তৈরি করে।

তার পরে কতকাল কেটে গেল। ষাট বছর প্রায় একটি আস্ত পরমায়ু। এতদিন ধরে স্বামী পুরুষাত্মানন্দকে আমার মনে রাখা এবং ভালোবাসার একটি গূঢ় কারণ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের চেলাদের মধ্যে যিনি আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেন সেই স্বামী

অদ্ভুতানন্দ বা লাটু মহারাজের সঙ্গে পুরুষাত্মানন্দ মহারাজের চেহারায় কিছু সাদৃশ্য ছিল। দুজন সন্ন্যাসীই খর্বকায়, ব্যায়ামপুষ্ট, কালো, রুক্ষ, অযত্নমলিন। দুজনের মধ্যেই শ্রমজীবীর লক্ষণ। দুজনেরই ছেঁড়া কাপড়, ঢিলে বেখাপ্পা গেঞ্জি, দুজনের মুখেই অসচেতন দীনতা, রুক্ষতা, ভানহীনতা এবং দুজনেরই পৌরুষ ভস্মাচ্ছাদিত।

.

কৃষ্ণসাধু

পীত ধড়া, মোহন চূড়া পরে আসতেন কৃষ্ণসাধু। কৃষ্ণসাধু ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো মানুষ– ছোটখাটো হালকা শরীর, মাথায় হলদেটে সাদা চুল, চাঁদির দিকে একেবারে পাতলা। দু মুঠো সাদা দাড়িগোঁফের মধ্যে তার ঠোঁট দুটি বালকের ঠোঁটের মতো রক্তিম আর আনন্দের হাসিতে কুঞ্চিত। অবিকল ছবির কৃষ্ণটি মাথায় বেড় দিয়ে ময়ুরপুচ্ছের চুড়ো, গলায় পুঁতির মালা, খালি পায়ে বাঁকা নূপুর। আদুড় গায়ে কাঁধ থেকে পিঠ ঢেকে ঝোলে একখানা কারুকার্য করা কাঁথার পাছড়া বা পাছুড়ী। একদিন সেই পাছুড়ী খুব উজ্জ্বল রঙের ছিল, এখন তা ধূসর এবং জীর্ণ। অধোবাস একখানা হলদে রঙে ছোপানো হেটো ধুতি, মালকোঁচা দিয়ে পরা। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে বর্ণনা আছে:

পাটের পাছড়া পৃষ্ঠে ঘন উড়ে বায়।
ধড়ার আঁচল লুটি পাএ পড়ি যায়।

অবশ্য কৃষ্ণের চেয়ে দুটি জিনিস তাঁর অতিরিক্ত ছিল একটি হল ভিক্ষের ঝুলি, অন্যটি হল বাঁশের ডাঁটের একখানা ছাতা।

কৃষ্ণসাধু আসতেন অনেক দূর থেকে, হেঁটে। বোধ হয় তাঁর বাড়ি ছিল কোনো টিলার পাদমূলে। পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ধুলো, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ঝুলি থেকে ভাঁজ করা গামছা বার করে মাথা-মুখ পুঁছতেন। গামছা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেয়ে ক্লান্তি দূর করতেন। সকালে বার

হবার সময় বোধ হয় অলকাতিলকা কেটেছিলেন, এখন সেসব মুছে গেছে। কৃষ্ণসাধুর ঝুলিতে ছোট একটি পিতলের বাঁশি থাকত। বললে পরে বিনাবাক্যে সেটি বার করে বাজাতেন। তাতে সাতটি ফুটো ছিল ঠিকই, কিন্তু কৃষ্ণসাধু ছোট ছেলেদের মতোই বংশীবাদক- এলোমেলো এ ফুটো ও ফুটো টিপে পুঁ পুঁ করে আওয়াজ বার করা ছাড়া কোনো রাগিণীই তাঁর বাঁশিতে বাজত না।

কৃষ্ণসাধু কেন ঐ রকম সাজ করতেন জানি না। কিন্তু বেশ লাগত যখন এক মাস দু মাস পরে তিনি ঠা ঠা দুপুরের শেষে কোনো রংজ্বলা অপরাহ্নে এসে হাজির হতেন। ভিতরের বারান্দায় মোড়ার উপর বসতেন। একটু জিরোতেন, মৃদু মৃদু কথা, অল্প অল্প হাসিতে তাঁর প্রসন্নতা ফুটে উঠত। আমার মনে হত, উনি ভিখিরিও না, বৈষ্ণবও না, একজন স্বাধীন মজার মানুষ।

.

গৌরদাস বাবাজী

বৈষ্ণব অনেক রকমের দেখেছি সংসারী, সন্ন্যাসী, মোহন্ত, ভিখিরি, নির্বিকার, চঞ্চল। কিন্তু বৈষ্ণব যেমনই হন, সংসারের আগুন সবাইকেই তাড়া করে বেড়ায়।

গৌরদাস বাবাজী ছ ফুট লম্বা, হাড়সর্বস্ব এক ল্যাগবেগে মানুষ। যেন কোনো উট বা ঘোড়ার কঙ্কালের উপর উনি নিজের ছালটি পরিয়ে নিয়েছেন। যেন সেই জন্যেই তাঁর চামড়া অমন ঢিলে, হলদেটে, খড়ি ওঠা। তাঁর বড় বড় ফাটা পা, মুড়নো মাথা, বড় বড় কান, ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখে রুক্ষ কাতর দৃষ্টি। সাদা কোরা থানের অধোবাস পরা, ধুকড়ি চাদর গায়ে, গলায় দু তিন প্যাঁচ ছোট দানার তুলসীমালা, গরুড়পক্ষী নাকে তিলক। দূরের কোনো পাহাড়তলিতে বাবাজীর আখড়া। বছরে এক বারের বেশি এই শহরে আসতে পারেন না।

বাবাজীর অত বড় শরীরটা কখনোই সুস্থ থাকত না। বেশি কথা বলতেন না, কথা বললে হাঁপানির টান উঠত। আমাদের উঠোনে শীতের রোদের মধ্যে মোড়ায় বসে থাকতেন হাতের পাতায় চোখ ঢেকে অনেকক্ষণ। তুলসীপাতা দেওয়া গরম চা খেতেন। দিদিমা তাঁর কাছে বসে খবরাখবর নিতেন। কানে আসত ছেলেপিলেরা ভালো হয় নি। সংসারে অশান্তি অনটন।

বাবাজী ভিখিরি ছিলেন না, কিন্তু অন্যের কৃপার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এই শহরে সপ্তাহখানেক কাটিয়ে, কয়েকটা বাড়ি থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে তিনি চলে যেতেন। হয়তো পালা করে আরও কয়েকটা জায়গায় তাঁকে ঘুরতে হবে। সাধুর সব চেয়ে বড় শত্রু রোগ আর সন্তান তাঁকে পেড়ে ফেলেছিল।

তাঁর কোনো শিষ্য-ভক্ত ছিল না। আধ্যাত্মিক কথা দূরে থাক, সামান্য সুখদুঃখের কথা বলতে গেলেও কাশির দমকে তাঁর নিশ্বাস আটকে যায়। চোখের গর্তের নিচে রাতের অনিদ্রার চওড়া কালো দাগ নিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকেন। এইভাবে আর কত দিন যাবে কে জানে!

.

বৈষ্ণবীদিদি

বৈষ্ণবীদিদি আসতেন রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে হেমন্তকালে। কোনো এক চা-বাগানে ছিল তাঁর ডেরা। এসে উঠতেন সাধুদিদির কাছে। বৈষ্ণবীদিদি বিধবা মানুষ, মধ্যবয়সিনী। সংসারে তাঁর নিজের কে ছিল জানি না, কিন্তু সন্তানের মতো কোলে করে আনতেন একটি কাঠের গৌরাঙ্গ। মূর্তিটি রঙিন, খাড়া দাঁড়ানো, তিন বছরের বালকের উচ্চতা আসনে বা মেঝেয় দাঁড় করিয়ে দিলে সোজা হয়ে সে অনন্তকাল হাসিহাসি মুখে, বড় বড় চোখে চেয়ে দাঁড়িয়েই থাকবে। বৈষ্ণবীদিদি ফুর্তিবাজ লোক- গৌরাঙ্গকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়েই হেসে গেয়ে নেচেকুঁদে মাত করে দিতেন মহিলামহল।

বৈষ্ণবীদিদি এলে নাগাবাবার ভোগরাগের জাঁকজমক খুব বেড়ে যেত। কাঠের গৌরাঙ্গেরও ভোগ হত। একই ঘরে দুই ঠাকুর। গামলা ডেগ জামবাটি ভরতি করে নানা পদ ঠাকুরের সামনে সাজিয়ে দিয়ে, ধূপ দীপ জ্বালিয়ে, ঘরের দরজা বন্ধ করে সাধুদিদিরা বাইরে এসে ভোগের গান ধরতেন। বন্ধ ঘরের মধ্যে, লোকচক্ষুর অগোচরে ঠাকুররা শুক্তো থেকে পায়েস– কোন পদের পর কোন পদ খাচ্ছেন তারই ধারাবিবরণী হচ্ছে এই গান। গানের শেষটা এখনও মনে আছে—

আচমন করিয়া প্রভু মুখে দিলেন পান,
সিংহাসনে বসলেন যেন পুন্নিমার চান।
জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গিরিধারী।

তৃতীয় ছত্রটি হল ধুয়া। এসব গান চন্দ্রাবতীর রামায়ণের মতোই মহিলাদের রচনা, যা দরকার মতো টেনে বাড়ানো, হেঁটে কমানো এবং ভোগের পদ অনুযায়ী পরিবর্তন করা যেত।

অতঃপর পাঁচ মিনিট নীরবতা পালন করে দরজা খোলা হত। দরজা খোলা মাত্র গোবিন্দভোগ চালের গন্ধে, রান্নার সুবাসে ঘরটি ম ম করত।
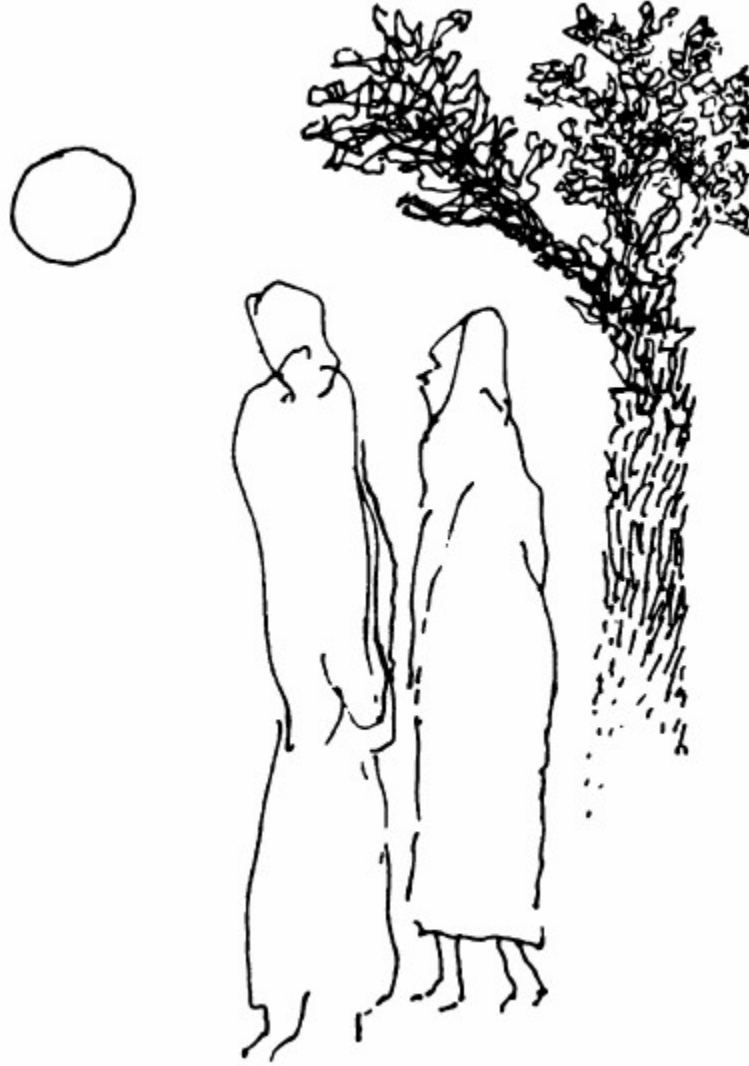
কোজাগরী পূর্ণিমার পরের পূর্ণিমাটিই রাসপূর্ণিমা। আমাদের উপত্যকা শহরে সন্ধে থেকে পৌর্ণমাসীর পূর্ণচাঁদ উঠেছে। হেমন্তের রাতে শীত তত নয়, কিন্তু হিম আর কুয়াশা পড়েছে খুব। সারা দিন ঠাকুরের কত রকম রঙিন সাজপোশাক হল– ফুলমালা, উত্তরীয়, উষ্ণীষ

পরানো হল। রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটায় যখন পথ জনহীন, ঘরে ঘরে বাতি নিবে গেছে, পাখিরা ঘুমিয়ে পড়েছে তখন বৈষ্ণবীদিদি নাগাবাবাকে রাসের সাজে সাজিয়ে দিয়ে উঠোনে নেমে এলেন। এখন, সাধুদিদি, বৈষ্ণবীদিদি, দিদিমা, কালোশশীর মা, রাধের মা, আরও কেউ কেউ—সাদা কুয়াশায় সব্বিকে চেনা যায় না—নাগাবাবার খোলা দরজার সামনে উঠোনে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে গান গাইতে গাইতে নাচছেন। এই প্রৌঢ়াদের কারো সংগীতের কোনো শিক্ষা নেই, নাচ বলতে খেমটা ছাড়া আর কোনো নাচের নাম পর্যন্ত তারা শোনেন নি। তাছাড়া, বয়স যেমন গলার কোমলতা মুছে নিয়েছে বাতের ব্যথা তেমনি কোমরের নমনীয়তা নষ্ট করেছে, আর এ গানও ছড়ার বেশি কিছু নয়। সব সত্যি। কিন্তু তবু সেই নাচ এখনও মনে রয়ে গেছে একটি অলৌকিক ছবি হয়ে। গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌখলী রজনীর মতো কোমল সাদা রঙের এই অঘ্রানের রাত, মাথার উপরে হিমে আবছা পূর্ণচন্দ্র, মহিলাদের পরনে তাঁদের প্রৌঢ়দিনের সাদা ধবধবে শাড়ি, সাদা মিহি কুয়াশা-আকাশ থেকে যেন কুড়চিফুলের রেণু ঝরছে। পুরুষগণ নিদ্রাভিভূত। কেবল ঐ নিবৃত্তরজস্কা মহিলারা গোল বৃত্ত করে, সামনে ঝুঁকে, হাতে তালি দিয়ে গাইতে গাইতে রাসের নাচ নাচছেন।

.

ভোলা গিরির চেলা

বাড়ির কাছের এইসব দীনদুঃখী সাধু বৈরাগীরা তো আমাদের আপনজন। এঁরা ছাড়াও আসতেন কিছু বাইরের উটকো মহাত্মা।

একবার এলেন ভোলা গিরির দুই সন্ন্যাসী চেলা। তারা উঠেছিলেন সাধনদের বাড়িতে। দুজনেরই মুণ্ড চকচকে কামানো। তখন শীতের দিন। দুজনেরই পরনে আজানুলম্বা মেরুন রঙের গরম পাঞ্জাবি। পাশাপাশি দাঁড়ালে মনে হয় যেন জুড়ি দোহার।

এঁদের একজন গলার মধ্যে একটি কৃত্রিম গর্ত বানিয়ে গোল্ড স্টোনের একটি নিটোল নুড়ি রেখেছিলেন। নুড়িটি ইঞ্চিটাক লম্বা, ওভাল আকৃতির। ঐটি তাঁর উপাস্য। পুজোয় বসে নুড়িটিকে তিনি আঁক করে উগরে হাতের পাতার উপর ফেলেন। তার পর ধুয়েপুঁছে যথাবিহিত পুজো করে আবার সেটিকে কপ করে গলাধঃকরণ করেন। তিনি বলেন ওটিকে তিনি কলিজার মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছেন কারণ ঈশ্বরের সবচেয়ে প্যারা জায়গা হল ভক্তের কলিজা।

অনেকদিন পরে পড়েছিলাম, চোরেরা ও জেলকয়েদীরা গলার ভিতরে সীসের গুলি রেখে মাংস ক্ষইয়ে ক্ষইয়ে একটা গর্ত তৈরি করে নেয়। সেখানে তারা মূল্যবান রত্ন আর মোহর লুকিয়ে রাখে। দরকার মতো আবার তা উগরে বার করে। এই গর্তটি হল তাদের ভল্ট এবং সর্বক্ষণের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। সাধুজী মুখে যাই বলুন, উনিও ঐ রকমই একটি গর্ত তৈরি করেছিলেন।

.

মায়াপুরের বৈষ্ণব

এই বহিরাগত সাধুদের মধ্যে ছিনে জোঁকের মতো লেগে থাকার ক্ষমতা দেখেছিলাম মায়াপুরের গৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবদের। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ছিলেন এই সংগঠনের প্রধান। কোনো বসন্তে বা গ্রীষ্মে, ঠিক মনে নেই, মঙ্গল গ্রহের হানাদারদের কায়দায় এঁরা শহরটাকে আক্রমণ করলেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল তিলক-কণ্ঠি-গেরুয়াধারী স্বাস্থ্যবান একদল লোক ট্রেন থেকে নেমেই শহরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লেন। এঁদের কিছু প্রচারপুস্তিকা ছিল, খোল করতাল ছিল, আর ছিল নবদ্বীপ-শান্তিপুরের মিষ্টি ভাষায় তোক পটানোর ক্ষমতা। এঁরা, সময় নেই অসময় নেই, গেরস্তের বাড়ি বাড়ি টু দিতে লাগলেন। সিংহ বা চিতা যেমন দল থেকে একটি প্রাণীকে বধ করবার জন্য বেছে নেয়, এঁদেরও সেই কৌশল।

একদিন এঁদের দু-তিনজন সকালে আমাদের বাড়িতে এলেন। তখন দাদুর অফিসে যাবার বেলা। দিদিমার রান্নার তাড়া। সুতরাং ওরই মধ্যে তাঁরা এই গৃহের পরমভাগবত গৃহকর্তা ও মা-জননীর প্রশংসা করে কিছু এককালীন দানের আবেদন জানিয়ে তাড়াতাড়িই বিদায় নিলেন। তাঁরা পাড়ার সব বাড়িতেই যাচ্ছেন, কিন্তু কেন জানি না, আমাদের পাড়ায় নির্বাচন করলেন দাদুকেই। তাঁদের দাবি দু শো এক টাকা। তখনকার দিনে ছ আনা মাংসের সের, দু আনা দুধের সের, ছ আনায় এক শো ছাতকের কমলালেবু, এক পয়সায় তিন সের টম্যাটো, দেড় টাকা আমার স্কুলের মাইনে। সুতরাং দাদু কিছুতেই ঐ টাকা দেবেন না। ওদিকে সাধুদেরও চলে যাবার দিন এগিয়ে আসছে। যাবার এক দিন আগে, সন্ধেবেলায়, একেবারে অন্দরমহলে এসে ওঁরা তিনজন দাদুকে পাকড়াও করলেন।

প্রথমেই এক কোপে দু শো টাকাটাকে কেটে এক শো টাকা করে দিলেন। আমি বসে বসে তাঁদের বিক্রয়নৈপুণ্য দেখলাম। আধঘণ্টার উপর ধস্তাধস্তি চলল। দাদু সরল সিধে লোক, শিবের পুজো করেন, অজানা অচেনা, কপালে ত্রিপুণ্ডকের বদলে নাকে তিলক টানা ঐ লোকগুলোকে অতগুলো টাকা দেবার তাঁর দরকারটা কি! তবু শেষ পর্যন্ত পারলেন না। বাবাজীদের সুললিত প্রশংসা এবং বাক্যের ছটায় ভেসে গিয়ে মাসিমা হঠাৎ ‘টাকাটা আপনারা পাবেন’ বলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে বাবাজীরা সমস্বরে পরমভাগবত অমুকবাবুর জয় বলে তিন বার উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি দিলেন। দাদু মাসিমার মান ও আদর রেখে টাকাটা বার করে দিলেন। তখনও ইসকন হয় নি, কিন্তু ইসকন যে হবে এটা তার ভূমিকা।

.

অরুণাচল

সুরমা মেলের রেললাইন এসে শেষ হয়েছে আমাদের শহরে। এর আগের স্টেশনটির নাম মাছিমপুর। ইচ্ছে হলে বিকেলের ট্রেনে সেখানে যাই। সাইকেলেও যাই। কোথাও একটি মানুষ নেই। পাহাড়ী রাস্তার দু দিকে গাছপালা ঝোঁপঝাড় নীরব হয়ে আছে। মাছিমপুর এক

ছেড়ে যাওয়া জায়গা। বর্মা অয়েল কোম্পানী এখানে একসময়ে গভীর কূপ খুঁড়ে পেট্রল খুঁজেছিল। কিছু না পেয়ে তারা চলে গেছে। পড়ে আছে তাদের ডিগিংয়ের লোহালক্কড়, অতিকায় যন্ত্রপাতি, আর আকাশের উঁচাইয়ে লোহার কয়েকটা দানবাকৃতি চৌবাচ্চা। তাতে এক এক পুকুর জল ধরে। একদিন বিকেলে লোহার সিঁড়ি বেয়ে উঠে দেখেছিলাম, সে চৌবাচ্চা জলে ভরতি। অত উঁচুতে হু হু করে একটানা গর্জন করে হাওয়া বইছে আর জলে ঢেউ উঠছে। কোথাও জনপ্রাণী নেই। দূরে কয়েকটা টিলা ধূসর নীলচে বনের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। সেই বিশাল বৃত্তাকার চৌবাচ্চার কিছুটা ঢাকা, সেখানে শুলে কেমন লাগবে ভেবে একটু শুলাম– টের পাচ্ছি, শয়ান শরীরের নিচেই লোহার পাতে জলের দুর্জয় ধাক্কা। অত হাওয়ায় শীতশীত করে, অথচ পড়ন্ত রোদে লোহার পাতের আরামদায়ক উষ্ণতা।

মাছিমপুরে একটি টিলার মাথায় ছিল অরুণাচল আশ্রম। অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত তাঁর স্মৃতিকথা 'তামসী'তে লিখেছেন: 'গুরুদাস চৌধুরী একটি আশ্রম খুললেন, দয়ানন ঠাকুর নাম নিয়ে। তার নিশ্চয়ই একটা আকর্ষণ ছিল। কারণ অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি দয়ানন্দের আশ্রমে যোগ দিয়েছিলেন। আশ্রম ছিল পুববাংলার জগৎসীতে আর শিলচরে কাছে অরুণাচলে। পুলিশের সন্দেহ হল এই আশ্রমে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ হয়। হয়তে সন্দেহটা অমূলক ছিল না'।

আমার কাছে অরুণাচলের অর্থ ছিল, যে পাহাড়ে উষা বা সন্ধ্যা-রাগ এসে লাগে, অথবা যে পাহাড় থেকে উষার বা সন্ধ্যার গোলাপী আভা দেখা যায়। এমন একটি নামেও তো মন ভোলে।

বিশেষ উৎসব ছাড়া সাধারণ দিনে প্রায় নির্জন সে জায়গা। একটি উঁচু গম্বুজের শক্তপোক্ত মন্দির আর কলমের নিচু নিচু আম গাছের আড়ালে ঘাস বাঁশ মাটির তৈরি ছোট ছোট কুটির। অনেক কুটিরই ফাঁকা। কিন্তু কেউ তাদের মোটামুটি পরিষ্কার করে রেখেছে- যে কোনো সময়ে অতিথি আগন্তুক এলে আশ্রয় পাবে।

অরুণাচলের দেবতা কে, আশ্রমবাসীরা কোন সম্প্রদায়ের, সেসব কথা আজ কিছু মনে নেই। মন্দিরের লম্বা সিঁড়িতে বসে বিকেলটা বেশ কেটে যায়। সন্ধ্যা নামে। একদিন এই রকম সন্ধ্যায় শুক্লপক্ষের আকাশে চাঁদ উঠল। ঘুরে ঘুরে দেখি কুটিরের পাশে পাশে খটখটে সাদা মাটিতে আমের ডালপালার আলোছায়া।

.

দেবদেবী পুরাণ

শৈবদের এক বরফের মতো সাদা শিব, আর শাক্তদের লাল কালো নীল হলদে অনেক দেবী। এই অমানুষী দেবীদের পুজোর রীতিপদ্ধতি খুব গূঢ়, তমসাঘোর। বৈষ্ণবেরা অন্য রকমের মানুষ সেই জন্যে তাদের দেবদেবী অপরূপ শরীরের যুবকযুবতী, কিশোরকিশোরী, এমনকি হামাগুড়ি দেওয়া শিশু। রসে লীলায় আনন্দে কখনো এরা টলমল করে, কখনো ডগমগ করে। এইসব দেবদেবীর মধ্যে বৈষ্ণবেরা নিজেরাই নিজেদের উপভোগ করে সেই জন্যেই কথায় কথায় তাদের এত গান, কীর্তন আর উৎসব। স্তব্ধতা এবং কবিতা কিন্তু শৈবদের। রঙের রহস্য এবং ছবি হয়তো শাক্তদের।

আমরা পিতৃকুল মাতৃকুল উভয় দিক থেকেই নিশ্ছিদ্র শাক্ত হওয়া সত্ত্বেও দিদিমা তাঁর বাড়িতে এক শব্দঘোর বৈষ্ণব উৎসব প্রবর্তন করলেন। এ হল সেই বাসনা যার জন্যে মানুষ দেউলচূড়ায় সোনার কলসি বসায়। দাদু দিদিমার ইষ্ট ছিলেন শিব। রুপো আর ধূসর বর্ণের একটি নুড়িতে তৈরি চমৎকার শিবলিঙ্গটিকে দুজনেই পুজো করতেন এছাড়া দিদিমার ছিল আবার স্বাধ্যায় বাংলা পদ্যে গীতা, ভাগবত, আর মূল চৈতন্যচরিতামৃত পড়তেন স্পষ্ট উচ্চারণে, অনেকক্ষণ ধরে। শিবলিঙ্গের পাশে বৈষ্ণব বই ভাগবত আর চৈতন্যচরিতামৃত দিদিমারই সংযোজন।

কান খাড়া করে আমি শ্রীমদ্ভাগবত শুনতাম। তাতে অনেক অদ্ভুত কাহিনী আছে: ব্রহ্মা যখন চরাচর সৃষ্টি করছেন তখন এক যাচ্ছেতাই কেলেঙ্কারি ঘটালেন। দিন-রাত সৃষ্টির সময়

সন্ধ্যাকেও সৃষ্টি করলেন। কিন্তু সেই কন্যার এমন দুর্নিবার রূপ যে বাবা হয়েও ব্রহ্মা কামাতুর হয়ে তাকে ধরতে ছুটলেন। ব্রহ্মার সন্তান মনুরা বাবার এই কাণ্ড দেখে অধোবদন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সন্ধ্যার উজ্জ্বল রং লজ্জায় ক্রমশ ম্লান হতে হতে কালো অন্ধকার হল। এইসব কাহিনীর সঙ্গে আবার পাতাজোড়া রঙিন ছবিও ছিল। বাড়িতে যখন কেউ থাকত না, আমি হাতপা ধুয়ে পবিত্র হয়ে সেই বই নামিয়ে নিয়ে পড়তাম, ছবি দেখতাম- বুড়ো ব্রহ্মাতে একবার চোখ বুলিয়ে, নিবিষ্ট হয়ে সন্ধ্যার শরীরের রূপ বুঝবার চেষ্টা করতাম। কার যে কোথা থেকে কি হয়! ধর্মগ্রন্থ পড়েই আমার কামের স্ফুরণ হল।

.

সাধু দিদি

এত রকম ধর্মকর্ম দিদিমা বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক সহায় ও আদর্শ ছিলেন প্রতিবেশিনী সরোজিনী বসু ওরফে সাধুদিদি বা দিদি।

আমি যখন দিদিকে দেখি তখন তিনি প্রৌঢ়ত্বের শেষ দিকে। তাঁর বড় ছেলে অধ্যাপক, ছোট ছেলে মুনসেফ, বড় মেয়ে চা-বাগানের ডাক্তারের গৃহিণী, ছোট মেয়ে স্বামীর সঙ্গে বর্মাপ্রবাসিনী। তাঁর অনেক নাতিনাতনী। মেয়েরা, নাতিনাতনীরা মাঝে মাঝেই আসে, থাকে। বাড়িতে ঝুলনও হয়, দুর্গোৎসবও হয়। বাড়িটি সারা বছর জমজমাট।

দিদি খুব সুকুমারী, হয়তো একটু বাতের ব্যথাও আছে, কোনো পরিশ্রমসাধ্য কাজ করেন না। আমি তাঁকে কোনোদিন রান্নাবান্না, ঘরের কাজকর্ম করতে দেখি নি। তাঁর বিছানাটি বেশ বড়, সাদা ধবধবে লেপ চাদর বালিশে ভরতি। দিনরাতের অনেকটা সময় তিনি সেখানেই শুয়ে বসে জপ করেন, ধর্মগ্রন্থ পড়েন, চা খান। বেলা হলে ঠাকুরঘরে যান, পুজো করেন। এত বড় সংসারটা যেন হেসে খেলে নিজে নিজেই চলে যায়। পাড়ার দু-চারজন প্রৌঢ়া গৃহিণী তাঁর খুব অনুগত। বিকেলে ফরসা জামাকাপড় পরে তাঁদের নিয়ে বেড়াতে বেরোন, হাঁটতে হাঁটতে আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দিদিমা মাসিমাকে ডেকে নেন। এই মহিলার

দল বেশ খানিকটা হাঁটেন হাঁটতে হাঁটতে কখনো নদীর পাড়ে যান, কখনো ইটখোলার দিকে, কখনো লোকাল বোর্ডের অফিসের পাশের অশ্বত্থ বটের ছায়াঘোর পথে। যেতে যেতে নানারকম সাংসারিক গল্প হয়। দিদি সবার খোঁজখবর নেন, কিন্তু কারো বাড়িতে ঢোকেন না। তার একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে। বয়স্ক গৃহিণীরা, তরুণীরা তাঁকে সমীহ করে। এদের কাছে তিনি কৌরবপুরস্ত্রীদের কাছে গান্ধারীর মতন।

কিন্তু অন্ধকারই হোক আর চাঁদের আলোই হোক, সন্ধে নামলেই দিদি অন্য মানুষ বাচ্চার মতো ভয়কাতুরে, অসহায়। এখন সারা রাত ঘরে লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখতে হবে, কাছে কাউকে না কাউকে থাকতে হবে। অস্থান কুস্থান থেকে এখন আচম্বিতে তাঁর কাছে প্রেতাত্মারা আসবে। কী যে কষ্ট তাদের! দিনের বেলায় ওরা দেখা দেয় না তা নয়, কিন্তু তখন তো চারদিকে আলো, মানুষজন। দেখতে পেলেও ততটা ভয় হয় না। কিন্তু রাত্রে তাদের যন্ত্রণার চেহারা, বীভৎস চেহারা দেখে রক্ত হিম হয়ে আসে। রাত্রে দিদি একা থাকতে পারেন না। কাউকে না কাউকে কাছে শুতে হবে।

সাধুর সঙ্গে ভূতের ও ভগবানের একটা সম্পর্ক আছে। দুজনেই সাধুর কাছে আসেন। রাত যত গম্ভীর হয় দুজনকেই তত বেশি অনুভব করা যায়। যেমন ভূতেরা আসত তেমনি সাধুদিদির ঠাকুরও রাত্রে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে নানা কথা বলে যেতেন। সাধুদিদির বিগ্রহের নাম নাগাবাবা। বিঘতপ্রমাণ একটি ধাতুর মূর্তি, সোনার মুকুট পরানো। আদর করে অনেকে, ছেলেপুলের মতো, ঠাকুরদেরও নামকরণ করে যেমন রুবীর, বেঙ্কটেশ্বর, মদনমোহন, রামলালা তেমনি এই বিষ্ণুমূর্তিটির নাম কেউ দিয়েছিল নাগাবাবা। নাগাবাবা দিদির সঙ্গে ঢাকা জেলার ভাষায় কথা বলতেন। এবং উচ্চমার্গের কথা না বলে সংসারী কথাই বেশি বলতেন। যেমন দিদিমার মুখে অনেক বার শুনেছি, আমার মার বিয়ের পর, বিয়েটা কেমন হয়েছে জিজ্ঞেস করায় নাগাবাবা গম্ভীর হয়ে এক কথায় বলেছিলেন– 'ছালির বিয়া'। অর্থাৎ বিয়ে না ছাই!

ভূতেদের নানারকম বিকট মূর্তি: কখনো তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো অসহায়, কখনো স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যে লোলুপ, বাসনাব্যাকুল, কখনো জলছবির মতো নিষ্প্রাণ, দ্বিমাত্রিক, ভয়ংকর এইসব প্রেতের কথা দিদির কাছে শুনে এসে দিদিমা বন্ধুমহলে বলতেন।

অনেক দিন পরে কয়লা ঘুঁটে কাঠ রাখা, আবর্জনায় ভরা ঘরটা পরিষ্কার করা হচ্ছিল। হঠাৎ সেখান থেকে বীভৎস দুটো প্রেত বেরিয়ে এল। একজনের নাকে মোষের নাকের মতো বড় ঘেঁদা, তাতে দড়ি পরানো। আরেকজনের পেটে একটা ঘা, সেই ঘায়ের গর্ত দিয়ে তার নাড়িভুড়ি বাইরে ঝুলে পড়েছে, সে দু হাত দিয়ে সেগুলো ধরে আছে। বেরিয়ে এসে তারা পায়খানার দিকে ছুটে পালাল। তখন বেলা দশটা এগারোটা। দিদি তাদের দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। কিন্তু উনি যাদের দেখেন আমরা কেউ তাদের দেখতে পাই না।

একদিন সেই লোকাল বোর্ডের পাশের বড়-বড়-গাছে-ঝুপসি পথে বেড়িয়ে এসে বললেন- ‘আগো ঝুনুর মা, ঐ আন্ধার পথে আর না যাওনই ভালো। ঐ গাছগুলানে কতগুলা ভূত থাকে। মাইয়ামানুষ দেখলে তারা ফাল দেয়, বিয়া করতে চায়’। আজ এখানটা লিখতে লিখতে আমার হাসি পাচ্ছে। গাছের উপরে ওগুলো সত্যিকারেরই ভূত ছিল নইলে প্রৌঢ়ত্ব পেরোনো, স্থূলাঙ্গী, বাতের ব্যথায় কাতর, ঘোমটা পরা ঐ পুরন্ধ্রীদের কেউ বিয়ে করতে চায়!

এক একটা সময়ে দিদির এই ক্ষমতাটা খুব বেড়ে যেত। স্থানে অস্থানে আত্মাদের দেখতে পেতেন। একদিন একটা কালভার্টের নিচে কাঁচা ড্রেনের নোংরা পাঁকজলে বিকেলে গোঁ গোঁ শব্দ শুনে দেখেন, সেখানে আধমরা মাছের মতো খাবি খাচ্ছে কতগুলো আত্মা। কী অসহ্য কষ্ট তাদের! দিদিমার মুখে ঐ কথা শুনে আমি পরের দিন বিকেলে ভয়ে ভয়ে ঐ কালভার্টের কাছে গেলাম। থিতিয়ে যাওয়া পাঁকের উপরে কালো শ্যাওলা, আর শ্যাওলার উপর দিয়ে তিরতির করে আধ ইঞ্চি জল বয়ে চলেছে। কাছে একটা ছোট শিমুল গাছে তিনটে কাক রোদ পোয়াচ্ছে। তাদের নুড়ির মতো ন্যাড়া মাথা থেকে বাঁকা ছুরির মতো ঠোঁট বেরিয়ে আছে।

রাত্তিরে আরও নানা রকম দুষ্ট আত্মা আসে। ভয়ে তরাসে দিদি ঘুমোত পারেন না। তাহলে জেগে জেগে জপ করাই ভালো।

পরিণত বয়সে দিদির স্বামী মারা গেলেন। নিরাভরণ নিভৃত নিরাসক্ত মানুষটি কোনো রোগে ভোগেন নি, কাউকে কষ্ট দেন নি। বাড়িটিতে শুধু যেন একটু শীতের বাতাস বয়ে গেল উঠোনের পেয়ারা গাছের কিছু পাতা ঝরে পড়ল, এক মহিলার পাকা চুল থেকে সিঁদুরচিহ্ন মুছে নিল, তার শাড়ির পাড়টিকে সাদা করে দিয়ে হাওয়াটুকু চলে গেল।

কর্তা মারা যাবার পরে দিদি তাঁর বড় ছেলের কাছে চলে গেলেন। বাড়িটা জনহীন ফাঁকা পড়ে রইল। বাড়ির সদর দরজা খোলা। বড় ঘরের দরজায় শুধু একটি পলকা তালা লাগানো। কি মনে করে আমি একদিন শেষবিকেলে সেই বাড়িতে ঢুকলাম। কী মলিন বাড়ি। বাড়ির উপরের টুকরো আকাশটুকু পর্যন্ত বিবর্ণ হয়ে আছে। ঘরগুলো যেন পোড়া ফানুসের মতো বেঁকে তুবড়ে কালো হয়ে আছে। হঠাৎ মনে পড়ল এই বাড়ির আনাচেকানাচে সর্বত্র তো ভূতের বাসা। আর দাঁড়ায় কেউ সেখানে!

এর পরেরটুকু অর্থাৎ দিদির বাকি কাহিনীটা এখানেই বলে নিই। দিদির সঙ্গে তাঁর পুত্রবধূর বনল না। অতএব তিনি ফিরে এলেন। শরৎকালের দুর্গোৎসবে নাতিনাতনী ছেলেমেয়ে পাড়াপ্রতিবেশী নিয়ে আবার ঝলমল করে উঠল বাড়িটা। কিন্তু সময়ের ক্ষয় একবার শুরু হলে আর তাকে আটকানো যায় না। পুজোর পরে ছেলেমেয়েরা সবাই তো আবার ফিরে যাবে, একা মাকে কে দেখবে এখানে। সুতরাং এবার প্রবাসী ছোটছেলে তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে যাবে। ছোটছেলের নাম ইন্দু- কি রকম ইন্দু সেটা বোঝাতে মা তার ডাকনাম রেখেছিলেন ‘কালাচাঁদ।

কালাচাঁদমামা একজন অসাধারণ মানুষ। আত্মীয় অনাত্মীয়, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, বালক বালিকা সকলের কাছ থেকে এত অঝোর ধারায় স্নেহ টেনে নিতে তাঁর মতো কাউকে দেখি নি। চল্লিশের কোঠায় বয়স, চিরকুমার, নিরামিষাশী, পেটানো শরীর, আড়াই মন

ওজন, ভাগনে ব্যায়ামবীর জলিদাকে একদিন হাসতে হাসতে আমাদের সামনে তুলে আছাড় দিয়েছিলেন।

কালাচাঁদমামার চকচকে চোখ, একমাথা কালো কোঁকড়া চুল। জলের পাইপের মতো মোটা পার্কার ফোন্ডে বিচারের রায় লেখেন। কোর্টের বাইরে ধুতি আর পাঞ্জাবিই তাঁর পোশাক। একসঙ্গে এক ডজন পাঞ্জাবি আর দু ডজন রুমাল বানিয়ে নেন, কেননা নস্যির গুঁড়ো পড়ে সারা দিন তাঁর জামা নষ্ট হতে থাকে। আসলে ডজন হিসেবে জিনিস কেনা তাঁর বাতিক। এক গ্রোস দেশলাই, এক কার্টন কাঁচি সিগারেট, ছটা টুথ ব্রাশ, ছটা নিম টুথ পেস্ট, এক ডজন সাবান, তিনটে নস্যির কৌটো বিরাট একটা কালো ট্রাংকে তাঁর ভাঁড়ার। কিন্তু সেটা খোলাই পড়ে থাকে। তাঁর মিষ্টি খাবার ব্যাপারটাও ঐ রকম। জীবনের শেষ দিকে, যখন কলকাতায় ছিলেন, সকালে টালিগঞ্জ থেকে বেরিয়ে প্রথমে রাসবিহারীর মোড়ে নামতেন, হাসিহাসি চোখে বলতেন- ‘চলো নেফিউ, জলযোগে একটু পয়োধি সেবন করে আসি। পয়োধি হল। তার পর ভবানীপুরে দ্বারিকে রসগোল্লা, ভীম নাগে সন্দেশ। তার পর এসপ্ল্যানেডে কে সি দাসের রসমালাই। তার পর আর ব্রেক জানি নয়, সোজা কলেজ স্ট্রীট– পুঁটিরাম। বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেলা দুটো।

কালাচাঁদমামা পেংগুইনের বই কিনতেন একসঙ্গে তিনখানা করে। তখন পেংগুইন ছ আনা করে, কিন্তু একসঙ্গে তিনখানা এক টাকা। দি অ্যাডভেঞ্চারস অব দ্য ব্ল্যাক গার্ল ইন হার সার্চ ফর গড-এর ছবিওয়ালা শক্ত মলাটের সংস্করণ আমি তাঁর কাছেই প্রথম দেখি। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা- তিনটে পত্রিকারই তিনি গ্রাহক। বছরের শেষে সেট করে বাঁধিয়ে রাখতেন। ঐ পত্রিকাগুলিতে কত যে লেখকের লেখা পড়েছি। রামপদ মুখোপাধ্যায়, পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুবোধ বসু, নীরদরঞ্জন দাশগুপ্তের কথা কি কেউ মনে রেখেছে আজ। সুবোধ বসুর হাসির নাটক ‘কলেবর’ এবং মিষ্টি উপন্যাস ‘মানবের শত্রু নারী’ এত দিন পরেও মনে পড়ে। তার সঙ্গে জড়িয়ে ষাট বছর আগেকার সময়টাও মনে পড়ে। ১৯৩৮ সালে শরৎচন্দ্র হঠাৎ মারা গেলেন। যকৃতে ক্যানসার হয়েছিল। তাঁর শেষ দিকের অনেক

কথাবার্তা, টুকরোটাকরা চিঠি, ঘনিষ্ঠ খবরাখবর তখনকার ভারতবর্ষ আর বিচিত্রায় ছাপা হয়েছিল।

কালাচাঁদমামার একটি চোঙওয়ালা গ্রামোফোন ছিল। সেই গ্রামোফোনে দিলীপ রায় উমা বসুর সমস্ত গান, সাবিত্রীদেবী কৃষ্ণাণের গান, স্বামী সত্যানন্দের গান, হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গান যতবার ইচ্ছে শুনেছি। জীবনের গোড়ার দিকের এইসব সঙ্গ ও আনন্দের জন্য আমি এই জন্মের কাছে, এই মানুষদের কাছে ঋণী।

যে সময়টার কথা বলছিলাম সে সময় দিদি বরিশাল শহরে তাঁর কালাচানের কাছে থাকছেন। গরমের ছুটিতে বাড়ি যাবার পথে আমিও সেখানে কদিন কাটালাম। এখানে দিদিকে দেখলাম একটু বদলেছেন। ব্যক্তিত্ব আরও স্পষ্ট। আগের মতো ভূতের ভয় নেই। ধবধবে বিছানার পাশের সাদা দেয়ালটি পেনসিলের ছোট ছোট দাঁড়িতে ভীষ্মের শরশয্যা হয়ে আছে। জপ যতবার হাজার সংখ্যা পূর্ণ হয় ততবার দেয়ালে একটি করে দাঁড়ি টানেন। এই চলেছে দিনরাত। তাঁর বিছানায় কেউ বসবে না, তাঁর গদিমোড়া কৌচ কেউ ছোঁবে না। ঠাকুরমশায় খাঁটি ঘি ছড়িয়ে অতি সুঘ্রাণ নিরিমিষ রাঁধেন। নিত্য ভোগ হয়। নাগাবাবা এখানেই আছেন। দিদিমা মাসিমাও এখানে এসে কিছুদিন দিদির পরিচর্যা করে গেছেন।

কিন্তু নাগাবাবার এত সুখ সহ্য হল না। কালাচাঁদমামার অকালে মৃত্যু হল। পুত্রশোকাতুর রোগজীর্ণ বৃদ্ধাকে কাছাড়ের চা-বাগানে বড় মেয়ের কাছে আশ্রয় নিতে হল। সেখান থেকে দিদিমাকে চিঠি লিখতেন।

রোগ এক রকমের তপস্যা। দুঃখও এক রকমের তপস্যা। এতদিন রোগে যা হয় নি এবার পুত্রশোকে তাই হল– বৃদ্ধা রানীর মতো মহিলা পুত্রশোকে দীনভিখারির মতো হয়ে গিয়েছিলেন।

দিদি তো প্রথম থেকেই খুব জপ করতেন। দিনরাত জপতে জপতে ভক্তের হাড়ে ইষ্টের নাম ছাপা হয়ে যায়। পুত্রশোকও নাকি হাড়ের গায়ে ছেলের নাম লিখে যায়। মৃত্যুর আগে

দিদির জীর্ণ হাড়গুলি এইভাবে আরও জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাদের সারা গায়ে শুধু দুটি নাম ব্রেইলের অন্ধ ঘুচে কুঁড়ে কুঁড়ে লক্ষ বার লেখা।

নাগাবাবা দিদিকে কারো কারো পূর্বজন্মের কথা বলে দিতেন। একটি নাতনী সম্বন্ধে বলেছিলেন ও আছিল হাউদা গোয়ালনী অর্থাৎ বোকা গোয়ালিনী। ঐ কিশোর বয়সে ব্যাপারটা আমার কাছে রোমাঞ্চকর লেগেছিল। ঐ মেয়েটা সেই কৃষ্ণের সময়কার গোকুল বৃন্দাবনে জন্মেছিল বোকাসোকা হলেও গোপীদের একজন ছিল? পুরাণের আমল থেকে জন্মাতে জন্মাতে এত দূর পর্যন্ত এসেছে!

পরে, যখন সে বড় হল, যুবতী হল, আমি ভালো করেই বুঝেছিলাম, জীবনের কতগুলো বাস্তব চরিতার্থতার ব্যাপারে সে এজন্মেও বোকা রয়ে গেছে, কিন্তু জন্মান্তরের সূত্রে তার চরিত্রে আছে পৌরাণিক নায়িকার সবলতা, আকর্ষণী শক্তি এবং কর্মকুশলতা। আধুনিকতা এবং পৌরাণিকতা, ঈশ্বরভক্তি এবং অভিসারিকাভাব তার স্বভাবে অদম্য হয়ে কাজ করত। দুঃখী এবং অশক্ত আত্মীয়স্বজনের ভরসা এবং ছিটকে যাওয়া স্বার্থপর আপনজনদের যোগসূত্র ছিল সে। তার অকালমৃত্যুর পরে ঐ পরিবারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ চিরতরে ছিন্ন হয়ে গেল।

.

উদয়াস্ত

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

এই দুই ছত্র গান সূর্যের উদয়ের আগে শুরু হয়ে অবিচ্ছেদে চলে গিয়ে শেষ হবে সূর্যাস্তের পরে। এই হল উদয়াস্ত কীর্তন। সাধুদিদির বাড়িতে প্রত্যেক বছর উদয়াস্ত হয়। দেখাদেখি দিদিমাও নিজের বাড়িতে সেটি চালু করলেন। নির্মেঘ নাতিশীতোষ্ণ সময়ের একটি সাধারণ

ছুটির দিন ধার্য করা হল। আমাদের বারবাড়িটি ফাঁকা করে মেঝেয় শতরঞ্জি বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। শেষরাতের প্রায়ান্ধকার ঘরে আশপাশের কয়েকজন খোল করতাল নিয়ে গান শুরু করল। দুটো লণ্ঠনে ঘরে একটু আলো হয়েছে। ঐ শেষরাতে কোথায় আর তেমন গাইয়ে পাওয়া যাবে আমাদের ফুটবলের রাইট আউট, গোসাঁইপ্রভুর শিষ্য, তেরো-চোদ্দ বছরের রাধারমণ দাস, ডাকনাম রাধে, মূল-গায়েন হল। খোল টেনে নিয়ে গৌরচন্দ্রিকা, বন্দনা শেষ করে সে-ই হরে কৃষ্ণ ধরল। রাধের গানের গলা এবং খোলের হাত দুটোই মধুর। কিন্তু ঐ সকালে তার দোহারদের বেশির ভাগেরই বসা গলা, ধরা গলা, ভাঙা গলা। অবস্থা দেখে গোপালমামা এক ডজন কাপ আর বড় কেতলি ভরে গরম চা নিয়ে এল। ক্রমশ আলো ফুটল, আম গাছে ভোরের পাখি ডাকল, লণ্ঠন নিবিয়ে দেওয়া হল, হরে কৃষ্ণ চলতে থাকল।

এসব উৎসবে সেভাবে কাউকে নিমন্ত্রণ করা হয় না। তবু খবর ছড়িয়ে যায়। ভক্তের দায় ভগবান নির্বাহ করেন। ক্রমশ ভরাট গলার নতুন নতুন কীর্তনীয়া এসে জোটে। তারাই উঠোনের পাশে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ধুনি জ্বালায়। গোপালমামা আবার কেতলি ভরা চা আর চৌকো করে কাটা হালুয়া আনে। গায়করাই আরও খোল করতাল জুটিয়ে আনে। বাড়ি ভরে ক্রমশ চেনা লোকদের সঙ্গে অচেনা লোকের দল মিশে গিয়ে খাটে, খায়, গান গায় উৎসবে মাতে। বেলা বাড়ছে, এখন গান আবার স্তিমিত হয়ে যাবে। সকালের কীর্তনীয়ারা যে যার বাড়িতে গিয়ে স্নানটান করে পেটে খিদে নিয়ে ফিরে আসবে।

গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত পাড়ার মহিলারা উঠোনে বসে গল্প করেছেন আর বঁটি পেতে ঝুড়ি ঝুড়ি তরকারি কুটেছেন। আজ উঠোনে পাশাপাশি তিন-চারটে নতুন উনুন পেতে, একটুখানি ত্রিপল টাঙিয়ে বড় বড় হাঁড়ায় বৈষ্ণবসেব্য খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। খিচুড়ি নামলে পাঁচমিশুলি তরকারি চাপবে। খটখটে পরিচ্ছন্ন উঠোনের একদিকে একটু ছায়া পড়েছে। এই ছায়া আরও ছড়িয়ে যাবে। সেখানে আসন কলাপাতা বিছিয়ে পংক্তিভোজন

দুপুরে কীর্তন ঝিমিয়ে এল। এক দল খেতে আসে তো অন্য দল কীর্তন চালু রাখে। এরা খেয়ে ফিরে গেলে আবার ওরা আসবে খেতে। কিন্তু পেট ভরে খাওয়ার পরে একটু ভাতঘুম পায়, একটু বিড়িতামাকের নেশা পায়। অতএব তখন গান চলে গ্রীষ্মের হাওয়ায় চলন্ত শুকনো পাতার শব্দের মতো পাতারা যেন হাই তুলতে তুলতে ফিসফাস গুজগুজ গল্প করছে বা চলে যাচ্ছে।

কিন্তু বিকেল পড়তে না পড়তে নতুন নতুন শক্তিশালী লোক এসে যোগ দিতে থাকে, ঝিমিয়ে পড়ারা চাঙ্গা হয়ে ফিরে আসে। পুরো কীর্তনের দলটি ঘর থেকে নেমে আসে উঠোনে। সকালবেলা রাধে একটু ঘুমভাঙা ভোরাই সুর দিয়েছিল, তার পর থেকে সারা দিন একঘেয়ে ঝালাপালা চলছে। এবার কয়েকজন গাইয়ে পূরবী, পুরিয়া, মুলতান, ইমন-এ গেয়ে বেশ মাধুর্য আনলেন। কীর্তনীয়াদের গলা যাতে শুকিয়ে না যায় তাই লবঙ্গ দিয়ে গাঁথা খিলি খিলি পান সারা দিন ধুচুনি ভরে এসেছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসে। জোরালো বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। শহরের এবং শহরতলির ডাকসাইটে ভক্তেরা এসে যেন কীর্তনটিকে অধিগ্রহণ করেন। তখন আর কেউ বসে নেই, সবাই গোল হয়ে মণ্ডলী করে ঘুরে ঘুরে গাইছে, লাফিয়ে লাফিয়ে খোল বাজাচ্ছে, মধ্যিখানে জনা দুই উদ্দাম নৃত্য করছেন। তাঁদের পরিপুষ্ট ভোলা গা ঘামে ভেসে যাচ্ছে। নাচতে নাচতে অবধারিতভাবে একজনের ভাব হবে তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে কীর্তনীয়াদের পায়ে পায়ে মসৃণ উঠোনের মাটিতে পড়ে গড়াতে থাকবেন। কীর্তনীয়ারা সরে সরে তাঁকে গড়াবার জায়গা করে দেবে। ইতিমধ্যে আরেকজনেরও ভাব হবে। তিনিও মাটিতে পড়ে গড়াতে থাকবেন। কীর্তন উদ্দাম হয়ে উঠবে।

একবার এক ভক্ত, আমার মনে আছে, ঐ রকম গড়াতে গড়াতে ধুনির উপর দিয়ে চলে গেলেন। সবাই হা হা করে উঠল। কিন্তু অমন ভাবে পাওয়া মানুষকে ছুঁতে নেই, আর ভাবগ্রস্ত মানুষটিরও চেতনা ফিরতে নেই। অতএব তিনি দ্বিতীয় বার পিঠ পুড়িয়ে, উলটো পাকে গড়িয়ে গড়িয়ে আবার ধুনিটা পেরিয়ে এলেন। এই নিয়ে পরে যুবকমহলে হাসাহাসি হয়েছিল।

এক সময় বাতাসার লুট হয়। ভাবে আপ্লুত হয়ে ভক্তেরা এ ওকে প্রণাম করে। এই শেষ পর্যায়ে এসে কীর্তন একটা চূড়ায় পৌঁছত। আসলে পুরুষদের গান তো, শেষ পর্যন্ত বীররস দেখা দেবেই। গায়কেরা গাইতে গাইতে হুংকার দিত, আকাশে লাফ দিত। অবশেষে বার তিনেক বিলম্বিত লয়ে গাওয়ার পর আচম্বিতে সেই গান থামত। এত উচ্চ নিনাদের পর হঠাৎ সব নীরব, শুনশান। আমাদের কান ভোঁ ভোঁ করছে। একটু একটু চাঁদ উঠেছে। মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে। আড়াই শো তিন শো মানুষের প্রসাদ পাওয়া হয়েছে, উদয়াস্তের মধ্যে মুহূর্তের জন্যেও গানে ছেদ পড়ে নি। সবাই খুশি। দিদিমার মুখে সৌভাগ্যবতীর ও বিজয়িনীর হাসি। অন্তঃপুর থেকে তিনি একাই প্রায় সমস্তটা পরিচালনা করেছেন। গোপালমামা তাঁর লেফটেন্যান্ট।

.

বাটঠি মৌলবী

নরসিংহ স্কুলের মুসলমান হস্টেল আমাদের পাড়ার গা ঘেঁষে। মাটির ভিতের লম্বা ব্যারাক ছ-সাতটা কামরায় ভাগ করা। রসুইঘরটি আলাদা, সেখানেই ছেলেরা মাটিতে বসে ভাত খায়। ইস্কুলের আরবী ফারসীর মৌলবী হলেন হস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট। প্রথম ঘরটিতে তিনি তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে থাকেন। বাকি ঘরগুলোয় আছে দশ-বারোজন মুসলমান ও একজন খ্রীষ্টান ছাত্র। সবাই একান্নবর্তী। সপ্তাহে একদিন দুটি করে মুরগি জবাই হয়। সন্ধেবেলা তাদের গলায় ছুরির পোচ দিয়ে ছেড়ে দিলে যন্ত্রণায় তারা রসুইখানার পিছনে অন্ধকার ঝোপের মধ্যে পালিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড ঝটাপটি করে থেমে যায়।

পাড়ায় মৌলবীসাহেবের অবস্থানটি বেশ অদ্ভুত। স্কুলের ছাত্রেরা ও পাড়ার ছেলে বুড়ো তরুণী সবাই তাঁকে বাটঠি মৌলবী অর্থাৎ বেঁটে মৌলবী বলে উল্লেখ করেন। প্রাচীন ইট্রাসকান পুরুষের মতো তাঁর চওড়া, চ্যাপটা, মোটা ঘাড়। গোঁফ কামানো, কালো কুচকুচে

আবক্ষ দাড়ি, চোখে সুর্মা। লুঙ্গি বা পায়জামার উপরে আলখাল্লার মতো ঢিলে লম্বা পিরান পরেন তিনি। তাছাড়া, স্কুলে যাবার সময় মাথায় ফেজ, অন্য সময়ে সাদা মলমলের টুপি।

মৌলবীসাহেব কারো সঙ্গে কথা বলেন না, কারো ভালোমন্দের খোঁজ নেন না। কী কথাই বা বলবেন! স্কুলে একদল হিন্দু সহকর্মী, পাড়ায় একগাদা হিন্দু প্রতিবেশী। এদের সঙ্গে কি নিয়ে কথা বলবেন তিনি? তাঁর পাঁচ-ছটি পুত্র দুটি দুটি করে তারা বাবার কাছে থেকে মানুষ হয়, তার পরে বৃহৎ সংসারে বেরিয়ে পড়ে। মুসলমান এবং ইহুদী অর্থাৎ প্রাচীন সেমেটিক জগতের দু দিক মিলিয়ে তিনি ছেলেদের নাম রেখেছেন ইব্রাহিম, ইসাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, ইসমাইল অর্থাৎ আব্রাহাম, আইজাক, জেকব, জোসেফ, মাইকেল...। এসব কে বোঝে! ইয়াকুব ও ইউসুফ আমার বন্ধু ছিল- দুজনই দেখতে ভালো, ফরসা, দৃঢ়স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্ন। তারাও নিজেদের নামের পিছনে এত যে কুদরত তা কিছুই জানত না। আমি তো জানতামই না।

রোজ একটা সময়ে মৌলবীসাহেবকে পাড়ার সবাই দেখতে পায়। প্রাতঃকৃত্যের পর মাথায় আরব শেখদের স্টাইলে গামছা ফেলে, লুঙ্গি পিরান পরে মিউনিসিপালিটির পুকুরে স্নান করতে চলেছেন। পাড়ায় যেমন কালোশশীমাসির বাবা রমণীদাদু আছেন, সাধ্যবাড়ির কর্তা আছেন, আমার দাদু আছেন, তেমনি বাটুঠি মৌলবীও আছেন। এইভাবেই চলছিল।

কিন্তু রাধারঞ্জন ডাক্তারের সাত বছরের ছেলেটি ছিল ছিটগ্রস্ত, সে যে কখন কি ভাবে, কখন কি করে বসে ঠিক নেই। বাটঠি মৌলবীর গাম্ভীর্য, ভিনদেশী হালচাল তার পছন্দ হয় নি। সে তক্কে তক্কে ছিল। একদিন যখন মৌলবীসাহেব পুকুরে যাচ্ছিলেন সে পিছন থেকে গিয়ে আচমকা তাঁর লুঙ্গিটি তুলে ধরল। দিবালোকে এই রকম বেইজ্জত! মৌলবী খেপে গেলেন। পাড়াতে বিরাট হৈ চৈ এবং অল্পবয়সীদের মধ্যে হাসাহাসি। যা হোক, সাত বছরের বালক শাস্তিযোগ্য নয়- এই কথা বিবেচনা করে মৌলবীসাহেব শেষে শান্ত হলেন। কয়েকদিন পরে, যেমন পুকুরে যাচ্ছিলেন তেমনি যেতে লাগলেন। পাড়ার সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

.

কুঞ্জলতা

আর্যপট্টি থেকে একদিন শীতের বিকেলবেলা কুঞ্জলতা এল। অন্দরের দিকে না গিয়ে আমার পড়ার ঘরে চুপি চুপি অপ্রস্তুত মুখে এসে দাঁড়াল। কুঞ্জদিদি আমার চেনা, কিন্তু কোনোদিন তাকে তেমন লক্ষ করে দেখি নি। দিদিমাদের আলগা কথাবার্তার মধ্যে শুনেছিলাম, তার দু-তিন বছর হল বিয়ে হয়েছে, কিন্তু বর তাকে নেয় না। সে দাদা বৌদির আশ্রয়ে থাকে। কিন্তু তার দুঃখ-সুখের খবর আমি কী জানি। আজ দেখলাম, শীতের কুঞ্জলতার মতোই তার চেহারা ময়লা শাড়ি, রুক্ষ ত্বকে আঁচড় কাটলে দেহে হরেকৃষ্ণ লেখা যাবে, ঘন চুলের শ্যাম চিরল চিরল পাতা এখন শুকিয়ে গিয়ে পাঁশুটে হয়েছে।

কুঞ্জদিদি আঁচলের আড়াল থেকে একটি পোস্টকার্ড বের করে সলজ্জ মুখে নিজের ভাষায় যা বলল তার নির্গলিতার্থ হল- অনেকদিন সে ভাইয়ের বাড়িতে পড়ে আছে। তার খুব দুঃখ। এই পোস্টকার্ডে তার স্বামীকে একটি চিঠি লিখে দিতে হবে যাতে সে অবিলম্বে এসে তাকে নিয়ে যায়। এ রকম চিঠি লেখার অভ্যাস আমার আছে। ছুটির দিনে দিদিমা প্রায়ই রাঁধতে রাঁধতে তাঁর ভাই বোন আর গুরুদেবের চিঠি ডিক্টেট করেন আর আমি তলিপির মতো হুবহু তাই লিখি। অতএব আমি সেই কায়দায় কুঞ্জদিদির দিকে তাকিয়ে বললাম- বলো। কুঞ্জদিদি থতমত খেয়ে বলল- তুই লেখ। অগত্যা আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে লিখলাম, শ্রীচরণকমলেষু। লিখেই মনে হল, পরমারাধ্য পূজ্যপাদ লিখলে বোধ হয় আরও ভালো হত। যাক গে। আমি আবার কুঞ্জদিদির দিকে তাকালাম- হ্যাঁ, তার পর বলো। কুঞ্জলতা বেপরোয়াভাবে বলল- লিখ্যা দে, আইত্যো বুইল্যা। অর্থাৎ লিখে দে, যেন সে আসে। আমি একটু থমকে গিয়ে প্রায় দোভাষীর মতো লিখলাম, আপনি আসিবেন।—হুঁ, তার পর বলো। কুঞ্জলতা অধৈর্যভরে বলল– আরে তুই লিখ্যা দে না, আইত্যো বুইল্যা। আসলে ঐ একটিই তো তার জরুরি কথা, হৃদয়ের আর্তি। আমি আবার লিখলাম, আপনি অবশ্য ২ আসিবেন। চিঠি শেষ। এর পর নিচে শুধু সেবিকা কুঞ্জলতা। চিঠির মাথায় কুঞ্জলতা বর্ধনের দাদার নাম, ঠিকানা ও তারিখ লেখা হল। উলটো পিঠে

স্বামীর নাম ঠিকানা টোকা হলে আমাদের পত্ররচনা শেষ হল। এবং শেষ হওয়ামাত্র কুঞ্জদিদি চিঠিটি আঁচলের তলায় লুকিয়ে ফেলল। সুযোগ খুঁজে সে নিজেই ডাকে দেবে।

মাস দুয়েক অপেক্ষার পর কুঞ্জদিদি আবার একদিন বিকেলে এল। আবার সেই একই চিঠি একই প্রণালীতে লেখা হল। তখন বসন্তকাল। শীত নেই বলে এবার তার গায়ে খড়ি উড়ছে না। এছাড়া কোনো পরিবর্তন নেই। একই চিঠি নিয়ে দুটি ঋতু চলে গেল, কিন্তু কুঞ্জদিদির স্বামী এল না। স্বামী না আসায় কুঞ্জদিদি বোধ হয় আমাকেই অকর্মা এবং অপয়া ভেবেছিল। এর পর আর দেখা হলেও সে কথা বলে নি।

ধীরে ধীরে তার চেহারা আরও মলিন হয়েছে, একলা এখানে সেখানে যেন সে কিছু খুঁজে বেড়ায়। সারসীর মতো কুৎসিত পা, উঁচু কপাল, রোগা লম্বা গলা, তেমনি থমকে থমকে চলা তাকে লোকালয়ের চেয়ে নদীতীরেই বেশি মানায়। ক্রমশ সে আর মানুষের চোখে পড়ে না।

.

নাটাই মঙ্গলচণ্ডী এবং সংকটতারিণী

সৌভাগ্যবতী হবার জন্য দিদিমা আরও যেসব ধর্মাচরণ করতেন তার মধ্যে নাটাই মঙ্গলচণ্ডী আর সংকটতারিণী ব্রত দুটি বেশ কৌতুককর। সন্ধে পেরনো রাত নাটাই মঙ্গলচণ্ডীর সময়। দেবীর মূল প্রসাদ হল চালের পিটুলি। সেই পিটুলিটুকুতে যেন আলো না লাগে অন্ধকারে নিতে হয়, ঘুটঘুঁটে অন্ধকারে গিয়ে মনস্কামনা জানিয়ে খেতে হয়। বারান্দায় পুজো হত। আমি আমার পিটুলিটুকু নিয়ে বড়ঘরের পিছনে আম গাছের ঘুটঘুটি অন্ধকারের নিচে গিয়ে দাঁড়াতাম। এখন তো দাদু ঠাকুমা কাকা কেউ নেই, তাদের জন্য কিছু চাইবারও নেই। সুতরাং কিছু একটা চেয়ে, নাটাই মঙ্গলচণ্ডী বা অন্ধকারের কানে কানে সেই কথা জানিয়ে সেই স্বাদহীন পিটুলি খেয়ে মাথায় হাত মুছে ফিরে আসা।

সংকটতারিণী ব্বত ছিল সত্যিকারের মজার, আমার পক্ষেও, দিদিমা মাসিমার পক্ষেও। এটি হত শীতের দিনে, দুপুরবেলায়, হেঁশেলে, যখন বাড়ির কর্তারা অনুপস্থিত। ব্রতটির নিয়ম খুব সরল। কোনো পুজোআচ্চার ঝঞ্ঝাট নেই। প্রত্যেক ব্রতধারিণীর জন্য এর উপকরণ হল: ১৬ মুঠো চালের ভাত, ১৬ টুকরো পাকা রুই ও ১৬ টুকরো ফুলকপির ঝোল। শেষপাতে ১৬ হাতা দুধ আর ১৬টি পাকা কলা। স্নানটান করে এই ভাত এবং মাছের ঝোল যার যার হাঁড়ি কড়ায় নিজের হাতে বেঁধে পুরো পাত্রসুদ্ধ সাজিয়ে নিয়ে খেতে বসতে হবে। পিঁড়িতে বসে ব্রতকথাটি, অর্থাৎ আধ ঘণ্টার একটি লম্বা গল্প, প্রথমে বলে নিয়ে তার পর খাওয়া শুরু। আমার মনে হত, এই খাওয়াটাই আসল ব্রত।

মাসিমার খাওয়ার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই। সুতরাং খুব ছোট ছোট মুঠোয় সে চাল নিত। কপি আর মাছ ছোট ছোট টুকরো করত। দিদিমা ওসব ফাঁকিবাজিতে নেই। চুপচাপ দুপুরবেলা যার যার হাঁড়িভরা ভাত, জামবাটিভরা মাছের ঝোল, দুধ, কলা ইত্যাদি নিয়ে পাশাপাশি বসতেন। দিদিমা গল্পটি বলতেন। গল্পটি আর কিছু নয়, কি করে এক মহিলা এই ব্রত করে ভয়ংকর সব বিপদ পেরিয়েছিলেন। মাসিমা শুনত, দরজার বাইরে বসে আমিও শুনতাম, কারণ এই ব্যাপারে শেষটায় আমারও একটি মোক্ষম ভূমিকা থাকবে।

ব্রতকথা শেষ হলে খাওয়া শুরু হল। এই খাওয়ার তিনটি নিয়ম আছে: খাবার সময় কথা বলা চলবে না। শুধু মাছের কাঁটা ও কলার খোসা ছাড়া ভাত বা তরকারির একটি দানাও অবশিষ্ট থাকবে না। উবু হয়ে বসে ডান হাতটি ডান পা ও জানুর ফাঁক দিয়ে গলিয়ে ভাত মাখতে হবে এবং ঐভাবেই মুখে গ্রাস তুলতে হবে। খাওয়া শেষ হলেও হাতটি ঐ পায়ের ভাঁজের মধ্য থেকে বার করা চলবে না, কথা বলাও নিষেধ, যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য এক ব্যক্তি ব্বতিনীদের 'সংকটে পার হও, সংকটে পার হও, সংকটে পার হও' বলে সংকটমুক্ত করে দিচ্ছে। এইটে করার জন্যই বুঝিয়েসুঝিয়ে আমাকে ঐখানে মোতায়েন রাখা। ইশারা করার পরও আমি গড়িমসি করতাম। প্রত্যেক বারই দারুণ ইচ্ছে হত ঐ দুই টুঈডলডাম আর টুঈডলডিকে অনন্তকাল ধরে ঐ ভঙ্গিতে বসিয়ে রাখি। কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে ওঁদের পার করে দিতাম।

.

নাগাদের কথা

জায়গাটা আসলে উপনিবেশ। ভূমিপুত্র কেউ নেই। শহরটি ছোট, কিন্তু রাস্তাঘাট মসৃণ, সাইকেলে আধ বেলাতেই প্রদক্ষিণ করে আসা যায়। শহরের কেন্দ্রটুকু ছাড়িয়ে গেলেই জনবসতি ক্রমশ হালকা। আদিতে এখানে যারা ছিল তারা কোথায় গেছে কে জানে। নতুন করে, তিন রকমের লোক এখানে এসে বাসা বেঁধেছে। প্রথম দলে আছে সিলেট আর পুর্ববাংলার বাঙালিরা। দ্বিতীয় দলে আছে কিছু মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর লোক- নাগা, মিজো, মেইতেই, গোর্খা, খাসি। তৃতীয় দলে আছে অতি অল্প পরিমাণে ইউরোপয়েড।

নানা কারণে নাগারা আমার মনকে টানত। নাগারা টিবেটো-বার্মিজ গোষ্ঠীর লোক। আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তে পাহাড়-জঙ্গলে তাদের কত কালের দুর্ভেদ্য দেশ! তারা নৃমুণ্ডশিকারী, গভীর জঙ্গলে নিজের বাড়িতে তারা লেংটিটুকুও পরে না। দা এবং বর্শা তাদের অস্ত্র। ব্রিটিশ সরকার তাদের সঙ্গে একেবারেই পেরে উঠত না। অবশ্য সেই বাঁশ-লতা-গাছে ঘনাচ্ছন্ন দুর্গম পাহাড়ে পেরে ওঠা কঠিনও বটে। মুখরক্ষার জন্য অগত্যা সরকার বাহাদুর তাদের গ্রামপ্রতি বার্ষিক এক টাকা কর ধার্য করেছিলেন। নাগারা সেই এক টাকাও দিত

এই নদীউপত্যকা নাগাদের জায়গা নয়। তবু তারা এসেছিল জীবিকার খোঁজে, অথবা একটি অদ্ভুত জীবিকা দিয়ে তাদের এখানে আনা হয়েছিল। তখনও সেপটিক ট্যাংকের প্রচলন হয় নি। শহরে ভূগর্ভ পয়ঃপ্রণালীও ছিল না। পাড়ার সারবাঁধা বাড়িগুলির পিছনের দিকে গাছে ঢাকা, খটখটে শুকনো নালার দুই পাড়ে ছিল খাটা পায়খানাগুলো। এই পায়খানার মেথররা সবাই ছিল নাগা। সেই নালায় নেমে টিনের বালতিতে তারা দুপাশে থেকে মল সংগ্রহ করত। কতদিন এমন হয়েছে, পায়খানায় গেছি, পিছনের নালায় শুকনো পাতা আর গাছপালার নড়াচড়ার শব্দ শুনে চমকে দেখি, লেংটিপরা হরিতালবর্ণ সুঠাম শরীরের কোনো পুরুষ তার মলের বালতি নামিয়ে রাখছে বা খাটা পায়খানার গামলার দিকে

হাত বাড়াচ্ছে। ওরা আমাদের দিকে চেয়েও দেখত না, কথাও বলত না। পুজো গেছে, দোল গেছে, কোনোদিন বাড়ির দরজায় এসে একটি পয়সা বকশিশ চায় নি। কুকুর বেড়াল ছাগল সাপ কাঠবেরালির মতো পিছনের জঙ্গলাকীর্ণ নালায় কেবল ওরাই চলাফেরা করে। পুরুষরা কোমরে জড়িয়ে সাদা লেংটি পরে। মেয়েরা শৌখিন, তারা ব্লাউজের নিচে স্কার্টের মতো করে ঘরে বোনা লাল কালো ডুরে লুঙ্গি পরে। তারা নকল গয়না পরে, সুন্দর করে চুল বাঁধে। পুরুষেরা বালতি করে মল নিয়ে এলে তারা সেগুলোকে হুইল ব্যারো করে দূরে নিয়ে যায়। মাইনের দিন দুপুর থেকে ওরা পুরুষ মেয়ে মিলে মিউনিসিপ্যালিটির চত্বরে এসে জমা হয়।

নাগাদের জন্য আমার মন খুব খারাপ হত। ঐ শুকনো নালার মধ্যে হলুদ শ্বাপদের মতো ওদের নীরব চলাফেরার ছবি আমার মনে পড়ত। কেউ চালাকি করে ঐ নোংরা কাজটা ওদের দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। পরে যখন নাগারা ইংরেজি শিখেছে, কটিবাস ছেড়ে প্যান্টশার্ট ধরেছে, নিজেদের রাজ্য দাবি করেছে, তখন মনের মধ্যে একটা বহুদিনের রুদ্ধ প্রতিশোধ যেন ছাড়া পেয়ে উদ্ভাসিত হয়ে হাততালি দিয়েছে বেশ হয়েছে! ভালো হয়েছে।

রাস্তার কুকুরেরা নাগাদের দেখলেই পরিত্রাহি চেঁচাত। কুকুরের মাংস ওদের প্রিয় খাদ্য। মাঝে মাঝে কাজের শেষে বিকেলে বাড়ি ফেরার সময় রাতের ভাতমাংসের জন্য একটা কুকুর কেউ ধরে নিয়ে যায়। বেতের ফাঁসে ধরা কুকুরটা ছাড়া পাড়ার আর সব কুকুর চেঁচাতে চেঁচাতে চলল ওদের পিছনে। নাগাদের কুকুর খাওয়ার পদ্ধতিটি অদ্ভুত। জ্যান্ত কুকুরটাকে তারা কাঁচা চাল খাওয়াতে থাকে। আমিষাশী কুকুর চাল খাবে কেন! অতএব ওরা জোর করে তার মুখ ফাঁক করে কামানের মধ্যে বারুদ গাদার মতো ঠেসে ঠেসে তাকে আকণ্ঠ চাল খাওয়ায়। ঐভাবে চাল খেতে খেতে কুকুরটা মরে যায়। এখন আগুনে ঝলসালে তার মাংস ও পেটের মধ্যেকার চাল সুপক্ক হয়ে উঠবে। এর পরে, তারায় ভরা নৈশ আকাশের নিচে নিভন্ত আগুনের চারদিকে গোল হয়ে বসে ঐ মাংস আর ভাতের পিণ্ড খাবার সুখ আমি না দেখেও ভেবে নিতে পারি।

কিন্তু, আরও রাত্রে, বালিশের কাছে, পাড়ার কুকুরটার কাঁচা চালে আটকে যাওয়া দমবন্ধ গলার কান্না শুনতে পাই যেন।

.

মণিপুরীদের কথা

মেইতেইদের দেশ মণিপুর বলে আমরা তাদের ডাকনাম দিয়েছি মণিপুরী। মণিপুরীরা চিনে জাপানীদের মতো চোখ নাক মুখের জায়গায় ছোট্ট ছোট্ট ফুটো, অভিব্যক্তিহীন মঙ্গোলয়েড না। তাদের চোখে, ঠোঁটে, শরীরে, আঙুলে ভাব আছে, বাঙালিদের মতোই তাদের মন সহজে পড়া যায়। তারা ধর্মে বৈষ্ণব, নাচে গানে মার্শাল আর্টে পারঙ্গম। সংস্কৃতির দিক থেকে ভারতীয় মূল স্রোতেই রয়েছে তাদের শিকড়। তাদের ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা, তব সেই ষাট সত্তর বছর আগে দেখেছি, বাংলা ভাষা ও বাঙালি শিক্ষার সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল তারা। আমাদের সঙ্গে যে মণিপুরী ছেলেরা পড়ত তারা তো আমাদের মতোই সাধু বাংলায় লেখাপড়া আর কথ্য বাংলায় আগল্প চালাত। ক্লাস সিক্সে আমাদের ফার্স্ট বয় ছিল জগৎ সিং, স্কুল টিমের গোলকীপার ছিল বীরেন সিং, অ্যাডভেঞ্চারার এক্সপ্লোরার ছিল ক্লাস নাইনের মাধব সিং, আমাদের অঙ্কের মাস্টারমশাই ছিলেন রমণ সিং, সারা শহরে গানের একমাত্র টিউটর ছিলেন ব্রজেন সিং। এঁরা তো সবাই মণিপুরী।

মণিপুরী জীবনের রঙিন সৌন্দর্যের দেখা পেতাম মণিপুরী মেয়েদের মধ্যে। তারা বিকেলের দিকে প্রকাণ্ড ধামায় করে টাটকাভাজা মুড়ি নিয়ে আসত, শীতের সকালে খেতের শিশিরভেজা রাইশাক মুলো নিয়ে আসত বিক্রির জন্যে। মণিপুরী মেয়েরা নিপুণ তাঁতী। তারা ঘরে পা ছড়িয়ে বসে কোমরে টানা বেঁধে বিচিত্র রঙের সুতোয় তাঁত বোনে। তাদের পুরো সাজ বুক অবধি মোটা খাপি লুঙ্গি, স্তনের উপর লুঙ্গিটিকে বাঁধবার গামছার মতো রঙিন কাপড় নিজেরাই বুনে নেয়। তরুণী বউদের জন্যে এর উপর থাকে সুতি বা সিল্কের ওড়না। ওড়নাগুলো একরঙা হালকা জাফরানী, ফিরোজা, কুসুম রং। তাদের মাথায়

পরিপাটি করে আঁচড়ানো এলো খোঁপা। সারা শরীরে একমাত্র অলংকার কাঁচা সোনার দুটি ভারী কুণ্ডল। এত ভারী যে কানের ঘেঁদা আধ ইঞ্চি লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে। এই পোশাকে এক একটি মেয়েকে এক একটি সৌন্দর্যছবির মতো লাগত।

এক মাঝবয়সিনী তার নতুন বিয়ে হওয়া পুত্রবধূকে নিয়ে মুড়ি বেচতে আসত। নিজের মাথায় ধামা, বউয়ের মাথায় বিরাট বস্তা। তারা গ্রাম থেকে নদী পেরিয়ে এসেছে পায়ে ধুলো, পরিশ্রান্ত মুখে ঘাম। নতুন বউটির নাকের ডগা চকচক করে, ঠোঁট দুটি টুকটুক করে, কপালে হলদে গিরিমাটির একটি টিপ। দিদিমা টিন ভরে মুড়ি কিনতেন।

এরা অনেক সময় তিনখানা ছেঁড়া কাপড় আর বারো আনা পয়সা নিয়ে খেস বানিয়ে দিত। সেই খেসগুলির রঙের পরিকল্পনা যেন কোনো রাজারানীর দেশের। এই মণিপুরী স্ত্রীলোকদের আমরা, কেন জানি না, দাদী বলে ডাকতাম। কথাবার্তা বাংলাতেই হত। ব্যবসার দামদর, একটু আধটু সুখদুঃখের কথা ওরা সহজেই চালাতে পারত।

একবার আমি একটা গর্হিত অপরাধ করেছিলাম, অবশ্য না বুঝে। এক ছুটির দিনের সকালে স্টেশন রোড ধরে প্রাতভ্রমণ করে ফিরছি। এই সময়ে জায়গাটা চুপচাপ থাকে। মধ্যবয়স্কা এক মণিপুরী স্ত্রীলোক ঐ পথেই কোথাও যাচ্ছিল। আর্যপট্টির একটা চেনা ছেলে দাঁড়িয়েছিল, আমাকে দেখতে পেয়ে ডেকে বলল- যা তো, ঐ দাদীকে, কাছে গিয়ে ‘দাদী মথন করিতো নি? বলে আয় তো। আমি তার গলার স্বরে বুঝতে পারছিলাম, কথাটা বললে বেশ একটা মজা হবে। ঐ ছেলেটা আর আমি প্রায় একই বয়সী। মৈথুনের অর্থ, বা মথন যে তার অপভ্রংশ তা আমিও জানি না, সম্ভবত সেও স্পষ্ট জানে না।

এদিকে দাদীর কাছে আমার অমন শুভ প্রস্তাব দেওয়ামাত্র একটা বিস্ফোরণ ঘটল। দাদী গালাগাল দিয়ে তেড়ে এল, এবং আমি পালালাম। একটু দূরে গিয়ে তাকিয়ে দেখি, আর্যপটির ছেলেটা খ্যাখ্যা করে হাসছে এবং এবার দাদী তার দিকে তেড়ে যাচ্ছে। আমি তখন কথাটার অশ্লীলতা আন্দাজ করেছি। নিজেকে খুব হীন মনে হল। পালিয়েছি বলে দ্বিগুণ হীন।

.

ইংরেজদের কথা

নদীউপত্যকায় আমাদের শহরটা ঘুরে দেখলেই বোঝা যায়, এটা ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচীন নগরী নয়, একেবারে আনকোরা, ইংরেজদের হাতে তৈরি একটা ছোট্ট পরিকল্পিত শহর। চা-বাগানের সাহেবদের এখানে ছিল আড্ডা এবং যাতায়াত, তাছাড়া ছিল শাসনকর্তা ইংরেজদের কিছু সরকারী অফিস ও বাংলো। দূর থেকে, কাছ থেকে এই ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের প্রায়ই দেখা হত। কিন্তু সে এক অদ্ভুত দৃষ্টিহীন দেখা। অনেক পরে, যখন ফচকেমি করতে শিখেছি তখন এ বিষয়ে বন্ধুদের কাছে একটা গল্প শুনেছিলাম

এক বাগিচাসাহেবের বাংলোয় দুই চুনকামমিস্ত্রী কাজ করতে গেছে। দুজনেই যুবক এবং সুরসিক। তারা কাজ করে আর ফাঁকে ফাঁকে সুযোগমতো লুকিয়ে দ্যাখে অপরূপ সুন্দরী মেমসাহেবটিকে। নিজেদের মধ্যে সেই বিস্ময় বলাবলি করে–

–পিঠত দুইখান পাখনা লাগাই দিলে পরী হই উড়ি যাইত!

— গায়ের রং দেখছেন নি?

— ভিৎরে কিতা আছে কওছাইন।

— ভিৎরে দালান, হাওয়ামহল, ক্ষীরপুঁখের...

–আরে বা, দেশর ভাই শুক্কুর মহম্মদ!

পরের দিন যখন ওরা স্নানঘরে কাজ করছে মেমসাহেব এসে বিবস্ত্র হয়ে বাথটবে নামলেন। ওরা ভয়ে লজ্জায় দেয়ালের গায়ে সিঁটিয়ে রইল। যাবার সময়, দরজার কাছে, অর্ধেলঙ্গ মেমসাহেব ওদের ধাক্কা দিয়ে চলে গেলেন একজনের বাহুতে তাঁর উন্মুক্ত স্তনটি ঘষটে গেল।

মেমের স্পর্শজনিত পুলকে তো লোকটির মূৰ্ছা যাবার অবস্থা। আহা! কী নরম! যেন স্বর্গত লই গেল! কিন্তু একটু পরেই তার আহত পৌরুষ চাড়া দিয়ে উঠল– দেখছেন, আমরার মানুষ বইলাই মনে করে না। ঘরত বিড়ালটা মুরগাটার সামনে যেমন ল্যাংটা হয় আমরার সামনেও ল্যাংটা হইল। সাধারণ ভারতবাসী সম্বন্ধে এই ছিল ইংরেজদের মোটামুটি মনোভাব। আমরা যেন সত্যি নই, আমরা যেন ছায়াবাজির লোক।

কাছাড় ক্লাবের প্রশস্ত লনে বিকেলে টেনিস খেলা হত। পুরুষ মেয়ের মিক্সড় ডাবলস্‌। চারটি কোর্ট ছিল। মেহেদি গাছের ছাঁটা বেড়ার এপাশে দাঁড়িয়ে পথিকেরা ভিড় করে খেলা দেখত। খেলার মান কতটা ছিল কে জানে, কিন্তু সাহেবদের দীপ্ত চেহারা, সাদা পোশাক, উচ্চ হাসি, মেমদের বব করা চুল, জানু দেখানো স্কার্ট, রঞ্জিত লাল অধরোষ্ঠ খেলায় একটা আশ্চর্য জৌলুশ এনে দিত। সন্ধে পর্যন্ত খেলা চলতেই থাকত। একটা দল ধবধবে তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে লনের পাশের বেতের চেয়ারে গিয়ে বসলে অন্য দুই জুটি কোর্টে নামে। দূরে বসা স্ত্রীপুরুষদের উপর পিছনের মেহেদিবেড়ার ছায়া পড়ে ইংলন্ডের গ্রামের কোনো সানন্দ বিকেলের আভাস আনত। বেশ বুঝতে পারতাম, ওরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের খুব উপভোগ করছে। অবশ্য খানিকটা তো দেখানোপনা ছিলই।

আমাদের বাড়ি থেকে আট-দশ মিনিটের দূরত্বে চার্চ আর ছ-সাত মিনিট দূরে কবরখানা। উঁচু উঁচু প্রাচীন ঝাউ গাছে ছায়া করে আছে ঢালাই লোহার রেলিংয়ে ঘেরা অনেকখানি শান্ত জায়গা। সেই উঁচু গাছদের ছাড়িয়ে মধ্যিখানে আরও উঁচুতে উঠেছে গির্জার গথিক মিনার। জায়গাটা দিনরাত নিস্তব্ধ নির্জন হয়ে থাকে, রবিবারের সকালেও তেমন কেউ আসে না, মোরামের রাস্তায় যখন পাতা উড়ে উড়ে পড়ে মালী সাফ করে। সেখানে বিয়ে নিশ্চয় হয়েছে, তবে আমি দেখি নি। শ্রাদ্ধ হয়তো নীরবে সম্পন্ন হত, তাও দেখি নি। আমি উদ্দেশ্য ছাড়াই কোনোদিন পথে যেতে যেতে হঠাৎ ঢুকে পড়েছি। ছবিতে যেমন দেখা যায় তেমনি

কাঠের আসনের সারি, পুলপিট, পিয়ানো। সিলিং অসম্ভব উঁচু। মাথার দিকে আর্চ, লম্বা লম্বা জানলা। তাতে রঙিন স্টেইনড় গ্লাস। নিশ্চয় ইউরোপ থেকে আনানো।

এক ছুটির দিনে বাজার থেকে কিছু বাঁশপাতা মাছ কিনে ফিরছিলাম। মাছের ন্যাকড়ার পোঁটলাটা আমার হাতে ঝোলানো। বেশ আসছিলাম, কোথাও কোনো সন্দেহের বাষ্প নেই। কাছারির কাছাকাছি যেই এসেছি, আচম্বিতে যেন হাতে কেউ দারুণ ঝাঁকুনি দিল। চমকে দেখি নদীপারের গাছ থেকে একটা বাজ ছোঁ মেরে মাছের পোঁটলাটা নিয়ে গিয়ে বসল কাছারির বট গাছে। আমি বোকার মতো তার পেছু পেছু ছুটলাম। দু-চারটে ঢিল মারতে সে বিশাল পাখায় উড়ে গিয়ে গির্জার চুড়োয় বসল। আমি অসহায়ের মতো গির্জার হাতায়

ঢুকে আবার ঢিল মারতে লাগলাম। বাজ চুড়ো থেকে উড়ে গাছে বসে, এক গাছ থেকে অন্য গাছে যায় আর তার নখে ধরা পোঁটলা থেকে দুটো-চারটে মাছ খসে পড়ে। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় অর্ধেকের বেশি মাছ পুনরুদ্ধার করে বিমর্ষ মনে বাড়ি ফিরলাম। বাজে মাছ নিয়েছিল একথা বাড়িতে বলা যাবে না। বাজের এঁটো দিদিমারা খাবেন কিনা কে জানে।

গির্জাকে এড়ানো যায়, কিন্তু কবরকে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। শহরে বা কাছাকাছি চা-বাগানে যে ইংরেজরা মারা যেত তাদের কবর দেবার জন্য মোটা দেয়াল আর গাছপালায় ঘেরা একটা গোপন হয়ে থাকা জায়গা ছিল। জায়গাটা এস ডি ও-র বাংলো এবং লোকাল বোর্ডের অফিসের পিছনে। এই অতি সুন্দর জায়গাটিতে কোনো জীবিত ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নি। কারো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখি নি, কোনো কবরের উপরে কোনো মেমসাহেবকে ফুল সাজিয়ে কাঁদতেও দেখি নি। জায়গাটা এত নির্জন যে এখানে কোনো দরোয়ান বা মালী আছে মনে হয় না। ঘাস ছাঁটা হয় না। ফুলগাছগুলোয় কিন্তু প্রচুর ফুল। পরিচর্যা করে কে?

তিরিশ চল্লিশটি কবরের উপরে নানা মাপের, নানা মণ্ডনের পাথরের বেদি। এই পালিশ করা বেদিগুলোর বিচিত্র কারুকার্য এবং শিয়রে একটি ক্রস খ্রীষ্টান পরলোককে সৌন্দর্যে আর শান্তিতে আবিষ্ট করে রেখেছে। বেদির গায়ে মৃতের পরিচয় লেখা। কোনো কোনো কবরকে ঘিরে লতানে ঘণ্টাফুল জুঁই গোলাপের নিচু চাদোয়া। আমি কল্পনা করতাম, তলায় যে শুয়ে আছে সে নিশ্চয় ছটফটে, জাদরেল, মদোন্মত্ত কেউ। এখন বুকের উপর বিরাট পাথর চাপ দিয়ে তাকে শান্ত করছে, ঠাণ্ডা করছে, তার চারদিক ঘন অন্ধকার করে রেখেছে।

কোনো কোনো বেদি অপেক্ষাকৃত ছোট, নিচু সবুজ ঘাসের মধ্যে সাদা পাথরের আসন যেন। তলায় নিশ্চয় ছোট কেউ ঘুমিয়ে আছে।

আমি কখনো কখনো বড় কবরের ঐ কাঁচের মতে: মসৃণ পাথরের উপরে বসতাম, তার মসৃণতার গায়ে হাত বোলাতাম, চিত হয়ে শুয়ে পড়তাম। একদিন, মনে আছে, শুয়ে আছি, সূক্ষ্ম রেণু রেণু বৃষ্টি পড়ছিল– ঘণ্টাফুলের পাপড়িতে, পাতায়, কবরের পাথরে বৃষ্টি পড়ছিল। আজ ষাট বছর পরে লিখতে লিখতে ভাবছি, এতদিনে মাটির তলায় হাড়গুলি সেই উড়ো বৃষ্টির মতো, দু মিনিটের বেড়াতে আসা বালকের মতো, কিংবা বিতানের ফাঁক দিয়ে নিঃশব্দে লাফিয়ে নামা বিকেলের রোদটুকুর মতো হালকা পলকা হয়ে যায় নি কি! ডুমস ডের দিন যখন তার নাম ডাকা হবে, ততদিনে সে নাম ভুলে গেছে।

চা-বাগানের সাহেবরা চাকরির শেষে প্রায় সবাই দেশে ফিরে যেতেন, শুধু দু একজন কোনো কারণে এখানে থেকে গেলেন। এই রকম একজন ছিলেন মিঃ মান্ডি। স্টেশন রোডের প্রথম বাংলোবাড়িটাই হল তাঁর। বাড়িটা ছোট না, কিন্তু বড্ড শ্রীহীন। ঘাসের লন নেই, ফুলগাছ নেই। ধুলোভরা পথে আর আঙিনায় সারা দিন কতগুলো লেণ্ডিগেণ্ডি ফরসা অপরিচ্ছন্ন ছেলেমেয়ে খেলে বেড়ায়। ইংরেজ মান্ডিসাহেব তাদের বাবা, আর মা মান্ডিরই বাগানের পাতা তোলা মজুরনী। এখন সবাই তাকে মান্ডিসাহেবের কুলি মেম বলে উল্লেখ করে। সে বেঢপ গাউন পরে, স্কার্ট ব্লাউজ পরে, লম্বা চুলে বিনুনি করে অনেকটা জিপসি মেয়ের মতো দেখায়। বাচ্চাগুলো খেলতে খেলতে গেট খুলে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। সে মা-মুরগির মতো তাড়া দিয়ে ভিতরে ঢোকায়।

মান্ডিসাহেব লম্বা, অস্থিসার, বুড়োমানুষ। অযত্নে তারও রং জ্বলে গেছে। আমাদের ডাক্তারবাবু বলেন, মান্ডিসাহেব পেটের অসুখে ভোগে আর প্রাতরাশে ছটা করে ডিম খায়।

সাহেবরা যে আছে তা সব সময়েই টের পাওয়া যেত। কিন্তু তারা যে আমাদের প্রভু, তারা যে আমাদের দেশে বসে আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে সুখ আর শখের চরম করে ছাড়বে, এইটেই প্রকট হয়ে উঠত বড়দিনের সময়। তখন নানা বাগান থেকে প্লানটাররা বউদের সঙ্গে নিয়ে এসেছে। তারা দেখবে, স্বামীরা কেমন ক্যাম্প-জীবন কাটায়। কাছাড় ক্লাবের কাছে পোলো মাঠের গা ঘেঁষে সারি সারি খাকি আর সাদা চল্লিশ পঞ্চাশটা তাঁবু পড়েছে। এক

দঙ্গল বাবুর্চী, বেয়ারা, খানসামা, সহিস খিদমতে ব্যস্ত। ক্লাবের বড় বড় ওয়েলার ঘোড়াদের সাদা কালো পিঙ্গল চামড়া সাটিনের মতো উজ্জ্বল। বিকেলে সাহেবরা ঘোড়ায় চেপে পোললা খেলে। বিশাল পোলো মাঠের একদিকে উলুঘাসের বন, সেখানে শরতে কাশও ফুটেছিল, এখন হেমন্তে ঝরে গেছে। হালকা খড়ের রং মাঠ, সেখানে সাদা কালো পাটকিলে ঘোড়া ছুটিয়ে সাহেবরা পোলো খেলে। দূরে কৌরব শিবিরের মতো ওদের সারি সারি তাঁবু। শীতের পরিষ্কার ঠাণ্ডা বাতাসে সূর্য লাল হয়ে অস্ত যাচ্ছে। এই জাঁকজমক, বীরত্ব ও রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হত আর্টিস্টিসের দিন (১১ নভেম্বর), তার বাৎসরিক স্মরণ প্যারেডের মধ্য দিয়ে।

আর্মিস্টিসের সকালে পল্টনের গোখা সৈন্যেরা নিখুঁত উর্দি পরে, যন্ত্রের মতো কুচকাওয়াজ করে মাঠে এসে ফাইল করে দাঁড়াত। গত মহাযুদ্ধের পুরনো, অবসর পাওয়া জমাদার, সুবাদারদের সেদিন খুব আদর। পুরো উর্দিতে ফিটফাট হয়ে বুকে মেডেল, ইনসিগনিয়া, ওভারসীজ ব্যাজ লাগিয়ে তাঁরা নিমন্ত্রিতদের জায়গায় এসে বসেছেন। চা-বাগানের ছোট ম্যানেজারই হোন বা অফিসের বড়সাহেবই হোন শ্বেতাঙ্গ হলেই সববিদ্যাবিশারদ। অতএব আর্মিস্টিস অনুষ্ঠানেও খাকিটাকি পরে তাঁরাই প্রধান পুরুষ।

শীতের দিনে খোলা মাঠে হু হু করে হাওয়া বইছে। বিউগল বাজল- বিউগলে জটিল সুর বাজে না, কিন্তু তার স্বর উঁচু আকাশের দীর্ঘডানার পাখির ডাকের মতো বাতাসে ভেসে অনেক দূরে চলে যায়।

বিউগলের সুর, ইউনিয়ন জ্যাকের ওড়া, গোখা প্লাটুনের কুচকাওয়াজ, সেনাধ্যক্ষ সেজে সাহেবদের নিশ্চল দাঁড়ানো জায়গাটাকে চঞ্চল, ভারিক্কি, পরদেশী করে তুলল। ফৌজদের হাঁটাচলা, অভিবাদন করে এক পা পিছিয়ে ঘুরে যাওয়া মানুষের উদ্ভাসিত যন্ত্রের মতো ব্যবহার অদ্ভুত লাগে। এক সময় ভেরী তুরী ড্রাম ট্রাম্পেটে মিলিটারি ব্যান্ড বাজে। বাদ্যকরদের পোশাকের কী বাহার! সকাল এগারোটায় যখন আর্মিস্টিস হয়েছিল, ঘড়ি ধরে

ঠিক সেই সময়ে সমস্ত প্লাটুন নিশ্চল হয়ে দাঁড়ায়। মৃতদের স্মরণে টানা সুরে তিন বার লাস্ট পোস্ট বাজে। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

এই একচিলতে শহরে এত ঘটা করে বছর বছর নকল আর্মিস্টিস অভিনয়ের মানে কি? দর্শক তো আমরা বাঁশের রেলিঙের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা কাছাড়ী নেটিভরা।

.

ঐ দ্বীপবাসী লোকগুলো এই দেশে এসে অহংকারে মটমট করত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না'- ভূগোলে ইতিহাসে এই অদ্ভুত বাক্যটি আমাদের পড়তে বাধ্য করত। স্কাউটদের ইউনিয়ন জ্যাক আঁকতে শেখা ছিল আবশ্যিক। নিজেদের কোনো রাজা নেই, জাতীয় সংগীতও নেই, অথচ 'গড সেভ দি কিং' শুনি ব্যান্ডে। আমি তো পঞ্চম জর্জ ও রানী এলিজাবেথের যুগল ছবিও চটপট আঁকতে পারতাম– দশ মিনিটের বেশি লাগত না।

ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের ভাবভঙ্গি গ্রাম্য সামন্ততন্ত্রেরই মতো। একটি শোক পালন এবং একটি রাজ্যাভিষেকে ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

আমি যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি তখন পঞ্চম জর্জ মারা গেলেন। ইংরেজরা এই শোকের ভার সাম্রাজ্যের কোটি কোটি পরদেশী প্রজার উপর চাপিয়ে দিল। হাতের মুঠোয় রয়েছে সরকারী কর্মীরা, তাদের নির্দেশ দেওয়া হল, জামার হাতা ঘিরে কনুইয়ের উপর মখমলের একটা কালো ফিতে পরতে হবে। দাদুকে দেখতাম হালকা ঘিয়ে রঙের কোটের হাতায় ঐ রকম ফিতে লাগিয়ে অফিসে যাচ্ছেন। আমাদের বাপমা মরলেও তো দশদিনে অশৌচ যায়, আর এক্ষেত্রে পুরো এক মাস! যা হোক, এর পর ছেলে ষষ্ঠ জর্জের রাজ্যাভিষেক হল। এই উৎসবে শহরের বড় বড় বাড়িতে দীপান্বিতার আলো দেওয়া হল। সমস্ত স্কুলের ছেলেমেয়েদের খেলার মাঠে নিয়ে গিয়ে একদিন মেঠাই খাওয়ানো হল। তবে, সে মিষ্টি জমিদারবাবুর ছেলের উপনয়নে চাষী প্রজাদের চিড়েগুড়ের ফলারের মতোই উৎকৃষ্ট। রাত্রে

পোলোর মাঠে আতশবাজি পোড়ানো হল। আকাশ আলো করে লাল সবুজ নীল তারার ফুলঝুরি ঝরল।

.

জেলার কমিশনার আমাদের শহরে থাকতেন। তাঁর একলা বাংলোটি একটা গাছে ছাওয়া বীথিকার শেষ প্রান্তে। বীথিপথের দু পাশে এবং বাড়িটি ঘিরে বড় বড় প্রাচীন গাছ তাদের ডালপালা থেকে বসন্তকালে ফুলের ছড়া দোলে। কমিশনার খুব একটা লোকসমক্ষে আসতেন না। পুরো জায়গাটাই খুব নিরিবিলি।

একবার ঐ অসাধারণ সুন্দর রাস্তাটায় একা একা মুগ্ধ হয়ে হাঁটছিলাম। রাস্তার দুটি পাশই ঢালু, কোনো বাড়ি নেই। গাছের ছায়া আর বিকেলের ছায়া মিশে গিয়ে জায়গাটা একটু ঘোর ঘোর। হঠাৎ কমিশনারের কিশোরী মেয়ে সাইকেল চালিয়ে সেই ঢালু রাস্তায় আমার ঘাড়ে এসে পড়ল। মেয়েটা পড়েও যায় নি, ব্যথাও পায় নি, তবু একটা গালাগাল দিয়ে সবেগে ঐ ঢালু পথে নেমে গেল।

ভাবছি, ষাট বছর আগেকার ঐ ঘটনা যদি আজ ঘটত, এই যুগের ছেলেদের কাছে ঐ সাদা মেয়েটা এত সহজে পার পেত না। না, ভুল হল- অত উঁচু বাড়ির মেয়ে আমার মতো কোনো ছেলের ঘাড়ে এসে পড়বার আগেই জেড ক্যাটিগরির রক্ষীরা ছেলেটাকে পেটাতে পেটাতে নিয়ে যেত, পিটিয়ে পিটিয়ে দেশছাড়া করত।

কিন্তু এই উড়ো ভাবনাটা থাক। ঘটনাটার আজও যেটুকু সত্যি মনে রয়ে গেছে তা হল মেয়েটার ক্রুদ্ধ গালাগাল, সাইকেলে তার দ্রুত অপস্রিয়মাণ শরীরের ভঙ্গিমা। কিন্তু সবচেয়ে বেশি মনে আছে জায়গাটার সৌন্দর্য তার ছায়া, চতুর্দিকে গাছ থেকে নামা ময়ালসাপের মতো ফুলের ঝুরি।

.

তখন বোধ হয় ক্লাস ফাইভে পড়ি, একদিন নোটিশ এল আসামের গভর্নর আমাদের স্কুল দেখতে আসছেন। ইতিহাসের বইয়ে হেস্টিংস, বেন্টিংক, কর্ণওয়ালিসের ছবি দেখেছি। ধরে নিয়েছিলাম ইনিও ঐ রকমই একজন হবেন। যেমন ভেবেছিলাম, ঠিক তাই দেখলাম, গভর্নর সেই রকমই আঁদরেল পোশাক পরা দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, ছুঁচলো গোঁফ, কালো প্যান্টের কোমর থেকে গোড়ালি পর্যন্ত তিনটি লাল রঙের ডোরা টানা, বুকে পদক, ব্যাজ, কোমরে তলোয়ার। গম্ভীর। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, কারো সঙ্গে কথাও বলছেন না। আমরা ক্লাসসুদ্ধ ছেলে তাঁর দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। তাঁর সঙ্গে হেডমাস্টার মশাই ছিলেন, সাধারণ কোটপ্যান্ট পরা আরও তিন-চারজন ইংরেজ ছিলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। যা হোক, দু-মিনিটের মধ্যেই তাঁরা পাশের ক্লাসে চলে গেলেন। গভর্নরের পোশাক, চেহারা এবং গাম্ভীর্য নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হলে মাস্টারমশাই বললেন ঐ কোমরে-তলোয়ার লোকটি তো বডিগার্ড, আসল গভর্নর হলেন সাদামাটা কোটপ্যান্ট পরা টাকমাথা সাহেবটি। কিন্তু আমরা যে তাঁকে খেয়াল করে দেখিই নি। যাক গে। আমাদের মন ঘুরতে লাগল সেই দীর্ঘকায় বীরের পিছনে।

.

এই সময়ে আমি জীবনে প্রথম উড়োজাহাজ দেখি। একটা ছোট্ট লাল রঙের বিমান, পাখির মতো ডানা ঝাঁপটে নয়, একটা বড় উড়াকু মাছের মতো ভেসে এসে নামল সেই পোলো খেলার মাঠে। মাত্র একজন সাহেব সেটা চালিয়ে এনেছে। যন্ত্রে কোনো গোলমাল দেখা দিয়েছিল তাই এখানে বাধ্য হয়ে নামা। আমরা দূর থেকে দেখতাম লোকটি সারা দিন বিমানটি নিয়ে ঠুকঠাক কাজ করে যাচ্ছে, আরও দু-একজন সাহেব তাকে সাহায্য করছে। আমার অবাক লাগত- ওরা কি সব রকম কাজ জানে নাকি। একদিন বিকেলে সেই বৈমানিক কাজ করছিল। ককপিটে বসে হঠাৎ এঞ্জিন চালু করল। খানিক দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি, দারুণ বেগে পাখা ঘুরছে, কাছের লোকগুলোর টুপি উড়ে গেল। বিমান দ্রুতগামী গাড়ির মতো চলতে চলতে হঠাৎ শূন্যে উঠে পড়ল। আকাশে উঠে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে চলে গেল। আমি মনে মনে খুব হকচকিয়ে গেলাম। বৈমানিক কি প্রস্তুত ছিল? না কি

বিমানটা নিজের ইচ্ছায় হঠাৎই উড়তে শুরু করল! এই বিকেলের আকাশে সে এখন কোথায় যাবে? এখানে ওখানে পাহাড়। একটু পরেই তো অন্ধকার নেমে আসবে।

.

বন্যা

বর্ষার শেষ দিকে আমাদের এই পাহাড়ী নদী ঘোলা জলে তীব্র স্রোতে বয়ে চলে। অতখানি খাড়া উঁচু পাড় ছাপিয়ে উঠতে চায় জল। পশ্চিম দিগন্ত থেকে আকাশের তিন-চতুর্থাংশ মেঘে ঢাকা, অন্য দিকে বরাইল পাহাড়ের গা ঘেঁষে ভিজে মেঘের ছায়া এবং নিস্প্রভ সূর্যের ম্রিয়মাণ আলো। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে নদী অসম্ভব ফুলে উঠেছে। এই গম্ভীর ঘোলা জলের রাশি কোথা থেকে আসে? আমরা শুনি, মণিপুরে আর লুসাই পাহাড়ে দারুণ বৃষ্টি হচ্ছে সেখান থেকে জল নামছে পাহাড়ের গা বেয়ে। জিরি, চিরি, হোরং আর লংগাই উপনদী থেকে জল এসে পড়ছে মূল নদীতে। তখন, বৃষ্টি শেষ হয়ে এলেও এই উপত্যকা বিপদের মুখোমুখি। বড় বড় তিন চারটে মালবাহী গাধাবোট নোঙর করে রাখা হয়েছে। বোটগুলির বিশাল বিশাল গহ্বর এখন শূন্য, অন্ধকার। আমরা দু-একজন ছেলে নেংটি ইঁদুরদের সঙ্গে সেই বোটের মধ্যে ঘুরে বেড়াই, তাদের কিনারায় গিয়ে নদীকে দেখি। গাধাবোটের লোহার খোলে জলের ধাক্কা লেগে মাঝে মাঝে চাপা গুমগুম শব্দ ওঠে। জল শুধু ঘোলা নয়, ময়ালের গায়ের চকরা-বকরার মতো তারও গায়ে মধ্যে মধ্যে ফেনা বোঝা যায়, কোনো গভীর অরণ্যের মধ্যে ঘুরে গাছপালা লতাকে নিষ্পিষ্ট করে এসেছে এই জল। গভীরতর জায়গায় কুমোরের চাকের মতো ঘূর্ণি- সেই ঘূর্ণি নাকি ঘুরতে ঘুরতে তলার মাটি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অকস্মাৎ পূতিগন্ধে তাকিয়ে দেখি গরু বা মোষ মরে ঢোল হয়ে ভেসে চলেছে- আর সেই ভাসমান পশুদেহের উপর বসে শকুনি তার নাড়িভুড়ি টেনে বার করছে। মৃতদেহগুলির গতিবেগ দেখে বুঝতে পারি জলের স্রোত কী সাংঘাতিক তীব্র।

দিদিমার কাছে শুনেছি, আগে নাকি ভরা বর্ষায় এই নদীতে হাতিও ভেসে গেছে। আমি হাতি ভেসে যেতে দেখি নি, কিন্তু তার চেয়েও একটা আশ্চর্য জিনিস দেখেছিলাম। একদিন দুপুরবেলা। তখন ঘোলা জলে আকাশের ছায়া পড়ে না, মাছেরাও বোধ হয় ভয় পেয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। হঠাৎ দেখি, দূরে, স্তম্ভের মতো সোজা দাঁড়ানো অবস্থায় একটা আস্ত বাঁশঝাড় নদীর মধ্যভাগ ধরে ভেসে আসছে। কাছাকাছি এলে স্পষ্ট দেখা গেল, সেই উপড়ে আসা বাঁশের জঙ্গলে বাঁদরদের ছোট একটা দল ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে। তারা লাফালাফি করছে না, চেঁচামেচি করছে না। আমার মনে হল, বাঁদরদের এমনিতেই বসা গাল যেন আরও বসে গেছে, গোল গোল কপিশ চোখ যেন নিথর হয়ে আছে। দেখতে দেখতে সেই বাঁশঝাড় আর অভিশপ্ত বাঁদরের দল দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গেল। আমি এখনও ভাবি, এ কি সম্ভব! নদীর মরীচিকা আমাকে ভুল দেখায় নি তো?

প্রত্যেক বছরই নদীতে এই রকম ঢল নামে। কিন্তু কোনো কোনো বছর নদী আর তার জল ধরে রাখতে পারে না। বন্যায় তখন এই উপত্যকা ভেসে যায়। তখন শঙ্কিত আকাশের নিচে সবাই আগেকার বন্যার কথা বলাবলি করে একবার নাকি জল বাড়িতে ঢুকে লাফিয়ে লাফিয়ে চাল ছুঁয়ে ফেলেছিল। সেবার পোটলাপুটলি নিয়ে মহিলারা আশ্রয় নিয়েছিলেন দুর্গের মতো শক্তপোক্ত পোস্টঅফিসে। দিন দশেক সেখানে এক হেঁশেলে খিচুড়ি খেয়ে আর দিনরাত গল্পগুজব করে কয়েকটা পরিবারের মধ্যে নতুন করে সৌহার্দ্য গড়ে উঠল।

জল সরে যাবার পর বাড়ি ফিরে এসে সে কী কাণ্ড! এক হাত মোটা হয়ে নদীর পলি জমে আছে উঠোনে, ঘরের মেঝেয়, তক্তপোশে, চেয়ার টেবিলে, তাকে, কলতলায়, চৌবাচ্চায়, বাগানে। আর সে কী দুর্গন্ধ! যাদের মাটির ঘর তাদের দুর্দশা আরও বেশি। জলের ঘূর্ণি ঘরের মেঝেয় গভীর গর্ত খুঁড়ে রেখে গেছে, গলিত উনুন বুজে আছে কাদায়।

একবার আমি প্রাণসংশয় বিপদে পড়েছিলাম। সেবার বর্ষা শেষ হবার মুখে পাহাড়ে নতুন করে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি শুরু হল। দেখতে দেখতে কয়েকদিনে আমাদের নদী প্রমত্ত হয়ে উঠল। শোনা যেতে লাগল মণিপুরের বাঁধ উপচে জল নামছে। তার পর একদিন শোনা গেল সেই

বাঁধ ভেঙে গেছে, এবং এক্ষুনি তা মেরামত করা অসম্ভব। রাত্রে রাত্রে কখন কি যে হল জানি না। ভোরবেলা জেগে দেখি নদী ছাপিয়ে, রাস্তা ডুবিয়ে জল এসে গেছে আমাদের পাড়ার প্রতিটি বাড়ির উঠোনে। দেড় মানুষ সমান নিচু আমাদের খেলার মাঠ এখন গভীর জলের তলায়। দূরের ঢালুতে ঘরবাড়িগুলোকে দেখাচ্ছে যেন জলের চোরাবালিতে ডোবা অসহায় টিনের প্রাণী।

উঠোনে আমার জানু পর্যন্ত জল। সেই জলে দিয়েই বুঝলাম, এ স্পর্শ পুকুরের বা নদীর মতো না, এ অনেক বন্য, উপদ্রুত, দূরদেশের জল। দায়িত্বশীল যুবকেরা ধুতি গুটিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে, খোঁজখবর নিচ্ছে। বেলা একটু বাড়লে খলবল করে বালকেরাও বেরিয়ে পড়ল। রাস্তার ওপারে মুসলমান হস্টেলের নিচু ভিতের ব্যারাক বাড়িটাতে জল ঢুকেছে। ছাত্রেরা বাক্স-প্যাটরা তুলে তক্তপোশের উপর রেখে ভাবছে, কী করা যায়। সেখানে এক পাক ঘুরে আমাদের পিছনের পাড়া নতুন পট্টির দিকে এগুলাম। সেখানে বাণীভবন লাইব্রেরিতে এ বছর অনেক নতুন বই কেনা হয়েছিল। বইগুলো কি জল থেকে বাঁচবে? নতুন পট্টির শেষ দিকে আলিঝালিদের বাড়ি, জঙ্গুদের বাড়ি, মসির বাড়ি। কাছেই নিচু বিশাল খেলার মাঠ। মাঠের ওপারে ইটখোলার রাস্তায় একটা বড় কালভার্ট। এদিককার সমস্ত বৃষ্টির জল ঐ কালভার্টের নিচের খাদ দিয়ে নেমে তীব্র বেগে একচিলতে বন পেরিয়ে একটা ছোট্ট স্রোতস্বতীতে গিয়ে পড়ে। লম্বা লম্বা জারুল গাছ, ক্ষয়ে যাওয়া কঠিন মাটি-পাথরে উঁচু কংক্রিট আর্চ, বয়ে যাওয়া জলধারা আর ছায়াবিজনতা নিয়ে জায়গাটা অতি সুন্দর। ঐ ছোট নদীর ওপারে কৃষির মাঠ, মাঠের শেষে মণিপুরীদের গ্রাম। এখন এই সমস্তই বানের জলে একাকার হয়ে আছে।

নতুন, পট্টির রাস্তা থেকে গঙ্গেশ চক্রবর্তীর ভাইপোরা একটা কলা গাছের ভেলায় চেপে খেলার মাঠের গভীর জলের দিকে যাচ্ছিল। বেলা বাড়ছে, আকাশ বেশ পরিষ্কার, জল ঈষৎ তপ্ত হয়ে উঠছে। এবার ঘরে ফেরা দরকার। চারদিক কেমন যেন পাণ্ডাশ ধূসর।

খাওয়াদাওয়ার পর দুপুর আর কাটতে চায় না। পুব দিকে যেতে ভয় করে সেখানে গভীর খরস্রোতা নদী বানের জলে মিশে সচল চোরাবালির মতো মারাত্মক হয়ে বইছে। ভুল করে তার গণ্ডির মধ্যে গিয়ে পড়লে আর রক্ষা নেই। আমরা ঘণ্টায় ঘণ্টায় কাঠি দিয়ে জল মাপি। সকালের পর এই শেষদুপুর পর্যন্ত দুই ইঞ্চির বেশি বাড়ে নি। সাধুদিদিদের বাড়িটা অনেক দিন জনশূন্য হয়ে পড়ে আছে। সেখানে দুর্গামণ্ডপের পিছনে দারুণ মোটা আর সতেজ কলা গাছের ঝাড় অযত্নে বেড়ে উঠেছে। আমি সবার অলক্ষ্যে একখানা দা নিয়ে বেরুলাম। দুটি পুষ্ট কলা গাছ কাটতে পারলেই চমৎকার একটা ভেলা তৈরি হবে।

একটা ফাঁকা জনহীন বাড়িতে বানের ঘোলা জল এসে ঢুকেছে। একটা ছেলে তার মধ্যে ঢুকে কলা গাছ কাটছে। সাধুদিদির ভৌতিক আত্মারা চামচিকের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে। এখানে পচা কলা গাছের রস খেয়ে মশার দল খুব তেজী ছুঁচের মতো হুল নিয়ে তারাও উড়ছে। বেলা পড়ে আসছে। কলা গাছের চারখানা কাণ্ড পাশাপাশি রেখে তার মধ্যে তিনটে বাঁশের গোঁজ ঢুকিয়ে, দড়ির বাঁধন দিয়ে চমৎকার একটা ভেলা তৈরি হল। আজ এটি এখানেই লুকনো থাক। কাল সকালে এই জলযানে ভ্রমণে বেরুব। সেদিন রাত্রে বৃষ্টিহীন তারায় ভরা আকাশের নিচে বিস্তীর্ণ জল ক্রমশ শীতল হল। মৃদু হাওয়া উঠল। জল বোধ হয় আরও ইঞ্চি দুয়েক বাড়ল। জলের গন্ধে অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে সামুদ্রিক স্মৃতি জাগে।

ভোরবেলা রোদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেলে আমি ভেলা নিয়ে পাড়া ঘুরতে বেরুলাম। এই বিরাট জল যেন অদৃশ্য আয়তক্ষেত্র আর ট্রাপিজিয়মের খোপে ভাগ করা এক এক জায়গায় এক এক রকম শৈত্য। জল কি করে বাড়ে? নতুন জল কি পুরনো জলের তলা দিয়ে আসে ডুবসাঁতার কেটে, না কি ভেসে আসে সফেন জলদেবতার মতো জলস্তরের উপর দিয়ে। দু-এক বার ভেলা উলটে গিয়ে জলে পড়লাম। এখন বাড়ি ফেরা দরকার। খিদে পেয়েছে। দিদিমা এসব গ্রাম্য ডানপিটেমি পছন্দ করেন না। তাছাড়া পরের ছেলের যদি কিছু হয়ে যায় তো কে তার দায় নেবে? দিদিমার কিছু বাঁকা বাক্য হঠাৎ যেন বঁড়শির মতো এসে আমার কানকোয় বিঁধল। আমি লগি মেরে ভেলাটাকে ঠেলে দিলাম খেলার মাঠের গভীর জলে। এখান থেকে কোনাকুনি গেলেই বাড়ির রাস্তায় পৌঁছে যেতে পারি। ঐ তো

ছেদির কুঁড়েঘর, মুসলমান হস্টেল, নীলুদের বাড়ি। সবই হাতের মধ্যে। কিন্তু আমার কী যে দুর্মতি হল- আমি সবই হাতের বাইরে চলে যেতে দিলাম। আমি লগি ঠেলে সেই কালভার্টের দিকে এগিয়ে গেলাম। একবারও মনে পড়ল না, সেই দিকেও তো নদী! আমার অজান্তে কেউ যেন ভেলাটাকে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। যখন টের পেলাম তখন ভেলা স্রোতের মধ্যে পড়ে গেছে। আমি প্রাণপণে লগি দিয়ে ভেলাটাকে ভেসে যাওয়া থেকে আটকাবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। কিন্তু হরি যাকে রাখেন- হঠাৎ ভেলাটা কালভার্ট ডিঙিয়েই ওপাশের জারুল গাছেদের ছড়িয়ে দেওয়া শাখায় আটকে গেল। আমার বুকের মধ্যে ধকধক শব্দ হতে লাগল। আমি কালক্ষেপ না করে ভেলা ছেড়ে জারুলের শাখা আশ্রয় করলাম। এখন শরীর কেমন যেন নিস্তেজ লাগছে। বেগুনী ফুলে ভরা জারুলবনে এখন কোথাও একটা ভ্রমর নেই। এই গাছগুলি, কালভার্টের নিচে যেখানে ঝরনা বয়, খাদের সেই ম্লান ছায়া থেকে উঠেছে বলে বেশ লম্বা। কাণ্ডগুলো ডুবে গেলেও, জটিল ছড়ানো শক্ত শাখাগুলি এখনো জলের উপরে। দুপুর ঢলে পড়েছে। গাছের ডালপালার মধ্যে বসে আছি। এখন আর খিদে নেই। মনে হচ্ছে, এইখানে বসে বসে কয়েকদিন পরে আমি আর মানুষ থাকব না। গাছবাসী রোগা পাঙাশ রং কৃলাস হয়ে যাব।

এদিকটা এমনিতেই জনমানবহীনদু-চারটে মাত্র বাড়িবিজনদের বাংলো, সুপুরি-বাগানের মধ্যে সুজিতদের বাড়ি, শিল্পী অনন্ত ভট্টাচার্যের বাড়ি, এছাড়া জংলা জমি শেয়ালের নেউলের গর্ত নিয়ে নেমে গেছে নদীকিনারায়। এখন তো জল এসে সব ঘিরে ধরেছে। চিৎকার করে কোনো লাভ নেই, শুধু নিজের অবরুদ্ধ গলা নিজের কানে ভূতের-ভয়-পাওয়া-কুকুরের ডাকের মতো শোনাবে। বিশ-ত্রিশ গজ পিছনে জলের মধ্যে বইছে লুকনো নদী। বিকেল হয়ে এল। পাতার ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্ণ রোদ এসে লাগছে চোখে, কানের পিছনে। এর পর সন্ধে নামবে। এখনই যে করে থোক এ জায়গা ছেড়ে বেরুতে হবে। আমি অতি সাবধানে গাছের ডাল বেয়ে যতটা পারা যায় রাস্তার দিকে এগুলাম। তার পর শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে জলের গা ছুঁয়ে উজান বাওয়া মাছের মতো ঝাঁপ দিলাম। রাস্তার পাথরে হাত ছড়ে গেল। আঃ! এইবার ডুবে থাকা রাস্তা ধরে ধরে বাড়ি পৌঁছতে পারব। ভেজা

গায়ে, কোমর পর্যন্ত জলস্রোতে দাঁড়িয়ে আমার ভিতর থেকে শীতের কাঁপুনি আর কান্না উঠল।

পরদিন থেকে জলে ভালো রকম টান ধরল। দিন চারেক পরে শহরের মাঠ বাট আঙিনায় ঘন কাদার স্তর জমিয়ে রেখে জল নেমে গেল। সেই পলি ধুলো হয়ে শিশিরে ধুয়ে ক্রমশ শিকড়ের দিকে মাটিতে ঝরে গেল। নদী ধীরে ধীরে আবার স্বচ্ছ ও অলস হয়ে এল।

.

বিচিত্র পেশা: ম্যাজিশিয়ান

বর্ষায় যেমন ঢাকা জেলা থেকে ছাতা সারাইওলারা আসত, পুজোর পর বহুরূপীরা আসত তেমনি শরৎ শীত বসন্তে বাংলাদেশের নানা জায়গা থেকে আসতেন ম্যাজিশিয়ান, ব্যায়ামবীর, কথকঠাকুর ও পালাগায়কেরা। এঁরা ভ্রাম্যমাণ অভাবী মানুষ হলেও নিজের বিদ্যেটি ভালোই জানতেন।

একবার এক ম্যাজিশিয়ান এলেন- রোগা, লম্বা, কালো পোশাক পরা, সালভাদর দালির মতো গোঁফ। নিজের স্ত্রীর জিভ কেটে এক বীভৎস খেলা দেখালেন তিনি। মহিলা আধোঘোমটা, পাট করা শাল গায়ে, ভদ্র, সভ্য, বাঙালির মেয়ে। জাদুকর তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে, সম্মোহন করে ঘুম পাড়িয়ে ফেললেন। তার পর বলতে লাগলেন শো মী ইঅর টাং, শো মী ইঅর টাং। ইংরেজিতে স্বামীর আদেশ শুনে অচেতন স্ত্রী একটু একটু করে এতখানি লম্বা জিভ বার করলেন। জাদুকর আমাদের চোখের সামনে দু আঙুলে জিভটিকে টেনে ধরে ধারালো ক্ষুরে কেটে ফেললেন। একটি গাঢ় লাল রঙের প্লেটে রেখে দর্শকদের কাছে নিয়ে গিয়ে সেটি দেখালেন। দর্শকরা নিশ্চিত হলে, কাটা অংশ স্ত্রীর মুখের বাকি অংশের সঙ্গে আবার চেপে ধরা মাত্র জিভটি জোড়া লেগে গেল। অচেতন মহিলা এবার পুরো জিভটি মুখের মধ্যে টেনে নিলেন। জাদুকর বলতে লাগলেন- ওয়েক আপ, ওয়েক আপ, জাগো, জাগো। ধীরে ধীরে মহিলার সম্মোহন কেটে গেল। জাদুকর বললেন- তোমার কি কিছু মনে

পড়ে? মহিলা কথা না বলে দু দিকে মাথা নাড়লেন। তোমার জিভটা এঁদের দেখাও। ভদ্রমহিলা বিনাবাক্যে তাঁর জিভটি বার করে দেখালেন। আস্ত জিভ। কোথাও কোনো কাটা বা জোড়ার চিহ্ন নেই। সবাই হাততালি দিচ্ছে; কিন্তু ভদ্রমহিলার রক্তশূন্য, দুঃখী, লম্বাটে মুখে কষ্টের চিহ্ন।

পরে জেনেছিলাম, এ খেলাটা কিছুই নয়। মাংসের দোকান থেকে সামান্য পয়সায় ছাগলের একটা কাটা জিভ জোগাড় করা যায়। খেলার আগে সেই জিভটি সহকারী মুখের মধ্যে রাখেন। সেই জিভই তিনি একটু একটু করে বার করেন। জাদুকর সেটিই কাটেন। সেটিই জোড়া দেবার ভান করেন। তার পর সহকারী পুরো জিভটিই মুখের মধ্যে নিয়ে গিলে ফেলেন। পরে নিজের আস্ত জিভটি দর্শকদের দেখান। তখন মনে পড়ল, জাদুকর জিভটি কেটেছিলেন, কিন্তু একফোঁটাও তো রক্ত পড়ে নি। মহিলা একটিও কথা বলেন নি, ছাগলের কাটা জিভ গিলে অতি কষ্টে যেন বমি চাপছিলেন।

আরেকজন ম্যাজিশিয়ান দেখিয়েছিলেন একটা সত্যিকারের ভোজবাজি। নরসিং স্কুলের ঘাসের উঠোনে ক্লাসঘর থেকে গোটা ছয়েক নিচু প্ল্যাটফর্ম বার করে এনে এক বেলার এক অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করা হল। এই মঞ্চ এতই নিরাভরণ যে সেখানে কৌশলের কোনো অবকাশ নেই। জাদুকরটিও দেখতে সাধারণ।

ঘণ্টা দেড়েক খেলা দেখাবার পর ক্লান্ত জাদুকর বললেন– অনেকগুলো খেলা দেখানো হল। বেশ পরিশ্রম হয়েছে। তাছাড়া এই শীতের রাত। একটু চা হলে ভালো হত। তার পর ফাঁকা মঞ্চের চারদিকে তাকিয়ে হতাশের অভিনয় করে বললেন কিন্তু এখানে তো দেখছি চেয়ার টেবিল চায়ের সরঞ্জাম কিছুই নেই। যাক গে, দেখছি কি করা যায়। স্তিমিত স্বরে এইসব বলতে বলতে জাদুকর হঠাৎ যেন কাজের লোক হয়ে গেলেন। দেখুন, আপনারা ভালো করে দেখুন, এখানেই এক্ষুনি সব এসে যাচ্ছে–কাঠের প্ল্যাটফর্মের উপর শব্দ করে তিনি জাদুদণ্ডটি ঠুকলেন, আর চুম্বককাঠিতে লেগে লোহা যেমন উঠে আসে তেমনি একটি বড়সড় গোল টেবিল যেন প্ল্যাটফর্মের কাঠ ফুঁড়ে উঠে এল। আমরা স্তম্ভিত। তার পর

জাদুদণ্ডের আঘাতে চারটি চেয়ার উঠল। ব্যাপারটা কিছুই বোঝা গেল না। প্ল্যাটফর্মের কাঠ অটুট, যেমন ছিল তেমনি। এবার জাদুকর টেবিলের উপর জলতরঙ্গের মতো লাঠিটি বাজান আর টুকটুক করে চায়ের পাত্র, দুধের পাত্র, চিনির পাত্র আর পেয়ালা পিরিচ দেখা দেয়। জাদুকর টিপট থেকে গরম ধোঁয়াওঠা লিকার ঢাললেন, দুধ চিনি মেশালেন। চেয়ারে বসে আরাম করে কাপে চুমুক দিলেন। আমাদেরও চায়ে ডেকেছিলেন, কিন্তু কেউই সাহস করে গেল না। চা খাওয়া হলে জাদুকর একটি একটি করে কাপ, টিপট চেয়ার টেবিলে জাদুদণ্ডটি ছোঁয়ান আর তারা যেন মাটিতে মিলিয়ে যায়।

এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটি আমি দশ বছরের সতেজ চোখে মাত্র তিন ফুট দূরত্ব থেকে দেখেছিলাম।

.

কথকঠাকুর

ঢাকা, ফরিদপুর থেকে আসতেন কথকঠাকুরেরা। এঁরা নিজেরা ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ, এঁদের শ্রোতারাও বেশির ভাগই ধর্মপ্রাণা প্রৌঢ়া এবং কিছু গল্পখোর বালক। এই কথকেরা স্বল্পে সন্তুষ্ট, গৃহকর্ত্রীর দেওয়া দুটি টাকা দক্ষিণাতেই গৃহস্থের উঠোনে সন্ধ্যারাত্রে পুরাণ ভাগবতের কাহিনী কথকতা করে শোনান। আমি এইসব আসরে বসে অজামিল, নলদময়ন্তী, ধ্রুব, প্রহ্লাদ এবং আরও কত কাহিনী শুনেছি। এঁরা অসাধারণ গল্প বলিয়ে এবং এঁদের ভাণ্ডারও অফুরন্ত।

ঢাকা জেলা থেকে একজন বুড়ো মানুষ পুজোর পরে আসতেন। তিনি মোটা পুঁথিটি খুলে রেখে সেদিকে আর তাকাতেন না, নিজের মনের ভিতর থেকেই যেন অফুরান গল্প উপচে উঠতে থাকে। তার বলায় কোনো ব্যস্ততা ছিল না, একটু একটু করে কাহিনী ঘনীভূত হয়, একটু একটু করে পাত্রপাত্রী চারদিকে শিকড় ছড়ায়, ডালপালা মেলে, একটু একটু করে গল্প পরিণামের দিকে যায়। সাধারণত একটি গল্প আড়াই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা ধরে

বলেন। কিন্তু আমি জানি, ইচ্ছে করলে সেই একই গল্প সন্ধ্যারাতে শুরু করে শেষরাত অবধি বলে যেতে পারেন, জীবনের এত খুঁটিনাটি এত টুকিটাকি জানা ছিল তার।

অভিনয়ে পারদর্শী এই কথকেরা পাত্রপাত্রীর সংলাপ প্রায় অভিনয় করে শোনাতেন। দরকার মতো শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে গল্পে মহিমা আনতেন। কখনো কখনো দু-এক, কলি গানের সুরে মাধুর্যের ফুলকারি করতেন। জাতি, ধর্ম, দেশ ও শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁদের গভীর জ্ঞান কথকতার মধ্যে মিশে থাকত। হয়তো এইভাবে গল্প বলে নিজেদের জীবিকা সংস্থানের পাশাপাশি এঁরা নৈতিক মূল্যবোধ, জীবনের শান্তি, প্রাণের তৃপ্তি ও বিশ্বের ভারসাম্য সম্বন্ধে মানুষকে অবহিত করতেন।

যেহেতু অবলুপ্ত অতএব একক মানুষের এই মিশ্র শিল্পটি সম্বন্ধে এখানেই বলে রাখি, এটি মুখস্থ শিল্প বা রিহার্সাল শিল্প ছিল না। বুড়ো কথক মানুষটি প্রত্যেক বার তাঁর কাহিনীগুলিকে নতুন করে সৃষ্টি করতেন। গল্পের মধ্যে, পাত্র-পাত্রীর গলার স্বরে তাঁর নিজের মেজাজের জোয়ারভাটা আর সুখদুঃখের আলো আঁধারি খেলা করত। একই গল্প দু দিন দু রকম লাগত।

.

পালাগায়ক

পালাগায়কেরা ছিলেন মূলত সংগীতশিল্পী। কৃষ্ণ আর গোপীদের বয়ঃসন্ধির লীলানাট্যের গান গাইতেন তারা। কথকঠাকুরদের যদি ক্লাসিক মেজাজ তো এঁদের হল লিরিক। কথকঠাকুরদের কাঁচাপাকা কদমছাট চুল, বড় টিকি তো এঁদের তেলচুকচুকে মিশকালো বাবরি। কথকঠাকুরদের আমলকী-হরতুকির মুখশুদ্ধি তো এঁদের মশলা দিয়ে সাজা পান।

নৌকাবিলাস, মাথুর, মানভঞ্জন, উদ্ধবসংবাদের মান অভিমান বিরহ আমার খুব একটা ভালো লাগত না। কিন্তু ঘটনার রস বুঝে মুহূর্তে মুহূর্তে সুর পালটে নতুন গান ধরা সোজা কথা নয়। তাছাড়া, তখন তো মাইক্রোফোন ছিল না স্পষ্ট উচ্চারণে, কোমল মধুর উদাস গান অত উঁচু পর্দায় গাওয়া! পালাগায়কেরা খালিগায়ে, গলায় ফুলমালা, কোমরে রেশমী উত্তরীয় জড়িয়ে, দুই হাতের আঙুলে মুদ্রা দেখিয়ে গাইতেন। গাইতে গাইতে ঘামে ভেসে যেত শরীর।

মহিলাসমাজে এঁদেরও আদর কিছু কম ছিল না। তরুণী যুবতীরা স্বাভাবিক সংকোচেই এদের কাছাকাছি আসতেন না। কিন্তু বয়সিনী বা প্রৌঢ়ারা গানের শেষে স্নেহভরে এঁদের খাওয়াতেন। গান শুনে হয়তো নিজের অল্প বয়সের কথা মনে পড়ে। গায়ক যখন নৌকাবিলাস পালায় নদীঘাটে কৃষ্ণকে দেখে রাধার হয়ে হঠাৎ সুর ও ঠাট পালটে গান ধরেছেন ‘সখি, এই কি ঘাটের নেয়ে তখন যেন হঠাৎ এই শুকনো আসরে যমুনার নীল জল আছড়ে পড়ল- কতদিন আগেকার ছেড়ে আসা নৌকো দুলে উঠেছে।

.

কার্নিভাল

কোনো কোনো শীতে সার্কাসের দল এসে তাঁবু ফেলত। তাদের বাঘ সিংহ ঘোড়া ছাগল ট্রেনে চেপে আসত। সার্কাসের মাঠে একবার কার্নিভালের মেলা বসল। সন্ধের পর জায়গাটা আলোর মালায়, গরম চা ও খুচরো খাবারের দোকানে আর শীতের জামা কাপড় পরা লোকের ভিড়ে জমজমাট হয়ে ওঠে। ভিতরে টিকিট কেটে নানারকম লটারি হয়। সবই গ্রাম্য লোকেদের ঠকাবার কৌশল। কিন্তু সেখানে একটা খেলা ছিল দারুণ। সেটা আমরা আলাদা পয়সা দিয়ে ভিতরে ঢুকেও দেখতাম, আবার আধ মাইল দূর থেকে, কালো রাতের পটে ছবির মতো, বিনি পয়সাতেও দেখতাম।

কার্নিভালের মাঠে একটা ঘেরা জায়গায় সত্তর-আশি ফিট উঁচু একটা কাঠের মই তারের দড়ির টানা দিয়ে খাড়া দাঁড় করানো হয়েছিল। মইয়ের মাথায় কোনোক্রমে একজন লোক দাঁড়াতে পারে এইরকম একটি ডাইভিং বোর্ড। মইয়ের সামনে ধানের গোলার মতো বড় লোহার পাতের চৌবাচ্চা, জলে ভরতি। রাত সাড়ে আটটার সময় কার্নিভালের পুরো মাঠ স্তব্ধ হয়ে যায়। একটা মৃদু বাজনা বাজতে থাকে। পি সি পাল নামের এক দুঃসাহসী খেলোয়াড় হলদে রঙের অগ্নিনিরোধক পোশাক, ঘাড় ঢাকা টুপি এবং চোখ ঢাকা কালো চশমা পরে ধীরে ধীরে একটি একটি করে সিঁড়ি ভেঙে উপরে ওঠেন। সবাই রুদ্ধ নিশ্বাসে তাকিয়ে থাকে। পি সি পাল যখন উপরে গিয়ে ডাইভিং বোর্ডে দাঁড়ান তখন তাঁকে সিকি মাপের দেখায়। ভয়ে যেন বাজনা থেমে যায়। পি সি পাল একটি জেরিক্যান থেকে নিজের গায়ে বেশ করে পেট্রল ঢালতে থাকেন। তাঁর মন, তাঁর স্নায়ু আশি ফিট নিচ থেকে আমরা কিছু বুঝতে পারি না। নিচ থেকে ম্যানেজার চেঁচিয়ে বলেন

– মিস্টার পি সি পাল, আর ইউ রেডি?

— ইয়েস, আই অ্যাম রেডি। পি সি পাল উত্তর দেন।

–নো ওয়ান ইজ রিসপনসেবল ফর ইঅর লাইফ।

— নো ওয়ান ইজ রিসপনসেবল ফর মাই লাইফ।

এই অদ্ভুত সংলাপটি শুনে শুনে আমাদের মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। ঐ আশি ফিট উপরে শীতের হু হু করা রাতের বাতাসে একচিলতে তক্তার উপর দাঁড়িয়ে পি সি পাল তাঁর জীবনের জন্য আর কাকে দায়ী করবেন? পি সি পাল হঠাৎ দেশলাই ঠুকে নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেন। পাঁচ সেকেন্ড একটা জ্বলন্ত মশাল হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে নিচের চৌবাচ্চা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দেন। নিজের গায়ে আগুন না দিলে আমরা তাঁকে এই অন্ধকার আকাশে দেখতেই পেতাম না। পি সি পাল পড়ামাত্র চৌবাচ্চা থেকে তরল আগুন ছিটকে ওঠে। দু মিনিট পরে ভেজা পোশাকে পি সি পাল এসে আমাদের সামনে দাঁড়ান।

এর পর, কার্নিভাল চলে গেলেও, অনেকদিন রাত সাড়ে আটটা বাজলেই কে যেন আমাকে বলত, মিস্টার পি সি পাল, আর ইউ রেডি?

মাস তিনেক পর খবর পাওয়া গেল, কোথায় যেন খেলা দেখাতে গিয়ে পি সি পাল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে চৌবাচ্চার কিনারায় পড়ে দু-আধখানা হয়ে গেছেন।

.

পুনশ্চ

আমি বিচিত্র পেশার এই লোকদের লক্ষ করি। মানুষের কত যে গুণ। কত যে শিল্প। কিন্তু একটা জিনিস তখন থেকেই বুঝতে পারতাম– এই গুণীদের পুরো দলটাই হতভাগ্য। দুটি ভাত কাপড়ের জন্য তারা তাদের গুণটুকু নিয়ে লোকের দোরে দোরে ঘুরে বেড়ায়। ভিখিরির মতো মুখাপেক্ষী হয়ে চেয়ে থাকে। পৃথিবীতে নিগুণ লোকগুলোই মজায় আছে।

নিজের কথাও চিন্তা করি। আমিই বা ভবিষ্যতে কি করে খেয়ে পরে বাঁচব। আজ এখানে আছি, কালকেই চলে যেতে পারি। লেখাপড়া এইখানে ইতি হয়ে যেতে পারে। তার পর কি করে গ্রাসাচ্ছাদন জোগাড় হবে। আমি ভেবে ভেবে পথ বার করার চেষ্টা করি। ভাবতে ভালোও লাগে। আমার চিন্তার ধারা খুব সরল রেখায়, বাস্তব খাতে বইত। এত সরল এবং বাস্তব বলেই বন্ধুরা প্ল্যান শুনে হেসেটেসে আমাকে ঘোর অবাস্তববাদী বলত। আমার হিসেবগুলো কিন্তু আমার কাছে সোজা। যেমন বছরভরে ৩৬৫টি কলা গাছ পুঁতলে রোজ ১ ছড়া করে কলা পাওয়া যাবে। অর্ধেক কলাতেই পেট ভরবে, বাকি অর্ধেক বিক্রি করা যাবে। কলা গাছের জায়গায় নারকেল গাছ, পেঁপে গাছও লাগানো যেতে পারে।

কলা নিয়ে আমার এই প্ল্যান মোটেই আকাশকুসুম কল্পনা নয়। অনেক দিন পরে খনার বচনেও দেখছি–

তিন শ ষাট ঝাড় কলা রুয়ে। থাক গেরস্ত ঘরে শুয়ে ।।
রুয়ে কলা কেট না পাত। তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।
শতেক ধেনু, হাজার কলা। কি করবে আকাল শালা।
ধেনু আমি সামলাতে পারব না। দরকারও নেই। শুধু কলাতেই আমার চলে যাবে।

বাসস্থান, জামাকাপড়, বিছানা এবং অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়েও চিন্তা করতাম। আমি তখন থেকেই নিজেকে চিনি। আমার মতো মানুষকে দিয়ে কোনো কীর্তি সম্ভবপর নয়। যতটুকু না হলে নয় ততটুকু, যতটুকু না হলে নয় ততটুকু- এইভাবে খুদে খুদে হাতে একটু একটু নিয়ে, একটু একটু দিয়ে, পৃথিবীকে বিরক্ত না করে এতদিন কাটল। ছবি আঁকার সময় মিনিয়েচারের থেকে একটু বড় আঁকি। লিখবার সময় ছোট ছোট বই লিখি- একটি একটি শব্দ ভেবে সময় কাটাই। বেশ লাগে। পৃথিবীর আলোবাতাসের সঙ্গে শব্দগুলি কেমন দোয়েলের মতো, চড়ুয়ের মতো, কাঁচপোকার মতো মেশে, দেখি। বেশ লাগে।

আমি কি পাহাড়ের বাঁকে অজন্তা এলোরা বানাতে পারতাম? অসম্ভব। আমি উদয়গিরির চেয়েও অনেক ছোট একটি গুহা বানিয়ে ছেড়ে দিতাম। সেখানে বসে মেঘে বর্ষায় বৃষ্টির রেখা, শীতে অস্তমান সূর্যের রেখা দেখতাম।

.

উদয়শংকর

আমি যখন ক্লাস নাইনে পড়ি তখন বিদেশে নাচ দেখিয়ে ভারতবর্ষে ফিরলেন উদয়শংকর। শান্তিনিকেতনে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে নাচ দেখালেন, তার পর কলকাতায় নাচ দেখিয়ে স্বদেশ সফরে বেরুলেন। দেশে ও দেশের বাইরে তখন তাঁর খুব নাম। আমাদের শহরে এলে শহরবাসীরা সুন্দর করে পদ্মফুলে হল সাজিয়ে এক সকালে তাঁকে সংবর্ধনা দিলেন। চমৎকার ভাষায় একটি মানপত্র পড়া হল। পুঁথির মতো লম্বাটে কয়েক পৃষ্ঠার

একটি স্মারকপত্র বেগুনী কালিতে ছেপে অভ্যাগতদের মধ্যে বিলি করা হল। আমাদের শহরের পক্ষে এসব একটু অভিনব। স্মারকপত্র এক কপি আমিও জোগাড় করেছিলাম।

আজ ভাবি, সারা জীবনে এই রকম কত কাগজপত্র, হ্যান্ডবিল, বিজ্ঞপ্তি, সুভেনির, অনুষ্ঠানের প্রোগ্রাম, বিয়ের চিঠি, জরুরি চিরকুট, যাও পাখি বলো তারে চিঠি হাতে এসেছে। সব যত্ন করে রাখা উচিত ছিল, কিন্তু কিছুই রাখা হয় নি। রাখলে আজ নিজস্ব 'আ ব্রীফ হিস্ট্রি অব টাইম' লেখা যেত।

তিন আনা দিয়ে টিকিট কেটে সন্ধেবেলায় উদয়শংকরের নাচ দেখতে গেলাম। খোলা জায়গায় টিন দিয়ে ঘিরে এক অস্থায়ী প্রেক্ষালয় এবং গাঢ় নীল কাপড়ের একটি নাচের মঞ্চ বানানো হয়েছে। সীটের কোনো নম্বর নেই, দর্শকেরও শেষ নেই। আমি বাঁশের আগল টপকে টপকে একেবারে সামনে গিয়ে বসলাম। একসময়ে হট্টগোল থেমে গেল। শীতের রাত। কী দেখব ঠিক জানি না, কিন্তু সবাই এক গভীর আশা নিয়ে বসে আছি। তার পর মঞ্চের নীল পর্দাটি সরে গেল।

উদয়শংকরের দলে তখন ছিলেন সিমকি, জোহরা আর উজরা দুই বোন, রাজেন্দ্রশংকর, দেবেন্দ্রশংকর, আলাউদ্দীন খাঁ, তিমিরবরণ, বিষ্ণুদাস শিরালী, গুরু শংকরণ নাম্বুদিরি। তেরটি নাচ হয়েছিল কার্তিকেয় নৃত্য, রাসলীলা, স্নান, সাপুড়ে, তরবারি নৃত্য, গজাসুরবধ ইত্যাদি।

ঘন নীল মোটা কাপড়ের পর্দা দু দিকে সরে গেলে চোখের সামনে নাচ-মঞ্চের ফ্রেমে বাঁধানো একটি দ্বিমাত্রিক ছবি দেখা গেল। স্বর্ণাভ এক যোদ্ধা দেবতা ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছেন: কার্তিকেয় উদয়শংকর। মঞ্চেই পিছন দিকে বাজিয়েরা একটা লম্বা সারিতে বসে আছেন। বাজিয়েদের মধ্যে স্বয়ং আলাউদ্দীন আছেন, তিমিরবরণ আছেন। উদয়শংকরের শিল্পে বাজনা ও নাচ অঙ্গাঙ্গী। বাতাসের সমুদ্রে তারযন্ত্রের আঘাত, অনন্ত নৈঃশব্দ্যকে ছন্দে নাচিয়ে দেওয়া তালবাদ্য, কদাচিৎ বংশীধ্বনির চন্দ্রালোকের মতো গড়িয়ে যাওয়া বা পাখির ডাকের মতো বিস্ময়ে ফুকরে ওঠা, হঠাৎ ঝাঁঝরের শব্দে পরিস্থিতি

খানখান করে দেওয়া আশ্চর্য এই ধ্বনিসম্মিলন আমার অপরিণত মনে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের আভাস আনল। রূপলোক ও দেবলোকের যে দরজা সহজে খোলে না তার সামনে আমরা ক্ষুদ্র মানব– এই ভাব আনতে কমপোজার ঐ সংগীতে স্তবগানও মিশিয়েছিলেন।

বাদ্যধ্বনির আঘাতে মানুষপ্রমাণ সেই দেবতার দ্বিমাত্রিক ছবিটির মধ্যে নিশ্বাস জেগে উঠল, উত্তেজনা এল– নিশ্চল ছবিটি নাচের গতিভঙ্গে ত্রিমাত্রিক মূর্তি হয়ে দেখা দিল। সেই নাচ শুধু নাচ হিসেবে কতখানি ভালো, চোদ্দ বছরের ছেলে আমি, কি করে বলব? কিন্তু আমাকে সেদিন থেকে আজও মুগ্ধ করে রেখেছে সেই দৃশ্যগুলির চিত্রধর্ম, ভাস্কর্যধর্ম, রূপের ভাষা। যে কার্তিক কৃষ্ণ শিব পার্বতী রাধা এবং স্নানরতা মেয়েদের উদয়শংকর দেখালেন তারা সবাই আমার অচেনা। আমি পটের বা পুজোর বা যাত্রার যে কার্তিক কৃষ্ণ শিব দেখেছি তাদের কারো সঙ্গে এই কার্তিক কৃষ্ণ শিবের মিল নেই। এরা ইন্দ্রিয়েরও সৌন্দর্য, ধ্যানেরও সৌন্দর্য, আবার শুধুই সৌন্দর্য।

পশ্চাৎপট, পার্শ্বপট ঘন নীল এবং মঞ্চ নিরলংকার থাকায় নাচটি কোথায় হচ্ছে এ বিষয়ে ভ্রম জন্মে মনে হয় এ নাচ পৃথিবীতে না, দূর আকাশের কোথাও হচ্ছে গ্রহতারারা বুদের মতো নাচিয়েদের গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। রাসনৃত্যে কৃষ্ণ আর গোপীদের জামাকাপড়ের এমন রং যে মনে হয় আকাশ আর পৃথিবী জ্যোৎস্নায় ভেসে গেছে।

পুরুষ এবং নারীর দেব এবং দেবী রূপ চূড়ান্ত হয়ে উঠল গজাসুর বধ নাচে। সে নাচে উদয়শংকর শিব, সিমকি পার্বতী। শীতের রাত। শিব শুধু একটি অলংকৃত কটিবাস আর রত্নখচিত মুকুট পরেছেন। পার্বতীর বল্কল ধরনের কাপড়। কি করে তারা অতটা শীতে অমন খালি গায়ে না কেঁপে দাঁড়িয়েছিলেন। দুজন দুজনকে আলিঙ্গন করে আছেন অথচ কোথাও স্পর্শ করছেন না। ঐ রকম সৌন্দর্যের রচনা আজ পর্যন্ত আর দেখি নি। ছোট ছোট জিনিস নিখুঁত করে করে একটা বড় পরোকর্ষে পৌঁছনো। পোশাক, অলংকার, চুল বাঁধা, কাপড় পরা, শরীরের প্রসাধন সমস্ত দিকে কত যে কল্পনা, কত যে মনোনিবেশ পেয়ে ঐ চলচ্ছবি তৈরি হয়েছিল। সেদিন ঐ নাচ দেখে যেন ভারতীয় দেবকল্পনার শিল্পমহলটিতে

উপস্থিত হলাম। কাংড়া শৈলীর চিত্র, এলোরার কৈলাস গুহার মূর্তি, দক্ষিণ ভারতের নটরাজ মূর্তি। এই দলেরই আর একটি ছিল উদয়শংকর-সিমকির হরপার্বতী নাচ।

নাচের পরের দিন ট্রাউজার্স, পুলওভার পরা উদয়শংকরকে খুব কাছ থেকে দেখলাম সবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অত্যন্ত সুষম শরীর, যেন বিদেশী মানুষ। মুখে কঠিন ভাব। গায়ের রং গোলাপের পাপড়ির মতো। ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলছিলেন।

এর কিছু আগে দুটো বই পড়েছিলাম- অক্ষয়কুমার নন্দীর লেখা 'বিলাত ভ্রমণ আর অমলা নন্দীর লেখা 'সাত সাগরের পারে'। অক্ষয় নন্দী প্যারিসের বিশ্বপ্রদর্শনীতে গিয়েছিলেন তাঁর রোলড গোল্ডের গয়নার দোকান নিয়ে। অমলা তাঁর বালিকা মেয়ে, যিনি পরে উদয়শংকরের দলে সিমকির জায়গাটি নেবেন।

.

দিলীপকুমার রায়

সে সময়ে শোনা গেল দিলীপকুমার রায় উমা বসুকে নিয়ে প্রতিবেশী শহরগুলিতে গান গাইতে আসছেন। শহরের সংস্কৃতিমনস্ক মুরুব্বীরা দিলীপকুমারদের এখানে এনে গান শোনাবার ব্যবস্থা করলেন। সেদিন শহরে অপেক্ষার চাপা উত্তেজনা বিকেলবেলা ওঁরা এসে পৌঁছবেন। দিলীপকুমারের গান রেকর্ডে শুনি, ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় তাঁর লেখা গান আর স্বরলিপি নিয়মিত বেরোয়–

বুলবুল মন, ফুল-সুরে ভেসে
চল্ নীল মঞ্জিল উদ্দেশে।
অম্বর-বাঁশরী ঐ ডাকে, আয়
পিঞ্জর পাসরি চল্ অধরায়।

এ ধরায় দে বিদায়।

অধরায় প্রাণ চায়।

সন্ধেবেলায় খবর এল– সড়কপথে আসবার সময় ওঁদের গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করেছে। উমা বসুর বাবা ধরণী বসুর মৃত্যু হয়েছে। ওঁরা ফিরে চলে গেছেন।

.

মাসিমা

আমার মাসিমার মতো দুর্ভাগিনী আমি কমই দেখেছি। নাগাবাবাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, আমার মার বিয়েটা যদি ছাইয়ের বিয়ে হয়, তো মাসিমার বিয়েটা কি? পাত্র সদ্বংশের, শিক্ষিত, রোজগেরে- সব ঠিক। কিন্তু বিয়ের পরই টের পাওয়া গেল মাসিমাকে তার স্বামীর দরকার নেই। কারণ সে জন্যে তার বিধবা কাকিমা আছেন। কাকা বেঁচে থাকতেই কাকির সঙ্গে ভাইপোর সম্পর্ক ঘটেছিল। কাকা মারা যেতে কোথাও কোনো গোপনতা রইল না। কলকাতায় তাঁরা একই বাড়িতে থাকতেন। মেসোমশাইয়ের বাবাজ্যাঠারা ভেবেছিলেন বিয়ে দিলে ছেলে শুধরে যাবে। পুলিশ বদ্যি ওঝা রোজা ডাকার বদলে তাঁরা আমার ফজবেনে মাসিমাকে মোতায়েন করলেন তাঁদের ছেলের মতি ফেরাতে। সে কি পারে ঐ জবরদস্ত পাকা খুড়িশাশুড়ির সঙ্গে। বছর দুয়েক চেষ্টা করে মাসিমা চিরতরে চলে এল তার বাবামায়ের কাছে।

আমি মেসোকে কখনো দেখি নি। কিন্তু তার খুড়িকে দেখেছি। আগেই গল্প শুনেছিলাম, পূর্ণিমা অমাবস্যার গভীর রাতে ছাদে গিয়ে মহিলা অটুট যৌবনের জন্য অদ্ভুত সব ক্রিয়াকলাপ করেন। আমি যখন দেখি তখন তাঁর বয়স হয়েছে। পরনে কালো পাড় শাড়ি, তখনও দীর্ঘ কালো চুল, কপালে কালো টিপ, ঝকঝকে তীক্ষ্ণ দাঁত।

মাসিমা সারা জীবন সধবা ছিল, সিঁদুর পরত, শাঁখা পরত। কিন্তু স্বামী বেঁচে আছে কিনা খোঁজ নিত না। তার সধবা মূর্তির সিঁদুর কুঁড়ে ভেসে থাকত তার কুমারীত্ব, একটু তিরিক্ষি খেপা বালিকাভাব।

মাসিমা ফিরে আসার পর বাড়িটা আস্তে আস্তে বদলাতে শুরু করল। এই শান্ত শহরে দাদু-দিদিমার জীবন একটা স্বাভাবিক বয়সোচিত পরিণতির দিকে যাচ্ছিল, কিন্তু এখন মাসিমা এলে আবার নতুন করে শিশুপালন আরম্ভ হল। আবার দুশ্চিন্তা, শঙ্কা। এই মেয়ের সারা জীবন কি করে কাটবে? কে দেখবে তাকে? খুব তাড়াতাড়ি তাকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া দরকার। মাসিমা প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেবার জন্য তৈরি হতে লাগল। বই খাতা এল। গৃহশিক্ষক এলেন। তার ভাগ্যের ক্ষতি পূরণ করতে যথেষ্ট শিফন, জর্জেট, জামদানি কেনা হল। সেলাইকল এল। স্যাকরা ডেকে নতুন নতুন গয়না গড়ানো হতে লাগল। বিছানাও অনেক ঝকঝকে হল। সংসার একটা এঞ্জিনে চলত, এখন দুটো এঞ্জিনে চলতে লাগল অর্থাৎ বেশি কয়লা, বেশি স্টীম, বেশি হৈ চৈ, বেশি অশান্তি। আর দিদিমা খুব দ্রুত পালটে যেতে থাকলেন। তাঁর মধ্যে যে শোকের কারুণ্য, যে একাকী থাকার শান্তি ছিল তা দায়িত্বের চাপে এবং অহংকারের তাপে উবে গেল।

এর দু বছর পরে মামা ফিরে এলে সংসারটা আরো পালটে গেল। মামা কিন্তু এঞ্জিন না, একটি শৌখিন সেলুন কার। তার ইচ্ছায় এই পরিবারে একটা নতুন চমক যুক্ত হল। বছরে এক বার বাজার করতে, আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে এবং আনন্দ করতে কলকাতা যাওয়া শুরু হল। কলকাতায় এরা দিদিমার ভাইবোনদের বাড়িতেই উঠবে। সুতরাং দিদিমাই টীম তৈরি করতেন, আর আমি অবধারিতভাবে বাদ যেতাম। আনন্দ থেকে বাদ পড়লে কোন্ বালক আর খুশি হয়। তবু দিদিমারা রওনা হয়ে গেলেই আমি তেড়েফুঁড়ে উঠতাম। ভালোই হয়েছে। একলা একটা বাড়িতে আমি বরং এই এক মাস তোফা কাটাব। তোফা কাটাবার জন্য আমি তোড়জোড় শুরু করি। কৃচ্ছ্রসাধনের কথা আছে বইয়ে। কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য সরু একটা বিছানা করি। চাদর, বালিশের ওয়াড় ধবধবে করে কেচে শুকোই, টানটান করে পাতি। চরিত্রকে একতরকারি ভাত রাঁধতে বলি। বন্ধুদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে একবোঝা বই

নিয়ে আসি। রাত্রে লণ্ঠন জ্বেলে, বুকের নিচে বালিশ দিয়ে পড়ব। ভাবতে থাকি, এই পূর্ণ স্বাধীনতাকে কিভাবে কাজে লাগাব। বিনয়দের বাড়ি যাই। তিন চারটে বাঁশঝাড় পেরিয়ে পুকুরের কাছে ওদের বাড়ি। বিনয়রা দুই ভাই। ওদের পড়ার ঘরটা ছাগলের খোয়াড়ের মতো ছোট, এবং তার বাইরের বেড়া মাঝখানে বেঁকে গিয়ে ত্রিভঙ্গমুরারী। ওদের অবস্থা খুব খারাপ। গাড়ির চাকার বাতিল টিউব থেকে রবারের ফিতে কেটে চামড়া আর গাছের ডাল দিয়ে ওরা গুলতি বানায়। এক একটা গুলতি দুই থেকে তিন আনা। এই করে দুই ভাই কিছু পয়সা রোজগার করে। ওরা অনেক কিছু জানে, আমার চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীন। কিন্তু ওদের নিস্তেজ চোখের নিচে কালি, হঠাৎ হঠাৎ দাঁত থেকে রক্ত পড়ে। ওদের বাশিহীন চেয়ারটা খুব আরামের। অনেকক্ষণ বসে থাকি। একটা গুলতি কিনি। ওরা প্ল্যান করছে, খুব কায়দার বাঁশের লাঠি বানাবে, গাছের ডাল থেকে হকি স্টিক বানাবে, গাড়ির স্প্রিং কামারশালায় দিয়ে ক্ষুরের মতো ধারালো ছোরা বানাবে।

মাসখানেক পরে দিদিমারা নতুন কেনা জিনিসপত্র নিয়ে, দেখাসাক্ষাৎ শেষ করে, তাজা হয়ে ফিরে আসতেন। একবার আমার জন্যে সতীকান্ত গুহর ‘দুরন্ত কাহিনী এবং শিবরাম চক্রবর্তীর ‘টম সয়্যারের গল্প’ এল। দুখানা বইই শক্ত মলাটের, সচিত্র, এবং মূল্য ছ আনা মাত্র। তখন তিন আনা, দু আনা সিরিজেরও বই ছিল।

কিছুদিন হল দেখছি, দিদিমা মাসিমার মধ্যে যেন একটা চুক্তি হয়েছে– সব বিষয়ে মতের মিল। যখন কোনো কাজ থাকে না, চায়ের পর বিকেলে বসে বসে দুজন দুজনার প্রশংসা করে। সর্বৈব বানানো কথা, শুনে শুনে আমার গা জ্বালা করে। আমি তাদের উৎসাহে একটি বরুণ বাণ নিক্ষেপ করে পালিয়ে যাই। আজ মনে হয়, তাদের তেমন দোষ ছিল না। মেঘলা বিকেলে দিন যদি না কাটে, আশা যদি না থাকে তবে বসে বসে কি করবে তারা।

নিন্দামন্দ করা বা শত্রুতা করার একটা এজমালি লোক পেলে একতাটা খুব সহজ হয়। কাজের লোকের দোষ ধরার সময় কর্তা-গিন্নী কত একমত, বাড়ির বিধবা বোনটাকে ঠকাবার সময় সব ভাইয়েরা এককাট্টা, বিধর্মীকে খুঁচিয়ে মারার সময় পুরো ধর্মস্থান একসঙ্গে

সড়কি বল্লম বার করে। এক্ষেত্রে আমাকে পেয়ে দিদিমা মাসিমার পারস্পরিক সম্পর্কটি বেশ উছলে উঠল। কিন্তু আমি তত সুবিধাজনক না হওয়ায় ঈশ্বর শিগগিরই সব দিক থেকে আরও উপযুক্ত একটি পাত্র অযাচিতভাবে জুটিয়ে দিলেন। আরও ভালো, ইনি পাত্র নন, পাত্রী। মহিলাটি দিদিমারই আত্মীয়া, বিখ্যাত এক গুণী পরিবারের মেয়ে, মাসিমারই সমবয়সী। মহিলাকে তাঁর স্বামী দিদিমার বাড়িতে নির্বাসনে বা সংশোধনের জন্য পাঠালেন কারণ একটি গর্হিত অপরাধ করেছিলেন তিনি বিয়ের পর, সন্তান হবার পর এক বিবাহ-অতিরিক্ত প্রণয়ে জড়িয়েছিলেন। আমি এতদিন দিদিমার সংসারকে খানিকটা বর্স্টল স্কুলের মতো করে রেখেছিলাম, ঐ মহিলার জন্য এবার সেটা পুরোদস্তুর উদ্ধারাশ্রম হল। এর নেমিসিস পরে, অতি ধৈর্যসহকারে, ধীরে ধীরে কাজ করেছিল।

মহিলা যখন এ বাড়িতে এলেন তখন আমার বয়স এগারো আর তাঁর পঁচিশ ছাব্বিশ। তিনি আমার রাঙাদি হলেন। রাঙাদি বেশ অন্য রকমের লোক। তাঁর চৌকো চৌকো স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পাথর বসানো হারখানা সোনার না, কিন্তু খুব সুন্দর। তাঁর বেঁটে কালো শেফার্স পেনে দিস্তের পর দিস্তে কাগজ অতি দ্রুত নির্ভুল লিখতে পারতেন তিনি। ত্বরিত হাতে বিনা আয়াসে রান্নাবান্না ও ঘরের কাজ করেন। সামান্য হাসির কথায় বা না-কথায় এমন হাসতে থাকেন যে দিদিমা ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকেও তাঁকে থামাতে পারেন না। এই ঝরনার মতো অসংবৃত হাসির জন্যে তাঁকে আরও সন্দেহজনক লাগে। মাসিমা তাঁর উপরে নজর রাখে, এবং দিদিমা মর্মান্তিক বাক্যে তাঁকে কাবু করার চেষ্টা করেন।

রাঙাদি আসার পর পুরো রান্নার কাজ তাঁর উপর পড়ল। আমি মাঝে মাঝে তাঁর পিঠের উপরে গিয়ে পড়ি বড্ড খিদে পেয়েছে। রাঙাদি ঐ অবস্থায় খুন্তি ঠেলতে (ঠেলতে বলেন- রো রো এই হয়ে এল। রান্নার কাজে শরীর কালি হয়, তাই রবিবার বেলা দুপুরে রাঙাদি আমাকে কলতলায় ডাকেন পিঠে সাবান ঘষে দিতে। তাঁর শরীরটি অন্য রকম কোমর খাঁজ, পেটে খাঁজ, ধাতুর মতো উজ্জ্বল টানটান চামড়ার নিচে পুরু এক স্তর চর্বি। প্রচুর চুল ছোট কপালটিতে চুল প্রায় জোড়াভুরুর কাছে চলে এসেছে। তাঁর শরীরের সঙ্গে সমুদ্রের শুশুকের খুব মিল আছে। সে শরীর অনেক জলের চাপ নিয়ে নিচে যেতে পারে, আবার

ভুস করে ভেসে উঠতে পারে। দিদিমা মাসিমা চেষ্টা করে করে তাঁর হাসি অনেকটা শুষে নিয়েছিল। আর, অনেক বছর পরে শেষটায় তো তাঁর না-হাসির বয়সই এসে গেল।

ননিদা আমাকে একটা ছোট্ট নোটবই দিয়েছিল। নোটবইটা ভারি সুন্দর। প্রথম দুটো পৃষ্ঠায় কয়েকটা অজানা নাম ঠিকানা লেখা– কিন্তু হাতের লেখাটা অতি সুকন্দর বলে পাতা দুটো ছিঁড়ি নি। কোথায় রাখব, তাই আস্ত নোটবইটা রাঙাদির ডালা খোলা সুটকেসে রেখে দিয়েছিলাম। তার পরে ভুলে গিয়েছি। সেদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখি, বাড়িতে তুমুল কাণ্ড। মাসিমা রাঙাদির বাক্স হাঁটকে সেই নোটবই বার করেছে। সারা দিন ধরে তাঁকে ঐ নামঠিকানার লোকগুলো সম্বন্ধে জেরা করা হয়েছে। রাঙাদি হতচকিত হয়ে গেছেন, দুপুরে খান নি, ভাঁড়ার ঘরের কোণে আঁচল পেতে বসে আছেন। আমি কাছে যেতে যুগপৎ কেঁদে এবং ফুঁসে উঠলেন। আমি মামাকে গিয়ে ব্যাপারটা খুলে বললাম। তার বজ্র আঁটুনি অমন ফসকা গেরো হয়ে যাবে মাসিমা তা কি করে হতে দেয়। অতএব সে বলল– না, এ খাতা তোর না।

আমি বললাম– তাহলে কার খাতা?

— যার বাক্সে পাওয়া গেছে তারই খাতা।

আমি বললাম– তোমার বাক্সয় আমার প্যান্ট শার্ট আছে, তাহলে সেগুলোও তোমার? ভালো চাও তো আমার নোটবই ফেরত দাও।

– না, ও খাতা আমার কাছেই থাকবে।

আমি বললাম– তুমি গোপনে লোকের বাক্স ঘেঁটে দ্যাখো, সেখান থেকে অন্যের জিনিস বার করে নাও। তোমার ঘাড়টি আমি একদিন মুচড়ে দেব।

সেদিন থেকে আমি পুরো রাঙাদির দিকে চলে গেলাম।

কয়েক বছর পরে রাঙাদির গল্প গড়িয়ে গড়িয়ে এক দিকে চলে গেল আর মাসিমার গল্প গেল অন্য দিকে। ছেলেবেলার এত যে কাছাকাছি থাকা তবু আমি সেই দুই অগভীর জলস্রোতের পথে কোথাও ছিলাম না।

.

পুনশ্চ: কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই কিছু না। তিনি হাড়ীর মাকে নিয়ে তাড়ীর মা করেন। মাসিমা, সেই মাটো, পাটোয়ারীবুদ্ধিহীন মেয়েটি জীবনের শেষ পর্বে যেখানে পৌঁছেছিল রাঙাদি, দিদিমা বা আমি কেউ সেখানে পৌঁছতে পারি নি। দাদুর মৃত্যুর পর দুবুদ্ধি এবং দুর্ভাগ্যবশত পরিবারটি ক্রমশ গরিব এবং ছত্রখান হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেকেরই নিজের নিজের ইচ্ছা এবং স্বার্থ ছিল, মাসিমারই শুধু নিজস্ব কিছু নেই। সে তার সামান্য বিদ্যে নিয়ে ছাত্র পড়ায় ছোট ভাড়া বাড়িতে মায়ের সংসারটাই চালায়। মাকে দেখে, ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের মায়ের স্নেহ এবং বাবার দায়িত্ব নিয়ে পালন করে। দিদিমা যখন মারা গেলেন, সে একা হয়ে যায় নি। ঐ পাঁচ-ছটা ছেলেমেয়ে তাকে ঘিরে আছে। মামা অসুস্থ হয়ে কলকাতায় মাসিমার কাছেই ফিরে এল, মাসিমার কাছেই মারা গেল। অনেক দিন পরে মাসিমা যখন মারা গেল তখনও ঐ ছেলেমেয়েরা, মেয়েদের বরেরা তাকে সন্তানের মতো ঘিরে আছে।

.

মামা

মামা দাদুদিদিমার একমাত্র ছেলে এবং শেষ সন্তান। আমার চেয়ে মামা সাত বছরের বড়, মাসিমার চেয়ে সাত বছরের ছোট। এই শহরে পড়াশোনার অসুবিধে হওয়ায় মামা তার মামার কাছে দিনাজপুরে পড়তে গিয়েছিল। সেখানেও শিক্ষার উন্নতি হল না দেখে আবার বাড়িতেই ফিরে এল। প্রথমটায় যখন আমি দিদিমার কাছে যাই তখন পরিস্থিতি বেশ

স্বাভাবিক ছিল। মাসিমা আসার পর আমার স্থানটা এক ধাপ নিচে নেমে গিয়েছিল, মামা আসার পর সে স্থান আরও এক ধাপ নিচে নামল।

মামার গায়ের রং অত্যন্ত ফরসা, কালো চোখ ও কালো চুল, অসম্বদ্ধ দাঁত, শুকনাস, নরম চিবুক, পরিশ্রমবিমুখ দেহ। মামা কিন্তু লোক ভালো। তাহলে তাকে নিয়ে সমস্যাটা কোথায়? মামা যখন বাড়ি ফিরে এল তখন সে ক্লাস টেনের ছাত্র, আর আমি সবে ফাইভে উঠেছি। মামা তার পাঠ্য বাংলা কবিতা আবৃত্তির মতো করে পড়ে, শুনে শুনে সত্যেন দত্তের হিমালয়াষ্টক এবং মেথর আমার মুখস্থ হয়ে গেল। তার বাংলা সিলেকশনের বইটি নিয়ে আমি গল্প আর কবিতাগুলো পড়তাম। গাড়ির আড়ি, মহেশ, প্রেমের ঠাকুর, ভারতবর্ষ, গুপ্তধন। গুপ্তধনের মতো গল্প এর আগে কখনো পড়ি নি। সেই যে সন্ন্যাসী হরিহরকে বললেন- "বাবা, ছোটো হইয়া সুখে থাকো। বড়ো হইবার চেষ্টায় শ্রেয় দেখি না। হরিহর বোঝেন নি, কিন্তু সেই বয়সেই প্রারব্ধবশত কথাটা আমার মনের মধ্যে গেঁথে গেল। এবং গল্পটা শেষ হলে মন উচ্চাশাহীন বালসন্ন্যাসীর মতো হল। পড়তে পড়তে বিকেলের আলো পড়ে এসেছিল। পৃথিবীতে এখন কি গোধূলি আসিয়াছে। আহা, সেই গোধূলির স্বর্ণ। সে স্বর্ণ কেবল ক্ষণকালের জন্য চোখ জুড়াইয়া অন্ধকারের প্রান্তে কাঁদিয়া বিদায় লইয়া যায়। তাহার পরে কুটিরের প্রাঙ্গণতলে সন্ধ্যাতারা একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। এই জায়গাটায় এসে, চোখ তুলে পশ্চিম আকাশে তার প্রতিবিম্ব দেখে মন আশা নিরাশার, সুখ ও দুঃখের অতীত এক অবোধ ব্যথা অনুভব করল। আজ বুঝি, তা ছিল বিশুদ্ধ সৌন্দর্যানুভূতির আঘাত।

অনেক দিন পরে আর একটা সমাপতন চোখে পড়েছিল– গল্পটা কার্তিক ১৩১৪ সালে লেখা। অর্থাৎ আমার জন্মের সতেরটি বছর আগে, হেমন্তে। আমার কেন জানি না মনে হয়, সেই উদাসীন হেমন্ত, সেই তৃণে শষ্পে গাছের পাতায় শিশিরের নিশ্বাস ফেলা হেমন্তই গল্পের চারদিকে জড়িয়ে ছিল, যেমন সে জড়িয়ে ছিল আমার জন্মের চারদিকে।

সেই সময়টাতে মামার প্রধান সমস্যা দাঁড়াল পরীক্ষা পাশ করা। মামা নেশাভাং করে না, গল্পের বই পড়ে না, শীতের বিকেলে দু-তিন গেম ব্যাডমিন্টন ছাড়া অন্য খেলা খেলে না, ছবি আঁকা গল্প লেখা জিমন্যাসটিকস্ বা দাবা এসব উটকো বাই কিছু নেই, বারমুখোও নয়, রাজনীতিও করে না, অর্থচিন্তা বা অন্য দুশ্চিন্তাও নেই, তবু সে এবারেও ফেল করল। বাড়িতে যেন কদিন অশৌচ চলল- খিদে পেলে খাবার চাওয়া বারণ, চেঁচিয়ে কথা বলা বারণ, ঘরের বারান্দা থেকে উঠোনে লাফিয়ে পড়া বারণ। দিদিমা এমন তাকাবেন, তাঁর দৃষ্টি যেন কেটে কেটে বলে পরের হেনস্তায় খুব ফুর্তি! খোকনের বদলে তুমি কেন ফেল করলে না। মামার জন্যে আমার খারাপ লাগে তার মধ্যে কোনো নীচতা নেই, হিংস্রতা নেই। কেন সে বার বার ফেল করে। ক্রমশ এ বিষয়ে একটা অদ্ভুত কথা আমার মনে এল; পিতৃশাসিত সমাজও ভালো, মাতৃশাসিত সমাজও ভালো, হয়তো শাসনহীন সমাজও ভাল। কিন্তু আমাদের পিতৃশাসিত পরিবারে কত্রীর মেট্রিআর্ক ভূমিকা সর্বনাশা। সন্তানকে তা হাঁসজারুর মতো বিকলাঙ্গ ব্যক্তিত্ব দেয়। পরিবারে দিদিমার একাধিপত্য ও পুত্রস্নেহ মামাকে পুরুষের দায়িত্ব এবং সন্তানের কর্তব্য থেকে সরিয়ে রেখেছিল। নিজের সুখটি ছাড়া অন্যের কষ্টদুঃখের কথা সে বুঝতেই শিখল না।

ছাত্রাবস্থাতেই মামাকে বিলাসিতায় পেয়ে বসেছিল। সে ফিনফিনে ধুতির সঙ্গে সিল্ক, মটকা, গরদের শার্ট ছাড়া কিছু পরে না। সে শার্টে আবার সোনার বোতাম। তার জুতো সাদা সোয়েডের কিংবা কালো গ্লেস কিডের। এবেলার জামাকাপড় ওবেলায় চলে না। বেরোবার আগে পায়ের কাছে ছাড়া কাপড় দিয়েই সে জুতো ঝেড়ে চলে যায়। কয়েক মাস আগে আঠাশ টাকা দিয়ে একটি অ্যাংলো স্যুইসের ঘড়ি কিনেছে, আবার এ মাসেই তিরিশ টাকা খরচ করে একটা র‍্যালে সাইকেল কিনল। কিন্তু এইটুকু বিলাসিতায় কি ম্যাট্রিক পাশ করা আটকে যায়।

শুধু বাবু নয়, মামা অলসও বটে। সে সংসারের কোনো কাজ করে না। বাজার করে না, বাগানে জল দেয় না, উঠোনের মাটি দুরমুশ করে না, কাপড় কাচে না। রাত

মামা ভাগ্নে সম্পর্কটা, আমি ক্রমশ টের পাচ্ছিলাম, খুব অনির্দিষ্ট সম্পর্ক। হয়তো সব সম্পর্কই অনির্দিষ্ট। আমি যদি বাবার সঙ্গে বড়দিনের ছুটিতে এখানে বেড়াতে আসতাম তো একরকম হত। এখন অন্য রকম হল। মামার সঙ্গে আমার দূরত্বের ভদ্র সম্পর্ক আস্তে আস্তে আটপৌরে আর রুক্ষ হয়ে এল।

মামা মাঝে মাঝে কর্তব্যবোধ আমার পড়াশোনার দিকে দৃষ্টি দিত। খাওয়াদাওয়ার পরে রাত সাড়ে নটায় যখন ঘুমে ঢুলে পড়ছি তখন গোটা পাঁচেক প্রশ্নের অঙ্ক দিয়ে পরীক্ষা করত। আমি যেহেতু একটাও পারতাম না অতএব শাস্তিস্বরূপ ঐ পুরো প্রশ্নমালার পঞ্চাশটা অঙ্কেরই সমাধান না করে সেই রাতে আমার শুতে যাওয়া নিষেধ হল। পঞ্চাশটা অঙ্ক সুদূরপরাহত ব্যাপার। অতএব আমি একটি আঁকড়িও না টেনে সমস্ত রাতের জন্য তৈরি হয়ে গা ছেড়ে চেয়ারে হেলে বসতাম। মামা আড়াইটের সময় জেগে দেখত, আমি নিঃশব্দে বসে আছি। অত রাতে আর হম্বিতম্বি চলে না।

মামার পরীক্ষার আগে একবার গুরুদেবকে জানানো হল। তিনি ডাকযোগে বেঁটে মোটা একটি কাঠের কলম আর গোটা পাঁচেক স্টিল নিব মন্ত্রপূত করে পাঠালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, মামা এবারও ফেল করল। যা হোক, পরের বছর ফল বেরোবার দিন কণ্ঠায় প্রাণটি নিয়ে যখন সবাই অপেক্ষা করছে, তখন সন্ধেবেলা কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম এল: মামা তার হিমালয়ের প্রথম বরফচূড়াটি জয় করেছে।

এই শহরে কোনো কলেজ নেই, অতএব মামা কুমিল্লায় ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়তে চলে গেল। কলেজের দীর্ঘ ছুটিগুলোয় সে বাড়ি আসত। অধ্যাপকদের সম্বন্ধে মজার মজার গল্প শোনাত। তখন তাকে বেশ লাগত। উজ্জ্বল দেখাত। কিন্তু এক বছরের মাথায় আবার দেখা দিল তার সেই পুরনো সংকট পরীক্ষায় ফেল করে বাড়ি ফিরে এল সে। এখানে ততদিনে নদীর ওপারে শহরের প্রথম কলেজটি হয়েছে। এবারে সে সেই নতুন কলেজেই ভরতি হল। এপার থেকে খেয়ানৌকোয় যুবকেরা কলেজে যায়। মামা আর জলিদা দুই বন্ধু একসঙ্গে যায়।

নদীর ওপারে মেঘ ঘনিয়ে থাকে, কিংবা রোদ্দুর ধূ ধূ করে- এ পাড়টা যেমন খাড়া উঁচু ও পাড়টা তেমনি অনেক দূর থেকে ঢালু হতে হতে জলে নেমেছে।

ভালোবাসা, স্নেহ পেতে গেলে কতগুলো গুণ থাকা দরকার। আমার মধ্যে সেই গুণগুলি জন্ম থেকেই নেই। স্বভাবে না থাকলেও চর্চা করে তা একটু-আধটু বাড়ানো যেত। আমি সে চেষ্টাও করি না। অতএব ক্ষুরধারবুদ্ধি দিদিমা আমাকে ঘোর অপছন্দ করেন, মাটোবুদ্ধি মাসিমার সঙ্গে আমার খটাখটি বাধে। আর এই দুই বুদ্ধির প্ররোচনায় দুর্বলবুদ্ধি মামা আমাকে ভুল পথে শাসন করবার চেষ্টা করে।

ইতিমধ্যে আমার বালকবয়স শেষ হয়ে যাচ্ছিল বালিকার কণ্ঠস্বর ভেঙে পুরুষের মোটা গলা জেগে উঠছিল, চামড়ার নিচে মাংসপেশির গঠন অ্যানাটমির ছবির মতো হচ্ছিল, পেশির মধ্যে হাড় তেজোময় হচ্ছিল। অভিভাবকদের খেয়াল রাখা উচিত, ঐ সময়ে কিশোরদের শরীরে কাম এবং রুদ্র একসঙ্গে জেগে ওঠেন। তাদের অসম্মান করতে অনর্থ ঘটতে পারে।

আমার দুষ্টুমি, অসভ্যতা, অবাধ্যতার শেষ ছিল না। লেখাপড়াতেও ভালো নই, সুতরাং দাদু দিদিমা মাসিমা মামা চারজনই আমাকে অল্পবিস্তর মারধর করত। তাতে আমি আপত্তির কিছু দেখি নি। বাবার কাছে থেকে আমার ভাইয়েরা তো আরও বেশি মার খায়। মারের আঘাতকে আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না, গভীর সূক্ষ্মতা নিয়ে লক্ষ করি মারের উদ্দেশ্য।

একটি একটি করে এবার বলি। দিদিমার নালিশ শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে দাদু হঠাৎ হয়তো আকস্মিকভাবে দু-চার ঘা লাগাতেন। আমি স্পষ্ট বুঝতাম, মারতে গিয়ে দাদু নিজেই কষ্ট পাচ্ছেন। সেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরেও তাঁর মুখখানি দুঃখিত হয়ে থাকত। আমি জানি, কখনো কখনো বড় মেয়ের কথা মনে পড়ে তাঁর। আমাকে মারলে অবধারিতভাবে মনে পড়বেই।

দিদিমার মার দেবার পিছনে ছিল আক্রোশ। অতএব তাঁর মারবার কায়দাও ছিল একেবারে অন্য রকম- যাতে আমি সত্যিকারের ব্যথা পাই, যাতে চামড়া ছিঁড়ে রক্তপাত হয়। এই দুষ্ট বুদ্ধি বুঝতে পেরে একদিন তাঁকে বেশ দু ঘা দিলাম। দিদিমা এমন হাউমাউ করে উঠলেন যেন কেউ তাঁকে খুন করছে। সন্ধেবেলা সবাই ফিরে এলে পারিবারিক আদালতে সেই মামলা উঠল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেদিন তা নিয়ে কেউ বিশেষ উচ্চবাচ্য করল না।

মাসিমার কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীনতা আমাকে খুব বিপদে ফেলত। লাইব্রেরি থেকে গল্পের বই এনেছি। মাসিমা সে বই লুকিয়ে রাখল। বই ফেরত দেবার দিন পেরিয়ে গেল, রোজ জরিমানা হতে লাগল। আমি বিপদে পড়ে কাকুতি-মিনতি করি কিন্তু মূর্খ মাতৃষ্বসার কাছ থেকে বই ফেরত পাই না। এ মহিলাকে এবার কি করা উচিত?

মাঝে মাঝে তার বিদ্যেবুদ্ধি তাক লাগিয়ে দিত। পুরনো প্রবাসী থেকে যীশুর একটি ছবি, সম্ভবত রাফাইলের, কপি করছিলাম। সে ছবিতে যীশুর দাড়িগোঁফ নেই, লম্বা চুল। রাফাইলের চুল আঁকার নিপুণতা আমার শুকনো পেনসিলের ডগায় আনবার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ মাসিমা পিছন থেকে এসে ছোঁ মেরে ছবিটা তুলে নিল 'দেখি কি করছিস। এই বয়সে লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েমানুষের ছবি আঁকছ! মাসিমা চেঁচামেচি করতে লাগল। দিদিমা তাঁর খুলনাইয়া গলায় ঘেন্না ঝরিয়ে বললেন- "আউ আউ আউ ছি ছি ছি'। আমি বাক্যহীন হয়ে মা-মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

দাদুর দূর সম্পর্কের এক ভাইপো, জ্ঞানমামা, এস ডি ও টি হয়ে এই শহরে এলেন। জ্ঞানমামা অসাধারণ সুপুরুষ, বর্মায় মানুষ, সদ্যবিবাহিত, আমাদের বাড়ির কাছে তাঁর বাংলো। একদিন উনিই খোঁজখবর করে আমাদের বাড়িতে এসে দেখা করে গেলেন। আমি মাঝে মাঝে তাঁর বাংলোয় যাই। তাদের বিশাল ড্রইংরুমের পুরো মেঝে কার্পেটে ঢাকা। ইন্দিরামামী কেবল কুশনের পর কুশন তৈরি করেন। তাঁর সময় কাটে না। চমৎকার শাড়ি পরে, স্ট্র্যাপ লাগানো রঙিন খড়ম পায়ে খটখট করে বারান্দায় হাঁটেন। নিজের হাতে ছানা কাটিয়ে সন্দেশ বানিয়ে, কেক বানিয়ে খাওয়ান।

একদিন সেখানে ডিনারে আমার নেমন্তন্ন। সন্ধেবেলা তৈরি হতে গিয়ে দেখি, একটা প্যান্ট ভেজা, দুটো প্যান্ট যাচ্ছেতাই ময়লা, আর একটা প্যান্ট অবশ্য সঁতসেঁতে হলেও পরা যাবে। কিন্তু শার্ট তো নেই চারটেই ছেঁড়া ভেজা ময়লা। ফিজি সিল্কের একটা সাদা হাফশার্ট মাসিমার বাক্সে পাট করা আছে, কিন্তু সেটা সে কিছুতেই দিচ্ছে না। একটা ফরসা ধুতি অবশ্য আছে। তাহলে আমি কি এই বর্ষার সন্ধ্যায় তাঁদের সোফা কৌচে সাজানো বাড়িতে ধুতি পরে, কোচার খুট গায়ে দিয়ে যাব? আমার নেমন্তন্নের আনন্দ চলে গিয়েছিল। কিন্তু নেমন্তন্ন যখন নিয়েছি, না গেলে ঠিক হবে না, সুতরাং ঐ ধুতিটি পরে, খুট গায়ে দিয়েই গেলাম। জ্ঞানমামা, ইন্দিরামামী আর আমি টেবিলে বসেছি, বাবুর্চী মং পরিবেশন করছে, ওঁরা গল্প করছেন, যেন কোথাও কোনো বৈসাদৃশ্য নেই। কিন্তু আমার ভিতরকার সেই বিপন্নতা আমি আজও ভুলি নি। এত কথা মনে আছে, কিন্তু কি খেয়েছিলাম কিছু মনে নেই।

মামা লাইব্রেরি থেকে গল্পের বই আনতে শুরু করেছিল। আমি ফাঁক পেলেই সে বই পড়ি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বেনামী বন্দর ঘোট বই কিন্তু তার 'শুধু কেরানী' গল্পটির বলার ভঙ্গিমা আমাকে চমৎকৃত করেছিল। আমি মিঃ ব্লেক আর তাঁর সহকারী স্মিথের রহস্যলহরী সিরিজের বই অনেকগুলো পড়েছিলাম। পাগলের প্রলাপ মনে হত। মামার আনা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশের ডায়েরী' আর 'ব্যোমকেশের কাহিনী পড়ে বুঝলাম গোয়েন্দা গল্প কাকে বলে। নাওয়া খাওয়া ভুলে বইদুটো পড়েছিলাম। অন্নদাশংকর রায়ের 'আগুন নিয়ে খেলা এক সন্ধেবেলায় হাতে এল। রাত জেগে পড়লাম। পেগি। স্কট সেই রাতের বেলা যেন রক্তমাংসের দেহ ধরে আমাকে উচাটন করে তুলল। এই সময়ে আর একটা বই, 'লন্ডন রহস্য', কোত্থেকে জোগাড় হয়েছিল মনে নেই। সে এক অদ্ভুত বই। মূল বই 'দি মিস্ট্রিজ অব দি কোর্ট অব লন্ডন'। এ হল তার বাংলা তরজমা। মোটা, বৃহৎকায়, বইটা জুড়ে অধ্যায়ে অধ্যায়ে কেবল বিলিতি লর্ড আর লেডিদের উত্তপ্ত রতিক্রিয়া আর উত্তেজিত কামকেলি। ঐ বয়সে সেই বই পড়ে স্ত্রীসংসর্গের অস্বস্তি আর সুখানুভূতি হল। মামার বিছানার নিচে লাল রেক্সিনে বাঁধাই এক সচিত্র বই পেলাম 'যৌবন পথে। বইটা

একেবারেই ভালো লাগে নি। মেয়েরা কি আঁধার রাত মাপবার গভীর কুয়ো? গল্প উপন্যাস পড়ে পড়ে আমার তো তাদের সুদূর ও বাসনা-করুণ মনে হত।

এই সময়ে একদিন বিকেলের চায়ের আগে মামা আমাকে বড়ঘরে ডাকল। দিদিমা মাসিমাও সেখানে আছে। মামার হাতে একটা বই তার প্রথম কয়েকটা পৃষ্ঠা কেউ ছিড়ে নিয়েছে, লাইব্রেরির সীলের উপরেও কালি বুলনো হয়েছে। মামা সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল, কেন আমি এ কাজ করেছি। আমি হতবাক। বইটা এর আগে আমি দেখিই নি। আর, যে-আমি বইয়ের একটা পাতা মুড়লে বা আঙুলের একটা ছাপ ফেললে চটে যাই সেই আমি কেন করব ও রকম। মাসিমা তার বোকা বুদ্ধিতে বলল– যাতে লাইব্রেরিতে তুই অপদস্থ হোস, তাই এসব করেছে। আমি মনে মনে ভাবলাম, ও, তাই বুঝি তুমি আমার 'পাতাবাহার' আর 'ছন্দের টুং টাং গায়েব করেছিলে?

মামার বিপত্তিটা আমি বুঝলাম। তার ফরসা মুখ ক্রমশ লাল হয়ে উঠছিল। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ সে খাট থেকে নেমে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি তৎক্ষণাৎ স্থির করে নিলাম, এই প্রথম লড়াই-ই যেন তার সঙ্গে আমার শেষ লড়াই হয়। আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম– একবার গায়ে হাত দিয়ে দেখ তোমার কি অবস্থা করি। আমি তৈরি হয়ে দাঁড়ালাম। মামা বুঝতে পেরেছিল। সে আর এগোল না। আমিও ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। সন্ধে ঘোর হল। কোথায় আর যাব, নদীর পাড়ে গিয়ে বসে রইলাম। ওপারটা অন্ধকারে ডুবে গেছে। আজ তারারাও ওঠে নি। হয়তো মেঘ করেছে। মামাকে ওভাবে বলা উচিত হয় নি। মামা তো লোকটা ভালো। বইটা ছিঁড়ল কে?

যা হোক, এইভাবে ধীরে ধীরে শাসন আলগা হয়ে এল। ভালোবাসাও যেটুকু ছিল তাও আলগা হল।

.

গোপালমামা

গোপালমামা হল দাদুর পিয়ন। পুরো নাম গোপালচন্দ্র ভদ্র। কিশোর বয়সে বরিশালের গ্রাম থেকে এসেছিল, তার পর থেকে এই বাড়িতেই আছে। এখন তার বয়স তিরিশ বত্রিশ হবে। সে দিদিমার সব আত্মীয়স্বজনকে চেনে, বাড়ির সব ঘটনা জানে। দাদু ট্যুরে গেলে সঙ্গে যায়, বাড়িতে বাজার করে, বাসন মাজে, উনুন ধরায়, শীতে গ্রীষ্মে বাড়ি সংস্কার করে।

গোপালমামার সঙ্গে আমার সম্পর্কটি চমৎকার। একটা সময়ে সে লিঅ্যানে আমাদের বাড়িতে ছিল, কাকার দোকানে সাহায্য করত। ঠাকুমা তাকে কুটুম্বদের ছেলে হিসেবেই দেখতেন। এখানে, আমাকে গোপালমামা তার দেশের গল্প বলত, কাকার সঙ্গে মালপত্র কিনে ফেরার সময় বড় নদীতে ডাকাতের হাতে পড়ার গল্প বলত। দাদুর সঙ্গে সে পাহাড়-লাইনে ট্যুরে যায়, বর্ষাকালে সেখানে পাহাড় ধসে ট্রেন আটকে থাকে। একবার টানেলের মুখে লাইনের উপর হাতির দল বসে পড়ে ট্রেনকে দু দিন আটকে রেখেছিল।

গোপালমামার নানারকম ব্যবসাবুদ্ধি ছিল। শীতের দিনে পাঁচ-ছ ঝুড়ি সিলেটের কমলালেবু কিনে কমলার লটারি করত। তিন আনা করে টিকিট। প্রথম পুরস্কার ১০০ লেবু, দ্বিতীয় পুরস্কার ৫০, তৃতীয় পুরস্কার ৩০, তার পরে ৫টি পুরস্কার ১০টি করে লেবু। সিলেটের কমলালেবু খুব পুষ্ট ও বড়। লটারির বিকেলে সামনের শিমুল গাছের তলায় শতরঞ্জির উপর কমলালেবুর স্তূপগুলি দেখলে লোভ হবেই। চটপট টিকিট বিক্রি হত। গোপালমামা একটা কাঁসর এনে নিলামের স্টাইলে পিটত। শীতের পড়ে আসা বিকেলে গাছতলায় উজ্জ্বল কমলালেবুর স্তূপ! বেশ হৈ চৈ ফুর্তি উৎসবের মতো লাগত লটারির বিকেল-সন্ধে। সবাই বলত গোপালদার লটারি।

গোপালমামা আরও একটা ব্যবসা করত, সেও এই শীতের দিনে। আর্যপট্টির মাঠে প্রত্যেক শীতে যুবকদের নাটকের দল দু-তিনখানা নাটক নামাত। একবার হয়েছিল লাল পাঞ্জা। গোপালমামা এই থিয়েটারের মাঠে চায়ের দোকান দিত। ডিশ, কাপ, কেতলি, ছাঁকনি, তোলা উনুন, বিস্কুটের টিন নিয়ে গোপালমামা খদ্দেরদের গরম চা বানিয়ে দিত। প্রচুর বিক্রি হত।

গোপালমামা মামাকে খোকন বলে ডাকত। মাসিমাকে দিদিমণি, দিদিমাকে মা। দিদিমাকে মা ডাকতে ডাকতে সে বোধ হয় নিজেকে বাড়িরই ছেলে ভেবে বসেছিল। ছোটখাটো আদর স্নেহ নিয়ে দিদিমার উপর অভিমান করে ফেলত। গোপালমামা অত বুদ্ধিমান, তবু বুঝতে পারত না, এই গৃহিণীটির অপত্য স্নেহ নিজের দুটি ছেলেমেয়েকে ঢেলে দেবার পরে যদি উদ্বৃত্ত এক-আধ ফোঁটা থাকে তবে তো সে পাবে।

.

বই আর ছবি

শরীর কি বস্তু, সেই যৌবনে টের পেয়েছিলাম, আর এখন বার্ধক্যে টের পাই নদীকে মাঝিরা যেমন টের পায় জোয়ার আর ভাটায়।

মৃত্যুর পরে শ্মশানে বসে হয়তো দেখব শরীর ফিরছে তার অঙ্গারে, জলে, ধাতুতে, লবণে। আর তার সূক্ষ্ম বিদেহ আভা চলে যাচ্ছে আকাশে- আলো মেঘ আর শান্তির দেশে। শরীর তো যা পেয়েছিলাম তাই ছিল, কিন্তু অস্তিত্বের ঐ বিদেহ আভা আমিই দিনে দিনে তৈরি করেছিলাম বই পড়ে, ছবি দেখে, গান শুনে।

সেই ছেলেবেলাতেই প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, বিচিত্রা ছাড়াও অন্য পত্রিকার কিছু পুরনো সেট পড়েছিলাম। এসব কাগজ হয়তো আমার জন্মের আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মালঞ্চ, গল্পলহরী, মানসী ও মর্মবাণীর গল্পগুলিতে সেই পুরনো দিনেও আমি আরও পুরনো দিনের গন্ধ পেতাম। একটি বেশ মোটাসোটা নিয়মিত পত্রিকা, এখন নাম মনে পড়ছে না, ছিল শুধুই ভূতের গল্পের। এই পত্রিকাটি ছিল বড়দের জন্য এর গল্পগুলিতে স্ত্রীপুরুষের ইহজীবনের রিরংসা, লালসা, প্রতিহিংসা, কামনার ভয়ংকর কাহিনী পুনরভিনীত হত পুরনো অট্টালিকার ছায়াজগতে। এসব হচ্ছে, নিতান্তই গল্পখোর পাঠক পাঠিকার কাগজ, তবু এরাও মাথার মধ্যে ঢুকে বসে আছে।

বসুমতীই ছিল দীনেন্দ্রকুমার রায় বা তাঁর রহস্য লহরী সিরিজের পৃষ্ঠপোষক। মিঃ ব্লেক ও স্মিথের একের পর এক গোয়েন্দা কাহিনী একদল পাঠক গোগ্রাসে গিলত। আমিও দুলালদার কাছ থেকে এনে কয়েকটা পড়েছিলাম। কিন্তু সেই কামারে গল্প আর তার অদ্ভুত ভাষা বেশি দিন সহ্য করা গেল না। মাসিক বসুমতীতে তখন সতীশ সিংহ এবং চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় পাতার পর পাতা ভরে অজস্র ব্যঙ্গচিত্র আঁকতেন। ক্রোধ, প্রতিহিংসা, অট্টহাস্য, হাহাকার, ভয়, বিস্ময়, সেঁতো হাসি– এই রকম সব ক্যাপশনসহ ‘ভাবের অভিব্যক্তি’ শিরোনাম দিয়ে এক ব্যক্তির নানা ভঙ্গির প্রচুর ফোটো বেরুল একবার।

ভারতবর্ষের প্রধান লেখক ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরশুরাম, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলবালা ঘোষজায়া, প্রবোধকুমার সান্যাল সেই সময়ে এঁরা প্রত্যেকেই খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন, অথচ আজ শরৎচন্দ্র ও শরদিন্দু ছাড়া কারো বই দোকানে পাওয়া যাবে না। শৈলবালা ‘শেখ আন্দু লিখেছিলেন। তখনকার জীবনে যেহেতু ভালোবাসবার মতো মেয়ে পাওয়া সম্ভব ছিল না অতএব প্রবোধ সান্যালের ‘আঁকাবাঁকা’, ‘আলো আর আগুন’ কিংবা প্রিয় বান্ধবীর নায়িকাকে তরুণেরা বুকে করে রেখে ভালোবাসত। ভারতবর্ষে একটি করে গানের স্বরলিপি থাকত। ভলগার মাঝিদের গানের সুরে দিলীপকুমার রায় একটি গান লিখে তার স্বরলিপি করেছিলেন। এসব গান কাগজের পৃষ্ঠায় বোঝা যায় না, শব্দগুলি যেন মাছির মতো বসে থাকে, কিন্তু গাইলেই অন্য রকম, যেন যাযাবর হাঁস ভেসে পড়েছে আকাশে। আমি সত্যিই গানের মধ্যে তার ডানার ঝাঁপট শুনতে পাই কে এলে হিমেলা বায়ে, মেলে পাখা মেলে পাখা মেলে পাখা। কিন্তু মুশকিল হল- উমা বসু ছাড়া কে গাইবে এই গান।

ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ লিখতেন না। কিন্তু ‘মধুগন্ধে ভরা মৃদুস্নিগ্ধছায়া’ এবং প্রেম এসেছিল নিঃশব্দচরণে’ গান দুটি স্বরলিপিসমেত বোধ হয় সেখানেই ছাপা হয়েছিল। অর্থ না বুঝে, সুর না শুনেও, শুধু ভাষার ছবি আমাকে এমন মুগ্ধ করল যে আমি তাদের আমার নোটখাতায় টুকে নিলাম–

সে তখন স্বপ্ন কায়াবিহীন
নিশীথতিমিরে বিলীন
দূরপথে দীপশিখা রক্তিম মরীচিকা ।।

এই নোটখাতা বহুদিন আমার কাছে ছিল। গীতবিতান কেনার পর ক্রমশ সেটি নিরর্থক হয়ে লুপ্ত হল।

বনফুলের 'জঙ্গম' উপন্যাস কয়েক বছর ধরে ভারতবর্ষে বেরিয়েছিল। প্রত্যেক মাসে শংকর, করালীচরণ, মিষ্টিদিদির জন্য অপেক্ষা করতাম। জঙ্গম পড়ে কলকাতার অলিগলি, উত্তর কলকাতার স্ত্রীপুরুষের বিচিত্র জীবন ও বিপন্নতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেছিলাম।– শহরের নদীজল, নর্দর্ম্মার জল আর ঢেলে দেওয়া চোলাই একস্রোতে বয়ে চলেছে। কয়েক বছর পরে শুনেছিলাম, জঙ্গমের অনেক চরিত্রই বাস্তব থেকে নেওয়া। ভনটু সত্যিই একজন ছিল, করালীচরণ সত্যিই একজন ছিলেন। আর শংকর নাকি 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাস। এইখানটাতে আমার মন বেঁকে বসল- শংকরকে আমি দারুণ পছন্দ করি। সেই চমৎকার যুবকটির সঙ্গে কিছুতেই ঐ চওড়া-চোয়াল, ঘাড়ছাঁটা চুল, ওভারকোট গায়ে লোকটিকে মেলানো যায় না।

সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ পত্রিকা ছিল, নিঃসংশয়ে প্রবাসী। প্রত্যেক সংখ্যা শুরু হত রবীন্দ্রনাথের নতুন কবিতা দিয়ে। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্যদের ছবি সেই যুগে আমি প্রবাসীতেই পেয়েছি। সেই বয়সে আমি কতটুকুই বা বুঝতাম। হয়তো বুঝতাম না বলেই ঐ সৌন্দর্য একলা পেয়ে আমাকে আবিষ্ট এবং বিভোর করে দিত। অনুচিত জেনেও, কিছু কিছু ছবি কেটে নিয়ে, লুকিয়ে আলাদা অ্যালবাম তৈরি করেছিলাম। এত বছর, এত রণ রক্ত বিফলতার পরেও সেই কয়েক শশা ছবি যক্ষের ধনের মতো এখনও আমার কাছে রয়েছে। এখনও সেই অ্যালবামগুলি আমি বার করে দেখি।

'মাসিক বসুমতী'তে মিস্টার টমাস নামক একজন প্রতিসংখ্যায় ছবি আঁকতেন- সে ছবি হল স্খলিত-শাড়ি কোনো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ের ফোটোগ্রাফ, বেশ সমুচিতভাবে রং

করা। সুন্দরীর পায়ের কাছে ছাড়া কাপড়ের মতো ক্যাপশন হিসেবে পড়ে থাকত রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন। অন্য কাগজে রবি বর্মার ছবিও ছাপা হত সে ছবির একটা জৌলুশ ছিল সোনার গিল্টি করা মোটা ফ্রেমে বাঁধিয়ে সে ছবি প্রাসাদের দেয়ালে টাঙালে মানাবে ভালো- নিচ দিয়ে যারা আসবে যাবে তাদের উপর নিঃশব্দে হুকুম করবে সে ছবি। কিছু নিসর্গচিত্র ছিল থিয়েটারের ড্রপ সীনের মতো। কিছু পৌরাণিক বিষয়াশ্রিত ছবি ছিল ক্যালেন্ডারের ছবির চেয়ে হয়তো একটু আলাদা।

অবনীন্দ্রনাথ চিত্রের ঐ জগৎটাকেই পালটে দিলেন। ছবি শুধু চিত্রকরের আঁকা নয়, ছোট ছেলেরও আঁকা। চিত্রকর এই ছোট ছেলেটিকে প্রথম দেখতে পেয়েছিলাম অবনীন্দ্রনাথে, তার পর গগনেন্দ্রনাথে। ওঁরা খেলতে ভালোবাসতেন। আচার্য এবং ওস্তাদ নন্দলালও শেষে খেলার দিকেই গিয়েছিলেন।

ভারতী, প্রবাসী, বিশ্বভারতী পত্রিকা এবং আরও নানা কাগজে অবনীন্দ্রনাথের কত যে প্রিন্ট দেখেছি, প্রদর্শনীতে কত যে মূল ছবি দেখেছি মুঘল শৈলীর ছবি, কৃষ্ণলীলার ছবি, পাখির ছবি, মুখোশের ছবি, প্রতিকৃতি, ঠাকুরবাড়ির গলিতে নামা সন্ধ্যার কলকাতার ছবি, সাজাদপুরের ছবি, পাহাড়ের ছবি, পুরীর পথের ছবি। কিন্তু সব ছবিকে ছাপিয়ে যেন কুঠুরির পর কুঠুরি পেরিয়ে আসল ঘরটিতে রয়েছে শিশু হয়ে খেলার ছবি, শিশু ভাবের ছবি। মৌচাকে বেরিয়েছিল একখানা সোয়া দু ইঞ্চি বাই সোয়া পাঁচ ইঞ্চি ছবি : জগৎ-পারাবারের তীরে ছেলেরা করে মেলা। পিছনে সুদূরে নীলসবুজ সমুদ্রের একটি ঢেউ, সামনে বেলাভূমিতে লাল ফতুয়া গায়ে ন্যাংটো একটি শিশু খেলায় আর স্বপ্নে ডুবে আছে। ছেলের পালের মেলা নয়, শুধু একলা একটি ছেলে। ছবিটিতে কোথাও একটি ঘাস নেই, পাতা নেই, পাখি নেই- ঐ একটি ঢেউয়েই সিন্ধুর কলরোল দোলনার দুলুনির মতো শোনা যায়। এই হল জগৎ-পারাবার। এই একটি নিরলংকার ছবি দেখার পর থেকে জগৎ এবং জগতে আমার জন্মজন্মান্তরের উপর অতি কোমল কুয়াশা পড়তে থাকে।

'পুত্তলিকাপুরের দেশের ছাড়পত্র' ছবিটি সামনে নিয়ে কিছুক্ষণ দেখার পর মনে হতে থাকে, এই ছবির জমিটিতে পা দিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই চলে যাব এক অন্য পৃথিবীতে। এই ছবিটি একটি ইশারা। অবনীন্দ্রনাথের রূপের পৃথিবীতে কোনো বাসনা নেই, অথচ যা আছে তা বাসনার চেয়ে মনকে অনেক বেশি ব্যথিত করে।

অবনীন্দ্রনাথের চেয়েও অনেক বেশি ছবি দেখেছি নন্দলাল বসুর, কারণ অনেক বেশি এঁকেছিলেন তিনি। এই পৃথিবী, নিসর্গ, মানুষ ও দেবদেবী অনেক দিন তাঁর কাছে বস্তু ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিরেট দেয়াল হয়ে ছিল ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করতে করতে, আঁকতে আঁকতে জগৎ শেষে আত্মপ্রকাশ করল। ক্রমশ প্রাণীর কঙ্কাল, পাতার শিরা, গাছের গাঁট, পাথরের স্তব্ধতা বা ঢেউয়ের অস্থিরতা পেরিয়ে তিনি তাদের আত্মায় বা গহন দেবত্বে পৌঁছলেন। বাংলার নতুন চিত্রকলায় তিনিই একমাত্র সাধনসিদ্ধ পুরুষ।

শেষ অনেকগুলি বছর ধরে নন্দলালের ছবির অবলম্বন ছিল লোকজীবন, সাধারণ জীবন, পারিপার্শ্বিক জীবন। কলম রং কালি তুলি মাধ্যম যাই হোক; ওঅশ টেম্পারা চীনা কালির টাচ- পদ্ধতি যাই হোক, আচার্যের কৃৎকৌশল ফুটে বেরোত টানটোন দ্রুত এবং অমোঘ ভাব, রূপ, বিন্যাস এবং প্রাণ চারটি জিনিস নিয়ে চতুষ্কোণ ছবিটি চমৎকার সমতা পেত। মেয়েদের প্রতীক্ষার অজস্র ছবি, সন্ধ্যাপ্রদীপ দেবার ছবি, সাঁওতাল জীবনের ছবি, সহজ পাঠের ছবি, ভজার বাঁশীর ছবি, ক্ষুধার্ত শিব ও অন্নপূর্ণার ছবি, ছড়ার ছবির ছবি, হরিপুরা কংগ্রেসের মণ্ডপ সজ্জার ছবি নিয়ে কত সময় কেটে গেছে আমার।

আমার জন্মের বছর বার আগে প্রবাসীতে ভারতশিল্পে মূর্তি নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। সে লেখায় সদৃশ বস্তুর সঙ্গে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মিলের কথা ছিল। পাশাপাশি নন্দলাল এবং বেঙ্কটাপ্পার রেখাচিত্র দিয়ে ব্যাপারটা চমৎকার বোঝানো হয়েছিল। কুকুটাণ্ড অথবা পানপাতার সঙ্গে মুখমণ্ডলের মিল। চিবুকম্ আবীজ। পদ্ম, খঞ্জন, চেরা পটোল ও পুঁটিমাছের সঙ্গে বিভিন্ন রকম চোখের সাদৃশ্য। আমি দেখলাম, খঞ্জনের মতো করে চোখটি আঁকলে খঞ্জনের মতোই সেই চোখ নেচে ওঠে। বান্ধুলী ফুলের

মতো অধর। কলা গাছের মতো মেয়েদের ঊরু। নানা জাতের শরীরের কিছু মাপজোকের কথা ছিল। নরমূর্তি দশ তাল, ক্রমূর্তি বারো তাল, অসুরমূর্তি ষোল তাল, বালমূর্তি পাঁচ তাল। আমি তখন কুমারমূর্তি, আমার মাপ ছয় তাল। সেই লেখাটি পড়ে, ছবিগুলি দেখে ভারতশিল্পে শারীরসৌন্দর্যচিন্তা বিষয়ে আমার কিছুটা ধারণা হল।

প্রবাসীতে তখন আরও ছাপা হত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, সারদা উকিল, আবদুর রহমান চুঘতাই-এর ছবি। এঁদের কারো কারো মূল বড় ছবি অবিভক্ত ভারতবর্ষে লাহোর জাদুঘরে টাঙানো দেখেছি। জানি না এখনও সেসব ছবি সেখানে আছে কিনা।

আচার্য নন্দলালও শেষে শিশু-দৃষ্টির কথা বলেছিলেন। সেই কাহিনীটা এখানে বলে রাখি। আমার যখন চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স তখন ছবির টানে, বৈতালিকের গানের টানে, সুরেন করের স্থাপত্যের টানে, খোয়াইয়ের উপর অপরাহ্ন দেখার টানে মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে যেতাম। স্কুল কলেজ হস্টেল যখন বন্ধ থাকত সেই জনহীন সময়টাই আমি বেশি পছন্দ করতাম। প্রথম বার যখন নন্দলাল বসুর সঙ্গে দেখা করি তাঁর কাছে আমার রং লাগাবার সমস্যা নিয়ে কতগুলো প্রশ্ন ছিল। আকাশ থেকে আসা আলোর উজ্জ্বলতা কিছুতেই আমি আঁকতে পারি না। বিকেলের আলো, মেঘের গায়ে সন্ধ্যার আলো, চাঁদের আলো আঁকতে গেলে সমস্ত আলোর উপর ছায়া পড়ে, শেষে দেখি বেশি রং লাগিয়ে ছবি আরও ময়লা হয়ে গেছে।

সেদিন তখন বেলা নটা-দশটা। বাইরে বীরভূমের রোদ বেশ চড়া হয়েছে। নন্দলাল আমাকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নন্দনে এলেন, তালা খুলে ঘরে ঢুকলেন। মাথা থেকে পাট করা ভিজে গামছাটি নামিয়ে যথাস্থানে রেখে তাঁর আসনে বসলেন। আমার স্কেচ খাতা দেখলেন। কতকালের শিক্ষক তিনি, মুখে কিছু না বলে, সেই দুর্বল স্কেচের উপর ট্রেসিং কাগজ রেখে পুরো ছবিটাকে আমার চোখের সামনে নতুন করে এঁকে দিলেন।

তার পর আমার জিজ্ঞাসা ও সমস্যার উত্তরে বললেন– দ্যাখো, আলো ওভাবে আঁকা যায় না। প্রকৃতি যে আলো ফোঁটায় সে আলো আমরা কি করে ফোঁটাব। আমি যে এতকাল ধরে আঁকছি, আমিও পারি না। তাহলে এই রং নিয়ে আলো আর ছায়া কিভাবে দেখাব? ইতিমধ্যে ঘরের লাল মেঝেটিতে কানাই সামন্ত এসে নিঃশব্দে বসেছেন। নন্দলাল বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন- ঐ দ্যাখো, জানলার পাশে কাঞ্চন গাছে রোদ পড়েছে। যেখানটায় রোদ পড়েছে সেখানটা সাদা, যেখানে পড়ে নি সেখানটা কালো। অর্থাৎ আলো, ছায়া। সাদা কাগজে শুধু কালো রং দিয়ে এই আলো ছায়া আঁকা যায়। কালো এই একটা রং-ই যথেষ্ট। আমি কাঞ্চনের ঝোপে স্পষ্ট সাদা কালো দেখছি। তুমি দেখতে পাবে না। তোমার বয়স হয়েছে। তোমার বুদ্ধি তোমাকে দেখাবে সবুজ সবুজ আর কম-সবুজ, গাঢ় সবুজ আর হালকা সবুজ। ছোট ছেলেরাই ঠিক দ্যাখে। আমি এখন ছোট ছেলের মতো দেখার চেষ্টা করি। তোমার বয়স হয়েছে, বুদ্ধি হয়ে গেছে। তুমি এখন পারবে না।

.

পুরনো প্রবাসীতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপরাজিত পড়েছিলাম। আরণ্যক যখন মাসে মাসে বেরুত আমি তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। এর বছরখানেক পরে বই আকারে পথের পাঁচালী পড়লাম। এসব বইয়ের দেশকাল আমারই সময়কার। সে দেশকাল এখন লুপ্ত হয়ে গেছে। আমরা মরে গেলে তার জীবন্ত স্মৃতিটি লীন হয়ে যাবে বইগুলির ছাপার অক্ষরের দেহে। পথের পাঁচালীতে মায়াময় শব্দটা অনেক বার আছে। আচার্য শংকরের চেয়ে বিভূতিভূষণ মায়া কাকে বলে অনেক গভীরভাবে বুঝিয়েছেন।

মৌচাকে চাঁদের পাহাড় বেরুত (১৯৩৫)। আমি সহপাঠী শংকরের কাছ থেকে মৌচাক এনে পড়তাম। চাঁদের পাহাড় এত সরলভাবে লেখা যে আমি অনেকদিন ঐ গল্পটিকে সত্য কাহিনী বলেই জানতাম। ঐ একজন লেখক যাঁর লেখা, গল্প জেনে শুরু করলেও, পড়তে পড়তে সত্য বলে মনে হয়। পথের পাঁচালী, অপরাজিত, আরণ্যক, এমনকি তারানাথ তান্ত্রিকের গল্পেও সেই এক মায়া।

তখনও সিনেমার পত্রিকা বেরুত দীপালি, খেয়ালী। সচিত্র ভারত নামে একটি নতুন পত্রিকা বেরুল চিত্রসংবাদের। আগাগোড়া আর্ট পেপারে ছাপা। বিচিত্র বিষয়ের ফোটোর সঙ্গে স্বল্প পরিসর খবর ছাপা হত। এই কাগজে দুটো ছবি দেখেছিলাম অনাগারিক পি গোবিন্দ আর লি গোতমীর আঁকা। দুটি ছবিরই রং এবং ড্রইং এমন যে মনে থেকে যায়, চিত্রীদের নাম দুটিও এমন যে ভোলা যায় না। পরে জেনেছিলাম গোবিন্দ জার্মান, গোতমী পারসী। গোতমীর আগেকার নাম ছিল রতি পেটিট। তাঁরা বৌদ্ধ হয়ে নতুন নাম নিয়ে বিয়ে করেছেন। রতি অনেক সুখদুঃখ পার হয়ে এসেছিলেন। তার পরে তাঁদের কি হল জানি না।

গোবিন্দ বা গোতমী খুব গুরুত্বপূর্ণ কেউ না, তবু তাঁদের কথা উল্লেখ করলাম এই ভেবে যে মানুষের চিরকল্লোলময় মহাসমুদ্রে এই রকম কত জীবন একসময়কার কাগজপত্রে একটু চিহ্ন রেখেছিল তারা বুদবুদের মতো ক্ষণিক জেগে উঠে আবার মিলিয়ে গেছে। এত রকম বিচিত্র জীবনের স্মৃতি যদি চয়ন করে রাখা যেত তাহলে কেমন দাঁড়াত?

সাধুদিদির বাড়িতে রান্না করতেন নবকুমারঠাকুর। তাঁর বই পড়ার নেশা ছিল। তিনি ‘ছোট গল্প’ নামে একটি অভিনব সাপ্তাহিক রাখতেন। অতি পরিচ্ছন্ন পত্রিকা একটি সংখ্যায় একটি গল্প। দাম এক আনা। এক সংখ্যায় মনোজ বসুর ‘দেবী কিশোরী’ পড়েছিলাম। নবকুমারঠাকুরের কাছে আর একটি বেশ মোটাসোটা বই ছিল : দেবগণের মর্ত্যে আগমন।

আমার এত নানারকম বই পড়ার পিছনে কারণ ছিল। আমি জীবনটাকে নিংড়ে নিতে চাইতাম। অন্য কোনো উপকরণ না পেয়ে অজস্র জীবনের প্রতিরূপ নিষ্প্রাণ বইগুলিকেই নিংড়ে নিতাম। তবু অদ্ভুত অদ্ভুত অজস্র বই পড়লেও আমি ক্রমশ নির্বাচক হয়ে উঠছিলাম। নিষেধাজ্ঞা মুক্ত হয়ে পথের দাবী’ নতুন করে বেরুলে পাঠকমহলে বেশ গোপন উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। আমি দু দিনের কড়ারে অতি কষ্টে সে বই জোগাড় করে পড়লাম। ভালো লাগে নি। অত নামকরা বই শেষ প্রশ্নও ভালো লাগে নি। এত কথা! তবু শেষ পর্যন্ত কেমন শূন্যগর্ভ মনে হল।

অবশ্য সময় না হলে কেউ কিছু বোঝে না। রবীন্দ্রনাথের বাঁশরি পড়ে বুঝি নি। ছোট্ট বই ডাকঘর-ও কি বুঝেছিলাম? কিন্তু বইটি শেষ করার পরে সেই দিনটা কেমন উন্মনা হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা অতি সামান্য পড়েছিলাম। কিন্তু যেহেতু আমার যৌবনাগমের তখনও কিছু দেরি ছিল অতএব সুবিধা করতে পারি নি। আমার এখনও ধারণা, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ঢুকবার প্রথম উপযুক্ত সময় হল আরক্ত, বেদনাহত প্রথম যৌবনকাল।

সেই ছেলেবেলা থেকে বড়দের বই আর ছোটদের বই আমি একইসঙ্গে পড়ে আসছি। এখনও সেই অভ্যাস যায় নি। তাহলে বড়দের বইয়ের পরে এবার ছোটদের বইয়ের কথা বলি।

একই বছরে (১৩২৭) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সন্দেশে খাতাঞ্চির খাতা আর মৌচাকে বুড়ো আংলা লিখেছিলেন। মাসে মাসে সেই সব টাটকা সন্দেশ আর মধু যারা চেখেছিল তারা কেউ হয়তো এখন আর বেঁচে নেই, কিন্তু তাদের বাল্যকালটা রয়ে গেছে বইগুলিতে। আমি যখন ক্লাস ফাইভে তখন পনেরো বছরের পুরনো সেই সংখ্যাগুলি পড়ছিলাম। পুতু বা যক হয়ে যাওয়া রিদয়, কাউকে ঠিক বুঝতে পারি নি জায়গাটা সত্যি, অথচ ঘটনা দুটো যেন রূপকথা। পড়তে পড়তে জোড়াসাঁকোর আকাশের উপর দিয়ে বা হাঁসের দলের সঙ্গে চাঁদপুর-মেঘনার চরের উপর দিয়ে উড়ে যাই। সন্দেশে জোড়াসাঁকো অঞ্চলের একটা অতি মজার ম্যাপ ছিল। বই করে বার করার সময় প্রকাশকমশায়রা সেটিকে কোথায় খোয়ালেন।

মৌচাক ছিল শহুরে কাগজ আর শিশুসাথী ছিল পল্লীবাংলার পত্রিকা। মৌচাকে যেমন চাঁদের পাহাড়, আবার যকের ধন বেরিয়েছিল শিশুসাথীতে তেমনি বেরিয়েছিল খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ভোম্বল সর্দার। যকের ধনের বিমল-কুমার হল গল্পের দুই বাঙালি বীর। তারা মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরে, বন্দুক হাতে আফ্রিকার জঙ্গলে গোরিলাদের মুখোমুখি হয়। আর ডোম্বল হল আমাদের গাঁয়ের ছেলে, আলগা-বাঁধন কিশোর খালি গায়ে এক কাপড়ে সে

গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে চলেছে। সেও বীর। ফণী গুপ্ত এই বইটির পাতায় পাতায় ছোট ঘোট ছবি এঁকেছিলেন। সে ছবিতে গ্রামের পুকুরজলের তরল ঢেউ, গাঁয়ের পথে গাছপালার ছায়া, পদ্মবিলে সাপ, একলা-থাকা বুড়ী আর তার গরুর কথোপকথন, নায়েব-গোমস্তার কাছারিবাড়ি, পাঠশালার পোড়, এমনকি হাটের ময়রার দোকানের মাছির ঝাঁকের গুঞ্জন পর্যন্ত দেখা যায়, শোনাও যায়।

হেমেন্দ্রকুমার রায় ছিলেন ছেলেদের একচ্ছত্র প্রিয় লেখক। তাঁর ময়নামতীর মায়াকানন, অদৃশ্য মানুষ, কিং কং, জয়ন্তের কীর্তি, মানুষ পিশাচ, সন্ধ্যার পর সাবধান রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়েছি। ভয় দেখানোর গল্পে তাঁর জুড়ি নেই।

একদিন রাত সাতটা-সাড়ে সাতটা। বাড়িতে কেউ ছিল না। মাসপয়লা পত্রিকায় হেমেন্দ্রকুমারের গল্প 'মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী' পড়ছিলাম। কুমুদিনী এক পিশাচী। শীতের রাতে লেপ জড়িয়ে লন্ঠনের আলোয় সেই গল্প পড়তে পড়তে ভয়ে যেন নিশ্চল হয়ে গেছি। বাইরের দিকে অন্ধকারে তাকাতেও সাহস পাচ্ছি না। এমন সময় কাঠের খাটটা ছতরি-ডাণ্ডা সমেত দারুণ ঝাঁকুনিতে খটমট করে নড়ে উঠল। আমি কুমুদিনীর হাত থেকে বাঁচতে সঙ্গে সঙ্গে লেপ মুড়ি দিলাম। হঠাৎ চারদিক থেকে শাঁখের আওয়াজ আর উলুর শব্দ উঠল– বাড়িগুলি থেকে দুড়দাড় করে বেরিয়ে সবাই রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। ভূমিকম্প হচ্ছে। কুমুদিনী পিশাচীর চেয়ে ভূমিকম্প সহস্র গুণে ভালো আমিও এক লাফ দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

আগে পুজোয় বার্ষিক 'শিশুসাথী' বেরুত। পরে তার সঙ্গে শুরু হল দেব সাহিত্য কুটিরের পূজা-বার্ষিকী। এসব বইয়ের কাগজ, ছবি, ছাপা, বাঁধাই অতুলনীয়। দেব সাহিত্য কুটিরের প্রথম বার্ষিকী 'ছোটদের চয়নিকা'। তাতে শুধুই কবিতা। কয়েক মাসেই সে বই ফুরিয়ে গেলে সে বছরই বাসন্তী পূর্ণিমাতে আরও সুন্দর করে দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুল। এ ঘটনা থেকে সে যুগের ছোটরা কেমন ছিল, তাদের অভিভাবকেরা কেমন ছিলেন খানিকটা বোঝা যাবে।

এক বছর বার্ষিকী বেরুল 'সোনার কাঠি'। সোনার কাঠির প্রথম লেখা 'মোগলু' মাঠের শেষে গ্রাম/সাতপুরিয়া নাম। বইটা সত্যিই সোনার কাঠি মলাট খোলামাত্র পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরের শিল্প আর প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁশ গাছের আড়ালে সাতপুরিয়া গাঁয়ের শুকনো নদীর ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাওয়া স্রোতের ছবি। এসব পৃষ্ঠা এখনও চোখে ভাসে।

আমার বইয়ের কোনো অভাব হয় না। জুল ভেন, ডিফো, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, কোনান ডয়েল, শিবরাম চক্রবর্তী, রেমার্কের বই তো সবাই পড়ে, আমি পরীর দৃষ্টি, হাতেম তাই, বেপরোয়া, মরণের মুখে, পাইলট শিলু, লালন ফকিরের ভিটে, কানাকড়ির খাতার মতো তুচ্ছ বই পড়েও ছায়া-অন্ধকার নেমে আসা বর্ষা-শীতের বিকেলকে ফুরফুরে করে নিতাম। অনেক সময় ত্রুটিহীন জমাট কাহিনীর চেয়ে খেয়াল-খুশির হালকা লেখা আমার বেশি ভালো লাগত। এইসব লেখায় কেমন যেন রঙিন অবহেলা জড়িয়ে আছে। এটা একটা দুর্লভ গুণ। সুনির্মল বসুর ছবি ও কবিতায় এই দুর্লভ গুণটি দেখতে পেয়ে আমি তাঁর ভক্ত হয়েছিলাম। তাঁর উশ্রীগিরিডির সাঁওতালের ঘরে ফেরার জংলা সুরে রয়েছে ঐ অলস বিষণ্ন সৌন্দর্য–

বন-পাহাড়ী জংলা ভারি
আংলা বুড়োর দেশ।
উঁচু নিচু ঘাসের জমি,
পথের নাহি শেষ।
ফাগুনবেলা শেষ হয়ে যায়।
আগুন হাওয়া বয়
সন্ধ্যারেতে জাগতে পারে।
ভূত-পেরেতের ভয়।
ঝরা পাতায় পথ ঢেকেছে,
হায় হল মুশকিল
শিরশিরিয়ে উঠছে দূরের

শিরশিরিয়ার ঝিল।
ওরই পাশে মাঠটি যেন।
জানা জানা ঠিক
ছোটকু মাঝির ভিটে ছিল
ওরই কোনো দিক।
এমনি দিনে ছোটকু মাঝি
বাঘের পেটে যায়–
এমনি দিনে, এমনি বেলায়,
এমনি নিরালায়।
জংলা দেশের ঠিক কি বল্
মংলা ভায়া জলদি চল্
জলদি চল।

(মাদল– দিপির দিপাং দিপির দিপাং দিপির দিপাং তাং
বাঁশি– তুতুর তু আ উতুর তু আ তুতুর তু আ তু...)

আমাদের পাশের পাড়ার প্রতিবেশী অনন্ত ভট্টাচার্য মাসপয়লাতে ছবি আঁকতেন। ছবিতে সই করতেন AB। গুরুপদদা আর আমি তাঁর বাড়িতে যেতাম। অনন্ত ভট সাত্ত্বিক ধরনের মানুষ। মাসে দু-তিনটি জল রঙের ছবি করতেন। খুব চুপচাপ জীবন। শরীরও ভালো ছিল না।

সমর দে প্রধানত আঁকতেন মৌচাকে। তাঁর কাজ একেবারেই অন্য রকম রেখাই সে ছবির সৌন্দর্য। রেখা এঁকেবেঁকে পালতোলা নৌকোর মতো, জলের ঢেউয়ের মতো নিটোল সুষম শরীরের খোকাখুকু, বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরীর মূর্তি ধরেছে। তাঁর ফ্রক পরা, লম্বা বিনুনি করা, স্যান্ডেল পায়ে মেয়েদের মধ্যে একটা পরী পরী ভাব তারা মাটিতে হেঁটেও যেন বাতাসে উড়ন্ত। কবিতার গুণ পেত তাঁর ছবি।

ছোটদের গল্প-কবিতার সঙ্গে যাঁরা ছবি আঁকতেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো তিনজন ছিলেন প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণী গুপ্ত আর সমর দে। তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্টাইল, কিন্তু একটা মূল জায়গায় তারা এক তারা তিনজনই প্রাণ ভরে তখনকার বাংলা দেশ আর বাঙালিজীবনের ছবি এঁকে গেছেন। বাড়িগুলো সব বাঁশবন, চাঁপা গাছ, ধানখেত বা নদীতীর সন্নিহিত কুটির। মায়েরা সব হাসিমাখা মুখ, ঘরোয়া ধরনে শাড়ি পরা। তিরিশের দশকের একেবারে প্রথম দিকের ছবিতে দেখতাম, বালক-বালিকাদের পরনে ধুতি ও শাড়ি সেগুলি তারা যেন ছোটদের অগোছালো ধরনে নিজেরাই পরে নিয়েছে। ছেলেদের গায়ে জামা নেই, মেয়েরাও খালি-গা, খালি-পা। রাখালছেলের হাতে পায়ে বালা ও নূপুর, গলায় মাদুলি, নদীর ধারে বনের ছায়ে বসে বাঁশের বাঁশি বাজাচ্ছে।

পরের তিন-চার বছরে দেখছি– বাবা কাকা ডাক্তারবাবু ঠিকাদারবাবু যিনিই হোন তাঁর পরনে ধুতি পাঞ্জাবি শার্ট বা শার্টের উপরে কোট। শার্ট বা কোট যাই হোক, ট্রাউজার্স কখনো না। শার্ট ধুতির মধ্যে খুঁজে পরা। পায়ে ফিতে বাঁধা জুতো। বালিকারা তখনও ফ্রক পরছে না।

তিরিশের শেষ দিকের ছবিতে কৃচিৎ পুরুষেরা প্রয়োজনে ট্রাউজার্স পরছেন। বালিকারা কিন্তু ফ্রক ধরেছে, স্যান্ডেল পরছে। মা কাকিমা বৌদিরা ব্লাউজ এবং জুতো পরছেন, কদাচিৎ কেউ ঘড়িও হাতে দিয়েছেন, কিন্তু শাড়ি ছাড়া আর কিছু পরার কথা কল্পনাও করছেন না। ঘরবাড়ির দেয়ালে তখনও গাছের ছায়া দোলে, গ্রাম গ্রামের মতোই আছে। শহরও তেমন প্রমত্ত হয়ে ওঠে নি। কলকাতার বাড়িগুলিও সব একতলা দোতলা। তখনকার ছোটদের বইয়ের এই অজস্র ছবি একত্র করলে একটি অতি চমৎকার, নির্ভরযোগ্য, দেশভাগের আগেকার ‘চিত্রে বাঙালিজীবন’ তৈরি হতে পারে।

গুরুপদদা আই এ পড়ার সময়ে রবীন্দ্রনাথকে বুদ্ধি খাঁটিয়ে একটি চিঠি লিখেছিল। তাতে কবির প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা, তাঁর কবিতার প্রতি অসীম অনুরাগ এবং নিজের আর্থিক অসংগতি জানিয়ে বিনা মূল্যে এক কপি সঞ্চয়িতা প্রার্থনা করেছিল। গুরুপদদা ভেবেছিল,

রবীন্দ্রনাথ বই পাঠাবেন না, কিন্তু যদি দয়ার্দ্র হয়ে পাঠান তবে তাতে নিশ্চয় দু লাইন শ্রীমান গুরুপদ দাশগুপ্ত, কল্যাণীয়েষু আশীর্বাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন থাকবেই। এবং বইটি চিরজীবনের জন্য তার অমূল্য সম্পদ হবে। যা হোক, খুব তাড়াতাড়িই গুরুপদ দাশগুপ্তের নামে একটি পার্সেল এল। প্যাকেট খুলে দেখা গেল, এক কপি কাগজের মলাটের সঞ্চয়িতা। তাড়াতাড়ি পাতা উলটে গুরুপদদা দেখল, কোথাও কোনো আশীর্বাণী নেই, সঙ্গে একচিলতে চিঠি নেই, কে পাঠালেন তার কোনো হদিশ নেই। গুরুপদদার পেয়েও না পাওয়ার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হল। এর পর অভিমানে গুরুপদদা আর রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ না হয়ে নিজেই 'বাংলা কাব্য পরিচয়' সংকলনটি ডাকযোগে আনাল।

আলাওল, গগন হরার নাম আমি এই প্রথম জানলাম। সেই বইয়ে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা ছিল–

মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরজাটা।
মেলাবেন।

অথচ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বেলা ছাপা হল তাঁর ১৯২৬ সালে লেখা 'নবীন লেখনী'–

অধুনা-আনীত নব অলিখিত
লেখনী মোর,
কি জানি কেমন ভাগ্যলিখন
আছে রে তোর।.. ইত্যাদি ইত্যাদি

কী অন্যায় কথা!

একেবারে শেষ দিকে ছিল দিনেশ দাসের 'মৌমাছি'–

এসেছে আমার ঘরে ছোট এক বুনন মৌমাছি,
ডানায় ডানায় যার অরণ্যফুলের কাঁচা ঘ্রাণ
পাঁশুটে শরীরে যার সোঁদা গন্ধ অজানা বনের।

গুরুপদদা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা'র গুণগান করে। আমি প্রথমা এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত পূজাবার্ষিকী 'মায়ামুকুর' একসঙ্গে পড়ি। গুরুপদদা আর একজন কবি হীরালাল দাশগুপ্তের কথা বলত। তাঁর বইয়ের নাম 'না'।

বীরেনদা এম এ পরীক্ষা দিয়ে ফেরার সময় সদ্য প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রথম খণ্ড নিয়ে এসেছিল। রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা সে বইয়ের ভূমিকা নাকি অসাধারণ। একদিন বীরেনদা তার বই-ছড়ানো নিরিবলি ঘরে সে ভূমিকা পড়ে শোনাল। শ্রোতা গুরুপদদা আর আমি। তখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ বই আমার কাছে 'ডাকঘর', আমি কতটুকু বুঝব সে ভূমিকার।

গুরুপদদা আমাকে তারা দেখতে শিখিয়েছিল। ছবি সংগ্রহ করে কিভাবে অ্যালবাম করে রাখতে হয় শিখিয়েছিল। কাগজের ক্লিপিং রাখতে শিখিয়েছিল। তাকে দেখে আমি কাপড় কাঁচা শিখেছিলাম। কিন্তু কিছুতেই ইস্তিরি করাটা শেখা গেল না। গুরুপদদা কি এখনও বেঁচে আছে?

.

বয়ঃসন্ধি

বয়ঃসন্ধি একটা অদ্ভুত সময়। সেই বয়সে শরীরকে বড় দুর্বোধ লাগে। এই জীবনের কোনো অর্থ বুঝি না, এদের নিয়ে কি করব তাও বুঝি না। যৌবনগ্রন্থি থেকে নীলাভ বিষাক্ত কোনো বেদনা ক্ষরিত হয় আর সন্ধেবেলা অসহ্য মাথা ধরে। হঠাৎ কখনো কখনো শরীরকে বজ্রবিদ্যুতের মতো শক্তিশালী মনে হয়। আয়রন ম্যান নীলমণি দাসের চার্ট থেকে আমি

সন্ধ্যার প্রথম অন্ধকারে বাতাবিলেবুতলায় দাঁড়িয়ে এক ঘণ্টা ধরে ব্যায়াম করি। দরদর করে ঘাম ঝরে। শরীর শান্ত হয়। বাড়িটা চুপচাপ, কেউ নেই। জীবনই আমার একমাত্র সম্বল। সংসার আমাকে সব বাঁধন কেটে ছেড়ে দিয়েছে। কখনো মুষড়ে পড়ি। ভবিষ্যতের রেস্ত কোথায়? কখনো দারুণ ভালো লাগে– জীবন হল কানাকড়ির মির্যাকল। নিজেই নিজেকে বলি, ভয় নেই, ভয় নেই। তোমার এতগুলো বছর একলা তোমার জন্য, তোমারই মুখ চেয়ে বসে আছে।

আমাদের পরিবারে কয়েক পুরুষ ধরে সফলতার কোনো চিন্তা চেষ্টা নেই। পরিবারের ধর্ম আমার মধ্যেও নিশ্চয় ছিল, অতএব 'ছাৎৰাণাম অধ্যয়নং তপঃ এই সোজা উচিত কথাটা মনে পড়ল না, মনে ধরুল দারিদ্রদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়। সেই দারিদ্রদুঃখদহনকারী শিবকে নমস্কার। আমার মনে হল, নিরাসক্ত ভিখিরি শিবই আমাদের দারিদ্র্যদুঃখকে পুড়িয়ে দেবেন, দারিদ্র্যের চেয়েও খারাপ দরিদ্রম্মন্যতাকে ভস্ম করে উড়িয়ে দেবেন।

এক দিকে বয়ঃসন্ধির কিংকর্তব্যবিমূঢ় ব্যথা, অন্য দিকে চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে স্থির পথটি বেছে নেওয়া এই দুই দিকে একসঙ্গে লড়তে পারব না, আমি বরং উভয়কেই বিদ্ধ করব একটি বাণে। সেই বাণ সাধুর জীবন।

শতজীবনী নামে একটি চমৎকার বই জোগাড় করেছিলাম। শংকরাচার্য থেকে শুরু করে এক শো সাধুর জীবনী। আমি তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা নিই নিঃসঙ্গ থাকার শিক্ষা, প্রসন্ন থাকার শিক্ষা। আকাশবৃত্তি এবং অজগরবৃত্তি আমার কাছে কঠিন অ্যাডভেঞ্চার মনে হল। জীবনকে নির্ভয় ও দুর্জয় করার জন্য তাঁরা কত দিক থেকে নিজেকে তৈরি করেন– কোনো মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ো না। রত্নকে পাথর মাত্র ভেবো। নিজেকে মাঝে মাঝে মৃত ভেবো। কাল কি খাবে চিন্তা কোরো না। কালকের জন্য এক কুচো আমলকীও জমিয়ো না। সেলাই করা কাপড় পোরো না। জনহীন জায়গায় থেকো। দরকার ছাড়া কথা বোলো না। মানুষ পশু পাখি পোকা যত প্রাণী দেখবে ভাবতে থাকবে তুমি প্রত্যেকের মধ্যে আছ, কিছুদিন পরে আবার ভাবতে থাকবে, তারা প্রত্যেকে তোমার মধ্যে আছে।

আমি বিকেলবেলা পুকুরের চাতালে বসে বইটি পড়তাম। একটু হাওয়া আসে আর পুকুর জুড়ে জলে শিহরন ওঠে। চারদিক স্নিগ্ধ আর শীতল।

আর একটা বই পেলাম, ব্রহ্মচর্য। পাতলা চটি বই, চার আনা দাম। কিন্তু সাংঘাতিক জঙ্গী বই। তার মূল কথা হচ্ছে- মরণং বিন্দুপাতেন, জীবনং বিন্দুধারণাৎ। একফোঁটা শুক্র কোনক্রমে বেরিয়ে গেলেই সর্বনাশ। কোন্ ছেলে পারবে এভাবে চলতে! ধাতুদৌর্বল্যের ওষুধের পুস্তিকার মতোই এ বই ভীতি উৎপাদক।

এই সময় আর একটি ছোট মাপের পকেট-বই পেলাম, স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সংকলিত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ। এটিরও দাম চার আনা। মুখপাতে ফ্রান্স ডোরাকের আঁকা সেই বিখ্যাত রঙিন ছবি। এই বইয়ের সারল্য, স্বচ্ছতা আর সুনিশ্চয়তা আমার মনপ্রাণ জুড়িয়ে দিল। বইটি যেন বালকদের জন্যই লেখা। বইটি আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী হল, এমনকি স্কুলেও সেটি নিয়ে যেতাম। তার পর এতদিন কেটে গেছে। সেই বালক শষ্পের সতেজ সবুজাভা এখন পাটকিলে হয়ে বিবর্ণ। এখনও বইটির একটি কপি হাতের কাছে রাখি, শুধু সেই দিনগুলির স্মরণে।

যে কোনো বিষয়ের বই, দরকারের সময় ঠিক জুটে যায়। পাটাতনের লফট থেকে একখানা ঘেঁড়াখোঁড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রথম ভাগ পেয়ে গেলাম। কিছুদিন পরে কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর পাঁচ খণ্ড সদ্গুরুসঙ্গ জোগাড় হল। নিজের দুর্বলতা, যৌবনসমস্যা ও সাধনসংকট নিয়ে এমন অকপট ডায়েরী আর কোনো সাধক লিখেছেন বলে জানি না। ফলে এই পাঁচ খণ্ড বই শিক্ষানবীশদের পক্ষে ভরসাস্থল এবং সাহায্যকারী হয়ে ওঠে। তাছাড়া বইটি অলৌকিক কাহিনীরও ভাণ্ডার। অলৌকিক ঘটনা কখনো কখনো আকস্মিক বিদ্যুতের মতো আমাদের চমকে দিয়ে দৃষ্টির আবরণ সরিয়ে দেয়।

ঈশ্বরকে নিয়ে আমি তেমন ভাবি নি। আমার দু রকমই মনে হত একটি নুড়িকে যত্ন করে করে দুধে জলে স্নান করিয়ে অনেকদিন ধরে ফুলজল দিয়ে আদর করতে করতে সে সত্যিই ঈশ্বরের মতো প্রসন্ন হয়ে ওঠে। আবার হাতের মুঠো শূন্য করে সন্ধ্যাকাশের আলো আর

মেঘের দিকে তাকিয়ে, গাছপালার দিকে আর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে অপূজিত, অনিকেত ঈশ্বরকেও অনুভব করা যায়।

খুব বিপদে পড়লে আমি কাউকে নিঃশব্দে ডাকতাম। এবং অ্যাকসিডেন্টের মুখে হতাশ এঞ্জিনের মতো বা সমস্ত নিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে ফুটো বেলুনের মতো ডাকলে কাজ হয়। হয়ই। কিন্তু ঐখানেই শেষ। ঈশ্বরের সঙ্গে আমি লেগে থাকতে পারি না।

ঈশ্বরভক্তি নয়, সাধুত্বও নয়, আমাকে টানত সাধুর জীবন। আমার মনে হত ঐটিই শিল্পীর জীবন, যোদ্ধার জীবন, পুরুষের জীবন।

এসব কথা কাউকে বলি নি, নিজেই চিন্তা করতাম, নিজেই অভ্যাস করতাম। যোগৈশ্বর্যের কথা বইতে পড়েছি, চোখে কখনো দেখি নি। কিন্তু বালকেরা অভ্যাস করলে কিছু একটা ফল ফলে। বালকদের ভিতরটা নতুন একটা পাওয়ার হাউসের মতো। বাইরের জগৎকে প্রত্যাহার করতে করতে একটা ভিতরের জগতের আভাস যেন পাওয়া যায়। সেখানে চাঁদপুর বরিশাল দূরের কথা গোলোক কৈলাসও নেই। হরপার্বতী দূরের কথা দাদুঠাকুমাও নেই।

তার পর জীবন কোথায় কোথায় চলে গেছে। ব্যর্থতাও নয়, সফলতাও নয়, আমার যা হবার ছিল তাই হয়েছে। কিন্তু সেইসব অভ্যাস কিছু কিছু এখনও রয়ে গেছে। এখনও একা থাকতে পারি, কথা না বলে থাকতে পারি, অনেক ভোগ্যই আমার প্রয়োজনে আসে না। বাহুল্যের মধ্যে অস্বস্তি ভোগ করি।

তবু আমি শেষ পর্যন্ত সংসারীই তো হলাম। এমন ঘোর সংসারী যে মরার আগের দিনও কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, বিলিবন্দোবস্ত শেষ হল না। মন পালাই পালাই করে, এইসব যেমন আছে তেমনি রেখে দিয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে।

.

একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ খুব তেড়ে বৃষ্টি এল। আমি মিউনিসিপ্যালিটির পুকুরে চিতসাঁতার দিয়ে, বৃষ্টির মোটা মোটা ফোঁটা গায়ে নিতে নিতে স্নান করছি। বৃষ্টির জল ঠাণ্ডা আর পুকুরের জল গরম। চটরপটর চটরপটর শব্দে বৃষ্টি পড়ছে ঠাণ্ডা গরম ফোয়ারা। জায়গাটা সম্পূর্ণ নির্জন। এমন সময় রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ইলা রাজা মেয়েলি সাঁতারে বুক দিয়ে ঢেউ দিতে দিতে আমার দিকে আসতে লাগল। সেই সময়টাতে ইলার লিঙ্গ-রূপান্তর ঘটছিল– তার চার ভাগের তিন ভাগই তখন মেয়ে হয়ে গেছে। মেয়েলি কিশোর এবং যুবতী নারীর মধ্যবর্তী চেহারা। এ সৌন্দর্য সেই বিষমেশানো মিঠাইয়ের মতো, যা খেয়ে বাচ্চা ভীম অচেতন হয়ে ডুবতে ডুবতে নাগলোকে গিয়েছিল। আমি তাকে দেখে অবশ হয়ে জলতলে ডুবতে লাগলাম। সে যেন সব জানে- ডুব দিয়ে সে কাছে চলে এল। রামায়ণে আছে, একটি বৈশাখ মুহূর্তে ফুরিয়ে গেল। আমার দুটি মাত্র মিনিটকেই মনে হল দীর্ঘ একটি বৈশাখ। আমি কিছু জানি না, সেই আমাকে দিয়ে অবর্ণনীয় কেলি করিয়ে নিচ্ছে। ইলাকে দেখতে ক্রমশ যেন আমার কোনো চেনা মেয়ের মতো লাগছে। সে আমাকে নিয়ে কি করতে চায়। আমি তাকে নিয়ে কি করতে চাই? হঠাৎ প্রচণ্ড উত্তেজনায় আমার ঘুম ভেঙে গেল। স্প্রিংয়ের পাতের উপর ভারী হাতুড়ি মারলে যেমন হয় শরীরে সেইরকম কেউ যেন আঘাত করছিল। মন যারপরনাই বিষাদাচ্ছন্ন- মরণং বিন্দুপাতেন। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। আজ পুবের আকাশে শুকতারা ফ্যাকাশে হয়ে আছে। সারা দিন মন ঘোলাটে আর মেঘলা হয়ে রইল।

.

রাজা ইলের কাহিনী অনেকের না জানা থাকতে পারে তাই সংক্ষেপে এখানে বলে রাখি। বাহীক দেশের রাজা ইল একদিন মৃগয়া করতে করতে বনে যেখানে কার্তিকের জন্ম হয়েছিল সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীত্ব পেলেন। সেখানে শিব স্বয়ং স্ত্রীরূপে পার্বতীর সঙ্গে খেলা করছিলেন। যা হোক, ইল অনেক কান্নাকাটি করাতে স্থির হল, রাজা এক মাস পুরুষ থাকবেন, এক মাস মেয়ে হবেন। মেয়ে অবস্থায় তিনি বুধকে দেখে মুগ্ধ হলেন এবং বুধের সঙ্গে বিজন সরোবরে ক্রীড়া করতে লাগলেন। ন মাস পরে সেই ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হল।

মহাভারতেও একটি অনুরূপ কাহিনী আছে। রাজা ভঙ্গাস্বন মৃগয়া করতে গিয়ে একটি সরোবরে স্নান করে অকস্মাৎ স্ত্রীত্ব পেলেন। স্ত্রী হয়ে বনে তিনি এক তাপসের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। কালক্রমে তার গর্ভে একশো ছেলে হল। ভঙ্গাস্বনকে বেছে নেবার স্বাধীনতা দিলে তিনি স্ত্রীরূপেই থাকতে চেয়েছিলেন, কারণ স্ত্রীপুরুষ সংযোগকালে স্ত্রীরই অধিক সুখ হয়।

স্বাভাবিক একটি মেয়ে না এসে ঐ বয়সে কেন আমার প্রথম স্বপ্নে লিঙ্গ-পরিবর্তিত মেয়ে ইলা এল। আমার যৌন পছন্দে কি কোথাও কোনো অস্বাভাবিক ছিল? মেয়েরা সে যুগে কিশোরদের কাছে নিষিদ্ধ বস্তু। এই ট্যাবু কি আমার মানসিকতায় কোনো কাজ করেছিল? হতে পারে সবই। কিন্তু এখনও আমার মনে হয়, মেয়েরা যদি থ্যাবড়াথোবড়া স্তন জঘন ও নিতম্বের বদলে বালক-কিশোরের হালকা পলকা উড়ন্ত শরীর পায় তবে বোধ হয় তাদের সৌন্দর্য আরও অপ্রতিরোধী হয়ে ওঠে। অবশ্য এক এক জনের এক এক সৌন্দর্যপ্রতিমা।

যে পুকুরে, জেটির মতো ঘাটের প্রান্তে বসে, আমি বিকেলে ধর্মগ্রন্থ পড়তাম, ঠিক সেই জায়গাতেই জলে ডুবে ডুবে আমি দুপুরে ইলার সঙ্গে কেলি করেছিলাম। একই জলপৃষ্ঠের দু হাত উপরে আর দশ হাত নিচে দুই জীবন– এর নিশ্চয় কোনো মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য ছিল। একই মনের উপরিতল এবং গভীরতলে আমি দুই অস্তিত্ব বহন করে চলেছি।

.

মেড়ামেড়ীর ঘর

ছেলেবেলা থেকে অতি ছোট, একলার মতো, নিভৃত কুটির বানাবার ঝোঁক ছিল আমার। ঘর কত ছোট আর হালকাপলকা হতে পারে আমি তার অনেক রকম নকশা ভাবতাম। স্টীমারের সারেঙের কেবিন, ক্যাপ্টেন স্কটের জাহাজের খুপরিটি, ঢাকনা খোলা কফিন, এক-তাতামির জাপানী কুঁড়ে, পানের দোকানের নিচে বিড়ি বাঁধার ঘর, গ্রামের ঘরের ভিতে হাঁসের খোয়াড়, সাধুর গুহা, নীলগিরির টোডাদের কুটির ছোট নির্জন ঘরের কত বিচিত্র সম্ভাবনা।

এই রকম ঘরে আমার প্রথম গৃহপ্রবেশ হল এক নীরব দুপুরে বারবাড়ির তক্তপোশটির নিচে মেঝের উপর একটি মাদুর আর একটি বালিশ আর চার-পাঁচখানা গল্পের বই নিয়ে সেই ঘর। অতি শান্তির নীড় গ্রীষ্মের ছুটির দুপুরে ঠাণ্ডা, পরিচ্ছন্ন। চিত হয়ে শুলে মাত্র দেড় হাত উপরে তক্তপোশের কাঠের পাটাতন অর্থাৎ আমার বাড়ির সিলিং। বারবাড়ির ঘরে

ঢুকেও কেউ টের পাবে না যে আমি ওখানে আছি। শান্ত জানলা গলে আসা আলোয় শুয়ে শুয়ে ‘চারু ও হারু পড়ছি।

এটা যদি গ্রীষ্মাবাস হয় তো শীতের অস্থায়ী আস্তানাটি ছিল মায়ের গর্ভের মতো নরম এবং উষ্ণ। শীতের রোদে-ভেসে-যাওয়া বারান্দার রেলিঙে সারা দুপুর লেপ মেলে দেওয়া হত তপ্ত হবার জন্যে। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পরে আমি বড় লেপটাকে তাঁবুর মত করে তার ভাঁজের মধ্যে ঢুকে যেতাম। সঙ্গে থাকত গোটা ছয়েক কমলালেবু। সেই লেবুগুলো একটা একটা করে খেয়ে ঘণ্টা দুয়েক পার করে যখন উঠতাম তখন আরামের চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

আমাদের ঐ অঞ্চলে ছেলেদের একটা চমৎকার উৎসব ছিল মেমেড়ীর ঘর। পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন ছেলেরা দলে দলে ভাগ হয়ে মেড়ামেড়ীর ঘর তৈরি করত। নদীর ওপারের গা থেকে খড় আর মুলিবাঁশ আনা হত। মাঠ এবং ফাঁকা জায়গার তো অভাব নেই। অতএব এক একটা দলের এক একটা আলাদা ঘর। বাঁশের খুঁটি, বাঁশের আড়া, খড়ের চাল আর বেড়া। মাটিতে পুরু করে খড় বিছিয়ে গদি করা হয়েছে। খড়ের নিজস্ব ওম আছে। সারা রাত পৌষের ঠাণ্ডায় নক্ষত্র থেকে, দূরের পাহাড়শিখর থেকে, গাছের মগডাল থেকে ঐ নতুন হলদে খড়ের বাড়িগুলোর উপর হিম ঝরছে। কিন্তু ভিতরে আমাদের ঠাণ্ডা লাগে না।

রাত্রে ঐ মেড়ামেড়ীর ঘরের বাইরে হাওয়া আড়াল করে মাটিতে উনুন পেতে বা স্টোভে রান্না হবে। খিচুড়ি ডিমভাজা বা ভাত মাংস। সেজন্যে চাঁদা তোলা হয়েছে। গভীর রাত্রে বার বার চা এবং লেড়ো বিস্কুট। সারা রাত ছেলেরা ঘুমোয় না। নিজেদের ঘর থেকে চাদর মুড়ি দিয়ে অন্য দলের ঘরে আড্ডা দিতে যায়। বাড়িতে যারা লেপের নিচে বিছানায় শুয়ে আছে তারা মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙে ছেলেদের হুল্লোড় শুনতে পায়। সারা রাত হিম পড়ে, লক্ষ্মীপেঁচা আর বাদুড় ওড়ে, পুবের তারারা পশ্চিমে চলে যায়। বড় ছেলেরা লণ্ঠন জ্বালিয়ে ঐ খড়ের ঘরে তাস খেলে। ছোটরা চাদর পেতে ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোরে উঠে ছেলেরা শীতের হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে বরাকের জলে স্নান করে এসেই ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। খড়ের ঘর মুহূর্তে দপ করে জ্বলে ওঠে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সবাই আগুন পোয়। মাঠে পর পর এখানে ওখানে খড়ের ঘরে আগুন লাগে, আর ছেলেরা গুনতে থাকে কাদের ঘরে বাঁশের গাঁট ফেটে কটা শব্দ হল। কান করে শুনলে আগুন চলারও একটা স্রোত চলার মতো সোঁ সোঁ, ঝরঝর, কলকল শব্দ আছে।

রাতের বাসাকে পুরো ছাই করে ছেলেরা এর পর বাড়ি ফেরে। সেখানে মা পিসি মাসিরা তাদের জন্য পৌষের পিঠে বানিয়ে রেখেছে।

মেড়ামেড়ী মানে কি? শব্দ দুটো কোথা থেকে এসেছে? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'বেনের মেয়ে' বইয়ে মেড়া সম্বন্ধে লিখেছেন- 'শীত হইল মেড়া অসুর, তাহাকে আগের দিন মারিয়া পোড়াইবার পরের দিন [দোল] উৎসব। মাঠে সারি সারি মেড়া অসুর সাজানো আছে, বাঁশের উপর খড়জড়ান একটা বিকট মূর্তি।... সন্ধ্যাটি হইল, আর ছেলেরা উন্মত্ত হইয়া মেড়ায় আগুন লাগাইতে লাগিল। কতকগুলা ঘোট ঘোট ঝোঁপড়ার মত ঘর ছিল, তাহাতেও আগুন লাগাইয়া দিল, আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা নাচিতে লাগিল, গাইতে লাগিল ও হাততালি দিতে লাগিল, আর কত রকম বাঁদরামী করিতে লাগিল, তাহা আর লিখিয়া কাজ নাই। চতুর্দশীর চাঁদ উঠিল, আগুন তখনও নিভে নাই। তাহারা চারিদিকে একবার চাহিল, একটা হল্লা করিয়া উঠিল, তাহার পর যে যাহার ঘরে গেল'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন দোলের আগের সন্ধ্যার কথা, আমি বলছি তার দু মাস আগেকার পৌষ সংক্রান্তির আগের রাত্রির কথা।

কিন্তু বয়ঃসন্ধির কালে কোনো ছেলের ভাগ্যে এই আনন্দ-উৎসবের রাতও করুণ হয়ে আসে। প্রথম যে বার আমি দলে মিশে মেড়ামেড়ীর ঘরে রাত কাটাব স্থির করলাম, মাসিমা বাধা দিল। এই হুল্লোড়, এই লাগামছাড়া রাতের মধ্যে তুমি যাবে না। আমিও যাবই। শেষে রফা হল- আমি বাড়ির মধ্যেই শুকনো লতাপাতা দিয়ে একটা ঘর বানাব, সে ঘরে রাতের খাবার এনে খেতে পারব, কিন্তু পরদিন ভোরে তাতে আগুন দিতে পারব না।

একা একা তো এই আনন্দ হয় না, অতএব মাসিমাই বলল অঙ্কুর আর তার বোন অলিকে নেমন্তন্ন করতে। আমার সমবয়সী সহপাঠী অঙ্কুর কোনো হুজ্জুতে থাকে না, সভ্য, নরম, মাসিমার খুব পছন্দের ছেলে। আর ওরা যখন খাবে তখন লুচি মাংসই হোক।

আমি ভাঁড়ার ঘরের পিছনে কাঁঠাল গাছ ও তেলাকুচো লতায় ছায়া করা একটা সরু নিঃসঙ্গ জায়গা বেছে নিলাম। ডোবার পাড় থেকে শুকনো কলাপাতা টেনে টেনে ছিঁড়ে আনলাম। সারা দিন ধরে খেটে সেই ছায়ায় একটি ঘর বানালাম। তাতে তিনজন বেশ বসতে পারব। ঘরের মধ্যে শুকনো কলাপাতার হালকা বুনো গন্ধ। এখন আমি একাই সেখানে একটু বসে থাকি। শুধু একটু তেলাকুচো লতার আড়াল, তবু সংসারের বাইরের ঠাণ্ডা ছায়া এখানে অনুভব করি।

অঙ্কুর আর অলি সন্ধের একটু আগে এল। মেড়ামেড়ীর ঘরের নিয়ম মেনে আজ রাত্রে ওরা এখানেই থাকবে। আমি এতেই কৃতজ্ঞ। রাত্রে প্লেটে বাটিতে করে খাবার এল লণ্ঠনের আলোয় ভেঁড়া কলাপাতার কুটিরে মাংস লুচি। কিন্তু আমার সারা দিনের আশা এবং পরিশ্রম যেন ব্যর্থ। রাত নটা-সাড়ে নটা পর্যন্ত সহ্য করে মাসিমা আমাদের শুতে যেতে বলল। আমাদের শোবার ব্যবস্থা হয়েছে বারবাড়ির ঘরে। চমৎকার গরম ধবধবে বিছানা। পর পর অঙ্কুর আমি মাসিমা আর অলি। অঙ্কুর জুতো মোজা গরম জামা খুলে লেপের মধ্যে ঢুকে গেল। আজ সারা রাত নিঘুম থাকার মতো ক্ষমতা আর উত্তেজনা আমার ভিতরে যেন চার্জ করা রয়েছে। আমি কি করে তার সুইচ অফ করি!

মাসিমা খেতে গেছে। অলি ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে তার লম্বা চুল খুলল, চিরুনি চালিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আঁচড়ে ফিতে বেঁধে একটা বিনুনি করে ফেলল। মুখে শীতের ক্রীম মাখল। তার কানের সোনার রিং দুটো এবার ঝিকমিক করছে। গরম জামা স্কার্টের নিচে তার সাদা হালকা টেপ ফ্রক। সে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বিছানার এক ধারে লেপের ভাঁজ খুলে শুয়ে পড়ল। আমি বসে রইলাম আমি মেড়ামেড়ীর ঘরের কথা, আজকের দিনের আশা নিরাশার কথা ভুলে গেলাম। মনের মধ্যে একটা অবুঝ

ব্যথা, অস্থির ব্যথা- জলের উপরে কালির ফোঁটা ফেললে যেমন হয় তেমনি হাত পা দশ আঙুল মেলে ছড়িয়ে যেতে লাগল। মাঝখানে মাসিমার জন্য জায়গা রেখে আমি শুয়ে পড়লাম। শরীর চিত হয়ে কাঠের মতো পড়ে আছে। মন কেবলই চলে যায় ঐ মেয়ের দিকে, তার হালকা বালিকা শরীরের দিকে, তার কোল্ড ক্রীমের গন্ধের দিকে। আমি যদি হাত বাড়িয়ে দিই, অথবা গড়িয়ে চলে যাই ওর কাছে। কী হবে? কী হবে? কী হবে? কিন্তু আমি চিত হয়ে শুয়ে রইলাম, চোখের পাতা অপলক খোলা, শুকনো গলায় ঢোক গেলার শব্দটুকু পর্যন্ত নেই। ওপাশে মেয়েটি রাতের ফুলের মতো নিশ্বাস ছড়িয়ে দিচ্ছে, সুগন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে। মাসিমা তার ঠাণ্ডা হাতপা নিয়ে শুতে এল, হাত ঘষাঘষি করল। আমি নিশ্চল। নিশ্চল থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু আড়াইটে তিনটের সময় ঘুম আচমকা ভেঙে গেল। মাসিমা লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোয়। আমি দুটো নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ঘর অন্ধকার। এইভাবে শুয়ে থাকা অসম্ভব। আমি নিঃশব্দে উঠে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে আসামাত্র স্নেহময় জগৎ আমাকে জড়িয়ে ধরল। গুরুপদদা আমাকে তারা দেখতে শিখিয়েছিল। উপরে তাকিয়ে দেখি, সিংহরাশি শেষ পৌষের মধ্যআকাশ ছাড়িয়ে গেছে, মিথুন আর লুব্ধক হেলে পড়েছে, কৃত্তিকা অস্ত যাচ্ছে। দুরে, অল্প দূরে ছেলেদের খড়ের ঘরগুলো, তাদের লণ্ঠনের আলো, হৈ হুল্লোড়, শীতের কুকুরের ডাক। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঐ বিছানায় ফিরে যেতে কেন জানি না অপমানিত লাগছে।

এত দিনের পরে আজ আর কিছুরই কোনো চিহ্ন নেই, শুধু মনে পড়াটি আছে একতরফা মনে পড়া, এত খুঁটিনাটি মনে পড়া, লিখতে লিখতে খুঁচিয়ে তুলেছি বলে মনে পড়া।

এর পরের বছর থেকে মাসিমা আর আমাকে আটকাতে পারে নি। আমি সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে মিলে মণিপুরীদের গ্রাম থেকে খড় এনেছি, বাঁশ এনেছি, পুকুরের কাছাকাছি মাঠে দশবারোজন হেঁটেচলে বেড়াবার মতো ঘর বানিয়েছি সারা রাত বাড়ি ফিরি নি।

.

রাজনীতি

আমি যখন ক্লাশ এইটে তখন হঠাৎ একদিন অনেকগুলো ছেলে অকারণে খেপে গেল। তারা খেপবে বলেই তৈরি হয়ে এসেছে। তারা আজ স্কুলে আসবে না, হাত নেড়ে নেড়ে অন্যদেরও বেরিয়ে আসতে বলছে। তাদের চোখে মুখে রণং দেহি ভাব। শেষে, এত চেঁচামেচি উত্তেজনার কারণ শোনা গেল কমিউনিস্ট পার্টি ছাত্রদের মধ্যে স্টুডন্টস ফেডারেশন নামে একটি সংগঠন তৈরি করেছে। আজ সেই সংগঠনের ছেলেরা এইভাবে তাদের বিপ্লবী অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। কিন্তু আমার হল মুশকিল। রাজনীতিচেতনাহীন আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই অকারণ হুজ্জতি এবং জবরদস্তি মনে হল।

নিজেকে বেশি পর্যালোচনা করব না। তবে ছেলেবেলাতেই বুঝেছিলাম, কোনো রকম দলে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব না। আর এখন তো আমি চাই, সমস্ত দল ভেঙে যাক, অবশিষ্ট থাকুক শুধু একটি একটি বিচ্ছিন্ন মানুষ, যারা নিজের হালকা ওজনটি নিজেই বইবে, তাও যদি না পারে তো মারা যাবে। নিজের উচ্চাশার বোঝা অন্যকে দিয়ে বওয়াবার ধৃষ্টতা যেন কারো না হয়। রাজনীতি সেই ধৃষ্টতা।

আমাদের শহরে এক এক করে জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু, মানবেন্দ্রনাথ রায়, বাটলিওয়ালা, সোমনাথ লাহিড়ী এসে বক্তৃতা করে গেলেন। অভয়াচরণ ভট্টাচার্য পাঠশালার লাগোয়া মাঠটি ছিল সভার জায়গা। নেহরুর বক্তৃতামঞ্চটি যেন সমুদ্রজলের উপরে একটি উঁচু পেরিস্কোপ অথবা আজান দেওয়ার মিনারেট। সিঁড়ি ভেঙে লাফিয়ে লাফিয়ে তিনি একলা উঠে গেলেন- গোলাপী গায়ের রং, ধবধবে সাদা জামাকাপড়ের উপর জহরকোট, গান্ধী টুপি, জোরালো আলোয় মাঠের শ্যামাপোকা তাঁকে ঘিরে ধরেছে বক্তৃতা দিতে দিতে কয়েকবার পোকা তাঁর মুখের মধ্যে চলে গেল। হেসে বললেন, পোকা খেয়ে ফেলেছি, জল চাই। দীর্ঘ সেই বক্তৃতার একটি শব্দও মনে নেই, শুধু ঐ। পোকার কথাটি ছাড়া।

সুভাষচন্দ্র বসু গম্ভীর মানুষ, ছটফটে ভাব একেবারে নেই। সামান্য চওড়া হৃষ্টপুষ্ট শরীর। বক্তৃতার পরে তিনি স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলে জায়গাটাকে বুঝতে চাইছিলেন।

পরদিন সকাল দশটা-সাড়ে দশটার সময় তিনি মিউনিসিপালিটির অফিসের সামনে পতাকা উত্তোলন করলেন। সেই জমায়েতে ছিল দশ-বারোজন বয়স্ক মানুষ আর খবর পেয়ে দেখতে ছুটে আসা আমাদের মতো কিছু বালক। খুব কাছে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম, লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি পরেছেন। মনে হল, রাত্রে তাঁর ভালো ঘুম হয় নি, মুখে হালকা অপ্রসন্নতা ও শুষ্কতার ছাপ। পতাকা উত্তোলনের পর তিনি হেঁটে হেঁটে আমাদের পাড়া হয়ে, নতুনপট্টি হয়ে বেশ কিছুটা চললেন। পাড়া থেকে যুবকেরা সঙ্গ নিল, আমরা বালকেরা তো আছিই। তিরিশ-চল্লিশজনের একটি দল, ল্যাজের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বন্দেমাতরম ধ্বনি উঠছে। সুভাষচন্দ্র আস্তেসুস্থে হাঁটছিলেন। সেই দলের সঙ্গে কোনো পুলিশ ছিল না, কোনো দেহরক্ষী ছিল না। বলতে নেই, কিন্তু মনে হল, কলকাতা থেকে যেন নতুনকাকা এসেছেন, আমরা তাঁকে আমাদের পাড়া ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি।

সুভাষচন্দ্রকে জীবনে ঐ এক বারই দেখেছি। তার পর তো ত্রিপুরী কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, রহস্যময় অন্তর্ধান, আই এন এ এবং দুর্ঘটনায় মৃত্যু। সুভাষচন্দ্রের কিছুই স্থায়ী হল না। অন্যদিকে নেহরুর চিরস্থায়ী কীর্তি হল দেশভাগ এবং নিজের রাজবংশের পত্তন। কিন্তু স্বাধীনতার আগে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে লাহোরের সেনাছাউনিতে বসে আসমুদ্রহিমাচল ভারতের নানা জাতের নানা ধর্মের সিপাহীদের মধ্যে যে দুজন মানুষের অটল জনপ্রিয়তা টের পেয়েছিলাম তাঁদের একজন হলেন সুভাষচন্দ্র বসু অন্যজন পঙ্কজকুমার মল্লিক। আশ্চর্যের কথা, দুজনেই বাঙালি। সুভাষ বোসের বীরত্ব আর দেশপ্রেম পাঠান পাঞ্জাবী জাঠ মারাঠা মাদ্রাজী মহীশূরী তাবৎ ফৌজদের হৃদয়ে এক অদ্ভুত শ্রদ্ধার জন্ম দিয়েছিল। আর পঙ্কজ মল্লিকের গান! আহা অমন গাইয়ে আর কে আছে য় দর্দভরী দিলকি আবাজ সুনায়েংগে।

এম এন রায়, বাটলিওয়ালা, সোমনাথ লাহিড়ীর জন্য মঞ্চ বাঁধা হয় নি। কিন্তু প্রত্যেকের সভাতেই ভিড় হয়েছিল। মানবেন্দ্রনাথ রায় এসেছিলেন তাঁর মেমসাহেব স্ত্রী এলেন রায়কে নিয়ে। রায়ের গায়ের রং বেশ কালো, দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীর, ভরাট গম্ভীর স্বর, কোট প্যান্ট টাই পরা। ইংরেজিতে মাতৃভাষার মতো দ্রুত এবং অনর্গল বক্তৃতা দিলেন। তাঁর ভাষায় এবং

চালচলনে দীপ্তি এবং পৌরুষের বিচ্ছুরণ। বাটলিওয়ালা ফরসা, হাফপ্যান্ট আর চৌখুপী হাফশার্ট পরা। সোমনাথ লাহিড়ী কৃশকায়, অযত্নের ধুতি এবং ল্যাগবেগে শার্ট পরা।

নেতাদের বাগ্মিতায় শহরে কোনো কাজ হয়েছিল এমন মনে হয় না। বরং এর বিপক্ষে নিদারুণ কার্যকরী হল ইংরেজের দুষ্টবুদ্ধি। শিক্ষা ও পুলিশ বিভাগে প্রচুর মুসলমানকে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। আমাদের স্কুলে এখন অনেক মুসলমান শিক্ষক। তাঁরা হিন্দু শিক্ষকদের সঙ্গে নিজেদের একটা পার্থক্য তৈরি করে নিলেন। হিন্দু শিক্ষকদের সরল নিরলংকার ধুতি শার্ট বা পাঞ্জাবির বিপরীতে তাঁরা কেতাদুরস্ত সুট ও কামাল আতাতুর্কের ফেজ টুপি পরতেন। আছদ্দর আলী, মহসীন আলী, আবদুর রহমান হাবশী ও মূর কায়দায় ভারি চিত্তাকর্ষক দাড়ি রেখেছিলেন।

আমি যখন ক্লাস সেভেনে, সেই বছর, এই হিন্দু মুসলমান বিভেদটাকে কর্তৃপক্ষ আরও একটু উসকে দিলেন। পর পর কয়েক শুক্রবার দেখলাম মুসলমান ছেলেরা টিফিনের ছুটি শেষ হবার আধঘণ্টা পরে ক্লাসে ঢুকছে। ব্যাপার কি? না, তারা এখন থেকে প্রত্যেক শুক্রবারেই নমাজ পড়ার জন্য এক ঘণ্টার বিশেষ ছুটি পাবে। মুসলমান বালকদের ধর্মাচরণের জন্য খ্রিস্টান রাজার এই আগ্রহ নিশ্চয় অকারণ ছিল না। এইসব জলসিঞ্চনে মুসলিম লীগ বেশ সতেজ হয়ে উঠল।

আমি যখন স্কুলের শেষ ক্লাসে তখন শহরের প্রথম সাম্প্রদায়িক রক্তপাতটি ঘটল। এমন বেশি কিছু রক্ত পড়ে নি, তবুও তো সেটাই ছিল প্রথম রক্তপাত।

কিছুদিন হল সুনীল সুশীল নামে দুই বলিষ্ঠবপু যুবা এই শহরে বসবাস করতে এসেছে। তারা যমজ ভাই, একেবারে এক রকম দেখতে, খদ্দরের ধুতি আর পাঞ্জাবি পরা। সভাসমিতির শুরুতেই এক রকম জামা পরে হারমনিয়ম নিয়ে যমল গান গায় কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙে ফ্যাল কর রে লোপাট। ক্রমশ সারা শহর তাদের চেনে, তাদের ভালোও বাসে। ইতিমধ্যে স্বদেশী করে তারা জেল খেটেছে। জেলের অফিসারেরা তাদের আলাদা

করে চিনতে পারত না বলে সুনীল বা সুশীল কারো একজনের কড়ে আঙুলের ডগাটা হেঁটে দেওয়া হয়েছিল।

একদিন খুব হৈ চৈ শোনা গেল : জ্যাকেরিয়া নামক মুসলিম লীগের এক যুবক সুনীলকে রাস্তার উপর ছুরি মেরেছে। কিন্তু সে পালাতে পারে নি। রক্তাক্ত অবস্থায় সুনীল তার বজ্রমুষ্টিতে জ্যাকেরিয়াকে ধরে পুলিশের কাছে নিয়ে গেছে।

.

স্রোতের পথে

আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার বছরটায়, শেষ দিকে, বেশ গোলমাল পাকিয়ে উঠল। দিদিমার এমন অসুখ করল যে তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় পাঠাতে হল। মাসিমা মামা সঙ্গে গেল। আবার সে বছরটাতেই দাদুরও চাকরি শেষ। দু-তিন সপ্তাহ পরে অবসর হলে দাদুও চলে গেলেন কলকাতায়। বাড়িতে শুধু আমি আর কাজের লোক চরিত্র। আমাকে কেউ বলে নি, তবু মনে হল, ওরা আর কেউই এখানে ফিরে আসবে না। পরিবারটি কলকাতাতেই স্থায়ী হবে। মাস দেড়েক পরে পরীক্ষা শেষ হলে আমিও চলে যাব কোথায় যাব এখনও মুখ ফুটে কেউ বলে নি কিছু। কিন্তু আমি বুঝতে পারি, আমার ভবিষ্যৎ এবার খড়কুটোর মতো অনিশ্চিতের স্রোতে ভাসবে, কিংবা ট্র্যাপীজের দারুণ খেলোয়াড়ের মতো এ দড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে ও দড়ি ধরে ফেলবে। আমি কিছুই আর আটকাবার চেষ্টা করি না, প্রস্তুত হবারও চেষ্টা করি না। কষ্ট এড়াবার জন্য বরং অসাড় থাকার অভ্যাস করি।

মাস দুয়েক একা একা এতদিনের বাড়িটাতে বেশ কাটল। চরিত্র বাজার করে, রান্না করে। বাড়িটা এতদিন যেন দিদিমার ভয়ে আমাকে প্রাণ খুলে আদর করতে পারে নি, এবার একলা পেয়ে বুকের মধ্যে জাপটে ধরল। শীতের রাতে ঘরগুলো উষ্ণ হয়ে থাকে। লেপটা নিজে নিজেই আরামের তাপমাত্রা পায়। ধীরে ধীরে বসন্ত এল। বাড়িটিতে একটু আধটু পাখির ডাক ছাড়া কোনো শব্দ নেই। মসৃণ হাওয়া। কোথাও কোনো ভ্রুকুটি নেই। জলের

খরচ নেই, সারা দিন চৌবাচ্চারা জল টলটল করে। উঠানে পড়ে থাকা তক্তপোশটার উপরে চিত হয়ে শুলে অনেক উপরে শঙ্খচিলদের ডানা মেলে ভাসতে দেখি। এবার বসন্ত এসে আমার গায়ের চামড়াকে আমের নতুন পাতার মতো ঝকঝকে আর আতা করে তুলল। আমার ফুসফুসের মধ্যে রক্তের সঙ্গে প্রচুর অক্সিজেন মিশছে টের পাই। কিশোর শরীরের মেটাবলিজম অ্যানাবলিজমের ইন্দ্রজাল তার কাজ করে চলেছে, কিন্তু আমার আত্মার কি হল? এত অনিশ্চিতির মধ্যে আত্মা টুকরো টুকরো ছেঁড়া কাগজের মতো হয়ে যায়।

একদিন একদিন করে পরীক্ষা শেষ হল। যেমন পড়া তেমনি পরীক্ষা। বাংলা পরীক্ষার সময়, উত্তর সাধু ভাষায় লিখব না চলিত ভাষায়, তাই স্থির করতেই আধ ঘণ্টা কেটে গেল।

এর মধ্যেই চিঠি এল– আমি যেখান থেকে এসেছিলাম সেইখানে, সেই নিজের গ্রামেই ফিরে যাবার নির্দেশ। দুমাস পরে পরীক্ষার ফল বেরুবে। যদ্দিন না বেরোয় তদ্দিনই নিশ্চিন্ত।

বসন্ত ভালোভাবে এসে গেছে। একদিন বিকেলবেলা চাঁদপুরের ট্রেনে চাপলাম। সঙ্গে কয়েকটি বই আর একটি মাটির মূর্তি। ট্রেনের জানলায় বিদায় দিতে শুধু গুরুপদদাই এসেছে।

বিদায়ের মুহূর্তে কিভাবে বিদায় নিতে হয় আমি জানি না। দুঃখে আমার মুখে কথা আসছিল না। হঠাৎ নিজেকে সেই চোরাকাদায় ডুবতে থাকা অন্ধকার রাতের হাতিটার মতো মনে হল। পরমুহূর্তেই মনে হল, ধ্যাৎ। মাথার উপর সিংহরাশি, লুব্ধক, ব্রহ্মহৃদয়, কালপুরুষ- বিরাট ছায়াপথ আছে না- তারও উপরে নিশ্চয় আরও অসীম বেপরোয়া শূন্য।

আমি হাসিমুখে গুরুপদদাকে প্রণাম করে ট্রেনে উঠে বসলাম।

.

ইপাব নির্মাণে ▸▸ @bongboi।

তৃতীয় পর্ব

উৎসর্গ

দাদামশায় বিমলাচরণ সেনগুপ্ত ও দিদিমা সুবোধবালা সেনগুপ্তকে

কালপ্রবাহ

কালপ্রবাহ এক অদ্ভুত জোড়া শব্দ। কোনোদিন এই নশ্বর তেতলার ছোট্ট বারান্দায় বসে দূরের সান্ধ্য লাল মেঘ দেখতে দেখতে সাময়িক বোধিলাভ হয়। ভাবি, কাল বলে কিছু নেই, আছে শুধু প্রবাহ। সর্বপ্রকার অস্তিত্ব নিজধর্মেই রূপান্তর পায়। এই তো চোখের সামনে দেখছি, সবাই সবাইকে পালটে দেয় সূর্যডোবা আলো মেঘকে পালটে দিয়েছে, লাল মেঘ বিকেলকে পালটে দিল, বিকেলের ব্রহ্মাণ্ড আমাকে পালটে দিচ্ছে। সবাই সবাইকে পালটে দিচ্ছে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবার মতো, সবাই মিলে উৎসবে মাতবার মতো।

চিন্তা এইখানে আসতে আসতে সন্ধে হল, আকাশে দু-চারটে তারা ফুটে উঠল, ফিসফিস করে কেউ মনের মধ্যে শুধোল, অস্তিত্বগুলির রূপান্তরিত হবার ঐ নিজধর্মই কাল নয় তো? আরো ভাবতে ভাবতে দেখি, যখন সম্পূর্ণ জগৎ প্রলয়ের সীমানার মধ্যে চলে যাবে, সেই পূর্ণ অনস্তিত্ব বা শূন্যতা ভরে যে না-থাকার মতো করে থাকে বা থাকার মতো করে না থাকে সেই হচ্ছে কাল। প্রলয়ের আগে পরে যেমন কাল নেই, শুধুই প্রবাহ, তেমনি প্রলয়ের মধ্যে প্রবাহ নেই, শুধুই কাল।

পৃথিবীতে কালের গতি মাপবার সহজ একক হল একটি দিন-রাত। দিনরাতের একক কিন্তু আপেক্ষিকতত্ত্বের অধীন। চার হাজার যুগে অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলির হাজার বার আবর্তনে ব্রহ্মার এক দিন। আর এই দীর্ঘ ব্রাহ্ম দিনের হিসেবে ব্রহ্মার আয়ু এক শো বছর। মানুষের আয়ু যেমন একশো সৌর বছর, কাছিমের আয়ু যেমন আড়াইশো সৌর বছর, মে ফ্লাইয়ের আয়ু যেমন বসন্তসাঁঝের এক প্রহর, এও সেইরকমই। তাহলে ব্রহ্মারও মৃত্যু আছে। এটা জানার পর আমার সময়ধারণা অন্য মাত্রা পায়।

দেবতাদের আকাশে সময় বড় দ্রুত, টকাটক চলে। অথবা সময় ঘনীভূত হয়ে ঠাসা আছে সেখানে। একদিন হিমালয়ে বসে শিব দুর্গা গল্প করছিলেন, এমন সময় দুম করে একটা শব্দ হল। দুর্গা জিজ্ঞেস করলেন, কী হল? শিব বললেন, রাবণ জন্মাল। তাঁরা গল্প করতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে ফট করে আবার একটা শব্দ হল। দুর্গা জিজ্ঞেস করলেন, কী হল? শিব বললেন, রাবণ মারা গেল। আকাশে দেবতাদের সময় এই রকমই

টকাটক চলে, নইলে কি ওঁরা ছায়াপথ, নক্ষৎৰজগৎ, নীহারিকামণ্ডলের আলোকব মাপের নড়াচড়াকে এত নির্লিপ্ত মনে সইতে পারতেন!

সময়, আমাদের নশ্বরদের জন্য তৈরি একটি মায়া দেখতে না দেখতে, স্বাদ নিতে না নিতে ফুরিয়ে যায়। এই তো সেদিন কচি আমবউলের মতো শরীর উঁশা হল, মিহি হল, উতল হল, আর এরই মধ্যে দেখছি ঝরে পড়ার সময় এসে গেছে। আর শু কি শরীর, তার সঙ্গে নসিব আছে না! সুভাগার ভাগ্য যেন বাচ্চাদের লাল হলদে সবুজ কাগজের হাত-চরকি- একটু হাওয়া পেলেই ফুরফুর করে ঘোরে। আর অভাগার ভাগ্য কর্ণের রথচক্র কালো, ভারী, ক্রমাগত মাটিতে সেঁধোয়, আপ্রাণ টেনেও তুলতে পারি না।

.

ফিরে আসা এবং ছেড়ে যাওয়া

ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হলে অসমের সেই নদীউপত্যকার দেশ ছেড়ে দাদামশায়ের কাছে কলকাতায় না গিয়ে ফিরে এলাম গ্রামে, আমার জন্মভূমিতে, পূর্বপুরুষের ভিটেয়। ইচ্ছে করে বা কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে ফিরি নি, আর-কেউ অন্য কোথাও ডাকে নি বলেই এখানে এসেছি। কদিন থাকতে পারব তাও জানি না। এই অনিশ্চয়ের বিন্দু থেকেই বিপন্নতার শুরু। গীতায় সংশয়াত্মার খুব নিন্দে করা হয়েছে। বিপন্নেরা সংশয়াত্মা আর হৃদয়হীন হবে না তো কী হবে।

সে বাড়িতে বাসিন্দা তখন ছজন বড়মা, মা আর চারটি ছোট ছোট ভাইবোন। দাদু ঠাকুমা আর কাকার মৃত্যুর ন বছর পরেও দেখছি ঘরের খুঁটিগুলো আড়ার সঙ্গে, চালের বাতার সঙ্গে শক্ত করেই বাঁধা আছে। বাবা মাঝখানে কয়েকবার এসে গৃহসংস্কার করে গেছেন। ঘরদোর মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। তবু কোথায় যেন বাঁধন জীর্ণ হয়ে গেছে। আমি একবারও অনুমান করি নি, বাবারই সংসার এটা, বড়মা শুধু টিটিউলার হেড।

বড়পুকুরে মহিলারা মেয়েরা বাসন মাজতে, কাপড় কাঁচতে, গা ধুতে, জল ভরতে আসে। সেখানে ঐ-ঘরের-মাকে দেখি না। তিনি মারা গেছেন। তাঁর বালক ছেলে ফুচু সেও কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক হয়ে মারা গেছে। তাঁর মা-মরা শিশু মেয়েটি আগুনে পুড়ে গিয়েছিল পোড়ার ঘা সেরে গেছে, কিন্তু কেউ লক্ষ করে নি বলে বাঁ হাতটি বা বুকের সঙ্গে জুড়ে গেছে। কখনো ন্যাংটো, কখনো ছোট্ট জাঙিয়া পরা, বাচ্চা মেয়েটির সারা দেহে পোড়ার দাগ। আগুন কিন্তু তার মুখকে স্পর্শ করে নি, শুধু বাঁ কানের লতি এবং বাঁ কপালের রগ একটু ছুঁয়ে চলে গেছে। তার চোখদুটি নীল, ঠোঁটদুটি লাল, গালে ময়লার দাগ, চুলগুলো কেউ এবড়োখেবড়ো করে হেঁটে দিয়েছে। আমি যেমন ঐ-ঘরের মার কাছে স্নেহ নিতে যেতাম সেও তেমনি যখনতখন চলে আসে এই বাড়ির মার কাছে। সে মায়ের পায়ে পায়ে ঘোরে। মা বলে, ওর নাম ফুরতি।

এর মধ্যে বাড়ির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ধনদিদির ছোট মেয়ে সুবচনী অর্থাৎ সুবিপিসির দূর গ্রামে বিয়ে হয়েছিল, বিয়ের পরই সে বিধবা হয়েছে। বিধবা হয়ে সে মায়ের মতো মোটা হয়েছে, ফরসা গায়ের রঙে সাদা থান পরে তাকে পুষ্ট থোড়ের মতো দেখায়। ছোড়দাদু একটা গরু কিনেছেন- সে গরু গুতিয়ে তাঁর একটা চোখ কানা করে দিয়েছে। সোনাদাদুর ভিটে, কুতুকাকাদের ভিটে, রাঙাদাদুর ভিটে ফাঁকা পড়ে আছে। পরিত্যক্ত ঘরগুলোর ভাঙা জানলা দিয়ে বুনো লতা নিঃসাড়ে ভিতরে ঢুকে মাটির হাঁড়ি, বেতের ঝাঁপি হাতড়ে দেখছে। বুনো লতাগুলোর স্বভাব ঠিক বুনো সরীসৃপদের মতো। ভাঙা বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিলে হঠাৎ চমক লাগে- কুণ্ডলী পাকানো লতার ডগাগুলো ওখানে ও কী করছে? বাড়ির চারদিকের জঙ্গল, খালপাড়ের জঙ্গল যেমন ছিল তেমনি আছে। তেঁতুলতলার কাছে বেতের বন তেমনি কাঁটায় আকীর্ণ। ধনদিদিদের ডোবার পশ্চিমে তারাবনটি তেমনি ঘন সবুজ ও দুর্ভেদ্য। আমাদের পশ্চিমপুকুরটি, ঘাটের কাছটুকু ছাড়া, কলমি আর হিঞ্চের দামে জমাট বেঁধে আছে। কলমির বেগুনি ফুলের উপর ফড়িং উড়ে বেড়ায়। সোনাদাদুদের পুবের পুকুর আগাগোড়া কচুরিপানায় ঢেকে গেছে। মাছের আশায় পুকুরপাড়ের গাছে আগে শঙ্খচিল মাছরাঙা বসে থাকত, এখন আর তারা বসে না। বড়পুকুরের দক্ষিণ পারে

যে বিশাল রেইন ট্রি বা শিরীষ গাছটি ছিল, কথায় কথায় যার কাছে আমি পালিয়ে যেতাম, যার ফাটা ফাটা গায়ের বাকল শোলার মতো নরম ছিল, আমাদের পুরো বাড়িটার দক্ষিণ শিয়র যে একাই পাহারা দিয়ে রাখত, এবার এসে দেখছি সে নেই, বড় করাত দিয়ে তাকে গোড়া থেকে কেটে ফেলা হয়েছে। বাড়ির দক্ষিণ দিক বেআবরু, হা হা করছে। তবু এই ক'বছরে আমাদের পুরো বাড়িটার সবুজ রং কি আরও দু-এক পোচ গাঢ় হয়েছে? অযত্নে তার মধ্যে একটা পোড়া ভাব এসেছে যেন। তেঁতুলতলা, বেতের বন, সোনাদাদুদের পুকুরপাড় চুলখোলা এক উন্মাদিনীর মতো। নীল আকাশের নিচে আমাদের পুরো বাড়িটা অসংস্কৃত একটুকরো পান্নাপাথরের মতো গাছগাছালি ক্রমশ এসে তাকে আরও ঘিরে ধরছে। আর চুনির ঠোঁট, নীলার চোখ, বিকলাঙ্গ, পোড়া ফুরতি যেন সেখানকার ড্রাইয়াড়দের শিশু মেয়ে, যখনতখন এ বাড়ি ও বাড়ি আর জঙ্গলে তাকে দেখা যায়।

দক্ষিণে রেইন ট্রি গাছটি নেই বাড়ির সবচেয়ে বিশাল স্তব্ধতা আর হালকা পাতার তিরতির কাঁপন আর গভীর অস্তিত্ব অতখানি জায়গা ফাঁকা করে চুপচাপ চলে গেছে। তার গুঁড়িতে বাকলের ফাটলের ডেয়ো পিঁপড়ে আর সাধারণ খুদে পিঁপড়ে চলাফেরা করত। আমি পুকুরপাড়ে বসে কল্পনা করি আমরা যেমন কৈলাস-মানসসরোবরে যাই তেমনি হয়তো এক অভিযাত্রী খুদে পিঁপড়ে একদিন শিকড় থেকে হেঁটে হেঁটে মগডালের দিকে তীর্থযাত্রা করেছিল। একেবারে ডগায় পৌঁছতে হয়তো তার মাসখানেক লেগেছিল। উঠে কিন্তু সে সত্যিই দেখতে পেল: মানসসরোবর আঃ! কত বড় নীল হ্রদের মতো আকাশ! তার শুঙ্গে এসে লাগছে হ্রদের শীতল হালকা জলকণা, দূরে আবছা কৈলাসের মতো সুদূর মেঘ। তার জন্ম সার্থক।

সেই রেইন ট্রি গাছটি নেই। গতবছর বাবা এসে করাতিদের দিয়ে তাকে গোড়া থেকে কাটিয়েছেন। বাবার ইচ্ছে কাঠের একটি বাড়ি বানাবার। কিন্তু হঠাৎ কী যে হল কে জানে তৈজসপত্রসমেত আমাদের পুরনো বাড়ি বেওয়ারিশ পড়ে রইল, বাবা তাঁর সংসার গুটিয়ে জীবিকাস্থলে তুলে নিয়ে গেলেন। এই ঠাইনাড়ার সময় বড়মা একটা সাহসী সিদ্ধান্ত নিলেন, সেই পরিত্যক্ত বাড়িতে জনহীন সন্ধ্যায় লণ্ঠন হাতে এঘর ওঘর করার জীবন থেকে

নিজেকে অব্যাহতি দিয়ে তিনি কাশী চলে গেলেন। সেই চলে যাওয়া, সেই বিচ্ছেদ আমি দেখি নি। তার আগেই আমি কলকাতায় চলে এসেছিলাম।

মাঝে মাঝে মনে পড়ে। সব যদি ঠিকঠাক থাকত, যদি বাড়ি থাকত, দেশ থাকত, গাছটি বেঁচে থাকত তবে আজ তার বয়স অন্তত দুশো বছর হত। দাদু ঠাকুমা কাকা বাবা রাঙাদাদু ছোড়দাদু সবাই চলে গেছেন, কিন্তু গাছটি তো থাকতে পারত, আমার অতিবৃদ্ধ দাদুদের বংশাবলিতে এক অমর পুরুষ হয়ে অন্য দেশেই না হয় অনন্তকাল ছায়া দিত সে।

১৯৪১। এই সময় আমার সবে সোল বছর পূর্ণ হয়েছে। এখন আমার পড়াশোনা নেই। পরীক্ষা দিয়েছি বটে, কিন্তু কেমন দিয়েছি সে কেবল আমিই জানি। মাঝে মাঝেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অদৃষ্টবাদী বালকের মতো ফলনির্ণয় করি- এক দমে যদি দূরের ঐ গাছটা পর্যন্ত যেতে পারি তবে পাশ, দম ছুটে গেলে ফেল। এই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রইলাম– পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি একটা পাতা খসে পড়ে তা হলে পাশ, না পড়লে ফেল। আসলে আমি খুব খারাপ ছাত্র।

শিশুকাল থেকেই পড়ার বই না পড়ে কেবল না-পড়ার বই পড়েছি। ফলে সারা জীবন অনিশ্চিত এবং মলিন হয়ে কাটাতে হল। কী বলব, এত বয়স হল, এখনও মৃত্যুর স্বপ্ন দেখি না, অথচ একজামিনেশন ড্রিম দেখি রাত্রে, অন্ধকারে, পরীক্ষায় নানারকম বিপৎপাতের স্বপ্নে ঘুম ভেঙে যায়– গলা শুকিয়ে বুক ধকধক করে, সব সত্যি বলে মনে হয়। অনেকক্ষণ পরে বুঝতে পারি, নাঃ, সবই তো ঠিক আছে।

কিশোরশরীরে তারুণ্য আর বলিষ্ঠতা যুগপৎ আসে। আমার শরীরে বলিষ্ঠতা আসছিল, কিন্তু তারুণ্য এল না। এ হল যেমন কোনো বর্ষার দিনে ঘন মেঘ করে এল, দূর থেকে ভিজে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে, মাঠের ঘাসে ছায়া তিন পোঁচ গাঢ় হয়ে নেমেছে, বৃষ্টি এই এসে পড়ল বলে। কিন্তু নাঃ, দু-চার বার বিদ্যুৎ চমক দিয়ে ধীরে ধীরে মেঘ কেটে গেল। মনের গুঞ্জরন, কথাবার্তা, কলস্বর যখন অন্যের কাছ থেকে প্রতিধ্বনি পায় না তখন তারুণ্য মুখচোরার মতো সরে পড়ে। তারুণ্য একটি প্রদোষকাল। দোসরের অভাবে তারুণ্যহীন আমার বলিষ্ঠতা নিওলিথ হাতুড়ির মতো নির্মম আর ভোতা হয়ে উঠছিল।

কেউ আমাকে উৎসাহ দেয় নি, আমি নিজেই দিনগুলোকে নিয়মানুবর্তিতায় বেঁধে ফেলেছিলাম। ভোরে স্নান করে সকালের খাবার খেয়ে একটি বই নিয়ে বড়পুকুরের ওপারে আমাদের শ্মশানে চলে যেতাম। আমাদের শ্মশান মোটেই ভয়ংকর বা বৈরাগ্যসঞ্চারী নয়, বরং অযত্নে ফেলে রাখা গাছপালায় ভরা একটি উপবনের মতো। বই পড়ার পক্ষে চমৎকার জায়গা।

ঘরে বসে পড়া একরকম, কিন্তু শ্মশানের কাছে গাছের ছায়ায় বই পড়তে বসলে পড়া অন্যরকম হয়ে যায়। একটা অনুচ্ছেদ পড়ে কতক্ষণ ধরে ভাবি, তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছি এমন কমই ঘটে। আনমনে তাকাই। সঁড়িপথে দেখি বেজি চলেছে লুকিয়ে, ঝোপের মধ্যে শেয়াল উঁকি দিল বোধ হয় ওখানে তারা বাসা করেছে, একটু দূরে চিরস্থায়ী ছায়ার মধ্যে একজোড়া ডাহুক এসে সাবধানে হাঁটছে। বেজি শেয়াল ডাহুক কারো মুখে কথা নেই। বেজি কি আদৌ ডাকে? কোনোদিন শুনি নি। একটু বুঝি হাওয়া বইছে, পোকা কিটকিট শব্দ

করছে– সেই শব্দ মিশে গেল বইটির একটা বাক্যের গায়ে। কেমন যেন অর্থহীনতা পেয়ে বসে। অনেকক্ষণ পরে চটকা ভাঙলে আমি পরের অনুচ্ছেদের উপর চোখ রাখি। হঠাৎ মনে কামড় লাগল, পরীক্ষার ফল বেরুতে আর বেশি দিন বাকি নেই বইটার সেই পৃষ্ঠায় দুঃখ অনিশ্চয়তা হঠকারী চিন্তা মিশে গেল।

বেলা চড়লে ঘরে ফিরি। একই রান্নাঘরের দুই প্রান্তে দুই আলাদা উনুনে মা আর বড়মা রান্না করেন। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বড়মার রান্না করা দেখি। তাঁর বাসনপত্র সংক্ষেপের কঠোর দৃষ্টান্ত বোখনো, কড়াই, একটি বড় বাটি, ভাত খাবার একখানা কালো পাথরের থালা, জলের ঘটি, হাতা, খস্তি, বেড়ি। এছাড়া নারকেলের মালায় তৈরি নুনের পাত্র, ঘিয়ের শিশি, তেলের বোতল। সারা দিনে বড়মা এক বারই রাঁধেন, এক বারই খান। খাবার পরে উনুন নিকিয়ে আদ্যোপান্ত বাসন বড়পুকুরে নিয়ে গিয়ে মাজেন। ক্রমশ রোদ নরম হয়ে আসে। তাঁর নিজের তৈরি পাটিতে শুয়ে একটু গড়িয়ে নেবার সময় আর নেই। বড়মা দেখতে পান, দুপুরের তাপে যে-শোলমাছটি পুকুরের তলায় চলে গিয়েছিল সে এখন উঠে এসে পাড়ের কাছে নিথর হয়ে আছে।

মায়ের হেঁশেল ছড়ানো-ছিটনো বিশৃঙ্খল। তার তিনটে ছেলেমেয়ে কে কোথায় বাসন ছড়াচ্ছে, ডালা কুলো নিয়ে যাচ্ছে, জামাকাপড় ফেলে আসছে কে এত দেখে রাখে! হাঁসেরা যে-পুকুরে চরে বেড়ায় সেখানে জলে, শৈবালে, পাড়ের ঝোপে পালক পড়ে থাকে সন্ধেবেলা।

এই মলিন গার্হস্থ্যের মায়া বড় বেশি ঘরে জিনিস কম, যাও বা আছে তা তুচ্ছ জিনিস, ফাঁকা জায়গাগুলি ভরে রেখেছে মায়া। ছায়া পড়ে এলে উঠোনের ধুলো পায়ের নিচে স্নিগ্ধ লাগে। ভাইবোনদের চুল অযত্নে তামাটে সে করুণতা হঠাৎ মায়া টেনে নেয়। জীর্ণ বিছানা সারা দিন রোদ খাইয়ে বিকেলে ঘরে তোলা হলে তার শরীরী স্পর্শে গভীর সুখ পাই। এই জায়গা ছেড়ে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না আমার।

দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত যতক্ষণ দিনের আলো থাকে আমি ছবি কপি করি, কখনো স্টাডি করি, সব রেখাচিত্র, পেনসিলে। আমার সবচেয়ে ছোট ভাইয়ের বয়স এক মাস। একটা মস্ত বড় তক্তপোশের এক পাশে আমি আমার কাজ করি, অন্য পাশে সে শুয়ে থাকে, হাত-পা ছোঁড়ে। দুপুরটা ছবি এঁকে কাটে। সন্ধেবেলা বারান্দায় বসে দেখি, নিচের আকাশ দিয়ে কাকেরা ঘরে ফিরছে, উপরের আকাশ দিয়ে বাদুড়েরা চলল রাতের অন্ধিসন্ধি খুঁজে দেখতে আমাদের উঠোনের উপর দিয়ে তাদের দুই দলের অতিক্রমরেখা চলে গেছে। দাদুর কথা মনে পড়ে ন-দশ বছর আগে দাদু আর আমি ঠিক এইখানটিতেই এইভাবে বসে আকাশে সন্ধে হয়ে আসা দেখতাম। আমি কি সেই ট্র্যাডিশনের কবলে পড়ে গেলাম? ভয় করে। ভালোও লাগে।

নিরুত্তেজ পাড়াগাঁর তুচ্ছতা আর শূন্যতা গ্রামবাসীরা ভরে তোলে ভালোবাসা আর ঝগড়া দিয়ে। প্রাণের এক দিকে ভালোবাসা, অন্য দিকে কলহ। আর মেয়েরা তো প্রাণময়ী যেমন সহজে ভালোবাসে তেমনি সহজে কোন্দল করে। তারা পুকুরঘাটে এ ওর মাথা ঘষে দেয়। শীতের দুপুরে ননদ ভাজ সখীরা মিলে গল্প করতে করতে চালতা মেখে তারিয়ে তারিয়ে খায়। শোকের বাড়ির ছেলেপুলেকে নিজের কোলের মধ্যে এনে খাওয়ায় দাওয়ায়, আড়াল করে রাখে। একদিন সন্ধ্যায় হয়তো কোনো বউয়ের মন নেই, রাঁধতে ইচ্ছে করছে না- পাশের বাড়ির বউ নিজেদের হাঁড়িতে তার রাতের দুটো ভাত একসঙ্গে ফুটিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসে। আবার পরের দিনই ভোরে এক ঝুড়ি আমের ভাগ বা রাত্তিরে খসা একটা শুকনো নারকেলের অধিকার নিয়ে কোনো প্রৌঢ়া তুমুল শাপশাপান্ত করে: যেন তিন রাত্তির না পেরোয়, যেন বাড়িসুদ্দ ওলাউঠো হয়ে মরে। মেয়েদের ঝগড়া শেষপর্যন্ত হাস্যকরতায় পর্যবসিত হলেও পুরুষদের ঝগড়া তত নিষ্পাপ নয়। এক ঝাড় বাঁশের মালিকানা বা নতুন জাগা কোনো চরের আবাদ নিয়ে যখন তারা মুখোমুখি হয় তখন মোষবলির রামদার এক কোপে ধড় মুণ্ড আলাদা হয়ে যায়, তীক্ষ্ণধার সড়কির এক খোঁচায় পেটের নাড়িভুড়ি বেরিয়ে আসে।

কিন্তু গ্রামে মানুষের চেয়ে বিরাট হয়ে আছে গাছপালা আকাশ বাতাস। রাস্তাঘাট বনপথ মাঠ আমাকে পোকার মতো, ধুলোর মতো বুকে টেনে নেয়। রাত্রে আকাশ ভরে যখন তারা ওঠে তখন তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হয় তুলনাহীন এই জীবন। এ জায়গা ছেড়ে কোথায় যাব।

না, এ জায়গা ছেড়ে আমাকে কেউ যেতে বলবে না, যেতে চাইলে আটকাবেও না। কিন্তু এখানে আমার জীবিকা কোথায়? খাব কী? আমাদের পোড়ো জমির অভাব নেই–আমার সেই কয়েক বছর আগেকার কলাবাগানের পরিকল্পনা আবার মনে পড়ল। কিন্তু 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে' মনেই তা লীন হল। গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে ভাবি, ফেল করলে কী হবে? কোনক্রমে পাশ করলেই বা কী হবে? কোনো দিকেই কোনো উত্তর নেই। আমার নৌকো তো পাড় ঘেঁষে চলছে না, চলছে মধ্যগাঙ দিয়ে, সেখানে দিনে রাত্রে কখনোই কূল দেখা যায় না।

এর মধ্যে একদিন কলকাতা থেকে মামার টেলিগ্রাম এল: তুমি তৃতীয় বিভাগে পাশ করিয়াছ। সপ্তাহখানেক পরে দাদুর পাঠানো পাঁচ টাকার একটি মানি অর্ডার এল, সঙ্গের কুপনে মাসিমার হাতে লেখা একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি: এই মাসের অমুক তারিখে খোকার বিবাহ ধার্য হইয়াছে। তুমি তার আগে অবশ্যই আমাদের এখানে চলিয়া আসিবা। ইতি আশীর্বাদিকা দিদিমা।

পথখরচ হিসেবে পাঁচ টাকা যথেষ্ট। গ্রাম থেকে একটি পুরো রাত নৌকোয়, তার পরে স্টিমারে খুলনা, আর শেষে বরিশাল মেইলে একদৌড়ে শেয়ালদা। শেয়ালদা থেকে জৈডকাদের সবুজ রঙের বাসে টালিগঞ্জ- সব মিলিয়ে তিন থেকে সাড়ে তিন টাকা ভাড়া। এই পথ পুরবৈয়া বাঙালিদের গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড। বছরে বছরে, মাসে মাসে, ছুটিতে ছুটিতে এই পথে আমাদের চাকুরেরা, কলেজপড়ুয়ারা, ভাগ্যান্বেষীরা কতকাল ধরে যাতায়াত করছে। এই প্রথম আমিও তাদের মতো উৎসবে ও ভাগ্যান্বেষণে যাচ্ছি। তারা যেমন বার বার দেশে ফেরে আমিও নিশ্চয় তেমনি ফিরে আসব। সামান্য এই যাওয়া নিয়ে মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আজ জানি, ঐ যাওয়াটা ছিল ঠিক মৃত্যুর মতো। মৃত্যুকালে কেউ

কি বোঝে, এই যে চলে যাচ্ছে আর ফিরবে না। তাকে বার বার সবাই বলেছে, আবার জন্মবি, আবার ফিরে আসবি। এই বাড়ি ঘর নদী নক্ষত্র সব তো রইল তোর।

.

১৯৪১-এর কলকাতা

এখন এই একুশ শতকে এসপ্ল্যানেড-ধর্মতলার মোড়ে রোজ বিকেলে ঘরে ফেরা মানুষের আর ঘরে না-ফেরা মানুষের ঢল নামে। আজকের (২৩.১০.২০০১) কাগজে দেখছি, এবার সপ্তমীর রাতের রাস্তায় প্রতিমাদর্শনার্থীর সংখ্যা নাকি কোটি ছাড়িয়ে যাবে। রাক্ষুসে, অশ্লীল এই জনসংখ্যায় আমি আতঙ্কিত হই। অথচ সেই ১৯৪১-এ নিজে নিজে হেঁটে বা ট্রামে ট্রামে ঘুরে যখন কলকাতাকে প্রথম দেখি তখন তার সাজানো দোকান আর অজানা নরনারীর রহস্যে আকৃষ্ট হয়ে কী-যে সুখে পথ চলেছি! মফস্বলের আকাশ-বাতাসের মতোই কোমল সতেজ আকাশ-বাতাস ছিল এই নগরীর। ট্রাম বাস ঘোড়ার গাড়ি জিনরিকশা হল প্রধান যানবাহন। বসন্তে দক্ষিণ থেকে হাওয়া আসে সে বাতাস বড় সুখাবহ সাদার্ন অ্যাভিনিয়ুর রাস্তায় বা টালিগঞ্জের তেতলার ছাদে মিহি সুতোর সাদা ধুতি শাড়ি যখন ত্বকের উপর উসুখুসু করে তখন রোমাঞ্চ হয়, উদাসও লাগে। আমি বসন্তে প্রথম এসেছিলাম বলে ঐ অনুভূতিগুলি মনে আছে।

তখন কলকাতা বেশ মাপসই ছিল উত্তরে বাগবাজার খাল আর বেলগাছিয়ার খাল। পুবে মানিকতলা, শেয়ালদা, পাকসার্কাস, গড়িয়াহাট। দক্ষিণে ঢাকুরিয়া লেক, লেকের ওপারে বজবজের রেললাইন। আর পশ্চিমে আদিগঙ্গা, আলিপুর জেল, কেল্লা, হুগলি নদী। এই চৌহদ্দির বাইরে মোটামুটি শহরতলি- এঁদো বস্তি, পোড়ো বনবাগান, স্পেকুলেটরের তারকাঁটাঘেরা জমি, পানাপুকুর, তাড়ির হাঁড়িঝোলানো তাল গাছ, বাঁশ বন, হোগলাবন, পাড়াগাঁ। পুবে, আরও দূরে, আমাদের গতিবিধির বাইরে জনহীন এবং বিস্তীর্ণ হয়ে ছিল লবণ হ্রদ, ধাপা এবং তিলজলা। প্রাচীন বাসিন্দাদের মনস্তাত্ত্বিক কলকাতা ছিল আরও

ছোট। ভবানীপুরের পুরনো লোকেরা বড়বাজার, কলেজ স্ট্রিট বা ধর্মতলায় যাবার সময় বলতেন, কলকাতায় যাচ্ছি।

বেশির ভাগ বাড়িই তখন একতলা বা দোতলা। উত্তর কলকাতা ঘনবসতিপূর্ণ হলেও দক্ষিণ কলকাতায় মধ্যবিত্তের বাড়ি বানাবার মতো প্রচুর ফাঁকা জমি ছিল। কেল্লা থেকে চৌরঙ্গি রোড পর্যন্ত এক অবাধ প্রান্তর গড়ের মাঠ– সবুজ ঘাসে ছেয়ে আছে। সারা কলকাতা জুড়ে কঠোরভাবে তিন আইন বলবৎ। পাড়ায় পাড়ায় আবর্জনা জমার আগেই সাফ করা হয়। রোজ ভোরে হাইড্রান্ট থেকে লম্বা হোস পাইপে তোড়ে জল ছিটিয়ে রাস্তা ধুয়ে দেয় পুরসভার লোকেরা। অনেক বাড়িতেই দু রকম জল আসে- পরিসুত জল আর অপরিসুত গঙ্গাজল। রাস্তার তলা দিয়ে বাড়িতে বাড়িতে কলঘরে জলের পাইপলাইন এসেছে সমস্ত শহরটা ভালো জল ও ঘোলা জলের লাইনে এবং ভূগর্ভ পয়ঃপ্রণালীর হিউম পাইপে আচ্ছন্ন হয়ে তলায় তলায় অন্য একটা নল ও ঝাঁঝরির গোলকধাঁধা শহর হয়ে আছে। ঐ অপরিসুত জলে এত চাপ যে বিনা পাম্পেই জল সোজা উঠে যায় দোতলার ছাদের ট্যাংকে। সেই জলে গঙ্গার পলি থাকে, কখনো কখনো দু-একটা চকচকে ছোট মাছও এসে পড়ে। আমার চাইতে পঁচিশ বছরের বড় জীবনানন্দ দাশ কলকাতার এই ভূগর্ভ পাইপের জলধারা এবং কেবল লাইনের ধাবমান বিদ্যুৎকে নিয়ে তাঁর অকৃতার্থ ঘুমভাঙা রাতে আরো কত অসম্ভব ভেবেছেন: ‘বাইরে কোথাও জলঝরার শব্দ- প্রায় সারা রাতই শুনতে পাওয়া যায়; কার বিরাট চৌবাচ্চা ভরছে হয়তো কিংবা অন্যমনস্কভাবে কল খুলে রেখে গেছে কেউ হয়তো রসাতলবাহী পাইপের জলধারা রাতের নিস্তব্ধতায় মানুষের আধোঘুমের কানে ছলছলিয়ে চলকে ছলছলিয়ে কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন। না, তা নয়। তা যদি হত, তা হলে কলকাতার মাটি ও দেওয়ালের ভিতরের পাইপগুলোতে কত যে জলদেবী ধরা পড়ত। আধো-ঘুমন্ত মানুষের হৃদয় এমন নির্জন রাতে একজন দেবিকাকেই চায় তবুও; জলের থেকে উঠে আসুক উঠে আসুক রাস্তার শামদানের বিদ্যুতের থেকে।

রাজপথে বিদ্যুতের আলো ক্রমশ একচ্ছত্র হলেও কোনো কোনো নিভৃত গলিতে তখনও কিছু গ্যাসের বাতি ছিল। গ্যাসের খুঁটিগুলো বেঁটে, পলতোলা, দেখতে সুন্দর। এই খুঁটির মাথায় আলোর ম্যান্টলকে ঘিরে কাঁচের চিমনি। ভূগর্ভপথে আসছে। গ্যাসের জোগান। ছেলেবেলায় একটা ঢ্যাঙা লোকের গল্প পড়েছিলাম লোকটা অনেক রাতে বাড়ি ফিরত আর রাতের রাস্তায় গ্যাসের বাতির চিমনি খুলে সিগারেট ধরাত।

গ্যাসের আলোর মতো একটি সুন্দর, ক্ল্যাসিক জিনিস ধীরে ধীরে কলকাতার বুক থেকে নিঃশব্দে লুপ্ত হয়ে গেল। ঢালাই লোহার এরকম আরো দু-একটি জিনিস ছিল যা এখন

আর নেই– যেমন কিছু পুরনো বনেদি বাড়ির রেলিং ও অলংকৃত গেট, যেমন ট্রামের ঘোড়াদের ফেলে যাওয়া জলপাত্র। চৌরঙ্গির ট্রামলাইনের পাশে পড়ে থাকা আয়তক্ষেত্রাকার পাত্রগুলো গভীর ট্রের মতো, চমৎকার গড়ন। ট্রামে যেতে যেতে চোখে পড়ত, গাছের ছায়ায় উচ্ছল ঘাসের মধ্যে অনাদৃত পাত্রগুলিতে বৃষ্টির জল জমে আছে, শালিকরা আর কাকেরা খাচ্ছে।

পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে চোখ টেনে নিত ঢালাই ব্রঞ্জের জেনারেল আউট্রামের অতিকায় মূর্তিটি ছুটন্ত ঘোড়ায় যেতে যেতে পিছন ফিরে এক ঝলক তাকিয়ে দেখছে এক সৈনিকপুরুষ। পাশের সরু রাস্তার গাছের ছায়া আর ঝরা পাতা উড়ে উড়ে পড়ে তার উপর। সম্ভবত সেইটিই ছিল কলকাতার শ্রেষ্ঠ অনিকেত ভাস্কর্য। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আর আউট্রামের মূর্তি নিশ্চয় একে অন্যের পরিপন্থী ছিল, অতএব স্বাধীনতার পরে বিরাট ঐ ব্রঞ্জখণ্ডটিকে লোকচক্ষুর অগোচরে সরিয়ে ফেলা হল।

.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিশ্চয় একটা ব্র্যহস্পর্শ দোষ লেগেছিল, নইলে তার শুরুর তারিখটা কেন বিশ শতকের ৩. ৯. '৩৯ হবে? যা হোক, যুদ্ধ দেড় বছর গড়িয়ে গেলেও আমি অসমে বা পুববাংলায় একটা শিশুর নখের আঁচড়ের মতোও তার কোনো আক্রমণ টের পাই নি। দিন যেমন বয়ে চলেছিল তেমনি চলেছে, মাঠ খেত নদীজল খাল বিল যেমন নিশ্চিন্ত আর টলটলে ছিল তেমনই আছে, স্টিমার ট্রেন আগের নিয়মেই আসছে যাচ্ছে। শুধু কলকাতায় এসে একটা পরিবর্তন দেখলাম: রাত্রে বিমানহানার ভয়ে শহরটিকে অন্ধকারের আড়ালে লুকিয়ে ফেলা হচ্ছে। সন্ধে হলেইব্ল্যাক আউট নামের একটা নতুন জাতের পাচা যেন ডানায় পালকে আকাশ বিমর্ষ করে বাড়ি-বাড়ির ছাদে নামে।

তখনও কালো বাজার কাকে বলে আমরা জানি না। বাজারে গেলেই সব জিনিস অজস্র পাওয়া যায়, দামও আগের মতোই সস্তা। সেই সময়কার কোনো মধ্যবিত্ত বাড়ির সংসারখরচের খাতা এখন দেখলে অবিশ্বাস্য মনে হবে। গ্রামে আমি দশ থেকে পনেরো

টাকায় ছ জনের পরিবারকে মাস চালাতে দেখেছি, অবশ্য একটু টানাটানি করে। চলবেই বা না কেন? তিন থেকে চার টাকা মন চাল, আড়াই থেকে তিন টাকা মন আস্ত মসুর। তাছাড়া, বেড়ার গায়ের শিম লতা, লম্বা গাছ বেয়ে ওঠা বরবটি, শুকনো মরা আম গাছকে ঝোপের মতো ঘন হয়ে ঘিরে ধরা ঝিঙে লতা, তারাও সাহায্য করে। এদিকে কলকাতাতেও তখন দেখছি, পাঞ্জাবী হোটেলে কোয়ার্টার প্লেট মাংস ২ আনা, তন্দুরি রুটি ২ পয়সা, লস্যি এক গ্লাস ১০ পয়সা। পবিত্র হিন্দু হোটেলে পেটভরতি ভাত ডাল আলুভাজা তরকারি মাছ অম্বল সাকুল্যে ৩ আনা। বাজারে হাঁসের ডিম ২ পয়সা, ফিরপোর কোয়ার্টার পাউন্ড মিল্ক ব্রেড ৪ পয়সা। এর সঙ্গে দু চা-চামচে তেল হলেই ফ্রেঞ্চ টোস্ট খেয়ে এক বেলার মতো নিশ্চিন্দি। কে সি দাশের 'আবার খাব' সন্দেশ ৪ আনা। ফিরলোর ছোট কেক, উপরে লাল চেরি, ৪ আনা। মেট্রোতে ম্যাটিনি শো-র টিকিট ৬ আনা। ট্রামে প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ৪ পয়সা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৩ পয়সা, সস্তা মধ্যদিনের ভাড়া ২ পয়সা। ইভ্যাকিউয়েশনের সময় আমার চেনা এক যুবা ভবানীপুরের পূর্ণ থিয়েটারের পিছনে একটা একতলা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল মাসিক ৫ টাকায়। এই সময়েই সাদার্ন মার্কেট থেকে তিন মিনিটের দূরত্বে দাদামশায় একটি আনকোরা নতুন বাড়ি কিনলেন। তাতে দুটো শোবার ঘর, একটা বসবার ঘর, তাছাড়া রান্নাঘর, স্নানঘর, ডাবলিউ সি, সিঁড়ি, প্যারাপেটঘেরা ছাদ, দুটো ছোট্ট ছোট্ট বারান্দা। কালোবর্ডারঘেরা লাল সিমেন্টের মেঝে। দাম? ৮ হাজার টাকা।

এই রকম প্রাচুর্য আর সৌভাগ্যের দিনে মামার বিয়ে হল। সেদিনের সন্ধেটা ছিল ভারি মনোরম। কনের বাড়ি সাদার্ন অ্যাভিনিয়ুতে শহরের দক্ষিণ বীথিকায়, বরের বাড়ি থেকে হাঁটাপথে পনের মিনিট। সন্ধে খানিকটা উতরে গেলে মামা গাড়িতে রওনা হয়ে গেল। চমৎকার দক্ষিণে হাওয়া দিচ্ছিল। আমরা বরযাত্রীরা ভাবলাম, এইটুকু রাস্তা, বেশ হাসি গল্প করতে করতে হেঁটেই চলে যাই। চারদিক নিরিবিলি। রাস্তা নিষ্প্রদীপ। রাতের আকাশ কালচে নীল। মুদিয়ালিতে পৌঁছে দেখি, ব্ল্যাক আউটকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে ঘনীভূত সাদা জ্যোৎস্নাভরা ফানুসের মতো চাঁদ অনেকখানি উপরে উঠে গেছে। চাঁদের আলোয় সাদার্ন অ্যাভিনিয়ু ভেসে যাচ্ছে। সবার পরনে সাদা ধুতি সাদা পাঞ্জাবি। কনের বাড়িতে পৌঁছতে

তারা সাদা গোড়ে মালা হাতে জড়িয়ে দিল, স্প্রে করে গোলাপজ ছিটিয়ে দিল। তাদের দোতলা বাড়িটার রং সাদা, সাদা মারবেল বসানো বড় বারান্দা। এই সাদায় সাদা বিবাহদৃশ্যের চারদিকের উপকূলে ঘিরে আছে রাত। ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে। কাছে কোথাও নহবত বসানো হয়েছে সানাইয়ে সন্ধ্যারাতের সুর আসছে। বর কনে দুজনের রংই দারুণ ফরসা সাদায় একটু লাল মেশান। টুকরো দৃশ্যটাকে আকাশে গন্ধর্বদের বিয়ের মতো লাগছিল।

উৎসবের জোয়ারের পর সংসার আবার তার স্বাভাবিক ভাটায় ফিরে গেল। এবং এইবার এই ছোট পরিবারের মধ্যে আমার অস্তিত্ব এক অস্বস্তিকর প্রশ্নচিহ্নের মতো এসে দাঁড়াতে লাগল। এখানে এরা সবাই আমার মাতৃকুলের, অর্থাৎ এই গোষ্ঠীতে আমি বাইরের লোক, দাঁড়কাকের মধ্যে পাতিকাকের মতো, গোবকদের মধ্যে কোঁচবকের মতো বা আঙ্গামি নাগাদের মধ্যে আও নাগার বাচ্চার মতো। এদের চোখে যেমন অনুমোদন নেই, মুখেও কিন্তু কোনো কুবাক্য নেই। আমার সমবয়সী এক সম্পর্কিত মামা আর বোন আমার সঙ্গেই পাশ করেছিল, তারা নিঃশব্দে কলেজে ভরতি হল। এই কদিনে তারা আমার বন্ধু হয়েছে। আমরা অন্য গল্প করি কিন্তু পড়াশোনার কথা কেউই আর তুলি না। আমি একলা হয়ে মনে মনে ভাবি, আমার যা পরীক্ষার ফল তাতে আরও পড়তে চাওয়া আবদারের মতো শোনাবে। যত দিন যায় আমার অস্বস্তি হয় তাহলে এখানে কী কারণে আছি? দিন যায় আমি একটা প্রান্তিক অবস্থানে পৌঁছই। দুপুরের খাবার পর অপেক্ষা করি, যেই রোদ একটু পড়ে, বাড়িগুলোর নড়বড়ে ছায়া পুবের দিকে হেলে, আমি পথে বেরিয়ে পড়ি। পথে বেরিয়ে একটু একটু করে মন ভুলে যায়, একা একা লোকজন, বাড়িঘর, দোকানপসার দেখতে দেখতে চলি। পুরো কলকাতাকে পুব আর পশ্চিমে দুই ভাগ করে একটাই রাস্তা উত্তরে দক্ষিণে লম্বা হয়ে আছে। যদি দক্ষিণ থেকে ধরি, রাস্তাটা টালিগঞ্জের রসা থেকে বেরিয়ে কালীঘাট ভবানীপুর চৌরঙ্গি হয়ে, চিতপুর জোড়াসাঁকো টিরেট্টাবাজার শোভাবাজার হয়ে বাগবাজারের খাল পর্যন্ত গেছে। একই নদীর নাম যেমন সাংপো, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা তেমনি ঐ একই রাস্তার নাম বাগবাজার স্ট্রিট, চিতপুর রোড, বেন্টিংক স্ট্রিট, চৌরঙ্গি রোড আর রসা রোড। আমি কোনোদিন লেকের পাড়ে হাঁটি, জলের কোল ঘেঁষে বসে থাকি, কোনোদিন

সাদার্ন অ্যাভিনিয়ু বা রাসবিহারী অ্যাভিনিয়ু ধরে হেঁটে যাই। কোনোদিন টালিগঞ্জ থেকে সোজা হাঁটতে হাঁটতে চলে যাই চৌরঙ্গিতে। পথ হেঁটে আমি ব্যথা এবং ভার ক্ষয় করতে চাই। এখন গ্রীষ্মকাল। লেকের পাড়ে জলের ধারে বসে দেখি কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠল- কালো আকাশে আধভাঙা চাঁদ যেন একটা পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া কাগজের মধ্যে তখনও খানিকটা কাগজ না পুড়ে সাদা আর হলদেটে হয়ে আছে। ওদিকে জীবন কিন্তু ইন্ধন জ্বালিয়ে রেখেছিল তখন আমার বয়স মাত্র ষোলো পেরিয়েছে পরাজয় ও শঙ্কার সঙ্গে খ্যাপামি আর হঠকারিতা এক হাঁড়িতে চড়িয়ে যেন কেউ জ্বাল দিচ্ছে- অদ্ভুত ঝাঁজালো বলশালী সেই অরিষ্ট।

আমরা ভাবি ঘটনাই বুঝি মানুষকে পালটে দেয়, না-ঘটনাও যে মানুষকে পালটায় সে কথা এখন বুঝলাম। যদি আমার স্কুলের পরে কলেজ, তার পর চাকরি– এইসব স্বাভাবিক ঘটনা পর পর ঘটত তবে হয়তো আমার স্বাভাবিক বিকাশ হত। কিন্তু তা তো হল না। আমার ঘটনাগুলি না ঘটে অপমানিত মাথা নিচু করে স্তব্ধ বসে রইল বলে আমি উলটোপালটা লোক হলাম। দিন চলে যেতে লাগল আর নীরবে আমার ছাত্রজীবন শেষ হল। আরো দিন গেল, আমি নিঃশব্দে একজন স্বীকৃত বেকার হলাম। এই অকালবয়স্কতা মেনে নিতে মন চায় না। আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা হলে ভিতরে সতর্ক হয়ে উঠি- কথাবার্তা যেন 'আর পড়লে না কেন' বা 'এখন কী করবে ভেবেছ' বা 'আর কদিন আছে এখানে'-র দিকে গড়িয়ে না যায়। আমি লোকব্যবহারে ক্রমশ সন্দিগ্ধ, সতর্ক, কুটিল এবং বেপরোয়া হতে থাকলাম। কিন্তু নিজেকে ঐরকম বানাতে আমার কষ্টও হচ্ছিল।

যা হোক, আমি অকর্মা হলেও দু-একটা টুকটাক কাজ করে দিই। অসমে দাদুর পুরনো বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবার পর সেখানকার খাটপালঙ্ক, বাসনপত্র, অস্থাবর আরও যা ছিল সব নদীপথে জগন্নাথ ঘাটে এসে পৌঁছেছিল। আমি রসিদ নিয়ে একদিন সেগুলো ছাড়িয়ে আনতে গেলাম। জগন্নাথ ঘাটের বিরাট টিনশেডের এক জায়গায় একটা খাঁচার মধ্যে খাতাপত্র নিয়ে কেরানিবাবুটি বসেছিলেন। রসিদ দেখে বললেন- "ঠিক আছে, সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। চৌধ্রি, দেখ তো, এই মাল এই ঠিকানায় যাবে। আমাকে বললেন, "আমাকে

পান খাবার জন্যে দু আনা দাও। আমি অবাক। উনি পান খাবেন তো তার পয়সা আমাকে কেন দিতে হবে? আর, এভাবে কেউ চায় নাকি? যা হোক, আবছাভাবে বুঝে বা না বুঝে একটা দোআনি তাঁর খাঁচার টেবিলে রাখলাম। চৌধুরীর লোকেরা তিনটে ঠেলা এনে তার উপর মাল চাপাল। জিনিসগুলো আমার কতকালের চেনা। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আজ অনেকদিন পরে তাদের দেখা পেয়ে শুকনো মন কেমন যেন স্নেহে ভিজে উঠল– অতখানি রাস্তা আমি খেয়াল না করে ঠেলার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চললাম। রাস্তায় কড়া রোদ ছিল, কিন্তু গায়ে যেন লাগল না। কেউ বিশ্বাস করবে, কাঠের আসবাবও আপনজন হয়?

লেখাপড়া যখন হলই না তখন আমি বেপরোয়া হয়ে ইচ্ছেমতো বই পড়ার দিকে মন দিলাম। ঘটনাচক্রে এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যিকারের প্রথম পরিচয় হল। মামা আর মামি বিয়েতে অনেকগুলো বই পেয়েছিল, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথেরও কিছু কবিতার বই ছিল। প্রাপক-প্রাপিকার তখন বইয়ে মন দেবার সময় নেই, অতএব রবীন্দ্রনাথকে আমি নিজের হেফাজতে নিয়ে নিলাম। ছড়ার ছবি আর মহুয়া আমার মন ভুলিয়ে দিল। এই ভাষায় তো আমরা কথা বলি না, লিখি না। আমাদের ভাষা কুটিল পরুষ আবিল অচক্ষু অসমাপ্ত স্বপ্নহীন ধ্যানহীন। নতুন এই ভাষার আলো লেগে মেয়েপুরুষকে, জগৎকে অনির্বচনীয় দেখাল। মহুয়ার তিন চারটে পাতা ওলটাতেই পেলাম:

আমি যেন গোধূলিগগন
ধেয়ানে মগন,
স্তব্ধ হয়ে ধরা-পানে চাই;
কোথা কিছু নাই,
শুধু শূন্য বিরাট প্রান্তরভূমি।
তারি প্রান্তে নিরালা পিয়ালতরু তুমি।

কবিতার ঐ ‘আমি’ আমি নই জেনেও, আমার অপ্রাপ্তবয়স্ক শরীরে-মনে একজন বয়স্ক পুরুষের উদাসীন আর প্রতীক্ষমাণ আত্মা ছড়িয়ে যেতে লাগল। স্তব্ধ প্রচেষ্টাহীন কমলারঙের গোধূলিগগন আমি অনুভব করি, কিন্তু পৃথিবীপারের পিয়ালতরুর মতো মেয়েটিকে চিনি না, আমার তুচ্ছতা নিয়ে তাকে কাছে এনে ভাবতে সাহস পাই না, দূরের আবছায়াতে কল্পনা করে চলি।

আরও কিছুদূর গিয়ে আর-একটা কবিতা–

বিদেশের ঐ সৌধশিখর-’পরে
ক্ষণকালের তরে
পথ হতে যে দেখেছিলেম, ওগো আধেক-দেখা।
মনে হল তুমি অসীম একা। ..
সামনে তোমার মুক্ত আকাশ, অরণ্যতল নিচে,
ক্ষণে ক্ষণে ঝাউয়ের শাখা প্রলাপ মর্মরিছে।

কিছু না। একটি মেয়েকে দূরত্বে একাকিত্বে আকাশলগ্ন বাড়িতে মুহূর্তচিত্রের মতো দেখা গেল। কিন্তু কী করে যেন ঐ কটামাত্র ছত্রে চিরকাল, অসীম, এবং অনন্ত লাবণ্য এসে জড়িয়ে গেল। ক্রমশ কবিতার অলৌকিক শক্তি আমি টের পাই। এবং ভবিষ্যতে আমি যে কবিতা লেখার দিকে মন দিতে পারি সেই সম্ভাবনা তৈরি হতে থাকে।

ছড়ার ছবি-তে এক জায়গায় পড়ি–

নৌকোখানা বাঁধা আমার মধ্যিখানের গাঙে
অস্তরবির কাছে নয়ন কী যেন ধন মাঙে।

লাইন দুটো আমি কয়েক বার আওড়াই। শেষে চোখ বুজে জপ করতে থাকি অস্তরবির কাছে নয়ন কী যেন ধন মাঙে। আমার বোজা চোখের মধ্যে অন্ধের দেখার মতো অস্তায়মান

সূর্যের রঙিন আলো জগৎকে পূর্ণ করে সর্বব্যাপী হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের ঘরোয়া কিংবা ঐতিহাসিক বর্ণনা অনেকেই দিয়েছেন। আমারটুকু আমি এখানে বলি। বাইশে শ্রাবণের তারিখটা তো সবারই জানা। আমি সেদিন বারোটা সাড়ে বারোটা নাগাদ শিবপুর থেকে ফিরছিলাম। মেঘলা আকাশ– মাঝে মাঝে মেঘ ফেটে গিয়ে কড়া রোদ বেরিয়ে আসছে, মাঝে মাঝে ফুরফুরে ইলশেগুঁড়ি কদমরেণুর মতো উড়ছে। আমি যখন ওপারে যাবার জন্য পনটুন ব্রিজ পেরোচ্ছি, হঠাৎ উত্তেজিত পথিকদের মুখে শোনা গেল, রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন। ওপারে গিয়ে দেখি, কলকাতাটা যেন এই খবরের জন্য অপেক্ষা করছিল এবং খবরটা শোনামাত্র পড়িমরি করে ছুটল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দিকে। আমি ঐ ভিড়ে গিয়ে কী করব ভেবে বাড়ি ফিরে এলাম। তার পর সারা দিন ধরে কত খবর কানে এল মানুষের চাপে ঠাকুরবাড়ির লোহার ফটক ভেঙে পড়েছে, মৃত রবীন্দ্রনাথের পায়ের নখ নাকি এক ভদ্রমহিলা দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে নিচ্ছিলেন, জোড়াসাঁকোর একতলার ঘরে সজনী দাস নাকি তিন দিন ধরে নন্দলাল বসুর নকশায় শেষযাত্রার খাট বানাচ্ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের দাড়ি নাকি অনেকে মুঠো মুঠো ছিঁড়ে নিয়েছে, দেহ বাড়ির বাইরে বেরোনোমাত্র অপেক্ষমাণ জনসমুদ্র নাকি সেটি মাথার উপর দিয়ে জিনের মতো হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে, ভিড় ঠেলে রথী ঠাকুর নাকি শ্মশানেই পৌঁছতে পারেন নি, এবং মুখাগ্নির জন্য আপনজন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে অনেক পত্রিকা তাদের রবীন্দ্রস্মরণ সংখ্যা বার করল। এদের মধ্যে অমল হোম-সম্পাদিত ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট স্থায়ী বিশ্রুতি পেয়েছে। মিউনিসিপ্যাল গেজেটে রবীন্দ্রনাথের প্রচুর ছবি বেরিয়েছিল। বিভিন্ন কাগজে এবং বইতে তখন রবীন্দ্রনাথের নানারকম ছবি বেরুত নিচে লেখা থাকত শ্যামলীর সামনে রবীন্দ্রনাথ, শালবীথিকায় রবীন্দ্রনাথ, সুরুল কুঠিতে রবীন্দ্রনাথ, চিত্র অঙ্কনরত রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি। শনিবারের চিঠি দুষ্টুমি করে একটি চৌকো সলিড ব্লকে কালি লাগিয়ে ছেপে দিয়ে নিচে লিখল, অন্ধকারে রবীন্দ্রনাথ।

মজার কথা থাক। রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বেশি লেখা ছেপেছে যে-প্রবাসী তারা কিন্তু তেমন কোনো বিশেষ সংখ্যা করল না, তবে পরের সংখ্যার মুখপাতে এমন একটি ছবি ছাপল যাতে বাঙালির মনে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু চিরমুদ্রিত হয়ে রইল।

ছবিটি অবনীন্দ্রনাথের একটি বোয়া জলরং: সন্ধ্যার প্রদোষছায়ায় রবীন্দ্রনাথের শয়ান দেহ ভেসে চলেছে। আকাশে এবং জলে একই রঙের ধূসরতা। বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের চোখ বোজা। দেহটিই যেন একটি নুলিয়ার নৌকো সরল, জীর্ণ। অদৃশ্য মাঝি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। জোব্বার কাপড়ে, বুকের উপর কারো পায়ের আবছা লাল দু-তিনটি ছাপ। ছবির নিচে লেখা–

সমুখে শান্তিপারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।

ছবির সেই প্রিন্টটির বাষট্টি বছর বয়স হল। এখনও সযত্নে রেখে দিয়েছি।

.

আমার প্রথম চাকরি

অমিয়মামা একমাত্র ব্যক্তি যিনি মাঝে মাঝে আমার স্বাস্থ্যের তারিফ করেন। জিজ্ঞেস করেন, আমি ব্যায়াম করি কি না। একদিন তিনি খুব নরম গলায় জানতে চাইলেন, আমি যদি তাঁদের অফিসে কোনো কাজ পাই তো করব কি না। আমি বললাম- করব। দু দিন পরে আমি ট্রামে চেপে অমিয়মামার সঙ্গে চললাম তাঁর অফিসে। ডালহৌসি স্কোয়ারে ক্লাইভ বিল্ডিংসে এক ইংরেজ ব্যবসায়ী অফিসে উনি অফিসার। টাকপড়া, ক্রিকেটারের মতো চেহারা মেইলস নামে এক সাহেব আমার ইন্টারভিউ নিলেন। এক মিনিটের ইন্টারভিউ- তোমার বয়স কত? আঠারো। ঠিক তো? আমি চুপ। আচ্ছা, কাজ তো কয়রা, ..। ক্লাইভ বিলডিংসের তিনতলায় দক্ষিণখোলা একটা মস্ত জানলার পাশে টেবিল চেয়ার পাওয়া

গেল। তিরিশ টাকা মাইনে। কাজ খুব সোজা। বিমানহানার আশঙ্কা করে দরকারি নথিপত্র নকল করে রাখা হচ্ছিল। সেই কাজ। এখনও মনে হয়, জীবনে এইরকম সুখের দিন আমার অল্পই এসেছে। এই প্রথম আমি স্বাধীন, স্বনির্ভর, ভরা-পকেট। মাংসাশী প্রাণীদের কোনো নিঃসঙ্গ শাবক একাকী সাভানায় তার প্রথম শিকার ধরার পরে যেরকম উল্লসিত আদেখলে আচরণ করে, টের পাই, আমিও তেমনই করছি। বিশ্বাস হচ্ছে না শিকার পুরো মরেছে- থাবা দিয়ে চাপড় মেরে দেখছি, কলজের কাছে মুখ ঢুকিয়ে রক্ত খাচ্ছি, গোঁফে চিবুকে রক্ত লেগে আছে, মুছছি না। মাঝে মাঝে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাচ্ছি। তখন তিরিশ টাকা অনেক টাকা। তার থেকে পাঁচ টাকা যায় ট্রামের মাসিক টিকিটে। তার পরেও পঁচিশ টাকা- সেও অনেক। শনিবারে মেট্রোয় ম্যাটিনিতে ছ আনায় সিনেমা দেখি। কে সি দাশে চার আনায় আবার খাব সন্দেশ খাই। হাঁটতে হাঁটতে ফিরি ভবানীপুরে, দ্বারিকের দোতলায় লুচি আর ছোলার ডাল খাই।

এসপ্ল্যানেডের চত্বরে মাটিতে ত্রিপল বিছিয়ে খাকি হাফশার্টপরা কালোমতো একটা লোক যাবতীয় ইংরেজি বাংলা ম্যাগাজিনের গোছা সাজিয়ে বসে। সেখানে দাঁড়িয়ে পত্রিকা দেখি, বুদ্ধদেব বসুর ‘এক পয়সায় একটি’ সিরিজের রঙিন মলাটের চটি বইগুলো দেখি। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আর্মি অ্যান্ড নেভি স্টোর্স, হল অ্যান্ড অ্যান্ডারসন, ওয়াছেল মোল্লা, হোয়াইটওয়ে লেডল এবং আরো সব বড় দোকানের সাজানো বাতায়ন দেখি। বড়দিনের হগসাহেবের বাজারে ঢুকে মুগ্ধ হয়ে যাই- কত রকমের সুন্দর জিনিস যে পৃথিবীতে আছে! দরকার না থাকলেও কিনতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কিনে রাখব কোথায়? আমার তো বাড়ি, আলমারি, সিন্দুক, গুদাম সবই সেই রাঙাদিদির দেওয়া একচিলতে টিনের সুটকেস।

অত বড় অফিসে আমিই বয়ঃকনিষ্ঠ। বুড়ো লিফটম্যান আমাকে বয়স নিয়ে কখনো একটু আলতো ঠাট্টা করে। বাচ্চা কেরানি হিসেবে আমি তখনকার ডালহৌসি স্কোয়ারকে চিনতে শুরু করলাম। পুজো শেষ হয়ে গেছে। হেমন্ত গড়ের মাঠে অনেক শিশির ঝরিয়েছে। কাজ করতে করতে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি বেলা সাড়ে এগারোটার বিদেহী চাঁদ শুকনো চন্দনের মতো নীল আকাশের কপালে ফুটে আছে। দুটো চিল চক্কর মারছে উঁচুতে।

দুপুরবেলায় নিচে নেমে গিয়ে রেস্তরাঁয় আলু কপির ঝোল দিয়ে বান রুটি খাই। দারুণ লাগে। তখন লালদিঘির পাড়গুলো ছিল ঘাসে ঢাকা। সেখানে মিষ্টি রোদ্দুরে একটু বসি। লালদিঘিকে প্রদক্ষিণ করে ট্রাম যায়। কোথাও হৈ চৈ, ঠেলাঠেলি, স্থানাভাব নেই। ট্রামে চেপে, স্কার্ট ব্লাউজ উঁচু-গোড়ালি জুতো পরে স্টেনো টাইপিস্ট কিছু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে অফিস করতে এলেও কোনো বাঙালি মেয়ের এ তল্লাটে পা পড়ে না। এবং দিনে যে-জায়গাটা এত কর্মব্যস্ত, সন্ধের পরই সেটা জনশূন্য আর কেমন যেন ভুতুড়ে হয়ে যায়। এক ছুটির দিনের সন্ধ্যায় হাওড়া থেকে শর্টকাটে এসপ্ল্যানেড যেতে গিয়ে পনটুন ব্রিজ পেরিয়ে ঢুকে পড়েছিলাম ডালহৌসিতে। জনহীন পরিত্যক্ত নগরীতে বেলাশেষের ছায়া নামলে হঠাৎ যেমন ভয়ভয় করে এই অট্টালিকাশ্রেণীর মাথার উপরে বিমর্ষ রোদ্দুরের মিলিয়ে যাওয়া দেখে মন তেমনি ত্রস্ত হল। ঐ নিঃশব্দ স্কোয়ারের অ্যাসফল্টে-পাথরে বাঁধানো পথ আমি যতদূর সম্ভব দ্রুত পেরিয়ে গেলাম।

যুদ্ধের আঁচ না লাগলেও কলকাতায় যুদ্ধের আবহাওয়া ঘনিয়ে আসছিল। আমাদের বড়সাহেব বুড়ো মানুষ, হঠাৎ দেখছি উনি ফৌজি উর্দি চড়িয়ে অফিসে আসছেন। পার্কে, পথপাশের ফাঁকা জমিতে সোজা বা জিগজ্যাগ ট্রেঞ্চ কাটা হয়েছে। দোকান আর অফিসের বড় বড় কাঁচের জানলায় কাগজের পট্টি সাঁটা, ঢুকবার দরজার সামনে ইটের ব্যাফল দেয়াল, লাল রঙের বালতিগুলিতে ভরতি বালি– এ সবই বিমানহানার জন্য সতর্কতা। এ আর পি অর্থাৎ এয়ার রেইড প্রিকশনের বিরাট অফিস খোলা হয়েছে। প্রচুর বেকার যুবক ঢুকেছে সেখানে, তাদের খালাসি-নীল উর্দি। তারা বাড়িতে বাড়িতে স্টিরাপ পাম্প, রবারের লম্বা নল আর দুটো করে বালতি বিনি পয়সায় দিয়েছে। গঙ্গা আর ময়দানের উপরে আকাশের অনেক উঁচুতে জেপেলিনের মতো বেলুন ব্যারাজ ভাসিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের লম্বা দড়ি বাঁধা আছে মাটিতে। বিমানে যারা আক্রমণ করতে আসবে তাদের ধোঁকা দেবার জন্যে তাল গাছের গুঁড়ির ডামি কামান বসানো হয়েছে লেকের পাড়ে। মাঝে মাঝে সাইরেন বাজিয়ে, বিমানহানা হলে কী করতে হবে, তার মহড়া হয়। যারা বাইরে আছে তারা তখন

ট্রেঞ্চে ঢুকবে, যারা ঘরে আছে তারা সিঁড়িকোঠায় আশ্রয় নেবে। অল্পবয়সীরা কিন্তু কথা শোনে না, সাইরেন বাজলে তাড়াতাড়ি ছাদে উঠে দ্যাখে– কোথায় কী ঘটছে।

এর মধ্যে শোনা গেল, কলকাতায় বোমা পড়বে। ক্রমশ এই শোনা কথা গড়াতে গড়াতে তার নিজস্ব গতিবেগ পেয়ে কলকাতার নিরাপত্তাবোধে আঘাত করল। কলকাতাবাসীরা, যাদের একটু উপায় আছে তারা মফস্বলে, শহরে, গ্রামে পালাতে লাগল। বিশেষ করে বাঙালি, বিহারী, ওড়িয়া, মারোয়াড়ী কলকাতা ফাঁকা করে, ট্রেনে গাদাগাদি করে, পড়িমরি করে পালাল। এই গণপলায়নের নাম হল ইভ্যাকিউয়েশন। সত্যি, পলায়নের যে কত রকম নাম ইভ্যাকিউয়েশন, এক্সোডাস, রিট্রিট। দাদুরা চলে গেলেন খুলনা শহরে। আমি চাকুরে মানুষ, তাঁর ফাঁকা বাড়িতে আমি, অমিয়মামা, পুতুলমামা থাকলাম। আমরা একই অফিসে চাকরি করি। সর্দারী নামে এক বিহারী পালোয়ান কোত্থেকে যেন এসে জুটে গেল আমাদের বেঁধে দেবার জন্যে।

প্রত্যেক মাসে তিরিশ টাকা করে পাই। নটায় বেরোই আর সন্ধে বাজিয়ে বাড়ি ফিরি। চমৎকার কাটছিল দিনগুলো। এইভাবে শীত গেল, বসন্ত এল। গ্রামেও বসন্ত দক্ষিণ দিক দিয়েই ঢোকে। কিন্তু ঢোকার পর হাওয়া চারদিকের বনজঙ্গল গাছপালায় ধাক্কা খেয়ে নানা অচিহ্নিত পথে বইতে থাকে, মিহি ধুলো উড়ে এসে পুরনো পাতায় বসে সেই ধূলিম্লান পাতার পাশে নতুন পাতা কখনো সবুজ কখনো তামারং সদ্যোজাত আগুনের মতো ঝকমক করে। কলকাতায়, ছাদের উপর উঠে সন্ধেবেলা স্পষ্ট টের পাই- টালিগঞ্জের ছাদগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে একটা লম্বা চিরুনির মতো বাতাস হু হু করে চলল শ্যামবাজার বাগবাজারের দিকে।

বসন্তকালটা যাচ্ছিল ভালো। কিন্তু একদিন রাত্তিরে বেশ মাথা ধরল, জ্বর হল। পরদিন বিকেলের মধ্যে দেখি জলবসন্তের গুটি বেরিয়েছে মুখে, বুকে। তার পর অসঙ্গ মশারির মধ্যে একগাদা বই নিয়ে তিনটি সীমাহীন সপ্তাহ কাটল। অসুখ থেকে উঠে আর অফিসে যেতে

হল না- তিন ছত্রের একটি চিঠি এল: অনুপস্থিতির কারণে তোমাকে আর আমাদের দরকার নেই।

কদিন পরে, জাপানী বোমার ভয়ে পুরো অফিসটি কাগজপত্র এবং কর্মচারীসমেত ট্রেনে চেপে লখনৌ চলে গেল।

অমিয়মামারা চলে গেলেন, সর্দারিও চলে গেল। এইবার আমি সত্যিই একা হয়ে পড়লাম, নিছক একা। কলকাতা ফাঁকা হয়ে গেছে। দিনের বেলা শুনশান আর রাত্রে মনে হয় ভূতের শহর আগুন লাগলেও বাড়িগুলি থেকে আধপোড়া কেউ চেঁচাতে চেঁচাতে বেরিয়ে আসবে না। অনেক বাড়ির গায়েই ‘টু লেট’ টাঙানো, কিছু কিছু বাড়ির গায়ে ‘ফর সেল’। পাঁচ টাকা, দশ টাকা, তিরিশ টাকা, চল্লিশ টাকায় আস্ত আস্ত বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়।

ভোর হয়, সন্ধ্যা হয়, রাত হয় আমার কোনো কাজকর্ম নেই। হাঁটতে হাঁটতে দশটা-এগারোটার সময় বালিগঞ্জের ত্রিকোণ পার্কে গিয়ে জুটি। সেখানে আসে আমার সমবয়সী এক আত্মীয়, যে তখন খুব বন্ধুও। খানিকক্ষণ এলোমলো বকি, একটু ঝিম ধরে, বেলা গড়াতে থাকে। ত্রিকোণ পার্কের পাশেই একটা হোটেল। দুজনায় সেখানে গিয়ে দুপুরের খাওয়া খাই। খেয়েদেয়ে বাড়ি ফিরি, বিছানায় গড়াই, বিকেলে স্নান করি, সূর্য ডোবার আগে আবার বেরোই, যেখানে-সেখানে আটটা-নটা পর্যন্ত ঘুরি। এইরকম ঘুরতে ঘুরতে জনক রোড বা পরাশর রোডের কাছাকাছি কোনো ফুটপাথে দেহাতিদের একটা ডালরুটির ঠেক আবিষ্কার করলাম– বগি থালার মতো বড় এবং মোটা রুটি, দাম চার পয়সা, এবং তার সঙ্গে এক বাটি ঘন ডাল মাগনা। দুটো রুটি, দু বাটি ডাল খেলে পেটে আর জায়গা থাকে না। বাড়ি ফিরে দেখি, চাঁদের জ্যোৎস্নায় বাড়ির ছাদ দেয়াল আলো অন্ধকার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাশের বাড়িগুলির দরজায় খিল পড়ে গেছে। বাড়িতে ঢুকে প্রথমটায় ভালো লাগে না, তার পর ধীরে ধীরে লাগতে থাকে।

কিছুদিন পরে সেই পলাতকেরা, যারা ভীরু হাঁস ও সন্দিগ্ধ হরিণের মতো পালিয়েছিল, আবার ফিরে এল। কলকাতা যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। ইতিমধ্যে ভারত ছাড় আন্দোলন হল, মাতঙ্গিনী হাজরা মারা গেলেন, সুভাষচন্দ্র বসু ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে ভারতের বাইরে চলে গেলেন, জাপান যুদ্ধটাকে আমাদের দোরগোড়ায় নিয়ে এল। কমিউনিস্ট পার্টি রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রভাবশালী হয়ে উঠছিল নাটক গান সাহিত্য ইশতেহার এবং যুবকযুবতীদের সংযোগ এই পার্টিকে রাজনীতি ছাড়িয়েও অধিক কোনো মূল্য দিয়েছিল। যুদ্ধ অনেকগুলো রণাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ছিল। সাদা কালো দুই বর্ণেরই আমেরিকান সৈন্য, তাদের প্রচুর সাজসরঞ্জামসমেত, ভিনগ্রহের বাসিন্দার মতো কলকাতায় দেখা দিল।

দাদু-দিদিমাও সংসার নিয়ে আবার ফিরে এসেছেন। খাওয়াদাওয়ায় আবার গার্হস্থ্যের রস লাগল। কিন্তু হঠাৎ আমার কাছে কলকাতা এবং এই মধ্যবিত্ত সংসার অসহনীয় হয়ে উঠল। আলগা উঁটা থেকে আমি এখন শুকনো পাতার মতো খসে পড়েছি- যদি এখন হাওয়ায় উড়ে যাই তবেই মঙ্গল। কোথায় যাই, কোথায় যাই ভাবতে ভাবতে ঠিক করলাম বাবার কাছেই যাই বাবা এখন যেখানে আছেন সেখানটা দেখা হয় নি।

.

বেতনা নদীর পাড়ে

ষাট বছর আগের যাত্রাপথ আজ নিখুঁত মনে নেই, তাছাড়া ম্যাপও তো পালটে গেছে। সম্ভবত হাসনাবাদ পর্যন্ত ট্রেনে, সেখান থেকে নদীপথে কালীগঞ্জ আশাশুনি হয়ে গিয়েছিলাম। নদীটির নাম বেতনা- যেমন নাম তেমনি স্বভাব। মিষ্টি জলের ভাগ্যশালিনী চন্দ্রভাগা নদী নয়, নোনা জলের হতভাগা গাঙ। এতদিন কাটল বরাক নদীর কাছে বড় বক্র থেকে বরাক, যেন নামের অর্থ নিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে। মেঘনা- আকাশের আয়নার মতো

নাম। আর আড়িয়ল খাঁ– বেমক্কা এক যবন পুরুষের নাম। জানি না অন্য কোনো দেশে, অন্য কোনো ভাষায় নদের এ রকম মৌলিক নাম আছে কি না।

একটু বেশি রাতেই পৌঁছেছিলাম। প্রায় নদীতীরেই বাড়ি। কাদা ভেঙে রাস্তায় উঠতে হল। রাত্রে জায়গাটা কিছুই দেখতে পাই নি। ভোরে ঘুম থেকে উঠে ভালো লাগল– জায়গাটা একেবারে অন্য রকম, নদীপারে একটি ছোটখাটো গঞ্জ- কয়েকটা স্থায়ী দোকান, আড়ত, পোস্ট অফিস, স্কুল। রোজ জমজমাট বাজার বসে, কিন্তু দীর্ঘায়িত দুপুর হেলে গেলেই জায়গাটা ফাঁকা আর শান্ত হয়ে আসে। বিকেলে, সন্ধ্যায় নোনা নদীর পারে জায়গাটা একেবারে স্লান এবং নিঃশব্দ। শুধু কয়েকজন স্থানীয় বুড়ো লোক বন্ধ পোস্ট অফিসের বারান্দায় বসে পোস্টমাস্টারের সঙ্গে বৈকালিক আড্ডা দেয়। বুধবার বুধবার এখানে হাট বসে বলে জায়গাটার নাম বুধহাটা। হাটের দিন জায়গাটা একেবারেই অন্য রকম– সকাল থেকে পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়ি করে, নৌকোয় ব্যাপারীরা সওদা নিয়ে হাটে আসে। বিকেলবেলা কেনাবেচা হৈ চৈ তুঙ্গে ওঠে। রাত ঘন হবার পরে হাট ক্রমশ ভাঙে। অন্ধকারে ক্রমশ পেট্রোম্যাক্স নেভে, লণ্ঠন নেভে, কারবাইডের আলো নেভে, কেরোসিনের ডিবে নেভে, বিড়ির আগুন নেভে।

চাষবাস, খাদ্যবস্ত্র এবং গেরস্থালি জিনিসের এই হাটে টি বোর্ড থেকে এক ভদ্রলোক এসে গ্রামের হাটুরেদের চায়ের নেশা ধরাবার চেষ্টা করতেন। মঙ্গলবার বিকেলে চায়ের পেটি, হান্ডা, ডেকচি, লোকজন নিয়ে তাঁর ঋষ্যশৃঙ্গকে ভোলাবার তরণী বেতনার ঘাটে এসে ভিড়ত। রাতে নদীতীরে রান্নাবান্না করে খেয়ে, ঘুমিয়ে, পরদিন ভোরে তাঁর লোকেরা কাজে লাগত। হাটে খানিকটা জায়গা নিয়ে বড় বড় কেরোসিন স্টোভে বিশাল বিশাল হাঁড়িতে চায়ের পাতা, দুধ আর আখের গুড় পাঁচনের মতো জ্বাল দেওয়া হত, হাটে আসা মানুষজনকে ডেকে ডেকে সেই চা ঘটি ঘটি, গেলাস গেলাস বিনিপয়সায় খাওয়ানো হত। সারা দিনই চা সেদ্ধ হচ্ছে একই নোক যে কত বার এসে খেয়ে গেল। লোকেরা যত চা খায় টি বোর্ডের ভদ্রলোকও ততই খুশি। তাঁর নৌকো আজকে বুধহাটা তো কালকে আশাশুনি চলল হাটে চা খাওয়াতে।

ভোরবেলা মনে আশা নিয়ে নদীর পাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কাছেই একটা অশথ গাছ, তার নতুন পাতা হাওয়ায় চটরপটর করছিল। নদী দেখে তবু ভালো লাগল না। এই জায়গা থেকে মাইল চল্লিশ দূরে সুন্দরবন, আর একটু দূরে বঙ্গোপসাগর। সমুদ্রের নোনা জলে নদী ভরতি সমুদ্রের জোয়ারভাটার সঙ্গে নদীতেও জোয়ারভাটা বয়- দুই তীরে বিশ্রী কাদা, ঘাস নেই, শৈবাল নেই, কাদার স্তরের কিনারায় মাটির কাছাকাছি ঘনসন্নিবদ্ধ ম্যাংগ্রোভবনশ্রেণী। ম্যাংগ্রোভের নিচের পাতাগুলি কাদায় ডোবা, উপরের পাতাগুলিতে কাদা শুকিয়ে লেগে আছে, আরও উপরের পাতায় বকের বিষ্ঠা। হাওয়া যদি-বা বয়, পাতা নড়ে না। নদীর ঘোলাটে জলেও বিশেষ সাড়া নেই। দেখলে শঙ্কা জাগে। নদীতে এপার ওপার খেয়া চলে। মাঝে মাঝে গোলপাতা নিয়ে নৌকো আসে। আমাদের দেশে ভাড়ার নৌকোকে বলে কেরায়া নৌকো, এখানে বলে টাপুরে নৌকো। ভাড়ার নৌকো, মাছ ধরার নৌকো, মাটির হাঁড়ি-কলসির নৌকো, ধান-চালের পেটমোটা নৌকো নাকছাবি, ইয়ারিং, টায়রা, চন্দ্রহারের মতো উজ্জ্বল করে রাখে আমাদের নদী আর খালের মুখগুলিকে। এই নদীতে সেইসব নৌকোর বিশেষ আনাগোনা নেই। কামটের ভয়ে এই নদীতে কেউ স্নান করে না, চলন্ত নৌকোয় বসেও কেউ জলে ঈশ্বরী পাটনীর মতো পা ডুবিয়ে রাখে না। লোকালয়ের মধ্য দিয়ে এতখানি অস্পৃশ্য জল কি অকারণেই বয়ে চলেছে?

আমি নদীকে ছেড়ে, বাজার চত্বর পেরিয়ে মাটির বড় রাস্তা ধরি, গাঁয়ের মধ্যে এগোতে থাকি। বুনো, জংলা জায়গা। উর্বর মাটি। গৃহস্থবাড়িতে কলা গাছের পাতা ফনফন করছে। বড় বড় গাছের ছায়ায় হলুদবন শটিবন নিজে নিজেই বাড়ছে। গাছ আগাছা-লতায় ভরা প্রাচীন জংলা বন যেমন আছে, তেমনি আছে নতুন হাসিল করা ফাঁকা জমিতে নতুন বাস্তু। ফাঁকা জমিতে হু হু করে হাওয়া বয়- গৃহস্থ চাষি কলার ঝাড় বসিয়েছিল হাওয়ায় ছিঁড়ে যাওয়া পাতা ফতফত করে ওড়ে। মাটি এমন জিনিস, তাকে নিয়ে একটু খাটলেই বেঁচে থাকার অন্ন মেলে।

বাড়ি থেকে এক পা দূরে বাজার। সবজি মাছ দই মিষ্টি গুড় প্রচুর এবং অভাবিত সস্তা। কত রকমের চিংড়ি কুচো, ছটকা, বাগদা, গলদা। হাত পা বাদ দিয়েও এক ফুট ব্যাসের

কাঁকড়া। মাটির কলসিতে আনা ঘোলের রং লালচে বাদামী উপরে মাখম ভাসে আর তলার দিকে গাঢ় হয়ে থাকে চূর্ণ দইয়ের কশা। দধির অগ্র, ঘোলের শেষ। আমাদের পুরুষেরা জীবিকার জন্য পুর্নিয়া, ঝরিয়া, অসম, ব্রহ্মদেশে যেত– বাবা তল্লাট খুঁজে খুঁজে এই জায়গাটি বার করেছিলেন। এইরকম খাবার খেলে লোকের স্বাস্থ্য ফেটে পড়ার কথা। কিন্তু তা যে হয় নি তার কারণ ম্যালেরিয়া। হেমন্তে কিছু কিছু গাছ পাতা ঝরার মুখে হলদে হয়ে যায়, এখানে যাকে ম্যালেরিয়ায় ধরে বারো মাস তারও ঐ গাছের দশা। বেতনা নদীর নোনা জল আর ম্যালেরিয়ার পাঙাশ রং এই জায়গাটাকে যেন একটা ঘোরের মধ্যে রেখে দিয়েছে। মানুষগুলো উলটেপালটে ম্যালেরিয়ায় পড়ে, তবু হাটের দিন ঠিক হাটে আসে, চিংড়ি মাছ, গুলে মাছ কেনে, বাড়িতে গিয়ে ঝাল চচ্চড়ি খায়। নোনা নৈশ বাতাসের চল্লিশ মাইল দূরে সুন্দরবন- এই জায়গাটা যেন সেই বাঘের জঙ্গলের ঘুমন্ত কিনারা। এইখানে একদিন হরিণের মাংস খেয়েছিলাম– চর্বির চিহ্নহীন টগবগে দৌড়বাজ লাল মাংস।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙলে ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না। দু পা হেঁটে বেতনার পাড়ে গিয়ে দাঁড়াই। নির্জন। এখনও খেয়া চলাচল শুরু হয় নি। এদিককার দোকানঘর আড়ত সব ঝাঁপ বন্ধ। এখানে আমার অদ্ভুতভাবে দিন কাটে। কোনো কাজ বা দায় কিচ্ছু নেই। আমি হাঁটি বা না হাঁটি, চলি বা না চলি, দিন যেভাবে সূর্যকে নিঃশব্দে আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ঠেলে নিয়ে যায় তেমনি আমিও ভোর থেকে সন্ধ্যায় পৌঁছই। রাত্রি দেড় প্রহর হলে লণ্ঠনের পাশে বিছানায় শুয়ে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি।

মায়ের স্বভাবে ছিল জলীয় ভাব। দেশের বাড়িতে আমাদের তিনটে পুকুরের সঙ্গে মা ছিল যেন চতুর্থ পুকুরটি ছোট পুকুর, সুখী, কলমিলতা-ভাসা জলে ছোট্ট মাছ হঠাৎ লাফিয়ে উঠে আবার ডুব দেয়, পাড়ের ঘন গাছে কোকিল লুকিয়ে বসে দুপুরে কখনো ডাকে। গঞ্জের এই ঘেরা বাড়িতে এসে সেই পুকুরটি এখন পাতকুয়ো। আত্মীয় বন্ধু কেউ নেই যাদের বাড়িতে যাওয়া যায়, পথে বেরুনো নেই, তাই গায়ের গাছপালার ডুরে ছায়া তার মাথায় মুখে আর পড়ে না।

চারপাঁচটা ছোট ভাইবোন এখানকার বেড়াল, ব্যাঙাচি, পাখির মতোই এই জায়গার সঙ্গে মিশে আছে কেউ এ ঝোপে কু দিচ্ছে তো কেউ অন্য ঝোপে মুখে শস্যদানা নিয়ে পালাল।

বাবা কি একটু পালটেছেন? আমার পড়া ছেড়ে দেওয়া বা কাজের চেষ্টা না করে এই অলস বসে থাকা নিয়ে একটা কথাও বলেন না। বরং সন্ধের পর অদ্ভুত সব বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো গল্প করার চেষ্টা করেন। নিঃশর্তে খাদ্য বাসস্থান ও বিছানা দেবার জন্য বাবার কাছে আমি ভিতর থেকে কৃতজ্ঞ বোধ করি। তাঁর দুঃখ দৈন্যও আমি টের পাই। কিন্তু যেই কথাবার্তা শুরু হয় অমনি আমাদের অসেতুসম্ভব মতদ্বৈধ প্রকট হয়ে ওঠে। কোনো গভীর বিষয় নিয়ে যে আমাদের আলোচনা হয় তাও না। একবার তো, এখনো মনে আছে, শালিকের আকার নিয়ে আমাদের তর্ক বাধল। বাবা নাকি কোথায় কাগের মতো বড় শালিক দেখেছিলেন। আমি শালিককে ছাতারের চেয়ে বড় বলে মানতে রাজি নই। বাবাকে আমি মনে মনে বললাম, বোগাস। বাবা আমাকে অস্ফুটে বললেন, ইমপিউডন্ট, ধৃষ্ট। যে-কোনো কথা, সে শালিক বা ঈশ্বর যাই হোক, আমাদের দুজনার মধ্যে পড়লে অনেক দূর ঝগড়ায় গড়িয়ে যায়। এর চেয়ে বাক্যালাপ না করাই শ্রেয়।

সেই দিনগুলির পর ষাট বছর কেটে গেছে। আবার এই বাড়িতে বাপ ছেলের ঐ চিরকালীন দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা দেখা দেয়। আমার ছেলে এসে নানা বিষয়ে তার মতামত শুনিয়ে আমার মতামত জানতে চায়। আমার সঙ্গে তার মতে মেলে না, তবু আদার ব্যাপারী আমাকে তার জাহাজের খবর জানানো চাই। উত্তপ্ত তর্কে নেমে পড়বার মুখে হঠাৎ আমার বাবার কথা মনে পড়ে আমি তৎক্ষণাৎ সাবধান হয়ে তর্ক থেকে পা তুলে নিয়ে ছেলেকে তার জাহাজসুদ্ধ ঠেলে দিই দূর জলে।

মাসখানেক গেল। জায়গাটা যেন তামসিকতায় আচ্ছন্ন। খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে দশ পা গেলেই পণ্ডিতমশাইয়ের পুরনো আমবাগান। তার মধ্যে পুরনো এক পুকুর। সেখানে দুপুরে যাই স্নানে। আঁটির আম গাছগুলি মহাকায়, ফলন কম। ঐ বনে কেউ ঢোকে না। ঝোঁপঝাড়, আগাছা, কুগাছা, পচা পাতা, সবুজ শ্যাওলা আর ছায়া ঢেকে রেখেছে মাটি।

সেই ঢাকনার নিচে, অগোচরে কেউ বা কারা শামুকে ডিমের মতো বিয়ে চলেছে তমোগুণ। পুকুরের পাড় থেকে অনেক নিচে নেমে আছে জল। জলে আকাশের ছায়া পড়ে না। সেখানে অনেকক্ষণ একলা থাকার পর কোনে সরীসৃপের শব্দে অকস্মাৎ সংবিৎ ফিরলে তাকিয়ে দেখি, বাগানের দূরের এক কোণে হলদে রোদ্দুর লম্বা আর তেরছা হয়ে গাছের গা বেয়ে শাড়ির মতো ঝুলছে শ্মশানে শুকুতে দেওয়া মড়ার শাড়ি বা গলায় দড়ির শাড়ি। একটু পরে সে-কাপড় ঈথারে মিলিয়ে যায়।

কিন্তু আমার দিন আর যায় না। হাট যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে স্থানীয় হাই। স্কুল। স্কুলের লাইব্রেরির দায়িত্বে ছিলেন অঙ্কের শিক্ষক আদ্যনাথবাবু। তিন-চার আলমারি বই ছিল, আরও নতুন বই কেনা হচ্ছিল। আমি আদ্যনাথবাবুর কাছ থেকে দু-তিনখানা করে বই একসঙ্গে নিয়ে আসি। বইয়ের তালিকা বিচিত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাশে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের চার খণ্ড ডিসক, বিভূতিভূষণের সদ্যপ্রকাশিত অনুবর্তনের পাশে কান্তিচন্দ্র ঘোষের রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম। আমি নির্বিচারে তৃষিতের মতো পড়ি। বাদা অঞ্চলের এই অজ গঞ্জে বসে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণের সংকলন ‘যাত্রী পড়ি। নতুন ঝকঝকে বই। রবীন্দ্রনাথ যখন ‘জাপানযাত্রীতে চা অনুষ্ঠানের বর্ণনা বা হারা সান-এর বাড়ির ছবির ঘরে দেখা টাইকানের ছবির বর্ণনা দেন তখন অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকি নিষ্কলঙ্ক শান্ত সৌন্দর্যের অনুভব তো বাক্যরচনা জানে না, এক মাত্রা সূচিকাভরণে চেতনায় কোথাও যেন একটা ব্যথা বোধ করি। কখনো মনে হয়, আমি যেন দেড় আঙুলে ছেলেটি, রবীন্দ্রনাথের জোব্বার খুঁট ধরে লুকিয়ে ঢুকেছি শান্ত এক ছায়াধূসর রূপকথার দেশে।

সাড়ে পাঁচ ফুটের এক যুবক কেন দেড় আঙুলে বাচ্চা হতে চাইছে? দেড় আঙুলে থেকে আধ আঙুলে হলে তার আরো সুবিধে হয়। সাড়ে পাঁচ ফুটের অনেক কর্তব্য, নিজের প্রতি, অন্যের প্রতি। সে কিছুই পারে না। পারে না যে তা তো দেখাই গেল। অতএব নিজেকে বাঁচাতে সাড়ে পাঁচ ফুটের অস্তিত্বকে সে আড়াল করে বইয়ের পাতা দিয়ে বই তার পালাবার ইগলু, বই তার পালাবার ইগলুর এক-একটি রামধনু ঠিকরোনো বরফ-ইট।

আমি তখনই বুঝেছিলাম, আমি আসলে কাপুরুষ। সারা জীবনে যত সাহসের কাজ করেছি, অ্যাডভেঞ্চার করেছি তা কেবল বিপদের মুখে পড়ে ভয়ে মাথা ঠিক ছিল না বলেই। এ হচ্ছে বাঘের বীরত্বের মতো। সামান্য ছাগলছানা দেখেও সে ভয়ে থরহরি হয় বলেই দাঁত খিঁচিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে, পাঁচ নখ বার করা থাবায় উড়িয়ে দেয় বাচ্চাটাকে। সাহস অনেক সময়েই ভীরুর রিফ্লেকস অ্যাকশন। কয়েক বছর পরে, যখন ছবি আঁকায় মন দিয়েছি তখন পলাতকের স্বর্গ নামে একটা সিরিজ করলাম। সে ছবিগুলোও আসলে রূঢ় বাস্তব এড়িয়ে পালাবার ফিকির, আমার পলায়নী মনোভাবের উপর অনিকেত তাঁবু আর সূর্যাস্ত ছড়িয়ে দেওয়া ছবি।

.

শটিবন ও ম্যালেরিয়া

এখানে আসার পরে কখনও কখনও ভাবি, যদি আমি কোনো জনহীন বনের মধ্যে নিজেকে পুঁতে ফেলি তবে আর কোনো ঝাট থাকে না, অথচ আমি বন্য লিলির মতো জ্যান্ত থাকব মাটির নিচে আমার হালকা শ্মশ্রুময় অণ্ডকোষ শিকড়ওয়ালা কন্দের মতো বাড়বে। কানের দুই ফুটো, নাকের দুই ফুটো থেকে লম্বা উঁটিতে দল বেরুবে, কেশর বেরুবে– বিরল অর্কিডের মতো তাদের শোভা আর হিংস্রতা। সেই ফুল সাপের ফণার মতো উদ্যত হয়ে থাকে বনের মধ্যে, আবার অবসাদে গা ছেড়ে দিয়ে লুটিয়ে পড়ে জলে ডোবা ছেলের পাজামার মতো। ইচ্ছে হলে আমি মাটির তলায় ফুলকে টেনে নিতে পারি, আবার বাইরে আগুনের শিখার মতো ঠেলেও দিতে পারি। এইসব ভাবতে ভাবতে, এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে দেখি পোড়ো জমি জুড়ে প্রাচীন শটি গাছের মূলে শর্করা জমে নীল হয়ে আছে। শটি গাছ ছায়ায় জন্মায়। হলুদ, দোলনচাঁপা, এলাচ আর শটি– এরা সব এক জাতের গাছ। কয়েক দিন ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে শটি গাছ দেখে দেখে বিনি পয়সার এই পড়ে-পাওয়া কাঁচা মাল থেকে অর্থকরী শটি ফুড বা পাতলা তৈরির মতলব মাথায় এল। আমাদের দেশে কেউ কেউ ঘরে খাবার জন্যই বাড়িতে পালা তৈরি করে। পালোর পায়েস চায়না গ্রাসের পায়েসের

মতোই জমাট এবং সুস্বাদ। শটির মূল থেকে পালো বানাবার পদ্ধতি মোটেই কঠিন নয়। আমি যদি এটাকে কুটির শিল্প করতে পারি তো নিশ্চয় লাভ হবে। এখন বড়মা থাকলে খুব ভালো হত। এসব ব্যাপারে বড়মার মতো আর কার পারদর্শিতা।

পণ্ডিতমশায়ের ছেলে গোপী আমার সমবয়সী, তার সঙ্গে পরামর্শ করে পরদিন দুপুরে দুজনাতে কোদাল আর বস্তা হাতে বেরুলাম। শিকড়ে কোপ দিতেই বোঝা গেল, বাইরে থেকে এদের যেমন সাধারণ শটি গাছ মনে হয়েছিল, এরা মোটেই তা নয়। শটির শিকড় পাঁচ বছর, দশ বছর নিশ্চিন্তে মাটির তলায় থেকে বানরসৈন্যদের তৈরি পাথরে জাঙালের মতো শক্ত আর জটিল গোলকধাঁধা হয়ে আছে– গাছের গোড়া থেকে কন এঁকেবেঁকে দূরে চলে গেছে, শিলাজতুর রেখার মতো নীল দাগ পড়েছে সেই প্রাচীন মূলগুলির বাকলের নিচে। আমার বিশ্বাস হল, এতে দারুণ পালো হবে, এর মজ্জায় ঘনীভূত হয়ে আছে স্টার্চ। আমি আর গোপী মহা উৎসাহে কোদাল চালিয়ে কন্দগুলি তুলছি কাজটা সোজা নয়, বেশ পরিশ্রম হচ্ছে। কয়েক ঘণ্টা কন্দমূল তুলে, বস্তায় ভরে নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরলাম।

পরের দিন দুপুরে গোপী এল একটা গরুর গাড়ি নিয়ে। গরু নেই, গোপী নিজেই ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এসেছে সেটা। আজকে আরো বেশি শটির মূল আনা যাবে। সেদিন বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে আমরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করলাম। সন্ধেবেলা একগাড়ি শিকড়বাকড় এনে

রান্নাঘরের দাওয়ায় স্তূপ করে রাখলাম। বাবা বা মা কেউ কিছু বলল না, কিন্তু হঠাৎ আমার নিজেকে অন্ধকারে শ্মশানফেরত ভূতের মতো লাগল। আমি, যেন শিকড়বাকড় নয়, শ্মশান খুঁড়ে কতগুলো হাড়গোড় নিয়ে এসেছি। পাতকুয়োয় বালতি নামিয়ে হাতপা ধোবার সময় হঠাৎ কেমন চিনচিনে শীত করল। রাত্রে তেমন খিদে পেল না, তবু খেলাম, শুতে গেলাম। আর গ্রীষ্মের গভীর রাত্রে হঠাৎ দারুণ শীতে হাড়মজ্জার ভিতর থেকে কাঁপুনি উঠল। যেন পাহাড়ী শীত। আমি অর্ধেক তোশকে শরীর মুড়ে নিলাম, ঘুম ভেঙে গেছে, যেন শীতের চেয়েও গভীর কোনো শীতে শরীর কাঁপাচ্ছে। ঘণ্টাখানেক কেঁপে শরীর নিস্তেজ হয়ে গেল- তপ্ত হবার একটা সুখানুভূতি এল, ক্রমশ শরীরে তাপ উঠছে। এখন বেশ ভালো লাগছে। পায়ের পাতা বেশ গরম হয়েছে। সকালবেলা গরম বিস্বাদ মুখ আর লাল চোখ নিয়ে মশারির ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রইলাম। সবাই বেশ নড়াচড়া করছে, দিনের কাজ শুরু হয়েছে। এর পর পাঁচ-ছ দিন সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রবল জ্বরে আমার সমস্ত দুশ্চিন্তা আর দুশ্চেষ্টা ধুয়ে মুছে গেল। তার পর একদিন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল এবং ম্যালেরিয়া তার স্বরূপ প্রকাশ করল।

এখন রোজ অপরাহ্নে কম্প দিয়ে জ্বর আসে। ঘন্টাখানেক হাড়সুদ্ধ কাঁপাবার পরে দৌড় করানো কুকুরের মতো হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাঁপাতে থাকি- শরীর ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসে আর জ্বর চড়তে থাকে। সন্ধের মুখে শরীর জ্বরে টং হয়ে যায় ভালো লাগে, নেশার মতো লাগে। জানলার বাইরে আম গাছে অন্ধকার হুতুম প্যাঁচা কিংবা শামুকখোল পাখির মতো ঝুপ করে এসে বসে। আমার মধ্যে যেটুকু যুবকত্ব এসেছিল জ্বরের তাপে সেটুকুও যেন মাখমের মতো গলে খসে পড়েছে। আবার যেন ছেলেবেলার অবুঝ জাতের মধ্যে ঢুকছি। রাত্রে জ্বরের মধ্যে আবছামতো কত কী ভাবি– মুখ শুকিয়ে যায়, তেষ্টা পায়। রাত পোহাবার জন্য অপেক্ষা করি, শেষরাতে অকারণে আশা জাগে। ঘুমিয়ে পড়ি। ভোরবেলা আলো দেখে আবার একটু ভালো লাগে। ছোট ছোট ভাইবোনেরা নিজেদের খেয়ালে চারদিকে ঘোরে। মা জলখাবার বানিয়ে দেয়, খাই। রোদ দরজা দিয়ে ভিতরে এসেছে, দেখি। মাছি ওড়ে, দেখি। এখন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ছে। রোদ সরে যায়, দেখি। মা বিছানা রোদে দেয়। আমি চাদর গায়ে

দিয়ে বসি। বসে বসে ক্লান্ত লাগে। আবার শুই। মা এসে মাথা ধুইয়ে দেয়। জ্বর ছেড়ে গিয়ে শরীর ঠাণ্ডা। ভাতের জন্য দারুণ লোভ হয়। ভাত মাছ আরো যা যা ইচ্ছে খাই। পেট ভরার পরে শরীরে আরাম ফিরে আসে। আকাশের দিকে তাকাই। নীল আকাশ। চালের উপর কাক উড়ে এসে ডাকে। খিড়কির দুয়ার থেকে উঠোনে পাতা উড়ে আসে। সূর্য একটু ঢলে গেলেই ভয় হতে থাকে এক্ষুনি আবার কাঁপুনি শুরু হবে। কুইনিন মিকশ্চার খাই, কেমোকুইন খাই, মেপাক্রিন খাই। কিছুতেই কিছু হয় না। অপরাহ্নে সূর্য যখন আমাদের বাড়ি ছেড়ে দূরের বাড়িটার নারকেল গাছ অতিক্রম করে ঠিক তখনই রোজ জ্বর আসে। জ্বরের আসা যাওয়া সময় ধরে চলে। সন্ধে উতরে গেলে মা আমার বিছানার পাশে একটি নোতা সুজি আর একবাটি তরকারি এনে রাখে। দুধ ভালো লাগে না, মা বিশ্বনাথ পরামানিকের দোকান থেকে কাঁচাগোল্লা আনিয়ে দেয়।

মাসের পর মাস ভুগে আমি ক্রমশ পাণ্ডাশবর্ণ, আখুটে আর স্বার্থপর হয়ে গেলাম। লিভারে টিপলে ব্যথা করে, পিলে বড় হয়ে পেটের বাঁ দিকটা ফুলেছে। রক্তাল্পতার জন্য পাও ফুলেছে। এ ঘর থেকে ও ঘরে যেতে কষ্ট হয়, মা কিংবা ছোটভাইয়ের কাঁধে ভর দিয়ে যাই। খুব অসহিষ্ণুতা বেড়ে গেছে, ছোটভাইকে অকারণে খাটাই। আমার অত্যাচার বাবা লক্ষ করেছিলেন, একদিন বললেন– ব্যাপার কী? তুই ওকে ক্রীতদাসের মতো খাটাস কেন? একটা ধাক্কা লাগল- এইরকম কথা বাবা এই প্রথম আমাকে বললেন। কেন, আমি কি ওদের ভালোবাসি না? ওরা মার আপন গর্ভের ছেলেমেয়ে, মা কিন্তু আমাকে কোনদিন এমন কথা বলে নি। তবু এই কথার জন্যই বাবাকে আমার অনেকদিন পরে ভালো লাগল। বাবা তাহলে সব লক্ষ করেন, নিজের সব সন্তানের সম্মান সম্বন্ধেই সজাগ। এর পর আমি ভিতরে ভিতরে সাবধান হয়ে গেলাম।

একটু দূরে গোলপাতায় ছাওয়া আমাদের আর একটা ঘর ছিল। জায়গা পালটালে যদি সেরে উঠি এই ভেবে সেই ঘরে থাকতে গেলাম। দিনে সবাই সেখানে আসে। রাত্রে আমি সেই কুটিরে একলা থাকি। এই কুটিরে ছোটখাটো জিনিস খুঁটিয়ে লক্ষ করি চিনির ক্রিস্টাল, মাছির চোখ, পিঁপড়ে... বাষ্পহীন গভীর রাতে জ্যোৎস্নায় চিনির দানাগুলি উড়িয়ে দিলে

তারা পরীর মতো ওড়ে। হাতের পাতা দিয়ে পশ্চিমের রোদ আড়াল করে দেখি, আমার লম্বা লম্বা আঙুলের ফাঁকে রোদের সঙ্গে মিশে থাকা সূর্যের আত্মহত্যার রক্ত টকটকে লাল। আঙুল ছড়িয়ে দিলে কিছু নেই। ম্যাজিক! দিনরাত জানলা খুলে রাখি, রাত্রে চাঁদের আলো এসে পড়ে বিছানার সাদা চাদরে। আমি সেখানে আমার হাতের আঙুলগুলো রেখে দেখি, যেন কাঠি কাঠি কালোজামের ডাল। আমার নিজের জিনিস বলতে এই হাত পা মাথা আর একখাবলা চুলের বাইরে আর কিছু নেই। কত দূরের, যেন অন্য আকাশের চাঁদ তারা সূর্যের রশ্মিকে আমার বিশ আঙুলের ডগা আর দশ হাজার চুলের চুম্বক উঁচ দাঁড়িয়ে উঠে সসম্ভ্রমে স্পর্শ করে। এ সবই পরীক্ষিত সত্য।

আসলে, মনে মনে অস্থির আর আর্ত হয়ে উঠছি বেতনা নদীর ভাটায় ভেসে এসে জলে কাদায় আটকে পড়েছিল শব, এখন উপুড় হয়ে পড়ে আছে। আমার ছোট বোন দেখে এল ট্যাংরা মাছ সেই মড়ার মধ্যে গিয়ে ঢুকছে, আবার একটু পরে বেরিয়ে আসছে, আবার ঢুকছে, আবার বেরোচ্ছে। অর্থাৎ মড়ার নাড়িভুড়ি সে টুকে টুকে খাচ্ছে। শুনে আমি চমকে উঠলাম। আমি বুঝেছি, এখনই বেরিয়ে যেতে না পারলে ঐ উপুড় হয়ে থাকা শবের মতো আমাকেও এখানেই থেকে যেতে হবে।

আমি চোখমুখ বুজে দাদুকে সব জানিয়ে একটি চিঠি লিখলাম। সংক্ষিপ্ত উত্তরে দাদু আমাকে কলকাতায় চলে আসতে বললেন। এরই মধ্যে ঈশ্বরপ্রেরিতের মতো আমার পিসতুতো ভাই এবং পুরনো বন্ধু ননিদা এসে হাজির। তারা এখন বাটানগরে থাকে। মাঝে মাঝে, পুরনো অভ্যাসবশত, মামা-মাসিদের খবর নিতে বেরিয়ে পড়ে সে। স্থির করলাম, ননিদা যেদিন বাড়ি ফিরবে সেদিন আমিও তার সঙ্গী হব। হাঁটাপথে সাতক্ষীরা হয়ে, ইটিন্ডা ঘাটে ইছামতী পেরিয়ে কলকাতার বাস ধরব। পা ফুলে থাকে, লিভারে ব্যথা, এ ঘর থেকে ও ঘরে যেতে কষ্ট হয়, আমি কি পারব অতটা পথ হাঁটতে? কিন্তু আমি যাবই। যেখানে যাব সে জায়গা এবার ভালো কি মন্দ হবে জানি না, কিন্তু আমি যাবই।

যাবার আগের দিন ছ মাস আগেকার সেই স্তূপীকৃত শটির শেকড়বাকড় রান্নাঘরের পিছনে ফেলে দিয়ে বাড়ি সাফ করলাম। মূলগুলি শুকিয়ে গেছে, কিন্তু পচে নি, অদ্ভুত বিকলাঙ্গ ভাস্কর্যের রূপ ধরেছে। পিশাচ যেমন রক্ত খেয়ে আয়ু পায় ওরা তেমনি রান্নাঘরের পিছনে মাটি পেয়ে এবার পালা মেলবে, নিশ্বাস ফেলে জাগবে। জাগুক।

পাখার বাতাসে জুড়োনো ফ্যানসা ভাত খেয়ে ধেনু চরাবার মতো প্রভাতবেলায়। আমরা পথে নামলাম। মা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। বাবা কাছাকাছি কোথাও নেই। পথে নেমে, মোড় নিয়ে, দৃষ্টির বাইরে যেতে যেতে আমি যেন হঠাই টের পেলাম, প্রথম সন্তানের জন্য তাঁর নির্বাক দুর্বলতা, তাঁর বিপন্নতা। পাঁচ-ছটা ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে পিতৃস্নেহ সমান ভাগে ভাগ করে দিতে দিতে তাঁর ভাণ্ডার ফুরিয়ে যাচ্ছে।

কতদিন হাঁটাচলা নেই, মাথা আর পা টলমল করছিল। আমি কথা না পেড়ে মুখ বুজে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে ঘাম দিল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের খিল খুলে শরীর অভ্যস্ত হয়ে এল। খেত, জংলা জায়গা, গাছের সারি পাড়াগাঁর পর পাড়াগাঁ পেরোতে পেরোতে এক সময়ে ইটের বাড়ি, বাগান, ঘাটবাঁধানো পুকুর আর ইটের শক্ত রাস্তা দেখা দিল। দোকানের সাইনবোর্ডে দেখলাম: সাতক্ষীরা। সাতক্ষীরা হচ্ছে মহকুমা শহর। সেখানে, পথে এক জায়গায় হঠাৎ ঘন ছায়া ছায়া, টাটকা বকুল ঝরে আছে তাকিয়ে দেখি, এক বিশাল বকুল গাছ। কতকালের পুরনো গাছ কে জানে, মিশকালো তার গুঁড়ি আর ডালপালা।

বেলা পড়ে যাবার আগেই ইটিন্ডা ঘাটে পৌঁছলাম। ইছামতী পেরুলাম নৌকোয়। ওপারে শ্যামবাজারের বাস। দাদুর বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে রাত প্রথম প্রহর পেরিয়ে গেল। আশ্চর্যের ব্যাপার, সেদিন আর জ্বর এল না। কিন্তু হেঁটে হেঁটে কুঁচকিতে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সেদিন রাত্রে জ্বর এল না, পরের দিন সকাল গেল, দুপুর গেল, জ্বর এল না। বিকেলে রিকশায় চেপে একজন বুড়ো ডাক্তারবাবু এলেন। আমার পা ফোলা দেখলেন, নাড়ি দেখলেন, চোখের কোল টেনে ধরে দেখলেন, স্টেথো দিয়ে বুক পরীক্ষা করলেন, লিভার

পিলে টিপে টিপে দেখে কালো রঙের একটা বড়ির বিধান দিলেন। আমার ছ সাত মাসের পুরনো জ্বর যেন মন্ত্রবলে মিলিয়ে গেল।

.

আবার কলকাতায়, দ্বিতীয় চাকরি

ম্যালেরিয়ায় ভুগে আমার মুখে করুণ ছায়া পড়েছে, মাথার চুল উঠে গিয়ে মোষের বাচ্চার রোমের মতো হয়েছে। বুকের ছাতি ইঞ্চি দেড়েক কমে গেছে। অহংকার দু-তিন ডিগ্রি নেমে গেছে। সাহস বেড়েছে কি কমেছে বুঝি না। তবে এই কারুণ্য দেখে ভাগ্য বোধ হয় এ যাত্রায় কিছু প্রসন্ন হল।

যুদ্ধ ছেলেদের সামনে অনেক সুযোগ এনে দিয়েছিল নানারকমের চাকরি, নানা রকমের প্রশিক্ষণ, বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো ছেলেদের বাঁচার হরেক বন্দোবস্ত। যুদ্ধকালে সমরবিভাগ এক বিশ্বরূপমূর্তি ধরে যেখানে যা আছে সবই তার অন্তর্গত বাবলা কাঁটা থেকে বিরাট যুদ্ধজাহাজ সবই তার দরকার, রহিম হাজাম থেকে অটো হান সবাইকেই তার চাই। আমি সেই বিরাট মেশিনারিতে একটি স্ক্রু হয়ে লেগে গেলাম।

মেটেবুরুজের কেশোরাম কটন মিল তখন শুধু যুদ্ধের জিনিস তৈরি করছিল। গ্যাস যুদ্ধে লড়বার জন্যে সৈন্যদের গ্যাস মুখোশ আর অ্যান্টিগ্যাস কেইপ দেওয়া হত। কেশোরাম মিহি সুতোয় বোনা কেমব্রিক কাপড় বিশেষ কেমিক্যাল দ্রবণে ডুবিয়ে, উত্তপ্ত কক্ষে শুকিয়ে ঐ কেইপের কাপড় তৈরি করত। কাপড় বোনার আগে সুতোর টেনশন পরীক্ষা করে দেখা হত। অতি সহজেই এখানে আমি চাকরি পেলাম। আমার কাজ ছিল, দ্রবণে ডোবানো কাপড় শুকিয়ে যাবার পর সম্পূর্ণ নীর হয়েছে কি না দেখা। বিরাট শেডের সর্বত্রই রাসায়নিকের উগ্র গন্ধ তার ঝাঁজে চোখে জল আসে, সব সময় একটা অস্বস্তিকর গরমে কষ্ট হয়। শেডের মস্ত দরজা তিনটে শিফটেই খোলা থাকে। হঠাৎ সেই দরজা দিয়ে একঝলক হাওয়া আসে। একদিন, অনেকক্ষণ পরে এইরকম একটু হাওয়া এসেছে। মাদীন

বলে একটি ছেলে আমার পাশে কাজ করছিল- ন্যাড়া মাথা, বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠা বসন্তে খোদলানো চ্যাপটা মুখ, পরনে কালো গেঞ্জি- হঠাৎ শুনি সে বলছে, আঃ! রগুল্লার চেয়েও মিষ্টি এই হাওয়া তাকিয়ে দেখি মুহূর্তের আরামে মুদে এসেছে তার চোখ। মাতাদীনের পূর্বাপর কিছুই জানি না, কিন্তু ঐ একঝলক হাওয়ার সঙ্গে তার মন্তব্যটির জন্য তাকে মনে রয়ে গেছে।

আরও একজনকে মনে আছে, সে মহেন্দ্র সিং, ভারতীয় বংশোদ্ভূত মরিশাসের লোক। কী করে সে এখানে এসে জুটল কে জানে। ছ ফিটের উপর লম্বা, বিশাল দেহ, বডিবিল্ডারদের মতো সুঠাম শরীর, শ্যামলা রং, ঝকঝকে হাসি, সুন্দর মুখশ্রী, ক্রু কাট চুল, ইংরিজিভাষী। সে হট চেম্বারে কাজ করত, একা। প্রচণ্ড উত্তপ্ত ঐ ঘরে আর কেউ যেতে চাইত না বলে সে ছুটি পেত না। মিল তাকে রোজ তিন সের দুধ এমনিই দিত। একদিন আমি, কতটা গরম দেখার জন্য, হট চেম্বারে ঢুকেছিলাম। মুহূর্তে মনে হল, রক্ত যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। চোখে, নাকের গর্তে, মাথার কোটরে, ফুসফুসের বেলোতে আগ্নেয়গিরির বাতাস ঢুকে আমাকে এখনি মমি বানিয়ে ফেলবে। সবাই বলত, মহেন্দ্রের ঐ চেহারা আর থাকবে না। ও অসুখে পড়ে যাবে।

এখানে দু মাস কাজ করে টের পাচ্ছিলাম, আমি বদলে যাচ্ছি। এখানে সারা জীবনের মতো আমার একটি শিক্ষা লাভ হল: বংশ, রক্ত, বর্ণ সব বাজে কথা তেমন তেমন বৃত্তির পাল্লায় পড়লে মানুষের ল্যাজামুড়ো পালটে যায়। ভয় হল, শেষটায় আমি কি মাতাদীন বা নুরুলের মতো হয়ে যাব? ফরসা সাদা হাফশার্টের বদলে কালো রঙের গেঞ্জি পরব? মাথায় গামছা প্যাচাব, কাবুলিদের কাছে টাকা ধার করব, বিকেলে ভিজে ছোলা আর পাইট নিয়ে বসব, চাচেরা বোনকে বিয়ে করব?

.

বি ই কলেজ, পঞ্চাশের মন্বন্তর

সমরবিভাগের প্রয়োজনে ভারত সরকার পার্ক স্ট্রিটে একটা অফিস খুলেছিল। তাদের কাজ ছিল ইচ্ছুক ছেলেদের বিভিন্ন এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও টেকনিক্যাল স্কুলে রেখে কাজ শেখানো। শিক্ষাকাল শেষ হলে পরীক্ষা। পাশ করে যার ইচ্ছে ফৌজে যোগ দিতে পারে, যার ইচ্ছে বাড়ি ফিরে যেতে পারে। কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ব্যাপারটা আমার খুব মনমতো হল। অবিলম্বে একদিন আমি সেই অফিসে হাজির হলাম। আমার ইন্টারভিউ নিলেন ডক্টর এস আর সেনগুপ্ত, যিনি আর কয়েক বছর পরে আই আই টির ডিরেক্টর হিসেবে বিখ্যাত হবেন। অতএব এই ইন্টারভিউ যেন মশা মারতে কামান দাগা।

শিক্ষার জন্য আমাকে শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে রিপোর্ট করতে বলা হল। সেখানে আমাদের জন্য নতুন বানানো চমৎকার হস্টেল- কিচেন, ডাইনিং হল, ব্যায়ামাগার। শিক্ষাভাতা যা পাব তাতে হস্টেলের খরচ মিটিয়েও হাতে কয়েক টাকা থেকে যাবে।

এখানে ঢুকে অনেকদিন পরে আমি যেন হাঁফ ছাড়লাম। অনেকদিন পরে আবার আমি ছাত্র মন থেকে অনেক গ্লানি, অনেক ভার নেমে গেল। দিনগুলি চমৎকার।

বি ই কলেজে আমার বেশির ভাগ সময় কেটেছিল মেশিন শপে আর ড্রইং বোর্ডের সামনে। মেশিন শপের ইনচার্জ শিক্ষক সূর্যনারায়ণ কর্মকারকে ভোলা অসম্ভব। শপের বড় শেডে অজস্র মেশিনের মধ্যে দুটি হলক লেদ পাশাপাশি ছিল আমেরিকান মেশিন, ওজনে যেমন ভারী, কাজ করে তেমনি আরাম, এতটুকু জার্ক দেয় না, কাঁপে না। তার ভারী চাক বাঁধতে গেলে আমাদের একজন চাকটি দুহাতে তুলে ধরে, আর একজন বেল্ট ঘোরায়। কর্মকারের হারকিউলিসের মতো বুক আর বাহু, সিংহের মতো সরু কোমর শুধু ওঁকেই দেখতাম অনায়াসে এক হাতে চাক তুলে ধরে অন্য হাতে বেল্ট ঘোরাচ্ছেন। কর্মকার অবিরাম সিগারেট খেতেন আর কোনো-না-কোনো মেশিনে কাজ করতেন। ছাত্রদের আপনি বলতেন, রোল নাম্বার ধরে সম্বোধন করতেন যেন কিছুতেই কোনো ব্যক্তিগত স্পর্শের মধ্যে যাবেন না। সকালের পুরো শিফট কাজ করে, অনেক দিন দেখেছি, পরের শিফটে সন্ধের সময় চানটান করে, ভালো জামাকাপড় পরে আবার এসে হাজির হয়েছেন।

গ্রীজ-লুব্রিক্যান্ট-লোহার বাবরির পোড়া গন্ধ আর শব্দে ঝালাপালা মেশিন শপটা যেন ওঁর বেড়াবার জায়গা।

এঞ্জিনিয়ারিং ড্রইংয়ের বিমল সেনগুপ্ত ছিলেন যেমন ভদ্র আর নরম স্বভাবের, অকৃতদার আধবুড়ো ইংরেজ কোপল্যাণ্ড ছিলেন তেমনি খিটখিটে। ড্রইং প্লেট দেখার আগে দেখতেন পেনসিল ঠিকমতো কাটা হয়েছে কি না। একটু বেঠিক হলে পেনসিলটা ধরে খট করে হাইবেঞ্চে ঠুকে সিসটা ভেঙে দিতেন। ওঁরা ছাড়া সিংহরায় নামে এক ভদ্রলোক আমাদের রোমান উর্দু শেখাতেন। সিংহরায় মিশমিশে কালো, পরনে নিষ্কলঙ্ক সাদা খদ্দর, কালো চুল, ঝকঝকে দাঁত, সম্ভবত গান্ধীবাদী মানুষ। রোমান উর্দুর নাম করে উনি গালিব, মীর তকি মীর বা অন্য কারো শের শোনাতেন। একটি শের আমার আজও মনে আছে–

বনা লে জা জো কুছ বন সকে জওয়ানী মে
রাত থোড়ী হ্যায় ঔর বহুত হ্যায় সঙ্গ।

রাত ছোট আর মজা অনেক।

এখানেও আমাদের দুটো শিফটে ক্লাস হয়, রাত ছোট আর গাওনা যে অনেক।

মেশিন শপ থেকে গঙ্গা দেখা যায় না। কিন্তু গঙ্গাতীরের ফোরশোর রোডের গাছপালার ঘন শাখাপ্রশাখা দেখা যায়। সন্ধের আগে দেখতে পাই পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবছে কালো ডালপালার জ্যামিতিক রেখাজালের ওপাশে রক্তবর্ণ মোজেইকের মতো টুকরো টুকরো আকাশ, অথবা আকাশে কারো বাড়ির লাল টালি যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে আছে। মেশিন শপের বাইরে ঘাস আর চোরকাঁটার একটুখানি মাঠে আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নামে।

ঐ মাঠে, খুব কাছেই একটা অকেজো প্লেন, সত্যিকারের ছোট ডাকোটা, জাংক হিসেবে পড়ে ছিল। বিকেলের শিফটে কেমন ঢিলেমি ভর করে ছায়া পড়ে গেলে আমি সুট করে বেরিয়ে অন্তত দশ মিনিটের জন্য তার ককপিটে গিয়ে বসি। বসার জায়গাটি ছোট্ট এবং

অত্যন্ত আরামপ্রদ। প্লেনের বডি অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়ের, ভিতরে নরম লাইনিং। এঞ্জিনটা অকেজো, কিন্তু খুলে নেওয়া হয় নি। আমি এটা ওটা টেনে দেখি। জানি উড়বে না। তবু ইচ্ছে করে মনে রোমাঞ্চ আনি যদি প্রপেলার ঘোরে! যদি গোঁ গোঁ করে উঠে পড়ে!

রবিবারের ছুটিতে কোনো কোনো দিন দিদিমার বাড়ি যাই, কোনো কোনো রবিবারে হস্টেলেই থাকি, হস্টেল থেকে সকালে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে অনেক দূরে দূরে ঘুরে আসি। একদিনের কথা মনে আছে শীতের সকাল, গেস্ট কীন উইলিয়ামের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, ঘরবাড়ি বিশেষ নেই, রাস্তার ধারের গাছপালার দরুন পথে শিশির, হালকা ঘাস, ছায়া, রোদ। অচেনা পথের কৌতূহল, না কি শীতের তাজা বাতাসের নেশা, না কি কিশোরবয়সের অল্পজান কেউ আমাকে ঠেলছিল। আমি চারদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। টের পাই নি কখন বেলা চড়েছে, দুপুর হেলে পড়েছে। চার দিকে প্রায় দিগন্তছোঁয়া ধানের মাঠ ধান কাটা হয়ে গেছে আঁটি বেঁধে চাষারা নিয়ে যাচ্ছে চারদিকে সোনালি খড় দূরে মন্থর গরুর গাড়ি নীল আকাশ বাতাসে শস্যের ধুলোর হালকা রেণু- চারদিক উদাস, বিস্তীর্ণ, কর্মরত, অথচ অলস। কদিন আগে শোনা পৌষের গান আমার সামনে সেই মাঠে খড়ে ধানে আর ধুলোয় নেচে বেড়াতে লাগল। একটা ব্যথা ঘিরে এল। একেই বোধ হয় বলে একস্ট্যাসি- আনন্দ-আবেশ। সেদিন আমার ফিরতে ফিরতে সূর্য অপরাহ্নের দিকে ঢলে পড়ল। আমি আন্দুল ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিলাম।

কোনো রবিবারে দিদিমার বাড়ি গেলে ফেরার পথে একবার কলেজ স্ট্রিটে টু মারি। প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিঙের সামনে দাঁড়িয়ে পুরনো বই দেখি। কখনো কখনো লোভ খুব বেশি হলে কিনে ফেলি। এখান থেকেই প্রমথ চৌধুরীর বীরবলের হালখাতা (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৩৩) আর অতুলচন্দ্র গুপ্তের শিক্ষা ও সভ্যতা (প্রথম সংস্করণ ১৩৩৪) কিনেছিলাম। নিদাগ নিভাঁজ নতুন বই, আসল দাম ছিল দেড় টাকা, আমি কিনলাম দশ আনা করে। তখন বিশ্বভারতী পত্রিকা সম্পাদনা করতেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রমথনাথ বিশী। প্রতিসংখ্যার দাম এক টাকা। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, রামকিংকর, বিনোদবিহারী তো ওঁদেরই সম্পত্তি। এক সংখ্যায় অবনীন্দ্রনাথের একটি ছবি ছিল: উমা

একটি মেয়ের মুখ, ঊর্ধ্ববক্ষ পর্যন্ত। মেয়েটির চুল লালচে পিঙ্গল, তার আরক্ত ফরসা মুখে বরফের বা ভস্মের গুঁড়োর একটু সাদা আভা। একটি ধূসর অনুদ্যত সাপ তার গলায় আশ্রিত, সাপটির গলাতেও আবার হালকা একটু লাল সুতো বাঁধা। মেয়েটির নারীলাবণ্যের মধ্যে কী করে যেন পুরুষের শান্ত বৈরাগ্য মিশে গিয়েছে– উমা একমনা হয়ে শিবের কথা ভাবতে ভাবতে শিবের সত্তা পাচ্ছেন। সারা ভারতের শৈব চিত্রে এই বিষয়ে এমন ছবি আমি দুটি দেখি নি। কলাভবনে কয়েক বছর পরে মূল ছবিটি দেখেছিলাম। মূলের বর্ণলেপের তুলনায় প্রিন্টের সামান্য ফ্যাকাশে রং আমার বেশি অনুষঙ্গময় লেগেছিল।

আর-একটি সংখ্যায় প্রথম ছবিটি ছিল নন্দলাল বসুর শবরীর প্রতীক্ষা। জলরঙের টেম্পারা। বুনো, কঠিনজীবন, লঘুশরীর শবরী তপ্ত দুপুরে গাছে উঠে দূরে তাকিয়ে আছে রামের প্রতীক্ষায়। দ্বিধাহীন তুলির নিশ্চিত টানটোন, নির্ভুল রং চাপানো। এ ছবিতেও কাঠিন্য এবং কোমলতা মিশে গিয়ে একটা রূপ ধরেছে- তামা গেরুয়া হলদে বাদামি রঙের পোঁচ, তপ্ত গ্রীষ্মদুপুর, ছেঁড়া কাপড় পরা গরিব বুনো মেয়ে। অভ্যাসযোগের চূড়ান্তে পৌঁছলেই কেবল এমন সিদ্ধ হাতে ছবি আঁকা যায়। এইসব ছবির প্রিন্ট আমার সারা জীবনের অমূল্য ধন। দিদিমার বাড়ি টালিগঞ্জ থেকে কলেজ স্ট্রিটে আসতাম শুধু ঐ পত্রিকাটির জন্যে। তার পর ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে পত্রিকাটি কিনে হ্যারিসন রোডের ট্রামে চড়ে দুলতে দুলতে হাওড়া হয়ে শিবপুরের হস্টেলে ফিরতাম।

১৯৪৩-এ বাংলার দুর্ভিক্ষের সময়েও আমি শিবপুরে। সে দুর্ভিক্ষে, কেউ বলে পাঁচ লক্ষ, কেউ বলে তিরিশ লক্ষ, কেউ বলে পঞ্চাশ লক্ষ বাঙালি মরেছিল। শহরের রাস্তায় রাস্তায় খেতে না পেয়ে মরা মানুষের কঙ্কালসার দেহ পড়ে থাকত। এসব বর্ণনা অনেকে লিখেছেন। পরিমল গোস্বামী একটি ছোট গল্পের সংকলন করেছিলেন, নাম ‘মন্বন্তর। মৃত এবং মুমূর্ষু শিশু, নারী, পুরুষদের প্রচুর রেখাচিত্র এঁকেছিলেন জয়নুল আবেদিন আর চিত্তপ্রসাদ। ডকুমেন্টারির মূল্য রয়েছে এসব গল্পের আর ছবির। এসব ছবি থেকে অনেক দূরে, একেবারে অন্য একটি কোণে বসে নন্দলাল এক চিরদুর্ভিক্ষের ছবি এঁকেছিলেন: শিব ও অন্নপূর্ণা নিচে ভারতচন্দ্রের দু ছত্র উদ্ধৃতি:

অন্নপূর্ণা যার ঘরে সে কাঁদে অন্নের তরে।

এ বড় মায়ার পরমাদ।

এবার ছবিটি বর্ণনা করি। পদ্মে আসীনা অন্নপূর্ণা, তার পিছনে ঘন নীল আকাশ, যেন কোনো গভীর দিনের আকাশ, অথচ তাতে তৃতীয়ার চন্দ্রকলা আর তারা ফুটে আছে। অন্নপূর্ণার সামনে নৃত্যপর ভিখিরি শিব তাঁর নিরন্ন শরীরের হাড়ের খাঁচা পশুর কঙ্কালের মতো স্পষ্ট, ক্ষুধায় চোয়াল এবং দন্ত বেরিয়ে পড়েছে। তাঁর চারদিকে রুক্ষ রিক্ত অগ্নিবর্ষী রৌদ্র। ছবিটি ওয়শ-টেম্পারায় আঁকা। নিচে ক্ষুধা এবং সংহারের পুরুষ, উপরে অন্ন এবং জীবনের দেবী– ওঁরা যে যার জায়গায় আছেন, কেউ কাউকে কোনোদিন পাবেন না, কোনোদিন কারো যাজ্ঞা মিটবে না। এ বড় মায়ার পরমাদ।

ঐ দু রকম ছবি দেখে আমার চোখ ফুটল। বুঝলাম, পোস্টার খুব প্রয়োজনীয় এবং কার্যকর জিনিস, তবু পোস্টার শেষ না হলে ছবি আরম্ভ হয় না।

বি ই কলেজে থাকার শেষাংশে ঐ দুর্ভিক্ষের গোপন কার্যকারণ চাক্ষুষ করলাম। ক্লাসে বসে বা মেশিন শপে দাঁড়িয়ে কদিন ধরেই দেখছিলাম, ফোরশোর রোড ধরে অবিরাম ত্রিপল ঢাকা মালবোঝাই ট্রাক চলেছে, যথাসাধ্য নিঃশব্দে। কোথায় যাচ্ছে ওরা? কেন যাচ্ছে? পরের রবিবার বটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে গিয়ে রহস্যটি উদঘাটিত হল।

ট্রাকের সারি বোঝাই হয়ে আসছে চাল- লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মন চাল। শহরের প্রান্তে বিশাল বাগানটি নির্জন। কিছু মালী আর কৃচিৎ কয়েকজন দর্শক ছাড়া এই অশান্তির সময়ে কেউ সেখানে আসে না। খোলা গেট দিয়ে ট্রাকগুলো ভিতরে চলে আসে। বাগানের এখানে-সেখানে খোলা আকাশের নিচে স্রেফ মাটির উপর ত্রিপল পেতে সেই চাল পিরামিডের মত স্তূপ করে রাখা হয়। বিশাল বিশাল পিরামিড, পনেরো-কুড়ি ফিট উঁচু, লোকের চোখ বা পাখিপক্ষীদের ঠোঁট থেকে বাঁচাতে সামান্য ত্রিপলে ঢাকা। আমরা অবাক হয়ে যাই, এত চাল কোত্থেকে এল?

বাংলা দেশের সমস্ত গোলা, খামার, ঢেঁকিশাল উজাড় করে কেড়ে আনা হয়েছে এই শস্য। কারা আনল? শোনা যাচ্ছে, সরকারের খাদ্য সংগ্রহ বিভাগ এবং ইস্পাহানি কোম্পানির কাজ এটা। কেন আনল? কেন যে আনল তা মাসখানেকের মধ্যেই বোঝা গেল। শুধু বটানিক্যাল গার্ডেন কেন, নিশ্চয় আরো অনেক গোপন জায়গায় এরকম খোলা মাঠে গোলা বানিয়ে চাল মজুত করা হয়েছিল। ফলে পাড়াগাঁয়ে, মফস্বলের বাজারে তখন এক দানা চাল নেই। দিনের পর দিন গেঁড়ি, গুগলি, গাছের পাতা সেদ্ধ, মূল সেদ্ধ, ঘাসের দানা সেদ্ধ খেয়ে জীর্ণশীর্ণ মেয়ে পুরুষ শিশুরা বাঁচার শেষ চেষ্টায় দলে দলে এসে কলকাতার রাস্তা ছেয়ে ফেলল। রাস্তাই তাদের বাসা, রাস্তাই তাদের শ্মশান। কয়েকটা দিন তারা নিঃসাড় গলায় একটু ফ্যান দেও মা, একটু ফ্যান দাও মা বলে ভিক্ষা করেছিল। তার পরে নিঃশব্দেই মারা গেল। এতগুলো লোককে না খাইয়ে মেরে কার কী লাভ হল কিছু বোঝা গেল না।

ওদিকে বর্ষার বা প্রাকবর্ষার মৌসুমি বাতাস বোধ হয় এসে পড়েছিল- ছিপছিপ, ঝিপঝিপ, ঝরঝর করে মাঝেমধ্যে বৃষ্টি হয়। অনাচ্ছাদিত সেই চালের পিরামিডে, টিলায় বৃষ্টি পড়ে। জল ভিতরে ভিতরে চুঁইয়ে নেমে স্তূপের গোড়ায় এসে জমে থাকে। তার পর রোদ উঠল, চালের টিলাগুলি গুমসে উঠল, টিলার গায়ে সবুজ ছাতা ধরল। এর পর রোদ্দুর যখন কড়া হল চালগুলি ছোপ-ছোপ কালো আর ছাইবর্ণ হয়ে পশুখাদ্যেরও অযোগ্য হয়ে গেল। এই হল বিখ্যাত পঞ্চাশের মন্বন্তরের কার্যকারণ সম্পর্ক, আমার স্বচক্ষে দেখা।

.

রিক্রুটজীবন ও সি ই কলেজ

বি ই কলেজ প্রাচীন প্রতিষ্ঠান, সেখানকার শিক্ষাক্রম শেষ করতে পারলে বোধ হয় ভালো হত। কিন্তু হল না, আমি পরীক্ষার আগেই পালালাম।

শুনেছিলাম ফৌজের নিজস্ব এঞ্জিনিয়ারিং কোর আছে। সেখানে ঢুকলে সমরবিভাগই তার নিজস্ব প্রয়োজনে ছেলেদের শিখিয়েপড়িয়ে নেয়। অর্থাৎ সেখানে চাকরি এবং শিক্ষা

একসঙ্গে চলে। এই নিরাপত্তা আমার দরকার ছিল। ফৌজে খাওয়া পরা থাকা চিকিৎসা যানবাহন আমোদমোদ সমস্তই বিনামূল্য, উপরন্তু র‍্যাক পে এবং ট্রেড পে মিলিয়ে মাইনে অনেক বেশি। তাছাড়া সত্যিই মুক্তির জন্য আমার প্রাণ কাঁদছিল। অনেক লম্বা সময় ধরে চাপ সহ্য করেছি এইবার যে করে থোক এই টিপেটিপে-চলার ভীতু জীবন থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

যেন কোনো নিষিদ্ধ অবশ্যম্ভাবী পথে পা দিচ্ছি, এইভাবে কাউকে কিছু না জানিয়ে একদিন দুপুরে আই টি এফ প্যাভিলিয়নে গেলাম। উর্দি পরা একটা লোক ফৌজের সুখ সুবিধা সম্পর্কে খুব বক্তৃতা দিচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম, লোকটা প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে। যাক গে, তাতে আমার কি! আমি আর চিন্তাভাবনায় না গিয়ে বেপরোয়া জুয়াড়ীর মতোই বন্ডে সই করলাম। তখন আমার আঠারো চলছে।

হেস্টিংসে ডাক্তারী পরীক্ষা হল। হার্ট লাং লিভার কিডনি চোখ ওজন সব ঠিক আছে। ব্যস, তার পর আমি পুরোপুরি আর্মির খপ্পরে চলে গেলাম। এবার আর পালাতে পারব না, পালালে ওরা হুলিয়া বার করে ধরে আনবে।

ফৌজে গেলাম বটে, কিন্তু শুরুতে খাস কলকাতায়, বাঙালি পাড়াতেই রইলাম। বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে রাসবিহারী অ্যাভিনিয়ুর শেষ মাথায় যেখানে ট্রামগুলো ঘোরে সেখানে ক্যালকাটা এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নামে একটি প্রযুক্তি শেখার প্রতিষ্ঠান ছিল। আমাদের শেখাবার জন্য সমরবিভাগ এই শিল্প বিদ্যালয়টিকে আত্মসাৎ করেছিল। সেখানে তখন আমার সহাধ্যায়ী তিন শো সাড়ে তিন শো ছেলে। সবাই আনকোরা রংরুট। ডিপ্লোমা কোর্সের পাঠক্রম এবং মিলিটারি এঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের প্রয়োজন মিলিয়ে-মিশিয়ে একটা মোটামুটি সিলেবাস তৈরি হয়েছিল। সমরবিভাগের আনুকূল্যে মেশিন, সরঞ্জাম, কাঁচা মাল ও শিক্ষকের অভাব ছিল না, অভাব ছিল শুধু উপযুক্ত পাঠ্য এবং নির্ধারিত বইয়ের। তবু পরবর্তীকালের স্বাধীন ভারতের শিল্পোন্নয়নে যে দক্ষ কারিগরদের প্রয়োজন হবে ঐটিই

হয়েছিল তাদের প্রস্তুতির আদি পর্ব। এবং আমি সেই আদি যুগ থেকে সম্পর্কের ফলে ঐ ইতিহাসের আদ্যোপান্ত সাক্ষী আছি।

যা বলছিলাম, সি ই কলেজ নিল আমাদের পড়াশোনার ভার আর ফৌজ নিল আমাদের শৃঙ্খলা শেখাবার দায়িত্ব। আমার তখন বয়স কম। এই দুই দল মিলে, অগোচরে, আমাদের ঢেলে সাজাচ্ছিল। সি ই কলেজে ঢোকামাত্র তারা আমাকে ফিটিং শপে এক অদ্ভুত, অকারণ, প্রবল ট্রেনিংয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করল। একটুকরো লোহা নিয়ে তাকে চিপিং করে, ড্রিল করে, করাতে কেটে, উখোয় ঘষে ছোট করি, আকার দিই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চিপিং করে, ফাইল করে আমার বাহুর পেশী এক এক ইঞ্চি বেড়ে গেল। মাসখানেক ফিটিং শপে অসুরের খাটুনি খেটে এঞ্জিনিয়ারিং ড্রইংয়ের ক্লাসে এলাম। প্র্যাকটিক্যাল ঠিক আছে, কিন্তু থিয়রি ক্লাস এলোমেলো। বিষয়টার বই পেতে আমরা নিজেদের তাগিদেই বই ঘাঁটি মেশিন টুলস, স্টিম এঞ্জিন, আই সি এঞ্জিন, অ্যাপ্লায়েড মেকানিকস। ফাউন্ড্রিতে কিভাবে ধাতু গলানো হয়, মোল্ড তৈরি হয়, ঢালাই হয়। প্যাটার্ন তৈরির মাপজোক, কৌশল ও মূলসূত্র। ইত্যাদি, ইত্যাদি। অনন্ত পারং কিল প্রযুক্তিশাস্ত্রং।

এসব ছাড়াও, এখানে কমিক রিলিফের মতো যিনি রোমান উর্দু শেখাতে আসেন তাঁর নাম সত্যগোপাল রায়। সাদা পাজামা, কালো শেরওয়ানি পরা, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল, তিনি তাঁর নাম বলতেন, সৎগোপাল রায়। সৎগোপালজী কবিতা লিখতেন। বীরদর্পে আমাদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন

বীর চলে হ্যাঁয়
তীর চলে হ্যাঁয়
লড়নেবালে শির চলে হ্যাঁয়
হিম্মৎবালে ধীর চলে হ্যাঁয়
ইত্যাদি…

সকাল নটা থেকে সারা দিন ক্লাস, দুপুরে এক ঘণ্টা লাঞ্চ-ব্রেক, বিকেল পাঁচটায় ছুটি, তার পর এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টা প্যারেড। শনিবারে পি টি। সন্ধ্যায় নৈশাহার। আটটা সাড়ে আটটায় রোল কল। ব্যস, দিন শেষ।

সি ই কলেজের কাছে, গড়িয়াহাটের মোড়ে বড় পাঁচতলা বাড়িটায় আমরা থাকি। ওটা আমাদের হস্টেল তথা ব্যারাক। আমাদের দেখাশোনা করা এবং প্যারেড ও ফৌজী নিয়ম শৃঙ্খলা শেখাবার জন্য এক ক্যাপ্টেনের অধীনে কয়েকজন নায়েক হাবিলদার জমাদার ছিলেন। বাড়িটা খুব আরামপ্রদ, খোলামেলা, স্নানের ঘরে শাওয়ারে সারা দিন প্রচুর জল। নিজের ইচ্ছেমতো রুমমেট পছন্দ করে এক একটা ঘরে দুজন বা তিনজন করে থাকি। বিশাল ছাদে হু হু করে বাতাস বয়। ঘরের লাগোয়া বারান্দায় বেরিয়ে এসে রেলিংয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালেই দেখা যায়, রাস্তা দিয়ে কত রকমের লোক চলেছে। গড়িয়াহাট রোডের মধ্যিখানে বুলেভার্ডে কাঁটাতারের ঘের দিয়ে আমেরিকান সৈন্যেরা তাদের সাজসরঞ্জাম রেখেছিল। গড়িয়াহাট রোড তখন প্রায় ফাঁকাই থাকত, প্রায়ই দেখতাম, সেই বুলেভার্ডে, উলটো গাধায় চাপার মতো উলটো সাইকেলে চেপে এক ঢ্যাঙা নিগ্রো বাহাদুরি দেখাচ্ছে। বারান্দার শানে বসে পড়লে আকাশ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না, শুধু বাজারের কাছাকাছি নারকেল গাছে বসা চিলের তীক্ষ্ণ ডাক মাঝে মাঝে শোনা যায়। অবাক কাণ্ড, সেই নারকেল গাছের দুটো একটা, এই ষাট বছর পরেও, দশতলা মেঘমল্লার বাড়ির পড়শী হয়ে রয়ে গেছে। হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ি থেকে দেখছি, সেই গাছে এখনও চিল এসে বসে, এখনও তীক্ষ্ণ স্বরে ডাক দেয়। ভাবি, সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ- সেই কোকিলই ডাকছে। সেই অফুরন্ত কোকিল! সেই অফুরন্ত চিল!

কিন্তু এখনকার গড়িয়াহাট দেখে ষাট বছর আগেকার গড়িয়াহাটকে ভেবে নেওয়া কঠিন হবে। গড়িয়াহাট বাজার বলতে তখন বড় একটা টিনের চালার নিচে নিঃশব্দ নিস্তেজ এক অপ্রস্তুত বাজার। বাজারে তরিতরকারি কিছুটা মেলে। টিনশেডের নিচে গ্রাম্য ধরনের চিড়ে-মুড়ি-মুড়কির দোকান সেখানে কাঁচের খোপে সাদা বাতাসা, লাল বাতাসা, তালপাটালি

আর ছাতু। কলার ছড়া টাঙানো। গামছা আর লুঙ্গির দোকান। অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র...

শুনেছিলাম ফৌজে খাওয়াদাওয়া খুব ভালো। এখন কার্যক্ষেত্রে দেখছি কথাটা সর্বৈব মিথ্যে। ধানে ভরা বিশ্রী মোটা চালের ভাত আর লার্ডে রাঁধা ভুষিসুদ্ধ ডাল- ব্যস, দু বেলা এই খাদ্য। মাস দুয়েক এই খাবার খেয়ে আমাদের মাথা গরম হয়ে গেল। একটু মুখ বদলাবার জন্যে, বিকেলের চায়ের সঙ্গে আমরা বাইরে থেকে তেলেভাজা আনিয়ে খাই। অন্যদিকে চোখের সামনে দেখি, নায়েক হাবিলদার আর জমাদার মিলিয়ে চারজন শিখের একটা দুষ্টচক্র দোতলায় একটা হলঘর নিয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। ক্রেটে করে কমলালেবু আসে, তারা খায়। কার্টনে করে ইভাপরেটেড মিল্ক আসে, শুকনো ফল আসে, তারা খায়। লঙ্গরিরা আলাদা রুটি পাকিয়ে ঘি মাখায়, মাংস পাকায়, তারা খায়। আমাদের তিন শো, সাড়ে তিন শো ছেলেকে খাওয়াবার ভার নাকি কন্ট্রাক্টরের উপর। সে ব্যাটাকে দেখা যায় না। আমাদের র‍্যাশন কোথায় যাচ্ছে কে জানে, আর এই কদই বা কোত্থেকে আসছে তাই বা কে জানে! ঐ চারটে শিখ, ক্যাপ্টেন (তাকেও দেখা যায় না) আর অদৃশ্য কন্ট্রাক্টর এই তিনে মিলে ভাগাভাগি করে পুকুরচুরি করছে। আমরা দু বেলা দেখছি। গা নিসপিস করছে। কিন্তু কাকে বলব। খাবার সময় আমরা কলাই করা থালা হাতে নিয়ে লাইন করে দাঁড়াই। বিরাট হাতা করে লঙ্গরি ভাত আর ডাল ঢেলে দেয়। ডালের হাণ্ডার পাশে ঐ চারটে শিখের একটা, রাজপুত্তুরের মতো চেহারা, গুরদয়াল সিং দাঁড়িয়ে থাকে যেন লাটের ব্যাটা।

শিখ ছাড়াও কিছু গোর্খা এন সি ও, ভি সি ও ছিল। গোর্খরা সোজাসাপটা ফৌজি, তারা চুরিচামারির মধ্যে নেই। কিন্তু কেউ বোকা নয়, ছোট ঘোট চোখে তারাও ব্যাপারটা লক্ষ করেছিল।

একদিন বিকেলবেলা ক্লাস করে ফিরেছি, চা খেয়েছি, আমাদের বুড়ো গোর্খা জমাদার এসে বললেন- চলল, আজ আমি তোমাদের প্যারেডে নিয়ে যাব। সিংহী পার্কে বড় বড় দেবদারু গাছে ঘেরা মাঠ, সেখানে আমরা প্যারেড করি। বোধ হয় চৈত্র মাস। দেবদারু গাছে

নতুন পাতা এসেছে। শেষবেলার রোদ্দুর লাল হয়ে উঠেছে, জমাদারের কানের লতিতেও রোদ্দুর আটকে লাল হয়ে আছে। ঘামে আমাদের শার্ট ভিজে উঠছে, ক্লান্ত লাগছে। জমাদার জিজ্ঞেস করছেন- এত সুস্থি কেন? ঠিক মতো খানা খাও না নাকি? জমাদার হয়তো বুঝেসুঝেই আমাদের ক্ষোভের জায়গায় হাত রাখলেন। আমরা হুড়মুড় করে আমাদের খাবারের হাল বললাম।

জমাদার শুধোলেন ঐ খানা আপনারা খান কেন?

— কি করব?

– আপলোগ পড়ালিখা আদমী, আচ্ছা ঘরের লেড়কা। আপনারা কি করবেন তা কি আমি বলে দেব?

ব্যস, ব্যস। আর বলতে হল না। রোল নাম্বার নাইনটি-নাইন বলল– অনেকদিন শালা ভালছেলে হয়ে আছি। খাবার লাইনে আজ আমিই প্রথম শুরু করে দেব, তার পর আপনারা হাতে নিয়ে নেবেন। দেরি করবেন না, তাকাবার সময় দেবেন না।

তখনও সন্ধে হয় নি, দিনের আলো স্পষ্ট। তিন-চার জনের পরেই নাইনটি-নাইন লাইনে দাঁড়ানো। লঙ্গরখানার বারান্দায় ভাতের গামলা আর ডালের হাণ্ডা রেডি করে লম্বা হাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লঙ্গরি। পাশে মুরুব্বির মতো গুরদয়াল।

নাইনটি-নাইন থালা না বাড়িয়ে বলল– ইয়ে চাবল আচ্ছা নেহি, বদবু আতা।

লঙ্গরি থমকে গেল, গুরদয়াল কটমট করে তাকাল লেনা হ্যায় তো লো, নেহি তো আগে বঢ়ো, দুসরেকো আনে দো।

– কেঁও? ইয়ে চাবল তুম কাঁহাসে মাঙ্গকে লায়া, কুত্তা ভি নেহি খাতে!

– হঠো, হঠো, নেহি মিলেগা খানা। হঠ যাঃ। গুরদয়াল হাণ্ডার পিছন থেকে বেরিয়ে এল। আর যায় কোথা! নাইনটি-নাইন এরই জন্যে অপেক্ষা করছিল- খানা নেহি মিলেগা? কেঁও, তুমহারা বাপকা খানা হ্যায়? নাইনটি-নাইনের এক থাপ্পড়ে গুরদয়ালের পাগড়ি উড়ে গেল। গুরদয়াল অসম্ভব বলিষ্ঠ, সেও তেড়ে এল, কিন্তু নাইনটি-নাইন ততক্ষণে তার লম্বা চুলের গোছা ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে সামনে নুইয়ে ফেলেছে। তিন শো ছেলে আর সুযোগ পেল না, পঁচিশ-তিরিশ জনই তাকে পিটিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিল। তাকে বাঁচাতে তার দলের বাকি তিনটে নেমে আসছিল– আমরা ধর ধর করে ছুটে যেতেই ফিরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। তখন সন্ধে হয়ে গেছে। লঙ্গরিরা অবস্থা দেখে কোথায় পালিয়েছে। গোখা সিপাহি আর অফিসারদের কোথাও দেখা গেল না। আমরা ভাত আর হাণ্ডাভরতি ডাল নর্দমায় ঢেলে দিলাম। একপেট খিদে আর মাথাভরতি উত্তেজনা নিয়ে আমরা যে যার ঘরে উঠে গেলাম। দেখা যাক, এবার কি হয়।

রাত আটটা সাড়ে আটটার সময় হঠাৎ নিচের উঠোনে উপর্যুপরি হুইসল বাজতে লাগল। অর্থাৎ, নেমে এসো। নেমে দেখি, অ্যাদ্দিন পরে ক্যাপ্টেন এসেছে লোকটা দেখতে ভালো, মাদাম বোভারির প্রেমিকের মতো নচ্ছার ড্যান্ডি চেহারা। আমরা উঠোনে চারদিক ঘিরে তিন লাইনে ফল ইন হলাম। সে কঠিন মুখ করে বক্তৃতা দিল– আর্মিতে ডিসিপ্লিন হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। প্রথমে হুকুম তামিল করো, তার পরে যদি কিছু বলার থাকে বল। কিন্তু তোমরা ডিসিপ্লিন ভাঙার চেয়েও খারাপ কাজ করেছ, বিদ্রোহ করেছ। তোমাদের কঠিন শাস্তি হবে। ক্যাপ্টেন কয়েকজনের নাম রোল নাম্বার টুকে নিয়ে চলে গেল, বলে গেল কাল এরা আমার সামনে পেশ হবে। ঐ দলে কি করে যেন আমার নামটাও ঢুকে গেল।

পরের দিন আমরা ঘটনাটা প্রিন্সিপালকে জানালাম। বিকেলে আমাদের ক্যাপ্টেনের সামনে পেশ করা হল। দোষীদের সাত দিন বিকেলে ফেটিগ ডিউটি আর সকালে ডাবল আপ-এর বন্দোবস্ত হল। শুনলাম, গুরদয়াল সিংয়ের ধুম জ্বর। লঙ্গরিরা আবার সেই একই ভাত ডাল রাঁধছে।

কিন্তু তিন দিন পরে কি করে যেন ভোজবাজিতে সব উলটে গেল। আগের ক্যাপ্টেন বদলি হয়ে নতুন ক্যাপ্টেন এলেন। শিখদের সেই ঘুঘুর বাসাও ভাঙল। নতুন ক্যাপ্টেন পাঞ্জাবী মুসলমান, ভারী চেহারা, নিয়মিত জগ করে দেহকে বাকায়দা রাখার চেষ্টা করেন। ছুটির সকালে দৌড়তে দৌড়তে চলে আসেন আমাদের ডেরায়, লঙ্গরখানার বারান্দায় ফোল্ডিং চেয়ারে বসে গল্প করেন– আমি সিপাহি হয়ে ফৌজে ঢুকেছিলাম, এই দ্যাখো এখন আমি ক্যাপ্টেন। আর্মি বড় ভালো জায়গা এখানেই আমি ইংরেজি শিখেছি, হাতিয়ার চালাতে শিখেছি, লড়াই করতে শিখেছি।

ক্যাপ্টেন সন্ধেবেলা কখনো কখনো সোজা চলে আসেন আমাদের খাবার জায়গায়, ঘুরে ঘুরে দেখেন, কখনো প্লেটে নিয়ে একটু চেখেও দেখেন। তাঁর আসার পর থেকেই আমাদের খাদ্য পালটে গিয়েছিল পরিষ্কার ভাত, ঘন ডাল, সবজি। বিকেলে রুটি মাংস বা টিনের মাছ আর ইভাপরেটেড দুধ আর শুকনো ফল। তাছাড়া সপ্তাহে চার প্যাকেট ওয়াইল্ড উডবাইন আর দুটো দেশলাই পাই।

.

কম্যান্ড হাসপাতাল

এই পর্বে আমার আর একটা ফৌজি অভিজ্ঞতা হল। আমার জ্বর হয়েছিল, চার-পাঁচ দিনেও জ্বর কমল না দেখে আমাকে আলিপুরে কম্যান্ড হাসপাতালে পাঠানো হল। সেখানে মেডিক্যাল আর সার্জিক্যাল বিভাগ আলাদা। যুদ্ধ তখন বর্মা হয়ে অসম সীমান্তে, বাড়ির দোরগোড়ায়, এসে পড়েছে। সার্জিক্যাল বিভাগে ভিড় রোজ বাড়ছে। রোগীদের জন্য সারি সারি টালির লম্বা দোচালা, তবু জায়গায় কুলোয় নি বলে সেন্ট টমাস স্কুলের বাড়িটাকেও দখল করে নিতে হয়েছে। বেড ডাক্তার নার্স ওষুধ পথ্য সরঞ্জাম সেবা কিছুরই অভাব নেই মিলিটারি হাসপাতালের মতো এমন দরাজ হাত, দক্ষ এবং কঠোর নিয়মানুবর্তী প্রতিষ্ঠান আমি অদ্যাবধি দেখি নি। সবাই বলে ফৌজে মায়াদয়া নেই, আজ যখন কম্যান্ডিং অফিসার কর্নেল পতিতপাবন চৌধুরীর সেই হাসপাতালের কথা মনে পড়ে, ভাবি, কি দরকার মায়াদয়া মানবিকতা ও আর্তসেবার বড় বড় কথার। তার চেয়ে যে যার কাজটি করুক, কাজ না করলে বা ফাঁকি দিলে বা চুরি করলে যেন কঠোর শাস্তির বন্দোবস্ত থাকে।

চার-পাঁচ দিনে আমার জ্বর সেরে গেল। সকালে রোগীদের ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের ডুপ্লিকেট কপি করে দিয়ে ডাক্তারকে সাহায্য করি। ক্যাপ্টেন মুখার্জি সাইপ্রাস ঘুরে এসেছেন। আমার ইচ্ছে সেইসব গল্প হোক, কিন্তু ডাক্তার তার দুঃখের কথা পাড়েন গতকাল কর্নেল চৌধুরী ইনস্পেকশনে এসেছিলেন। কথা নেই বার্তা নেই, এসেই এই ড্রয়ারটা টেনে খুলে ফেললেন– সিগারেটের পাঁচ-ছটা খালি প্যাকেট আর কিছু আজেবাজে কাগজ পড়ে ছিল, নির্দোষ জিনিস কিন্তু এতেই বুড়ো খেপে গেল।

বেশ ফুর্তিতেই সেরে উঠছিলাম। কিন্তু কি হল কে জানে, দু দিন পরে রাত্তিরে হঠাৎ আবার ধুম জ্বর এল। আবছা চেতনায় টের পাচ্ছি ক্যাপ্টেন মুখার্জির উদ্বিগ্ন স্বর, আরো কোনো ডাক্তারকে উনি ডেকে এনেছেন, আমার বিছানার পাশে ঝুঁকে পড়ে কথ বলছেন।

দ্রুত লাল কম্বল চাপিয়ে আমাকে ইমার্জেন্সিতে নিয়ে গেল। তার পর বাবি রাতটা আর কিছু মনে নেই।

তখনও টাইফয়েডের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক বের হয় নি। সাধারণ ওষুধে ওঁর আমাকে শুধু এক মাস ধরে যত্ন করে আর পরিচর্যা করেই সারিয়ে তুললেন। বাড়িতে, বোধ হয় মায়ের কাছেও, ঐ শুশ্রূষা পাওয়া যাবে না। সূর্য ওঠার আগেই একজন গরম জল এনে ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে দেয়। মুখ ধুই। হালকা চা দেয়। রোদ্দুর একটু ফুটতে দিনের নার্স আসে। সে গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে গা মোছায়, গায়ে স্পিরিট ঘরে ঘষে তুলো দিয়ে পোঁছে, পাউডার মাখিয়ে পাংশু চামড়ার নিচে রক্তবহা শিরা আর স্নায়ুকে চাঙ্গা করে। পায়জামা স্যুট পালটে দেয়। তার পর শুইয়ে রেখেই আমাকে এপাশ ওপাশ করে চাদর আর বালিশের ওয়াড় পালটে বিছানা টানটান করে, কোমর পর্যন্ত কম্বলে ঢেকে দেয়। কী যে আরাম হয় কি বলব! তার পর ডাক্তারেরা আসেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় নার্স টেম্পারেচার রেকর্ড করে। এই যে পরিচর্যা শুরু হল তা শেষ হবে রাত্রে মশারি ফেলার পরে, আলো ডিম করে দেবার পরে।

আমার বাঁ পাশের বেডের ছেলেটিকে নার্স করত এক তপ্তকাঞ্চনবর্ণা অ্যাংলোইন্ডিয়ান যুবতী। কঠিন রোগ থেকে ধীরে ধীরে সারিয়ে তুলতে তুলতে সে ছেলেটিকে দিদির মতো ভালোবেসে ফেলেছিল। ছেলেটি ছাড়া পাবার দু দিন আগে থেকে দেখছি, দিদি বিকেলে নার্স-কোয়ার্টার থেকে চলে আসে, কাছে বসে মগে ভেজানো আঙুর একটি একটি করে তুলে তার মুখে গুঁজে দেয়। তাহলে রোগ আর দৌর্বল্য দিয়েও মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক করা যায়!

আমাকে নার্স করত খাসিয়া, মিজোও হতে পারে, এক ক্রিশ্চান মেয়ে। তার স্তন দুটি ছোট। হালকা কাঠামো। তেমন সুন্দরীও নয়। কিন্তু তার আপাকা পেয়ারার মতো মুখখানিতে চিবুকের ঢালে তখনও সবুজ রং, সেই রঙের আভা আস্তে আস্তে লেমনইয়েলো হয়ে কপালে এসে বোঁটার দিকের পাকা হলুদ হয়ে ছড়িয়ে আছে। সে যেভাবে আমাকে হ্যান্ড

করে তাতে আমি কুঁকড়ে যাই, সেও থতমত হয়। দুজনার কারোর মুখেই কথা নেই, অথচ আমরা সমবয়সীই হব।

আমার মাথা রোগে আচ্ছন্ন, সে স্পিরিট ঘষে, পাউডার মাখায় আমার শরীর যেন প্যানট্রিতে রাখা ধুলো-জমা একটি হারমোনিয়াম। সেও কম বয়সের একটি মেয়ে, লজ্জা কাটে নি। তাকে বলা হয়েছে সকালে-বিকেলে হারমোনিয়ামে বসো, রেয়াজ করো, আঙুলে টিপে টিপে বাজাও। আমার সাদা কালো রিড– সে সাদা রিডে অপ্রতিভ আর কালো রিডে উৎসুক ডো রে মি ফা সো লা টি ডো বাজায়– তাতে আস্ত একটা ভারতীয় রাগিণী হয় না, পশ্চিমী ভাঙা ভাঙা সুরের দমক ওঠে– ট্রা লা লা।

রোগীর লিবিডো, সাপের মতো, অন্য সময় যার মাথায় মণি জ্বলে, সে এখন ঝরা পাতার রাশির নিচ দিয়ে সরসর করে পালাবার পথ খোঁজে।

কিন্তু এখানে শুধু আঠারো বছরের ছেলেরা নেই, নানা ফ্রন্ট থেকে ফেরা, মোটা গোঁফ কড়া দাড়ির তিরিশ-চল্লিশ বছরের আখাম্বা লোকগুলোও আছে। তাদের বেয়াদবী সামলাবার জন্যে পুরুষ নার্সও আছে। মাঝে মাঝে এই বয়স্ক লোকগুলো অবশ্য নেহাত বাচ্চার মতো ব্যবহার করে। সে আর এক কাণ্ড।

সকাল থেকে দফায় দফায় কত রকম যে খাবার আসে- ভোরের চা বিস্কুট, তার পর মাখন রুটি দুধ ডিম, দুপুরে ভাতের মধ্যে টুকরো টুকরো চিকেন, দু ঘণ্টা পরে আবার দুটো ডিম, কলা, কমলালেবু, বিকেলের চা, সন্ধ্যায় আবার দুধ, রাত্তিরে কি দিত কিছুতেই মনে পড়ছে না। সন্ধের পর নার্সরা চলে যেত। রাত্রে মেট্রন এসে ওয়ার্ডের ভার নিতেন। মেট্রন বয়স্কা, অতি স্বাস্থ্যবতী ব্রিটিশ মহিলা। রাতভর ঘণ্টায় ঘণ্টায় দুই সারি বেডের মধ্যিখান দিয়ে ওয়ার্ডের এ মাথা ও মাথা পায়চারি করতেন আর তাঁর উঁচু হিলের টকটক শব্দ হত। হাঁটতে হাঁটতে একঘেয়েমি পেয়ে বসলেই ঘুটঘাট করে কফি বা হরলিকস্ বানাতেন, হুঁকছোঁক করে কড়াইশুটি ভাজতেন। খেতে খেতে আবার পায়চারি– দুটো আড়াইটে বাজে,

আমার ঘুম ভেঙে গেছে, আর ঘুম আসছে না। দেখতে পেয়ে উনি হরলিকসের মগ হাতে কাছে এসে দাঁড়ান- খিদে পেয়েছে? খাবে নাকি একটু হরলিকস?

বিকেলে কলকাতার ছেলেদের বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন দেখা করতে আসে। কোনো কোনো বেডের চারদিক কলকাকলিতে ভরে যায়। নির্জন বেডের রোগীরা দূর থেকে আগন্তুকদের দ্যাখে। কোনো বেড অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে আছে বিরক্তিতে, রাগে, হতাশায় জীবনের তুচ্ছতা জেনে মুখ ফিরিয়ে শক্ত হয়ে বসে আছে ভগ্নস্বাস্থ্য সৈনিক।

আমার বাঁ পাশের নতুন ছেলেটির মা আর বোন প্রায় রোজই আসে। একদিন দেখি খুঁজে খুঁজে দাদু আসছেন। মামা পারে না, মাসিমা পারে না, এই বুড়ো লোকটাকেই কি আসতে হল! দাদু আর আমি কেউই বেশি কথা বলতে পারি না। দেখাশোনার সময়। শেষ হলে দাদু নীরবে চলে গেলেন। আমিই বা কি বলি।

আমার বেডের বাঁ পাশের ছেলেটি নেভির, ডান পাশের যুবকটি এয়ারফোর্সের, মধ্যিখানে আমি আর্মির। এয়ারফোর্সের যুবকটি গল্প করতে ভালোবাসে, তার বাড়ি ফরিদপুরে, তার অনেক স্মৃতি। বিকেল ফুরোলে সবাই ফিরে গেলে যখন সন্ধ্যা নামে, ওয়ার্ডে মৃদু আলো জ্বলে তখন রোজই সে নানারকম গ্রামীণ সুখাদ্যের গল্প জোড়ে এ খাবার ও খাবারের কথা বলতে বলতে সে অবধারিতভাবে শেষে ধানবনের চিংড়িতে এসে পৌঁছয়– ওঃ খেয়েছেন কখনো- ওঃ ধানবনের চিংড়ির যা টেস্ট! ধান গাছের গলা পর্যন্ত যখন জল চলে আসে তখন সেখানে জন্মায়, ধান গাছ থেকে ধান খায়, পোকামাকড় খায়, ধানবনের জলে ছিটকে ছিটকে খেলে বেড়ায়। খেলে আর ভোলা যায় না।

শুনে শুনে আমারও কেমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, সন্ধে হলেই কেমন উত লাগত– যেন দারুণ কোনো খাদ্য আসার কথা ছিল, এখনো কেন এল না! আমি ডা পাশ ফিরে বলতাম- কই মশায়, কি হল আজ? আপনার ধানবনের চিংড়ির গল্প আরম্ভ করুন।

আমাদের জীবন বড় আশ্চর্যের সমন্বয়। একই সময়ে কত যে বিন্দু স্পর্শ ক আমরা বাঁচি! তাতে এয়ারফোর্সের যুবাটির ধানবনের চিংড়ি যেমন থাকে তেমনি থানে আমার শিল্পসাহিত্য। একজন হকার বাংলা ইংরেজি পত্রিকা বিক্রি করতে মাঝে মাঝে ওয়ার্ডে আসে। তার কাছ থেকে এক সংখ্যা শনিবারের চিঠি কিনেছিলাম। তাতে তখ পঁচিশ তিরিশ পৃষ্ঠা করে মহাস্থবির জাতক কিস্তিতে বেরোচ্ছিল। অসাধারণ লেখা পাশের বেড যেমন রোজ এক বার ধানবনের চিংড়ির গল্প বলে, আমিও তেমনি রোড মহাস্থবির জাতকের কিস্তি পড়ি। যার যেখানে নাড়ী বাঁধা।

সেরে উঠে দু-এক দিন বিকেলে সার্জিক্যাল বিভাগ দেখতে গিয়েছিলাম। সার্জিক্যাল ওয়ার্ড না দেখলে যুদ্ধ কি বস্তু বোঝা যায় না। পুবদেশে যুদ্ধ চলছিল। আসাম-বর্মা সীমান্ত থেকে দলে দলে আহত সৈনিকদের প্লেনে এখানে আনা হচ্ছিল। কারো হাত, কারো পা, কারো হাত পা দুইই কাটা গেছে- দড়ির টানা দিয়ে তাদের ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। কারো বুকে মুখে পেটে ব্যান্ডেজ জড়ানো, কাউকে কচ্ছপ বা মাংসপিণ্ডের মতো মনে হয়। শুধু বীভৎস ধড় আর অর্ধেক মুণ্ড নিয়েও কি বেঁচে থাকা যায়? ভয়ানক এই কুরুক্ষেত্রের শিবিরে শুধু নার্স ও ডাক্তারেরা ছাড়া তাদের কাছে কোনো আপনজন নেই।

এখানে দাঁড়িয়ে শিউরে উঠি–

সেদিনকার সেই গা ছমছমে অনুভূতি বোঝাতে গিয়ে আজ আমার একটি ছবির কথা মনে পড়ছে। নন্দলাল বসু ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর একটি ছবি এঁকেছিলেন। ছবিটিতে তেমন কিছুই নেই, শুধু একজোড়া পুরুষের পা আর একজোড়া নারীর পা পাশাপাশি, পরস্পরনির্ভর, চাপ চাপ রক্তের উপর দাঁড়িয়ে আছে। দু জোড়া পায়ের মধ্যিখানে একটি অন্ধের লাঠির খানিকটা। ছোট ছবি।

এর পর গল্পের বাকিটুকু: ছবিটি দেখে অ্যান্ড্রুজ সাহেবের খুব পছন্দ হল। সবে করা নতুন ছবি, নন্দলালের হাতছাড়া করার ইচ্ছে নেই, তবু ভদ্রতার জন্যে সেটি তাঁকে উপহার দিতে

হল। দু দিন পরেই কিন্তু সাহেব শুকনো মুখে এসে হাজির। ছবিটি ফেরত দিয়ে বললেন, ঐ ছবি দেয়ালে টাঙাবার পর থেকে রাত্রে আর তিনি ঘুমোতে পারছেন না।

এইখানে, যুদ্ধের আহতদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বুঝি, মানুষের এও এক চরম মুখ, যা রক্তে ভিজে আছে, ক্রমাগত রক্তে ভিজে ভিজে উঠছে। আর ঐ মৃত্যু-উন্মুখ মুখকে আঁকড়ে বেঁচে আছে কত যে মানুষ।

এবারের যুদ্ধে এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মানুষ মরেছিল ৫ কোটির উপর। আর মৃত ঐ ৫ কোটির মরণের ছায়ায় বেঁচে ছিল পৃথিবীর বাকি ২০৮ কোটি।

আর দুটো একটা ছোটখাটো অভিজ্ঞতা শুনিয়ে আমার হাসপাতালের গল্প শেষ করি।

বছর দু-এক পরে লাহোরে মিলিটারি হাসপাতালে ভরতি হয়েছিলাম। সেখানে আমার পাশের দুটি পর পর বেডে দুই আফ্রিকান এসে জুটল। ঘোর কালো, না-বেঁটে না-লম্বা স্বাভাবিক উচ্চতার শক্ত চেহারা, লোহার স্প্রিংয়ের মতো কোঁকড়ানো চুল। ওদের কি অসুখ কে জানে! ভোরের বেলা দেখতাম ওরা বিছানায় বসে বসে খবরের কাগজ মশালের মতো পাকিয়ে দাঁতে চিবিয়ে চিবিয়ে নরম করছে। জিজ্ঞেস করতে বলল, ঐটে হল তাদের টয়লেট পেপার। সকালবেলা সাধারণ ব্রেকফাস্টের সঙ্গে তাদের আরও এক ছড়া কলা এবং এক পাউন্ড করে পাউরুটি দিয়ে যেত। তারা সেইসব খেয়ে অম্লানবদনে টিউব টিপে খানিকটা দাঁত মাজার পেস্ট খেয়ে জলযোগ সম্পন্ন করত। আমি বিছানায় বসে বসে অবাক হয়ে দেখতাম। কথাবার্তায় কিন্তু তারা স্বাভাবিক এবং ভদ্র। একদিন সিংহের কথা জিজ্ঞেস করাতে হেসে বলল– আরে না, না, রাস্তাঘাটে কি আর সিংহ ঘুরে বেড়ায়! ওরা সব আছে দূরে জঙ্গলে, আমাদের সঙ্গে অল্পই দেখাসাক্ষাৎ হয়।

সন্ধেবেলা একত্র বসে গপ্পেদের মধ্যে বেশ গপ্পসপ্প হয়। একদিন সেই আড্ডায় এক বর্মী ক্রিশ্চান যুবক তার দেশের গল্প করছিল। দেশের গল্প, বাড়ির গল্প, নিজের গল্প বলতে বলতে

অতি স্বাভাবিক স্বরে সে বলল, সে হচ্ছে একজন ব্যাস্টার্ড। কথাটায় আমাদের ভারতীয় কান চমকে উঠল– মানে?

– ব্যাস্টার্ড মানে হল যে ছেলে তার বাবা কে জানে না। আমাদের চমকানি তার বোধগম্য হল না, সরল গলায় বলল সে।

তার সারল্য আমাদের সংস্কারের উপরে জিতে গেল। আমরা আবার স্বাভাবিকভাবে গল্প করতে লাগলাম। কিন্তু সত্যি কি এমন সমাজ আছে যেখানে ব্যাস্টার্ড সন্তানকে বেজন্মা বা জারজ শব্দের অশ্লীলতা স্পর্শ করে না।

লিখতে লিখতে, আজ এতদিনের দুঃখকষ্টের পরে, ব্যাস্টার্ডের, সেই যুবকের দেওয়া অর্থটাকেই ঠিক মনে হয়– যে ছেলে তার বাবা কে জানে না। বাবা লুকিয়ে আছে, পালিয়ে আছে, ধরা দিতে চায় নি।

.

নাম্বার থ্রী কনস্ট্রাকশন গ্রুপ

কয়েকটা শিংশপা অর্থাৎ শিশু গাছের জটলার নিচে ছায়ায় একটি লোহার সাইনপোস্ট, তাতে লেখা–

NO. 3 CONSTRUCTION GROUP
RIE
LAHORE CANTT.

দেড়মানুষ উঁচু কাঁটাতারে ঘেরা সেই বিরাট সীমানার মধ্যে গিয়ে গাড়ি থামল। রাভি নদী থেকে বরফগলা জলের স্রোতোবহা খাল কেটে আনা হয়েছে সেচের জন্য। সেই নাহার থেকে সাত-আট মিনিট হাঁটলেই আমাদের এই ছাউনি। দীর্ঘ শুষ্ক ট্রেনযাত্রার পর জায়গাটা দেখে

ভালো লাগল। পরে ধীরে ধীরে সময়মতো আমি এই খালের কথা আর জায়গাটার কথা বলব।

রিপোর্ট করার পর দেখি সেদিন সকালে কুড়ি-পঁচিশ জন নতুন ছেলে এসেছে। আমাকেও সেই দলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। আমাদের প্রথম কাজ হল ভাঁড়ারে পুরনো সব জামাকাপড় জমা দিয়ে নতুন প্রস্থ নেওয়া। এই দলে অনেকেই খেটে খাওয়া বাড়ির ছেলে, খেতিবাড়ি করা মানুষ। অবশ্য একজন ছিল রাজপুত জমিদারবাড়ির, আর একজন ছিল কুমায়ুনের পুজোআচ্চা করা পুরুতবাড়ির ছেলে। ঢিলে-ঢোলা জোড়া জোড়া প্যান্ট বুশশার্ট পেয়ে এদের মুখে যেমন হাসি ফুটল, চোখে তেমনি কৌতুকও ফুটল। তারা একটুও না দমে, অলটার করাবার জন্যে সেগুলো নিয়ে দরজির কাছে চলল। আমি দেখলাম, জাঠ ও পাঞ্জাবীরা বেশ হাসিখুশি, পরিহাসপ্রিয় এবং আশাবাদী। আমার ভাগ্য ভালো, আমার হালকা পাতলা শরীরে শেষ মাপের জামাকাপড়গুলো ঠিক ঠিক লেগে গেল। আমার পুরনো বুটজোড়াটি চমৎকার। সেটি আমি পালটাব না। আমার অস্ট্রেলিয়ান কম্বলও আমি পালটাব না। হ্যাভারস্যাক, রুকস্যাক, কিট ব্যাগ, জলের বোতল, মেস টিন, হাজিফ এসব তো রাইফেল, টমিগান, এল এম জি, গ্রেনেডের মতোই ফ্রি সাইজ। এখন গ্রীষ্মকাল, এখন এই পর্যন্ত। শীতকাল এলে গরম ভেস্ট, গ্রেট কোট, ব্যাটল ড্রেস আর লেপ দেবে। আমি ভাবছি, ব্যারাকে এই নতুন দলটির সঙ্গেই থাকব। এই শিখ আর জাঠদের আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।

বাইরে প্রচণ্ড রোদের তাপ। বাতাস নেই, ছায়া নেই। আকাশ ব্যেপে একা সূর্য সমস্ত শুষে নিয়ে যেন ক্রমাগত অতিকায় হচ্ছে। হিন্দু পাকশালায় খাওয়া সেরে ব্যারাকে এসে শুয়েছি। কেউ পাগড়ির নতুন কাপড় ভাঁজ করছে, কেউ বুট পালিশ করছে, কেউ বেল্টের পিতলে ব্রাসো ঘষছে। আমি চিত হয়ে চালের আড়ার দিকে অপলক তাকিয়ে আছি কিং রুফ ট্রাস না কুইন রুফ ট্রাস? এমন সময় আধবুড়ো কেঠো চেহারার একটা আর্দালি গোছের লোক তুছিমুছি করে স্থানীয় পাঞ্জাবীতে কি বলল। সবাই উঠল– চলো, চলো, চুল কাটাতে যেতে হবে। খেয়েদেয়ে এই অবেলায় আবার চুল কাটানো কী!

চুল কাটাতে গিয়ে আমার কিন্তু মহা উপকার হল। ছাউনির মধ্যে কাছেই সেলুন। চোদ্দ-পনেরোজন নাপিত বড় বড় সাদা আয়নার সামনে কাঠের চেয়ারে বিনি পয়সার খদ্দেরকে বসিয়ে মনের আনন্দে চুল ছাঁটছে। চার-পাঁচ মিনিটে মাথা সাফ। টুপি বা পাগড়ির বাইরে যেন চুল দেখা না যায়। শৌখিন ছেলেদের কান্নাকাটি রাগারাগির উত্তরে সেই আধবুড়ো লোকটা অবাক হয়ে বলতে লাগল ‘আরে, তোমরা কাঁদছ কেন? এ তো ঘরের খেতিবাড়ি, এক মাসে বড় হয়ে যাবে। আমারও মনে হল, চুল বাঁকা করে কাটো, তেড়া করে কাটো, মুড়িয়ে কাটো, ঘুরিয়ে কাটো এখানে কে চেনে আমাকে!

কিন্তু দেখা গেল কেউ কেউ চেনে। আমার আগের ব্যাচের একজন ছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সেই সেলুনে। সে আমাকে একটি মূল্যবান উপদেশ দিল ‘ছুটি, ট্রেনজার্নি মিলিয়ে এই কদিনে আপনার দাড়িটি তো বেশ বড় হয়েছে দেখছি। কচি দাড়ি, মনে হয় যেন কোনোদিন কামানো হয় নি। ভালো হয়েছে। বাঁচতে চান তো এই সুযোগে দাড়িটি রেখে দিন, নইলে এই আমাদের দশা হবে। আমি দেখলাম তার মুখময় কড়া দাড়ির কালো কালো গোড়াগুলি র‍্যাম্প ফাইলের শুলোর মতো উঁচু উঁচু হয়ে ফুলে আছে।

সে বুদ্ধি দিল ‘কাল ইনস্পেকশনের সময় বলবেন, দাড়ি কাটা আমার ধর্মে মানা’।

পরদিন সকালবেলায় যথাবিহিত সাজগোজ করে প্যারেডে হাজির হলাম। আমাদের তিরিশজনের নতুন প্ল্যাটুন। ট্রেনার হাবিলদার মহম্মদ সফি ফাইলে দাঁড়ানো আমাদের এক এক করে দেখতে লাগল। সফি লম্বা, কৃশ, শৌখিন, ত্রিশ-বত্রিশ বছরের যুবা। তার চুল সুন্দর করে ছাঁটা, মেহেদি করা, মোগল রাজপুত্র সেলিমের মতো সরু লম্বা ঝুলন্ত গোঁফ, হালকা দাড়ি পরিষ্কার কামানো, মাথায় কুল্লা পেঁচিয়ে বাঁধা পাগড়িতে পাখির ছড়ানো পুচ্ছের মতো তোররা গোঁজা। এক এক জন করে দেখতে দেখতে সে আমার কাছে এসে ভুরু কুঁচকে দাঁড়াল, ভাববাচ্যে জিজ্ঞেস করল, ‘দাড়ি কামানো হয় নি কেন?’ আমি বললাম, ‘আমার ধর্মে নিষেধ আছে’। সফি কিছু বলল না, তার এক চোখে কৌতুকহাসি অন্য চোখে বাঁকাহাসি ফুটে উঠল। এর পর প্যারেডের মাঠে এক ইংরেজ ছোকরা লেফটেন্যান্ট এসে ধরল, রোমান উর্দু শেখা উচ্চারণে বলল- ‘হাজাম কিউ নহি কিয়া?’

যে হও সে হও তুমি, আমার একই উত্তর- ‘ধর্মে নিষেধ’।

– তুমি শিখ, হিন্দু না মুসলমান?

— আমি বৈদ্য, আ স্পেশাল সেক্ট অব হিন্ডুজ।

— ফলোয়ার অব বুডঢা? আ বুডটিস্টি?

– ওই হল। আমার বাবার এত বড় গোঁফ। পেট পর্যন্ত হাত নামিয়ে দেখালাম, আমার দাদুর এত বড় দাড়ি।

লেফটেন্যান্ট ইমপ্রেসড হয়ে বলল– আচ্ছা, ঠিক আছে।

সন্ধেবেলা রোল-কলের সময় বুড়ো সুবাদার এসে গোঁফে হাত বুলোতে বুলোতে হাঁকলেন– 'হিন্দু হয়ে যে লেড়কা দাড়ি রেখেছ সে বেরিয়ে এসো। আমি ফল আউট হয়ে দাঁড়ালাম। সুবাদার সাহেব সামনে এসে বিরাট গোঁফের আড়ালে লুকিয়ে হেসে আপনজনের মতো আমার থুতনিতে হাত দিয়ে বললেন- "কেন বেটা, দাড়ি বানাচ্ছ না। কেন? বার বার মিথ্যে কথার পুনরাবৃত্তি আমার ভালো লাগছিল না। আমি চুপ করে রইলাম। তখন সূর্য ডুবে গেছে, ছায়া পড়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষের শিয়রের দিকে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে আকাশ থেকে আলো চলে যেতে আরো অনেক দেরি হবে। আমরা সবাই সবাইকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সারা দিনের অসম্ভব পরিশ্রমের পর আমরা ক্লান্ত। সুবাদার মজার হাসি হেসে বললেন- "আচ্ছা, রেখে দাও, দ্যাখো কেমন দাঁড়ায়। সেই থেকে আর দাড়ি নিয়ে আমাকে কেউ কিছু বলে নি।

পাতলা, তরুণ দাড়ি ক্রমশ বাড়তে লাগল। আঁচাবার পর দাড়িতে জল লেগে থাকে, শীতের সন্ধ্যায় তাতে বেশ অস্বস্তি হয়। আর, একমাত্র হিন্দু যে দাড়ি রেখেছে, এই চিহ্নে তিন নম্বর কনস্ট্রাকশন গ্রুপের সবাই আমাকে চিনে রাখল।

.

হাওড়া-লাহোর ফৌজি স্পেশাল ট্রেন

লাহোরগামী ফৌজি স্পেশাল ট্রেন হাওড়া থেকে সপ্তাহে দু বার ছাড়ে। রাত দশটা এগারোটায় কলকাতা ছেড়ে, চার রাত, তিন দিন পরে সে ট্রেন লাহোরে পৌঁছয়। কখনো দ্রুত, কখনো মন্থর, ড্রাইভার ও গার্ডের যেমন খুশি চলে সে ট্রেন। দুপুরবেলা যে-কোনো

স্টেশনে ট্রেন থামিয়ে রাঁধুনীরা প্ল্যাটফর্মে উনুন পেতে সরঞ্জাম নামিয়ে ট্রেনসুদ্ধ লোকের রান্না করে। সবাই লাইন দিয়ে খাবার নিলে পরে ট্রেন আবার চলতে শুরু করে। দিল্লি ছাড়িয়ে ধূ ধূ বালির মাঠ, সেখানে হাড়গিলা আর ময়ূর ঘুরে বেড়ায়। কাঁকুড় লতায় সরস সবুজ কাঁকড়ি আঁকাবাঁকা ভঙ্গি করে ফলে আছে দেখে ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে ধীরেসুস্থে সেই কাঁকড়ি তুলতে যায়। যদি গ্রীষ্মের দুপুর দুঃসহ হয় তবে স্টেশনে দুমদাম করে বড় বড় বরফের চাঁই কামরায় কামরায় ঢুকিয়ে দিয়ে যায়। জলের সঙ্গে মিশিয়ে আমরা জল ঠাণ্ডা করে খাই।

প্রথম বার যখন যাই, পথের প্রথম দিনটি শেষ হয়ে এল সাসারাম স্টেশনে। কিছুক্ষণের জন্য গাড়ি থামল। অবনীন্দ্রনাথের উটের মরণের ছবি শেষ বোঝর গাঢ় লাল আকাশের মতো আকাশ। সেই আকাশের সামনে, অন্ধকারে সামান্য মলিন হয়ে আসা শের শাহের সমাধি গাট্টাগোট্টা বেঁটে ইমারতের মাথায় গম্বুজ। পরের দিন তিনটে সাড়ে তিনটের সময় গাড়ি থামল এলাহাবাদে। প্ল্যাটফর্মে নেমেই দেখি হুইলারের স্টল, তাতে বাংলা বই আর বাংলা পত্রিকাই বেশি। রবীন্দ্রনাথের অনেক বই কাগজ-মলাটের সংস্করণ। আমি ঘেঁটেঘুঁটে একখানা ফাল্গুনী কিনলাম, তার সবুজ মলাট, এক টাকা দাম। সে বই কঁহা হা মুল্লুক, কত কত ভাড়াটে বাড়ি ঘুরল আমার সঙ্গে। তার পরের দিন প্রথম প্রহরে গাড়ি যখন টুণ্ডলার কাছাকাছি, অনেকেই জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল- ঐ, ঐ, ঐ যে দেখা যায় কয়েক মাইল দূরে তাজমহল! তাকে, চেষ্টা করেও প্রেমিকের অশ্রু ভাবতে পারলাম না। বরং আরো কি ভাবা যায় ভাবতে ভাবতেই সে চিনির মঠের মতো, সাদা সাবানের বুদ্বুদের মতে, ঝিনুকের বোতামের মতো মিলিয়ে গেল। পরের দিন সকাল আটটা-নটার মধ্যে পৌঁছে গেলাম লাহোরে।

লাহোরকে উত্তরদিকে ঘিরে আছে রাভি নদী। তার পোশাকী নাম ইরাবতী, বৈদিক নাম পরুষ্ণী। গ্রীকরা তার নাম দিয়েছিল হাইড্রায়েটিস বা আদ্রিস বা বোনাডিস। এই নদীকে পতঞ্জলি জানতেন। ট্রেন এল পুব-দক্ষিণ থেকে। সুতরাং রাভির সঙ্গে প্রথমে মুলাকাত হল না। শহরটি পুরনো, ঘিঞ্জি। সংকীর্ণ পথগুলিতে টাঙ্গা, সাইকেল আর পদচারীদের ভিড়, মোগল সম্রাটেরা এই পথে আসাযাওয়া করেছেন, এই শহরে থেকেছেন।

খেয়া নৌকোয় রাভি পেরিয়ে গেলে ওপারে জাহাঙ্গীরের কবর। ছোট ছোট ইটে গাঁথা ছড়ানো ইমারত। কিন্তু সাজসজ্জা দূরে থাক, সেই আদুড় ইটের গায়ে, তিন শো বছর পেরিয়ে গেল, আজ পর্যন্ত এক পোঁচ পলেস্তারা পড়ল না। জাহাঙ্গীর কাশ্মীর থেকে ফিরছিলেন, পথে মারা যান। কবরটি শক্তপোক্ত ঠিকই, কিন্তু পুরো সৌধটিতে যেন পথপাশে-জীবন-শেষ-হবার অনিশ্চয়তা এবং উদাসীনতা লেগে আছে। রাভির পাড়ে লম্বা লম্বা ঝটিঘাসের ঝোঁপ। ঝোপের গোড়ায়, শিকড়ে ঠাণ্ডা শিরশিরে জল, চিকচিকে বালি নিস্তব্ধতায় আর হলদে রোদে জায়গাটা যেন কুঁদ হয়ে আছে।

শহরে ডাক্তার, উকিল, অধ্যাপক, চাকুরে অনেক বাঙালি। আনারকলি অঞ্চলে বাঙালিদের বাস। কিন্তু শহরে না, আমি যাব ক্যান্টনমেন্টের দিকে। শহরের পর খানিকটা শহরতলি, স্থানীয় লোকেরা বলে সদর। সেখানে কাঁচা সবজি, ফল, মাংসের বাজার, সার বাঁধা স্টেশনারি দোকান– তাতে ক্যালকাটা কেমিক্যাল, বেঙ্গল কেমিক্যালের তেল সাবান টুথপেস্ট ঠাসা। বাসিন্দারা বেশির ভাগই শ্রমজীবী মানুষ। শহর আর ক্যান্টনমেন্টকে আলাদা করে দিয়ে বইছে রাভি থেকে কেটে আনা সেচের খাল। দীর্ঘ সেই খাল চওড়া না হলেও গভীর ও স্রোতস্বান্। ফৌজি গাড়ি এবং লোকজন সব সময়েই আসে যায় তাই খালের উপর শক্ত একটি লোহার পুল। খালের দুই পাড়েই বেশ হালকা বন, লোকজন নেই, নিরিবিলি। সেখানে প্রচুর বন্য ভাঙের গাছ নিজে নিজেই হয়ে আছে। লোকালয়ের মেয়েরা কখনো কখনো সেই খালে কাপড় কাঁচতে আসে। সাবানমাখা কাপড়চোপড় কাঠের সিঁড়ির উপর রেখে বেঁটে বেঁটে দুটি লাঠি দিয়ে দু হাতে পিটিয়ে পিটিয়ে কাঁচে। সাদা জলের কিনারায় সাদা শালওয়ার কুর্তা পরা খুব ফরসা পাঁচ-ছটি তরুণী কাপড় কাঁচছে, জলে ধুচ্ছে, নিজেদের মধ্যে গল্প করছে- যেন ছবি যেন গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে দেখতে ইচ্ছে করে এমন ছবি। সেই খাল শেষে চলে গেছে গমের খেতের দিকে মূল খাল থেকে শিরা-উপশিরার মতো জলের নালা ঢুকেছে খেতের মধ্যে।

ক্যান্টনমেন্টের বড় রাস্তার দু দিকেই আমাদের তিন নম্বর কনস্ট্রাকশন ডিপোর জমি। সেখানে সমস্তই আছে যেন শিক্ষানবিস স্পার্টানদের জন্য একটি আস্ত ছোট শহর। দশ

পনেরো হাজার সৈন্য স্কোয়াডে স্কোয়াডে ভাগ হয়ে একসঙ্গে কুচকাওয়াজ করতে পারে এত বড় মাঠ। জঙ্গলে একাকী-লড়াইয়ের কৌশল শিখবার জন্যে উঁচুনিচু এবড়োখেবড়ো একটা বিস্তীর্ণ জংলা জায়গা। ছোট একটা রাইফেল রেঞ্জ। নৈশ আক্রমণ শেখাবার জন্য কাঁটাতার ঘেরা জায়গা, অস্ত্রাগার, থাকবার জন্য সারিবদ্ধ ব্যারাক, চারটে পাকশালা ও খাবার ঘর, তিনটি উপাসনালয়, ভাঁড়ার, অফিস, ডাক্তারখানা, ক্যানটিন, পানশালা, সিনেমা হল, সুইমিং পুল, বক্সিং রিং, সান্ধ্য স্কুল, দরজিঘর, হাজামখানা, ধোবিখানা। এছাড়া আছে বিরাট একটি কারখানা। যুদ্ধ এক মহাযজ্ঞ। বড় আকারের যুদ্ধ করতে গেলে রাস্তা চাই, ঘাট চাই, সেতু চাই, এয়ারস্ট্রিপ চাই, যানবাহন চাই, আনুষঙ্গিক আরো বহু কিছু চাই। এসব বানাবার ভার স্যাপার্স অ্যান্ড মাইনার্সের উপর। তাদের হাতে থাকে সম্পূর্ণাঙ্গ কারখানা সেখানে তারা কাজের সরঞ্জামগুলি তৈরি করে, অ্যাসেম করে, নষ্ট হলে সারাই করে।

ক্যান্টনমেন্টে, রাস্তার দু পাশে কয়েকটি হোল্ডিং মিলিয়ে আমাদের বিরাট ছাউনির ম্যাপটি বোধ হয় এতক্ষণে স্পষ্ট হয়েছে। রাভির খালের পাড়ে যে ফৌজি এলাকার শুরু তার প্রথমেই আছি আমরা। আর আমাদের ছাউনির শেষ মাথায় ছ নম্বর হোল্ডিংয়ের পাশের জমিতে আছে আমাদের কারখানা। কারখানার উলটোদিকে, রাস্তার ওপারে বি ও আর অর্থাৎ ব্রিটিশ অ্যান্ড আদার র্যাংকস-এর শিবির। বি ও আর ক্যাম্পের গা ঘেঁষে ওয়াকাইদের (উইমিন অগজিলিয়ারি কোর) ব্যারাক, নিভৃত এবং মেয়েলি।

আমাদের জীবননাট্য এখানে একেবারেই স্ত্রীভূমিকাবর্জিত। অত বড় চৌহদ্দির মধ্যে খুঁজলে কোথাও একটা চুলের কাঁটা বা ব্রোচ বা কাঁচের চুড়ির ভাঙা টুকরো পাওয়া যাবে না। কিন্তু হাসপাতালের নার্স এবং ফৌজি দিলখুশ সভার নাচিয়ে-গাইয়ে মেয়েরা ছাড়াও যুদ্ধে আরও কিছু মেয়ের দরকার ছিল সেই মেয়েরা ওয়াকাই দলে জায়গা পেল, তারা অফিসে কেরানীর কাজও করত। বি ও আর ক্যাম্প এবং ওয়াকাইদের বাসস্থান পাশাপাশি রাখার পিছনে কোনো মতলব ও হিসেব ছিল না একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

আমাদের কারখানা আর ব্রিটিশ শিবিরকে দু পাশে রেখে এর পর মসৃণ পাকা রাস্তা চলে গেছে পাড়াগাঁর ভিতরের দিকে। হঠাৎ রাস্তাটা বহুদূর পর্যন্ত ফাঁকা ও জনহীন। বিকেলবেলা এই পথে এসে যেন দেশটার আকাশ বাতাস জমিটিকে বুঝতে পারতাম। পাকা গোধূমখেতের মধ্যে দূরে দূরে পারসিক জলচাক্কি। অপরাহ্ন এখানে বড় দীর্ঘায়ত।

.

প্রথম সন্ধ্যার উপদেশ

ফৌজি রীতি হচ্ছে, কোনো কিছু ফেলে না রাখা যা করতে হবে তা এখনই করতে হবে। সুতরাং প্রথম দিনেই পোশাক-পরিচ্ছদ নেওয়া এবং চুল কাটানোর পর, বিকেল নামার আগেই থাকবার ব্যারাক ও নিজস্ব চারপাইয়ের বিলিব্যবস্থা হল। এবং তার পর, সেদিনই, সময় নষ্ট না করে, সন্ধেবেলাতেই ট্রেনিং শুরু হল।

রাতের খাওয়াদাওয়ার পরে সন্ধেবেলা শোনা গেল, সিনেমা দেখতে যেতে হবে। এবং এ ফিল্মটি দেখা বাধ্যতামূলক। কি নিয়ে নাটক? না, এক ফৌজি নিষিদ্ধ পাড়ায় এক স্ত্রীলোকের কাছে গেছে এবং যৌনসংসর্গ করেছে। এই সাক্ষাৎসংসর্গের ফলে লোকটির ভয়ংকর সিফিলিস রোগ হল। অতঃপর সে ছুটিতে বাড়ি গেল এবং তার কাছ থেকে রোগ তার স্ত্রীর মধ্যে সংক্রামিত হল। আর এর ফলে তাদের নতুন বাচ্চাটি বিনা অপরাধে জন্মান্ধ, বিকলাঙ্গ, ঘেয়ো এবং সিফিলিস রোগী হয়ে ভূমিষ্ঠ হল। ফৌজিটির সাময়িক অসংযম এবং অবিবেচনার জন্য তার সোনার সংসার নষ্ট হয়ে গেল। এটি ফিল্মের প্রথম পর্ব। এই অংশ ভেঁড়া পিটিয়ে বলছে- খবরদার, রেডলাইট এরিয়ার মেয়েদের কাছে যেয়ো না। গেলে সর্বনাশ হবে।

এর পর দ্বিতীয় পর্ব। দ্বিতীয় পর্ব একটু অন্যরকম। সমরবিভাগ এবং বিশেষজ্ঞেরা স্থির জানেন, যে-লোকটা আজকে আছে কালকে নাও থাকতে পারে, যার জীবন সত্যিই পদ্মপাতায় জল, তাকে যোষিৎসঙ্গ থেকে আটকানো যাবে না। বেশি কড়াকড়ি করলে হিতে

বিপরীত হবে, সে বন্য জন্তুর মতো খেপে যাবে। অতএব দ্বিতীয় পর্ব কুণ্ঠিত অনুমতি দিয়ে বলছে- নিষিদ্ধ এলাকায় যাচ্ছ যাও, তবে সাবধানতার এই নিয়মগুলো মেনে যেয়ো।

ফিল্মটা সাদা-কালো, বড় নিরানন্দ, বিবর্ণ ও কেজো। প্রথমাংশে সস্তা ভারতীয় বেশ্যা এবং তার আকাট খদ্দেরের মিলন-নাটক, তার পর ঘেয়ো জননেন্দ্রিয়ের ক্লোজ আপ। মায়ের কান্না, পিতার প্রস্তরমূর্তি। ফিল্মটা কাঁচা বাস্তব। মনে হয় সস্তা কোনো বেশ্যাবাড়িতে এর শুটিং হয়েছিল। আর যে জানে সে জানে ভারতীয় গরিব বেশ্যার খুপরির মতো নিরানন্দ পুরী পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই।

দ্বিতীয়ার্ধ প্রয়োগমূলক। এবারেও সেই একই বেশ্যাবাড়ির দৃশ্য। কিন্তু ক্লোজ আপে দেখানো হচ্ছে রতিক্রিয়ার আগে কিভাবে পুরুষাঙ্গে এক নম্বর মলমটি মাখিয়ে নিতে হবে, কন্ডোম পরে নিতে হবে। রতির পরে কিভাবে কন্ডোম খুলে দু নম্বর মলম লাগাতে হবে। কোথাও কোনো ঢাকাটুকি নেই, অস্পষ্টতা নেই।

এসব কথার কথা না। পরের রবিবার সকালেই দেখা গেল এম আই রুমে একটা বড় সার্জিক্যাল ট্রেতে প্রচুর প্যাকেট সাজানো রয়েছে। প্রত্যেক প্যাকেটে দুটি করে পাতলা সাদা কন্ডোম আর এক নম্বর দু নম্বর মলমের দুটি ছোট টিউব। কেউ দেখছে না, কারো কাছে চাইতে হবে না, কোথাও সই করতে হবে না তুমি শুধু নিয়ে যাও। সময়মতো ব্যবহার কোরো, ভুলো না।

সেদিন ঐ ফিল্মটি দেখে কেউ হাসাহাসি করে নি। বরং সবাইকে কেমন বিষণ্ন ও ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। বেশ্যাবাড়ি যেতে কে চায়! অথচ তাদের কাছে মাসের পর মাস এছাড়া আর কোনো রাস্তা খোলা থাকবে না। ভাড়াটে সৈন্য ও বেশ্যা দুটি জীবিকাই আদিম, দুজনই অবস্থার দাস এবং দাসী।

টেইলপিস: সেদিন রাত্তিরে মনে হয়েছিল জীবন যেন এক কাটাসুতো ঘুড়ি যা এখন উড়তে উড়তে গাঢ় ঘোরদর্শন বজ্রগর্ভ মেঘের মধ্যে প্রবেশ করেছে। রবিবার দেখি, সেই

ঘুড়িটার লম্বা লেজ বাকি আকাশের আলোর মধ্যে বাচ্চা ছেলের নেংটির মতো ফুড়ৎ ফুড়ুৎ করে উড়ছে আঠারো-উনিশ বছরের হালকা-পাতলা ন্যাড়ামাথা টিকি-রাখা মাঙ্গীরাম সেই প্যাকেট এনে কন্ডোম দুটোকে লম্বা বেলুনের মতো ফুলিয়ে হাসতে হাসতে ব্যারাকের টানা বারান্দায় দৌড়চ্ছে।

.

সখা রাইফেল

সপ্তাহ না ফুরোতেই রাইফেল কোট থেকে আমাদের প্রত্যেককে একটি করে লী এনফিল্ড রাইফেল দেওয়া হল। ঐ রাইফেলগুলো দারুণ মজবুত ও নিখুঁত লক্ষ্যভেদী, কাশীপুর গান অ্যান্ড শেল কারখানায় তৈরি। বন্দুকের গায়ে তার নিজস্ব নম্বর খোদাই করা আছে। এখন থেকে আমি যতদিন এখানে থাকব এই বন্দুকটি আমার, আমি ছাড়া আর কেউ এর গায়ে হাত দেবে না।

এর পর রাইফেলের ক্লাসে প্রথমেই শেখানো হল- রাইফেলের কোন অংশের কি নাম, কি কাজ তাদের। ক্লাসের শেষে ওস্তাদ বলল, মনে রেখো, তোমার রাইফেলটিই বিপদে তোমার সবচেয়ে বড় বন্ধু, হয়তো একমাত্র বন্ধু। রণক্ষেত্রে তুমি দলছুট হয়ে পড়বে শৎৰু কোথেকে আসবে তুমি জান না। তুমি আড়াল পাকড়াবে। তখন একমাত্র এই রাইফেলই তোমাকে বাঁচাবে। অজানা জঙ্গলে যখন তুমি একলা, কোথাও ভরসা নেই- তখন এই রাইফেলই তোমাকে ভরসা দেবে। লড়াইয়ের সময় খবরদার কখনো একে অলগ রেখো না। এখন একে একটা বোঝা বলে মনে হচ্ছে, এক মাস পরে দেখবে এ একটা লাঠির মতো হালকা। আমাদের ওস্তাদ চাইলে বেশ সুন্দর করে, অলংকার দিয়ে কথা বলতে পারে। ওস্তাদের কথায় রাইফেলের উপর আমার অগাধ ভক্তি হল, স্নেহও হল। চোখ সরু করে ব্যারেলের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখি সেখানে এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত সর্পিল প্যাঁচ কাটা। থ্রী নট থ্রী কার্তুজ নল থেকে ঘুরতে ঘুরতে বেরুবে, ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে ঢুকবে শত্রুর দেহে। নিজেকে মোচড়

দিতে দিতে হাড়মাংস ছাদা করবে। ফলে গুলির নিজের মাপের চেয়ে ক্ষতের ছ্যাদাটা বড় হবে।

সারা দিন অনেক লাফঝাঁপ হাঁটাচলা গেছে। আমি এবং রাইফেল দুজনেই সমান ধূলিধূসর। বিকেল চারটেয় তাকে পরিষ্কার করে, নলের মধ্যে তেল দিয়ে পুল থু টেনে রাতের মতো কোটে জমা করে দিলাম। কাল সকালে আবার এসে নেব।

রোজ সকালে প্যারেডগ্রাউন্ডে জমায়েত হবার পর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি চিরকুটে দিনের প্রোগ্রাম আসে। দশ মাসের মধ্যে শিক্ষা শেষ হওয়া চাই। ম্যাপ রিডিং, বেয়নেট ফাইটিং, সাঁতার বা শুটিং বিষয় যাই হোক, প্রত্যেকটি ক্লাস ছিল পঞ্চাশ মিনিটের আর দুই ক্লাসের মধ্যিখানে দশ মিনিটের বিরতি। বিরতি হওয়ামাত্র আমি ক্যানটিনে ছুটি, দ্রুত এক গ্লাস লস্যি নিই। দুপুরের আগে এইভাবে আমার তিন গ্লাস লস্যি খাওয়া হয়ে যায়। প্রচণ্ড গরমে আর দারুণ ক্লান্তিতে দুপুরের খাওয়া প্রায় খেতে পারি না। তাছাড়া খাবার পরের পিরিয়ডেই যদি বেয়নেট ফাইটিং থাকে তবে পেট ফাঁকা রাখতেই হয়। ভরাপেটে ঐ লাফঝাঁপ হয় না, পেট ব্যথা করে। যদি কোনোদিন দুপুরের খাবার আগের পিরিয়ডে সাঁতার এবং পরের পিরিয়ডে থিওরিটিক্যাল ক্লাস থাকে তো সেদিনটা সবচেয়ে ভালো। সেদিন ফুরফুরে বিকেলে নিজেই কিচেনে গিয়ে মগভরতি চা নিয়ে এসে একটু একটু করে চুমুক দিই আর সামান্য দূরের চার-পাঁচটা শিশু গাছের জটলার দিকে তাকিয়ে থাকি। সারা দিনের ঝাঁ ঝাঁ রোদ এখন নিস্তেজ হয়ে পাতার ফাঁকে ঢুকেছে, বেলা পড়ে আসার হাওয়াও এসে ঢুকেছে। পাতাগুলি ছোট, নীলচে, পাতলা তিরতির করে কাঁপে। এখানে বিকেল ফুরোতে অনেক দেরি হয়। কোনো কোনো দিন দেখি, দীর্ঘ করিডরের মতো সেই বিকেলের প্রান্তে ঐ গাছতলায় কয়েকজন মিলে কাওয়ালির আসর জমিয়েছে। মূল গায়ক একজন, বাকি সবাই গোল হয়ে বসে হাতে তালি দিয়ে তাল রাখছে আর ধুয়া ধরছে বিস্তর বিছা দিয়া তেরে ঘরকে সামনে।

যেদিন খাটুনি মাত্রা ছাড়িয়ে যায় সেদিন আর চা আনতে যাই না। বুটপটি খুলি, শার্ট খুলি না, খাঁটিয়ার উপর লুটিয়ে পড়ি। আমার পাশের বা পায়ের কাছের বা শিয়রের কাছের কেউ নিজের চায়ের সঙ্গে আমার মগেও চা ভরতি করে এনে দেয়। আমি যাদের মধ্যে থাকি তারা কর্নাল-রোহতকের জাঠ, অমৃতসর-লুধিয়ানার শিখ, আর লালামুসার মুসলমান। পাতলা দুবলা বিদেশী ছেলে দেখে ওরা আমাকে অনেক ছাড় দেয়, সাহায্য করে, হয়তো খানিকটা ভালোও বাসে। দু পাশের দু জন নিজেদের জায়গা যখন পরিষ্কার করে তখন আধাআধি করে আমার জায়গাটাও নিকিয়ে দেয়। পায়ের কাছে কৈলাস সিং সবসময় টিপটপ। নিজের পোশাক ধোপাকে দেবার সময় সে আমার জামাকাপড়ও নিয়ে যায়। ফেটিগ ডিউটি পড়লে সবাই আমাকে শুকনো লংকার বস্তাটা দিয়ে নিজেরা অবলীলাক্রমে আটার বস্তা,

নুনের বস্তা তুলে নেয়। পরিবর্তে অবশ্য, আমি লক্ষ করি, মৃদু একটা তুচ্ছের হাসি ফুটে ওঠে ওদের ঠোঁটে। তুচ্ছতা কিন্তু আমাকে নয়, বস্তার ঐ ওজনটাকে।

ক্রমশ যত দিন যেতে লাগল আমি এদের সঙ্গে মিশে যেতে লাগলাম। আমার বাক্সে চয়নিকা আছে, ফাল্গুনী আছে তাতে কিছু যায় আসে না। সারা দিন একই পোশাক, একই খাওয়া, একই পরিশ্রমে ঘর্মাক্ত হই। রাত্রে, দশটার পরে আলো নিবে গেলে যার যার খাঁটিয়ায় শুয়ে ওরা গল্প করে। চার-পাঁচ জন অল্পবয়সী শিখ ছিল– হঠাৎ আমার অস্তিত্ব তাদের খেয়াল হয়। মজা করে বলে- গুতোজি, একটু পাঞ্জাবী বলল। মজা করে আমিও বলি আহো প্ৰাজী, কি অইয়া তেনু? কি অইয়া পুত্তর? ইত্যাদি ইত্যাদি। ঐ সরল যুবকেরা নিজেদের ভাষা বিদেশীর মুখে শুনে প্রাণ খুলে হাসে। আরো বলল, আরো বলো। আর দু-চারটে কথার পরই আমার স্টক ফুরিয়ে যায়। ঐটুকু যেন ছিল সারা দিনের শেষে ঘুমের আগের গুডনাইট চুমু। তার পর কারো ঘুম আসত, কারো ঘুম আসত না। বিউগলে টানা লয়ে তিন বার ঘুমের সুর বাজত। রাত নীরব হয়ে গেলে দূরের গমের খেত থেকে হালকা কাঁচরকোঁচর শব্দ ভেসে আসত। সেখানে গরু দিয়ে পারসিক জলচাকি ঘুরিয়ে বর্ষীয়সী পাঞ্জাবিনীরা সারা রাত নাহার থেকে খেতে জল দিচ্ছেন।

.

চরম আবহাওয়া

পাঞ্জাব এবং উত্তরপশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের চরম আবহাওয়ায় যত কষ্ট গ্রীষ্মে তত কষ্ট শীতে। গ্রীষ্মে সর্গিমি থেকে বাঁচার জন্য রোজ আমাদের আধ বাটি করে নুনজল খেতে হয়। সারা দিনমান এবং রাত দুপুর পর্যন্ত আমরা শ্বাপদপ্রাণীর মতো তাপে আর তৃষ্ণায় হা হা করি। বাইরে খাঁটিয়া এনে খোলা আকাশের নিচে শুই। তখনও পৃথিবী এক আগুনভরা তন্দুর। রাতের আকাশ ফ্যাকফেকে সাদা দিগন্তে কোথাও একটু খোঁচখাঁচ নেই যেখানে অন্ধকারের কাজল সামান্য গাঢ় হয়ে জমতে পারে। আকাশ প্রায় নক্ষত্রহীন অনেক তারা

উবে গেছে, অনেক তারা দূরে চলে গেছে, বাকি যারা আছে। তারা ঝাপসা, শুকনো। শেষ রাতে মাটির কাছ থেকে ক্লান্ত একটু ঘুম উঠতে না উঠতেই আবার দাহ শুরু হয়ে যায়।

এই রকম গ্রীষ্মে একদিন বিকেলে হঠাৎ দেখা গেল, দিগন্ত থেকে, মেঘ নয়, মেঘের মতন একটা বিরাট ছায়া আকাশপথে দ্রুত এগিয়ে আসছে। সবাই হৈ হৈ করে উঠল আঁধি আসছে, আঁধি! ঢোকো, ঢোকো, ঘরে ঢোকো, দরজা-জানলা বন্ধ করো।

আমি কখনো আঁধি দেখি নি। ব্যারাকে না ঢুকে আমি বারান্দা থেকে একটু দেখতে চেষ্টা করলাম, আর মুহূর্তে আমার গায়ে মাথায় ভাঙা পাথরের, নুড়ির, বালির দানার হাজার হাজার ছররা এসে লাগল। তার পরই, আপূর্য্যমাণ সমুদ্র যেমন সৈকত গ্রাস করে তেমনি ধুলোর সমুদ্র আমাদের গ্রাস করে নিল। আমি এক লাফে ভিতরে এসে কম্বল মুড়ি দিলাম। দু-তিন মিনিট তোলপাড় করে আঁধি তার পথে চলে গেল। আর হঠাৎ আকাশ স্নিগ্ধ নীল হল, আবহাওয়ার তাপ কয়েক ডিগ্রি নেমে গেল, যেন ভারী এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। কিন্তু কম্বল থেকে বেরিয়ে দেখি, কম্বলের উপর, বন্ধ ব্যারাকের মেঝেয় আর জানলার তাকে সর্বত্র সিকি ইঞ্চি পুরু মিহি ধুলোর স্তর জমেছে। আমাদের বন্ধ মুখেও ধুলো ঢুকে কিচকিচ করছে।

শীতের দিনে এর ঠিক উলটো কষ্ট। শীতে সারা রাত ঘুমোতে পারি না। গরম মোজা, গরম গেঞ্জি, ছাইনীল ফ্লানেলের শার্ট, সোয়েটার, গ্রেট কোট পরে, কম্বল লেপ গায়ে দিয়ে শুই তবু শীতে কাঁপি। রাত এত দীর্ঘ যে ভোরেও অন্ধকার জড়িয়ে থাকে। তারই মধ্যে তৈরি হতে হয়। সবচেয়ে মুশকিল, হাতের দশটা আঙুলই ঠাণ্ডায় অসাড়, তাদের দিয়ে কোনো কাজ হয় না যেন কুঠের হাত, আঙুল খসে গিয়ে শুধু পাতা দুখানি আছে। কোনক্রমে বুট পায়ে গলিয়েছি কিন্তু ফিতে বাঁধতে পারি না, প্যান্ট বুশশার্ট পরেছি কিন্তু বোতাম আটকাতে পারি না। ব্যারাকের শেষ মাথায় ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালিয়ে নায়েক গোলাম মহম্মদ হাত সেঁকতে সেঁকতে অপেক্ষা করে সামনে গিয়ে দাঁড়ালে বোতাম আটকে দেয়, দরকার হলে অম্লান বদনে বুটের ফিতেও বেঁধে দেয়। বিরাট গোঁফওয়ালা, গৌরবর্ণ গোলাম মহম্মদকে

তখন দাদার মতো লাগে। প্যারেডে রাইফেল হাত থেকে খসে পড়ে যায়। মহম্মদ শফি, স্কোয়াডকে দাঁড় করিয়ে খানিকটা ডবল আপ করায়, যদি তাতে রক্ত চলাচল বাড়ে। দুপুরে যখন খেতে আসি আঙুল তখনও অসাড় রুটি ছিঁড়তে পারি না। মেস-টিন ভরতি ধোঁয়া ওঠা গরম ডালে হাত ডুবিয়ে রাখি, একটু একটু করে সাড় আসে। শীতের দিনে এর মধ্যে আবার ছিপছিপ করে বৃষ্টি নামে। তখন জিমনাসিয়ামে লম্বা সময় ধরে ত্রিবাঙ্কোর-কোচিনের ওস্তাদেরা পি টি করায়। সব সময় চোখে পড়ে হাতের কাছেই নিরিবিলি ওয়েট ক্যানটিন। সেখানে সস্তায় রাম, হুইস্কি, ব্র্যান্ডি মেলে। দু-এক চুমুক ব্র্যান্ডি খেলেই শীত যায়, কিন্তু সেদিকে আমার বুদ্ধি খেলে না। তখন বিনি পয়সার সিগারেটই খাই না, তায় মদ!

ফৌজে যেমন পোশাকআশাকের বাহুল্য নেই তেমনি অভাবও নেই। কিন্তু তিন রকম শিরস্ত্রাণ থেকে তিন রকম পাদুকা- এত যে সরঞ্জাম তার মধ্যে কোনো রকম জাঙ্গিয়া বা ট্রাংক বা আন্ডারউইয়্যার নেই কেন? আজ ভেবেচিন্তে মনে হয়, সৈনিকবৃত্তিতে বর্মচর্মের, মুখে বীভৎস রং মাখার যেমন দরকার আছে তেমনি নিরস্ত্র উলঙ্গ হবারও একটা প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। প্রাচীন গ্রীকেরা বা নেটিভ আমেরিকানদের কোনো কোনো জাতি শেষ লড়াইয়ে যাবার সময় পুরো ন্যাংটো হয়ে যেত। তিন নম্বর কনস্ট্রাকশন গ্রুপে এসে দেখছি, এদের পোশাকের তালিকায় যেমন জাঙ্গিয়া নেই তেমনি সারি সারি পায়খানা ও স্নানঘরে কোনো দরজাও নেই, ইচ্ছে করেই রাখা হয় নি। আমার সন্দেহ হয় এই দুয়ের মধ্যে কোথাও একটা লুকনো যোগসূত্র আছে। পায়খানার ব্যাপারটাতে প্রথম প্রথম আমার খুব অসুবিধে হত- দরজা নেই, সমুখ দিয়ে সবসময় শৌচার্থীরা যাতায়াত করছে। শ্রীরামপুরের শশাঙ্কসুন্দর একদিন বলল– আ মোলো যা, আজ সকালে আমি টাট্টিতে বসেছি, এক ব্যাটা তেলুগু এসে সামনে ডাঁড়িয়ে রইল– আমি উঠলে সে বোসবে। আমি পোঁ পোঁ করে সিগারেট টানচি, সে কাঁচুমাচু হয়ে উড়িয়ে আচে। থাক ব্যাটা উঁ;াড়িয়ে। হঠাৎ দেখি, ও মা, লোকটা কোত্থেকে একটা সিগারেট বার। করে সোজা কাঁচে এসে হাত বাড়িয়ে বলচে তোড়া আগ দিজিয়ে।

এতকাল পরে আমার ইতিহাস-দর্শনের চিন্তা জাগে: আদি সমরবিশারদেরা হয়তো ভাবতেন, সৈনিকের আবার গোপনাঙ্গ কী! তার আছে জননাঙ্গ, রাইফেলের নলের মতোই যা সোজাসুজি তাক করা যায়। দেশ দখলের সময় ঐ দুই দিক থেকে আক্রমণ করলে তার ফল হয় মারাত্মক। অতএব ব্যারাকে দেহকে এমনভাবে রাখো যাতে সে লজ্জা ভুলে রহস্যহীন এবং হৃদয়হীন হতে থাকে।

.

স্নানের গল্প

টাট্টিখানার গল্প তো হল, এইবার গোসলখানার গল্প বলি।

আমাদের সারবাঁধা স্নানঘরগুলো সারা সকাল-দুপুর শুকনো খটখটে হয়ে খালি পড়ে থাকে। কিন্তু বিকেল যেই হল, রাইফেল জমা করে দিয়েই পাঞ্জাবী জাঠ মাদ্রাজী সারা ভারতবর্ষ তোয়ালে হাতে পড়িমরি করে ছোটে সেই দিকে, শাওয়ার দখল করতে। বেশিক্ষণ জল থাকবে না। ওদিকে ছটা বাজলেই বিউগল বাজবে, বিউগল বাজলেই ম্যালেরিয়ার মশারা বেরুবে। তখন ফুলপ্যান্ট, হাতা নামিয়ে বুশশার্ট এবং মোজা পরা বাধ্যতামূলক। অতএব সময়াভাবে অলস বাঙালিদের আর স্নান হয় না। অবশ্য ঐ বিধিবদ্ধ পোশাকে দেহটি মুড়ে স্নান করা যায়। কিন্তু তাতেও বাঙালিদের উৎসাহ নেই। সে যা হোক, ঐ দীর্ঘ গ্রীষ্মে এক সপ্তাহ স্নান না করে যখন আমাদের মাথার মধ্যে ভো ভোঁ মৃগতৃষ্ণিকা দেখা শুরু হয়েছে তখন একদিন আকস্মিকভাবেই মুশকিল আসান হয়ে গেল।

সেদিন সন্ধের পর রোল কল হয়ে গেলে আমরা পাঁচ-ছ জন সিনেমা হল, ক্যানটিন বা ক্লাবের দিকে না গিয়ে সদর বাজারের দিকে গিয়েছিলাম। পাশের ছোট গেটে সান্ত্রী কম, জিজ্ঞাসাবাদ কম, আলো কম। সদরে যাবার এই রাস্তাটা নিরিবিলি, পথের পাশে কয়েকটা গাছ অন্ধকারেও স্পষ্ট হয়ে আছে কেননা রাত হলেও মাটি, গাছপালা, বাড়িঘর, বস্তুজগৎ এত উত্তপ্ত যে তাপের একটা আভা পৃথিবী থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। আকাশেও

তারাগুলো বিবর্ণ– যেন পাতলা গ্যাস হয়ে আরো উপরে উঠে গেছে। যাবার সময় রাভির সেই বরফগলা জলের খাল পেরিয়ে চলে গেছি, তখন কিছু মনে পড়ে নি। কিন্তু ফিরবার সময় খালের সাঁকোটি পেরোতে গিয়ে হঠাৎ একজন দাঁড়িয়ে পড়ল দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমি দুটো ডুব দিয়ে নিই, বলেই সেই খালপাড়ের ভাঙের বনের আলোআঁধারিতে প্যান্টশার্ট জুতোমোজা খুলে রেখে লাফ দিয়ে জলে পড়ল। আর বলতে হল না। আমরা পাঁচজনেই এক মুহূর্তে যার যার জামাকাপড় খুলে ঝুপঝুপ করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আঃ! কী ঠাণ্ডা বরফগলা রাভির জল! মুহূর্তে শরীর জুড়িয়ে গেল।

খালটি গভীর নয়, কিন্তু প্রখরস্রোত। একটুও ঢেউ নেই, কিন্তু গা ছেড়ে দিলেই ভাসিয়ে নেয়। আমি ভাসতে ভাসতে ভাবছি একদিকে সূর্যের আগুনে পৃথিবী গনগন করছে অন্যদিকে চাঁদ বোধ হয় রাত্তিরে কোনো গোপন পাহাড়ের ফাটলে বসে বরফ তৈরি করেছিল রাভির এই খাল সেই বরফগলা জল বয়ে নিয়ে চলেছে। সেই হিমঠাণ্ডার গোপন নেশাটুকু আছে বলেই খালের দুই পাড়ে নিজে নিজেই ভাঙের বন সৃষ্টি হয়েছে।

এর পর থেকে আমরা রোজ সন্ধেবেলা সেখানে আসি। জায়গাটা এমনিতেই জনহীন, সন্ধের পর দু-একজন মাত্র লোক চলাচল করে। আমরা আনন্দে চেঁচামেচি করে স্নান করে গোপনে ফিরে যাই।

আমরা ভাবি জায়গাটা বুঝি জনহীন। ভুল ভাবি। একদিন রোজকার মতো চেঁচিয়ে মেচিয়ে গল্প করতে করতে চান করছি- হঠাৎ খেয়াল হল, খালের অন্ধকার তীরে সারি দিয়ে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে। অন্তত দশজন লোক। মনে হচ্ছে, তারা মন দিয়ে আমাদের কথা শুনছে। দু-একজন সিগারেট খাচ্ছে। আমরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছিলাম, লোকগুলোকে দেখে থমকে গেলাম। তাদের সামনে যে উপরে উঠে জামাকাপড় পরব তারও উপায় নেই। আমরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। পাড়ে উঠে আমরা কেউ কারো দিকে তাকাই না। কিন্তু এই ব্যাটারা তো তাকাবে। হয়তো ঐ আশাতেই এখানে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা খিস্তি করে করে গালাগাল মিশিয়ে এইসব কথা যখন উচ্চহাস্যে বলাবলি করছি তখন

একবারও সন্দেহ হয় নি যে এরা বাংলা বুঝবে। কিন্তু আমাদের খিস্তির তোড়ে আর থাকতে না পেরে একজন বলল, আইজ্ঞা আপনাদের মুখে বাংলা শুইনা এখানে একটু দাঁড়াইছি। কতকাল ভালো কইরা বাংলা শুনি না।

এই 'বাংলা' শোনার জন্য দশজন বাঙালি উদগ্রীব হয়ে খালপাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভেবে আমার লজ্জা হল। কিন্তু উত্তর কলকাতার ভটচার্জি ছিল হাজির-জবান মানুষ। সে বলল- মশাইরা, আমরা ন্যাংটো হয়ে শিশুর মতো এখানে চান করছি। আপনারা দয়া করে একটু পেছন ফিরে দাঁড়ান। আমরা উঠে পেন্টুলটা গলিয়ে নিই, তার পর আরো বাংলা শোনাব।

যা হোক, উঠে জামাকাপড় পরে উভয় দলে আলাপ হল। এদিকপানে কোথায় যেন একটা নতুন কারখানা হয়েছে। এই বাঙালি কারিগরের দল মাসখানেক হল কাজ নিয়ে দেশ থেকে এসেছে। এখানে এদের ভালো লাগছে না। কিন্তু উপায় নেই, পেটের জন্য থাকতে হবে। এরা নেহাত সাদামাটা, ছাপোষা শ্রমজীবী। আমাদের পেয়ে মহাখুশি। বলে চলেন, দুকানে বইসা একটু চা-পানি খাই। আমাদের বাঙালিত্ব এতদিনে অনেক ফিকে হয়ে গেছে। আমরা ভাবছি, এই দলটি যদি সন্ধেয় ফেরার পথে রোজ এই নাহারের পাড়ে এসে দাঁড়ায় তো আমাদের স্নানের দফা রফা।

.

ফৌজি পরিবার

সবাই বলে যত সব বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো ছেলেরাই এসে ঢোকে সৈন্যদলে। কথাটা মিথ্যে নয়। সৎ সুবুদ্ধি, সভ্য পরিবারেও কিছু ছেলে বেমানান হয়ে জন্মায় চোর ডাকাত আউটকাস্ট অঞ্চুতের মতো তারা ছিটকে বেরিয়ে যায় সমাজ থেকে। কিন্তু সবাইকে জায়গা। দেয় সৈন্যবাহিনী। সৈন্যবাহিনী একটি বিশাল একান্নবর্তী পরিবার। রান্নাঘর আলাদা হলেও র‍্যাশনে কোনো তফাত নেই। কেউ পাঠান-পাগড়ি, কেউ শিখ-পাগড়ি, কেউ মন্টগোমারি ক্যাপ, কেউ গোখা হ্যাট পরলেও ভিতরে ভিতরে সব সময় একটা জোরালো

পারিবারিক মেজাজ আর তেজ কাজ করে। এটা শুরু থেকেই টের পেয়েছিলাম। প্যারেডের ফাঁকে ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি- পাকাগোফ সুবাদার ঘামে ভেজা পিঠে একটু হাত বুলিয়ে চলে গেলেন। ইনস্পেকশনের জন্য সার বেঁধে দাঁড়িয়েছি মেজরকে নিয়ে বুড়ো কর্নেল এক এক করে দেখতে দেখতে সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার বুট যথেষ্ট চকচকে নয়, বুকপকেটের বোতাম খোলা- ওস্তাদের চোখ লাল হয়ে উঠেছে। কর্নেল স্নেহভরে নিজের হাতে বোতামটা লাগিয়ে দিয়ে পরের ছেলেটার সামনে পা বাড়ালেন।

এই পারিবারিক বন্ধন আরো টের পাওয়া যেত যখন আমরা বাইরে গিয়ে পুলিশ বা অন্য কোনো লোকজনের সঙ্গে মারামারি করে ফিরতাম। ক্যাপ্টেন বা মেজর, কোম্পানির দায়িত্বে যিনিই থাকুন না কেন, প্রথমেই খবর নিতেন আমরা মার খেয়েছি না দিয়েছি। মার দিয়ে এসেছি শুনলে খুশি এবং নিশ্চিন্ত হয়ে প্রথমেই অপরাধীদের লুকিয়ে ফেলতেন, তার পর অভিযোগ এমনভাবে অস্বীকার করতেন যাতে অসামরিক শাসনবিভাগ আমাদের টিকিটি না ছুঁতে পারে। বকাঝকা যা করা সে কেবল পরিবারের মধ্যে।

সৈনিকদের র‍্যাংকগুলির জন্য আর্মি আরো পারিবারিক সৌগন্ধে ভরে থাকত। ছোকরা লেফটেন্যান্টরা যেন রাঙাদা ফুলদা। ক্যাপ্টেনরা বড়দা, কখনো বা ছোটকাকা। মেজররা, কেন জানি না, সাধারণত একটু দূরের, কড়া ধাতের। আবার কর্নেল হলেন স্নেহশীল বড় জেঠু। তবু সবাই কি সমান? এর মধ্যেও ভালো, মন্দ, ধূর্ত এবং পাগলাটে, সাত্ত্বিক ও তামসিক সব রকমই ছিল। চোর, নৃশংসও ছিল।

এই পরিবার-স্পিরিট থাকার জন্যে মাঝে মাঝে খুব মজার ঘটনাও ঘটত।

সে সময় আমাদের কোম্পানিগুলিতে অন্তত ১০% লোক বিবাহিত ছিল। বাঙালিদের মধ্যেও অন্তত জনাচারেকের দারপরিগ্রহ করা হয়ে গিয়েছিল। তারাই দেখতাম প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে নিয়মিত চিঠি পায়, চিঠি লেখে। যে চিঠি যেত আর যে চিঠি আসত দুটোই অবশ্য খোলা, সেন্সর করা। আমাদের ব্যারাকের গৌরহরি মজুমদার বছর দুই আগে বিয়ে করেছে, তার পর পালিয়ে যুদ্ধে এসেছে। সেও সপ্তাহে সপ্তাহে চিঠি পায়। মজুমদার একটু

শুচিবায়ুগ্রস্ত লোক আমাদের থেকে একটু দূরে বসে খায়। ওয়াটার বটলে মুখ লাগিয়ে জল খায় না, আলগোছে খায়।

একদিন সন্ধেবেলা শোনা গেল, মজুমদার কি যেন অপরাধ করেছে। কলকাতা থেকে নালিশ এসেছে। কাল তাকে অফিসার কমান্ডিংয়ের কাছে পেশ করা হবে। কি অপরাধ মজুমদারও জানে না, আমরাও জানি না। পরদিন আমরা প্যারেডে চলে গেলাম। মজুমদার বলির পাঁঠার মতো ব্যারাকে থেকে গেল। পেশ হওয়া মানেই নিশ্চিত শাস্তি। বিকেলে ধূলিধূসর আমরা ব্যারাকে ফিরে দেখি মজুমদার ঘুমিয়েটুমিয়ে তেল চুকচুকে টুবুটাবু হয়ে তার চারপাইতে বসে চা খাচ্ছে।

-কী হল, কী হল, মজুমদার?

আমাদের কৌতূহল দেখে মজুমদার তারিয়ে তারিয়ে তার গল্পটি বলল। ব্যাপার হল, তার বউ তাকে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই চিঠি দেয়, সেও প্রথম প্রথম তার উত্তর দিয়েছে, এখন মাস তিনেক হল নীরব হয়ে আছে। তার ভালো লাগে না। সারা দিনের এই হাড়ভাঙা খাটুনির পর প্রেমপত্তর লেখা অসম্ভব। চিঠি না পেয়ে পেয়ে বউ কাকুতিমিনতি করে চিঠি লিখত, শেষে রেগে গিয়ে এখন অফিসার কম্যান্ডিংয়ের কাছে নালিশ করেছে।

মজুমদার পেশী হয়ে সামনে দাঁড়ালে বউয়ের নালিশের চিঠি হাতে নিয়ে মেজর বললেন, ‘তুমি নববিবাহিত? পত্নীর চিঠির জবাব দাও না? তিন মাস ধরে চিঠি না লিখে পত্নীকে দুর্ভাবনায় রেখেছ? এর কারণ দর্শাও।

–আজ্ঞে সময় পাই না।

–সবাই সময় পায়, তুমি পাও না?

–‘আজ্ঞে পাঁচটায় উঠে টাট্টিখানায় যাই, ফিরে এসে হাজামৎ করি, বিছানা ভাঁজ করি, পোশাক পরি, বুট পরি, হোলস্টারের বাকস্ আঁটি, চা খেতে যাই, কোট থেকে রাইফেল নিই।

তার পর প্যারেড. .. সাঁতার, .. ক্লোজ কমব্যাট. ..'।

-'চোপ রও'। মেজরের দগদগে ঘামাচিভরা লাল মুখ আরো লাল হয়ে উঠল। নিচের পাটির সোনা বাঁধানো দাঁতটা ঝিলিক দিল 'আমি কোনো অজুহাত শুনতে চাই না। একজন ভদ্রমহিলা, ঘটনাচক্রে তিনি তোমার স্ত্রী, স্বামীর অবিবেচনায় কষ্ট পেয়ে প্রতিবিধান চেয়েছেন। ছি ছি! তোমার মতো লোকের জন্যই সেনাবিভাগের বদনাম। কত সময় চাই তোমার চিঠি লেখার জন্যে?

-আজ্ঞে ভালো করে লিখতে গেলে একটু সময় তো লাগবেই।

-ঠিক আছে, দু দিন তোমার ডিউটি অফ। পরশু ঠিক এই সময়ে এসে আমার হাতে চিঠি দেবে, আমিই পোস্ট করে দেব। আর শোনো, এর পর থেকে প্রত্যেক ফর্টনাইটে তোমার অর্ধদিবস ছুটি- প্রত্যেক ফর্টনাইটে তুমি চিঠি লিখবে। তোমার স্ত্রীর কাছ থেকে দ্বিতীয় বার নালিশ এলে তোমাকে কোয়ার্টার গার্ডে ঢুকতে হবে। ডিসমিস।

ঘটনা শুনে আমরা হেসে বাঁচি না– সাদামাটা গৌরহরি তো কম না।

রাঙামাটির সার্ভে স্কুল থেকে আসা ময়মনসিংহের গুপাল বলল- 'গৌরহরিদা, তুমি মেজররে এমন বুকা বানাইলা।

গৌরহরি বলল– 'আমি মেজরকে বানাব বোকা? আসলে উনিই আমাকে বোকা বানিয়েছেন। সব বুঝেছেন উনি হয়তো তখন খুব মুডে ছিলেন।

ফচকে ছোঁড়া সুলতান বলল- 'উনি, তেনি গৌরহরিদা, তোমার খুব ভক্তি দেখতাছি মেজরের উপর।

-শোন্ সুলতান, ডিসমিস বলার সঙ্গে সঙ্গে মেজর কি করলেন জানিস? আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মুচকি হেসে বাঁ চোখ খোলা রেখে ডান চোখ বন্ধ করলেন।

-তোমাকে চোখ মারলেন?

–তবে আর বলছি কি।

.

রাস্তায় রাস্তায়

ছুটির দিনের বিকেলে শহরের রাস্তায় না গিয়ে, আমার ভালো লাগত, তার উলটো রাস্তায় হেঁটে হেঁটে যদ্দ্র পারা যায় চলে যেতে। আমাদের ছাউনিকে লম্বালম্বি দু ভাগ করে পাকা রাস্তার মাথার দিকটা গেছে নাহারের পুল পেরিয়ে, সদরের দোকানবাজার পেরিয়ে শহরের দিকে আর ল্যাজটা নেমে এসেছে বি ও আর ক্যাম্প ও কারখানা ছুঁয়ে ধূ ধূ করা গমখেতের মধ্যে।

একদিন সেই বিস্তীর্ণ পাকা গমখেতের পাশ দিয়ে চলেছি। বিকেলের নির্জন রাস্তা। হঠাৎ দেখি এক লম্বাচওড়া ব্রিটিশ মেজর আসছে আরো ভিতরের দিক থেকে। এখানে তো এরা সাধারণত আসে না। এই সাহেব কি বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়েছিল নাকি? যাক গে। কিন্তু আমি পেরিয়ে যেতেই লোকটা আমাকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাকল- ‘তুমি স্যালুট না করে যাচ্ছ কোথায়?’

এমন চমৎকার বিকেলবেলা এ কী ঝঞ্ঝাট! লোকটা আর আমি গোলাইয়াথ আর ডেভিডের মতো গমখেতের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। আমি বললাম- ‘দুঃখিত, স্যার। আমি আনমনা ছিলাম, খেয়াল করি নি।

–আচ্ছা যাও, ঠিক আছে।

আমি পিছন ফিরতেই মেজর আবার ডাকল– কি হল? তুমি এবারও যে স্যালুট করে পালাচ্ছ?

'দুঃখিত, স্যার। এবার আমি পথের মধ্যে খট করে গোড়ালি ঠুকে স্যালুট করে অ্যাটেনশনে দাঁড়ালাম। প্রত্যুত্তরে মেজরও আমাকে বাকায়দা স্যালুট করল। তার পর যোগ করল 'বৎস, তুমি আমাকে স্যালুট করছ না, স্যালুট করছে এই এঁকে। মেজর নিজের কাঁধের এমব্রয়ডরি করা ক্রাউনটিতে আঙুল রাখল। তার পর মুচকি হেসে চোখ টিপল। ভাবখানা যেন, দ্যাখো, পথিমধ্যে কেমন একখানি অর্থহীন ফৌজি নাটক অভিনীত হল। আমি আবার গোড়ালি ঠুকে স্যালুট দিয়ে অ্যাবাউট টার্ন করে নিজের পথে চললাম।

.

সদরবাজারে ঢোকার শুরুতে ডানহাতি আরেকটা নতুন ফাঁকা রাস্তা অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। একদিন অপরাহ্নে সেই পথে যেতে যেতে দেখি, একটা জায়গায় খোড় চালের কুঁড়েঘরের দোকানগুলি আস্তে আস্তে বেশ জমে উঠেছে। রাস্তার পাশে মাটিতে চাটাই আর কাপড় পেতে স্তূপ করে আঙুর বিক্রি হচ্ছে। ছ আনা করে সের। এক এক স্তূপে কয়েক মন করে আঙুর। পাকা টসটসে আঙুর, নিজেদের চাপে নিজেরা ফেটে গিয়েছে, রস গড়িয়ে নেমেছে রাস্তায়। মাছি ভনভন করছে। এক সের কিনলে জোর করে এক পো ফাউ দিয়ে

দেয়। পর পর এইরকম স্তূপ স্তূপ আঙুরের দোকান। মাঝে মাঝে আখরোট কিসমিস শুকনো ফলের দোকান। সে বেসাতিও মাটিতে পাতা। এইসব খোলা দোকানের পরে দুধের দোকান বিশাল কড়াইয়ে দুধ জ্বাল পেয়ে পেয়ে ঘন হচ্ছে, পুরু করে সর পড়ছে। বিরাট কাঁচের গ্লাসে চিনি দেওয়া মালাই দুধ তিন আনা করে বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু তবু দোকানের তুলনায় খদ্দের কম। ফাঁকা জায়গায় বিকেলের আলো আর তেরচা রোদ, আঙুরের গন্ধ, দুধের গন্ধ, পাগড়ির রং, সাদাকালো দাড়ি, টাকাপয়সার দেনাপাওনা আর বাতাসে ভেসে যাওয়া কথাবার্তার সোরগোল মিলিয়ে একটুকরা বিদেশ তৈরি হয়েছে।

একদিন সন্ধ্যায় সদরবাজারের কাছাকাছি এসে একটা সত্যিকারের চমক লাগল। রাস্তার পাশে এক মাঝবয়েসী শিখ মাটিতে কিছু পত্রিকা সাজিয়ে বসেছে। অন্ধকার হয়ে গেছে। দোকানী একটি কারবাইডের আলো জ্বালিয়েছে। উর্দু আর গুরমুখী পত্রিকার মধ্যে একখানা ছিল পুজাসংখ্যা যুগান্তর। আমি নিচু হয়ে বসে কারবাইডের আলোয় পাতা ওলটাতে লাগলাম। পাতা ওলটাতে ওলটাতে মনের পিছনে চলচ্চিত্রের ফিতের রিল যেন কিরকির করে ঘুরে চলে: কলকাতায় কি এখন পুজো হচ্ছে, না কি হয়ে গেছে? এটা কি মাস? শরতের দিন বলেই বোধ হয় আজ বিকেলে আকাশ তত প্রখর ছিল না। আলোর রঙেও কেমন একটা গোলাপী আভা মিশে গিয়েছিল।

পত্রিকাটি বগলদাবা করে আমি ব্যারাকে ফিরলাম। সেই সংখ্যাটিতে ছিল কালীকিংকর ঘোষদস্তিদারের প্রচুর ইলাস্ট্রেশন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প তেলেনাপোতা আবিষ্কার সেই সংখ্যাতেই বেরিয়েছিল। গল্পটার জন্যেই কাগজটাকে মনে আছে, দিনটাকেও মনে আছে।

.

খাওয়াদাওয়ার গল্প এবং জাদুঘর

অগ্রহণীয় কুখাদ্য গলাধঃকরণ করে আমার ফৌজি জীবন শুরু হয়েছিল। কিন্তু সে কদিন মাত্র। তার পর থেকে খাদ্যের ব্যাপারে সুখেই ছিলাম। বরং কখনও কখনও এমনও মনে

হয়েছে, বুঝি দেশের লোককে ফাঁকি দিয়ে আমাদের ভালো ভালো জিনিস খাওয়ানোনা হচ্ছে।

লাহোরে আমাদের বিরাট ছাউনিটি ছিল চওড়া রাস্তার এপারে ওপারে দু ভাগে ভাগ করা। দুটি ভাগই স্বয়ংসম্পূর্ণ। পৌঁছবার পর প্রথম যে-ভাগে আমার ঠাঁই হল সেখানে লঙ্গরখানা ছিল চারটি হিন্দু, শিখ, মুসলমান এবং দক্ষিণী লঙ্গরখানা। হিন্দু শিখ মুসলমান রান্নাঘরে মোটামুটি একই ধরনের পাঞ্জাবী রান্না হত– লার্ড মাখানো রুটি, ঘন ডাল, পরিচ্ছন্ন সবজি, সুস্বাদু মাংস। ছুটির দিনে পায়েস বা হালুয়া, এবং বিকেলে প্রায়ই শুকনো ফল। দক্ষিণী কিচেনে রুটির পাট নেই সকালসন্ধ্যা শুধুই ভাত। ভাত, সম্বর, ডাল, রসম, জোলো দই, মাংস- সব দক্ষিণী খাদ্য। দক্ষিণীদের ভাত না দিয়ে উপায় নেই। ওরা হাসতে হাসতে বলত- ‘চাবল ইল্লে তো প্রেড ইল্লে। অর্থাৎ ভাত নেই তো প্যারেডও নেই।

পাঞ্জাবীদের মধ্যে মাছ খাবার তেমন চলন নেই। র‍্যাশনে কাঁচা মাছ কখনই আসত না, টিনের মাছ আসত সার্ডিন, ম্যাকরল। মুসলমান লঙ্গরে গোমাংস আসত কিনা জানি না। তবে, ওদের মাংসের স্বাদ-গন্ধে একটা অন্য আভিজাত্য ছিল। স্থানীয় সরবরাহ ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া থেকে শুকনো মাংস আসত। একদিন ভাড়ার ঘরে ঢুকে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম ছালছাড়ানো, নাড়িভুড়ি বার করে নেওয়া একটা শুকনো ছাগল আংটায় ঝুলছে ছাগলটার আকার টাটুঘোড়া কিংবা একটা পূর্ণবয়স্ক নীলগাইয়ের সমান। সেই বন্ধ ঘরে, অপ্রাণ আটা ডাল নুন লঙ্কার বস্তার পিরামিড গন্ধের মধ্যে তার বিশাল শুকনো শরীরে তার প্রাণীত্বের স্মৃতি যেন তখনও রয়ে গেছে।

মাস দুয়েক পরে আমাদের প্ল্যাটুন রাস্তার ওপারে ৬ নং হোল্ডিংয়ে বদলি হল। এখানেও চারটে লঙ্গরখানা, তিনটি উপাসনালয় ইত্যাদি। ৬ নং হোল্ডিংয়ে এসে প্রথম দিনই আমার এক বিপত্তি হল। নতুন ব্যারাকে চারপাই বাক্স কিটব্যাগ গুছিয়েটুছিয়ে চানটান করে হিন্দু লঙ্গরখানায় খেতে গেছি। এখানে কেউ আমাকে চেনে না। কিচেনের ইন-চার্জ বলল- “তুমি

তো দেখছি মুসলমান। এখানে তো খেতে পাবে না। তুমি মুসলমান লঙ্গরে যাও। বুঝলাম, দাড়ি দেখে সে ভুল করেছে।

তখন দুপুর ঝাঁ ঝাঁ করছে। খিদেও পেয়েছে খুব। আমি কথা না বাড়িয়ে মুসলমান রসুইখানার দিকে চললাম। কিন্তু সেখানে কেউ কেউ হয়তো আমাকে চিনত, তারা বলল, আরে এ তো হিন্দু, এখানে খাবে কি করে?

আমি বললাম, তাহোক গে, আমি তোমাদের সঙ্গেই খাব।

– আরে, তা কি হয়! ওরা তোমার র‍্যাশন ড্র করেছে। কোনো অসুবিধে হবে না, তুমি ওখানেই চলে যাও।

আমি আবার ফিরে চললাম হিন্দু পাকশালায়। গাট হয়ে বসে বললাম, চালাকি করার চেষ্টা কোরো না। আমি হিন্দু– বোনাফাইডি হিন্দু। আমি এখানেই খাব। দরকার হলে সন্ধেবেলা পে-বুক এনে দেখিয়ে দেব।

এবার কেউ আর আমাকে ঘাঁটাল না। একটু মুচকি হেসে, নিজেদের মধ্যে তাকাতাকি করে বিনা বাক্যে খেতে দিল।

কদিন গেলে ৬ নং হোল্ডিংয়ে আমাদের সন্ধেবেলায় খাওয়াটা হয়ে দাঁড়াল যাকে বলে আন্তধর্মীয় মহাভোজ। ধর্মভেদের জন্য আমরা হিন্দুরা হিন্দু লঙ্গরখানায় যাই আর সুলতান মমতাজ রহমানেরা যায় মুসলমান রসুইখানায়। দিনের বেলায় যেমন-তেমন, কিন্তু বিকেলে দুই হেঁশেল থেকে খাবার নিয়ে আমরা দুই দলই একটি শিশু গাছের নিচে ঘাসের উপরে এসে বসি। দুই হেঁশেলের খাবার ভাগাভাগি করে, আড্ডায় মজে, হাসিঠাট্টা করতে করতে রাতের খাওয়া যখন শেষ হয় তখন পশ্চিমের আকাশে সূর্য ডুবে গেলেও সারা আকাশ জুড়ে তার আভা ভেসে আছে। ঐটুকু সময়ের জন্যে ঐ দূর বিদেশের গাছতলায় ফরিদপুর

নোয়াখালি হুগলি খুলনার এক বাংলাদেশ বানিয়ে নিয়ে আমরা পরম সুখে আমাদের বাঙালিত্ব উপভোগ করি।

কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের হোতা পাঞ্জাবী মুসলমানেরা আমাদের ঐ প্রতিদিনের সুখটুকুকে বক্রচোখে দেখল। তারা আমাদের ফরিদপুর নোয়াখালির মুসলমানদের বোঝাল, তাদের মতো এমন আপনজন থাকতে ওরা কেন হিন্দুদের সঙ্গে বসে খাবে। এই মন্ত্রণায় ফল ফলল। একদিন দেখলাম, সুলতান রহমান মমতাজউদ্দীনেরা আর বিকেলে মেস-টিন হাতে শিশু গাছটির তলায় এল না।

আমরা ব্যাপারটা বুঝেছিলাম। সুতরাং কেউই কাউকে কোনো প্রশ্ন করি নি। কিন্তু সাত দিনের মধ্যে ওরা আবার ফিরে এল। এসে নিজেরাই সব বলল- 'হালার পো হালা পাঞ্জাবীরা এই কয়, ওই কয়। কয়, হিন্দুর লগে খানা খাও ক্যান? হালাগো ভাষা বোঝা যায় না। কয়দিন বৈকালের খাওয়াটাই নষ্ট হৈল। কয়েকটা মুখভার বিকেলের পরে সেদিন ফরিদপুরের বাংলা আর শ্রীরামপুরের বাংলা মিশে গিয়ে খুব হাসাহাসি হল।

সাতাশ বছর পরে ঐ ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হল। এবারেও, ভাষার মিল ছিল না বলে বাঙালি মুসলমানেরা ওদের ছেড়ে এল। কিন্তু এবার তারা ফিরে আর আমাদের কাছে আসে নি। কারণ আমরা কাছাকাছি কোথাও ছিলাম না।

এবার একটা মজার গল্প বলি। একদিন শোনা গেল মচ্ছিখোর বাঙালিদের জন্য আজ দারুণ খবর, বাঙালিদের সম্মানে আজ হিন্দু লঙ্গরে ইলিশ মাছ এসেছে, ডিনারে খাওয়ানো হবে।

সমুদ্র থেকে এত দূরে ইলিশের আগমন এক অলৌকিক ব্যাপার। পাঞ্জাবীরা কোনোদিন সেই বিখ্যাত মাছ চোখে দেখে নি। আজ নামডাক শুনে তাদেরও মনে একটা আশা তৈরি হয়েছে, যেন কি না কী খেতে পাবে। কিন্তু খেতে গিয়ে মেস-টিনে যখন সেই মাছ পড়ল তখন আমরা বাঙালিরা সবাই থ হয়ে গেলাম। চমৎকার চ্যাপটা এক এক হাত লম্বা,

রুপোর আঁশে মোড়া আস্ত মাছগুলোকে আড়াআড়ি মাঝখান দিয়ে কেটে লার্ড আর নুন-হলুদের জলে সেদ্ধ করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আঁশ ছাড়ানো হয় নি, কানকো ফেলা হয় নি, পোঁটা গালা হয় নি। প্রত্যেকের ভাগে আধখানা মাছ কেউ মুড়োর দিক, কেউ লেজার দিক। ইলিশের দুর্গতি দেখে আমাদের কান্না পেল। বাঙালি পাঞ্জাবী নির্বিশেষে সবাই সে মাছ থু থু করে ফেলে দিল। মচ্ছিখোর বাঙালিদের দিকে বাকি লঙ্গরখানা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাল। আর র‍্যাশনের ইন-চার্জ, যিনি অতি কষ্টে ঐ দশ ক্রেট মাছ জোগাড় করেছিলেন, মনোদুঃখ উড়িয়ে দিয়ে ঘোষণা করলেন- আমি শিগগিরি আবার দশ ক্রেট মাছ আনছি, এবং এবার বাঙালি কায়দায় রান্না করে খাওয়াব।

সত্যিই পরের সপ্তাহে সেই মাছ এল। এবার কজন করিতকর্মা বাঙালি জুটে গেল। তারা গিয়ে সদর থেকে মেয়েদের ডেকে এনে মাছ কোটাল। লার্ডের বদলে সরষের তেল, সরষে আর কাঁচা লঙ্কা আনা হল। রান্নার কাছে দুজন দাঁড়িয়ে রইল। ইলিশ মাছ ভাজা আর ইলিশের ঝাল হল। শুধু বাঙালিদের জন্য সেদিন ভাতও হল। সবাই বাঙালি রান্না খেয়ে মহা খুশি। সংস্কৃতিক্ষেত্রে এক সপ্তাহ আগে যে গৌরব আমরা হারিয়েছিলাম তা আবার ফিরে পাওয়া গেল।

তবু তখন থেকেই, অগোচর বিধাতার মতো উঁচু মহলে বসে কেউ হয়তো আমাদের হেনস্তা করার ষড়যন্ত্র আঁটত।

আমাদের সিনেমা হলে সন্ধে থেকে নাগাড়ে ফিল্ম দেখানো হয় বেশির ভাগই উর্দু, হিন্দি এবং কৃচিৎ ইংরেজি। একদিন শোনা গেল, বাঙালিদের জন্য বাংলা ছবি এসেছে। ফিল্ম আরম্ভ হলে দেখলাম, ফিল্মের নাম: চিনাবাদাম চাষের পদ্ধতি। পরিচালকের নাম দেবেন্দ্রনাথ মিত্র।

যা হোক, আমাদের যে এত গুণ, দেশে থাকতে তা জানতাম না, এখানে এসে টের পেলাম। আর্যাবর্তে জনশ্রুতি আছে- বাঙালি খুব আলমন্দ, দুবলা-পাতলা হলেও বেপরোয়া সাহসী এবং বাঙালি জাদু জানে।

ফৌজি ছাউনিতে সবচেয়ে প্রিয় দুই বাঙালি ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং পঙ্কজকুমার মল্লিক। হিন্দু মুসলমান শিখ সবাই একবাক্যে নেতাজীকে বীরশ্রেষ্ঠ এবং আপনজন বলে মেনে নিয়েছিল। তাঁর অন্তর্ধান রহস্যকেও ওরা বাঙালির বুদ্ধিমত্তা তথা জাদুবিদ্যা দিয়ে ব্যাখ্যা করত।

ফৌজিদের মধ্যে নেতাজীপ্রীতি না হয় বুঝলাম, কিন্তু পঙ্কজকুমার মল্লিক? ওরা বলত, পঙ্কজ মল্লিকের মতো গাইয়ে হিন্দুস্তানে আর কে আছে? আহা কী গান অ্যায় দর্দভরি দিলকী আওয়াজ সুনায়েংগে।

বাঙালিদের আরেকটা পরিচয় রাখা আছে লাহোর জাদুঘরে। মিউজিয়ামের ছবির সংগ্রহে বাংলা স্কুলকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। গ্যালারিতে পর পর প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, সারদা উকিল, বরদা উকিলের কয়েকখানা করে মৌলিক ছবি দেখে যুগপৎ খুশি এবং অবাক হয়েছিলাম।

তবে লাহোর মিউজিয়ামে সবচেয়ে দর্শনীয় বস্তু ছিল মোগল এবং রাজপুত বীরদের অস্ত্র ও বর্ম। মোগল-পাঠানদের লম্বা তলোয়ার, বেঁটে তলোয়ার, নানা মাপের ছোরা, কোমরে গোঁজার খঞ্জর। তলোয়ারের কত রকমের ভঙ্গিমা, ছোরার কত রকম কুটিল বক্রতা! আমীর, ওমরাহ, সম্রাটদের তলোয়ার ও ছোরার বাঁটে চমৎকার অলংকরণ ও মূল্যবান পাথর বসানোআফগানদের গাদা বন্দুকগুলো ছিল অত্যন্ত লম্বা। রাণা প্রতাপ সিংহের ব্রেস্ট প্লেট, আর্ম প্লেট ও তলোয়ার দেখে রোমহর্ষ হয়– উনি কি মানুষ ছিলেন না দৈত্য! কবাটবক্ষ সেই যোদ্ধার বর্মের মধ্যে আমার মতো তিনজন ঢুকে যেতে পারে।

বর্মগুলির আবার কতরকম কৃৎকৌশল- মাছের আঁশের মতো ছোট ছোট ইস্পাতের পাত জুড়ে জুড়ে বানানো, ইস্পাতের তারে জালি গেঞ্জির মতো বুননো, বুক পেট ও পিঠের মাপে টুকরো টুকরো লোহার পাত খিল করে জুড়ে দেওয়া। মানুষের কতরকমের যে উদ্ভাবনী শক্তি এবং প্রয়োজন। আর, এত অক্লান্ত উদ্ভাবনী শক্তি আছে বলেই এত উলটোপালটা প্রয়োজন।

.

হীরা মণ্ডি

শহরের মধ্যে জমজমাট রেডলাইট এরিয়ার নাম ছিল হীরা মণ্ডি। মণ্ডি মানে বাজার। হীরা মালিনীর বাড়ির মতো 'ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার চৌদিকে মালঞ্চ ঘেরা' একেবারেই নয়। প্রাচীন মোগল আমলের ঘিঞ্জি জায়গা পুরনো চিতপুরের গলির মতোই সরু গলি। ছুটির দিনের দুপুর খানিকটা ঢলতে না ঢলতেই সেখানে বেচাকেনার ভিড় লেগে যায়।

রবিবার ছুটির দিন। ভালো করে চানটান করে, খেয়েদেয়ে, ফিটফাট হয়ে ক্যান্টনমেন্টের সৈন্যেরা হীরা মণ্ডির দিকে ছোটে। ছাউনি থেকে একটু এগোলেই সেদিন প্রচুর টাঙ্গা। টাঙ্গাঅলাদের মধ্যেও যেন জোশ এসে গেছে ঘোড়া আর সওয়ারি দুই-ই টগবগ করছে। সওয়ারি তুলেই টাঙ্গাঅলা ঘোড়ার পাছায় শপাং করে ছিপটি মারছে তেজে টাঙ্গা ছুটছে। মনে হচ্ছে যেন মহাভারতের রথ, রথী আর সারথিদের অজস্র টুকরো চলচ্ছবি খর রোদে, হলদে ধূমল আকাশের নিচে নারীহরণ কিংবা নারীমৃগয়ায় চলেছে বীরের দল।

অনেকেই যায়। একদিন আমিও টাঙ্গায় সওয়ারি হয়ে চলে গেলাম। গিয়ে দেখি সে এক বিরাট ব্যাপার। মেয়েরা সব একেকজন একেকটি খুপরি নিয়ে রয়েছে, তাদের দোরের সামনে খদ্দেরদের লাইন পড়েছে সিপাহি, হাবিলদার, জমাদার সবাই আছেন। লাইন ক্রমশ অবিশ্বাস্য রকম লম্বা হচ্ছে। গলির এ মাথায় ও মাথায় সুঠামদেহ মিলিটারি পুলিশ জিপ থেকে নেমে টহল দিয়ে যাচ্ছে। সৈন্যদের লাইন স্বভাবতই নিখুঁত নিয়ন্ত্রিত কেউ হুড়োহুড়ি করছে না, আগে-পিছে যাবার চেষ্টা করছে না। কোথায় আর ঘুরব? আমিও একটা লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দাঁড়িয়ে লক্ষ করলাম একজন করে লোক ঢুকছে- খানিক পরেই লোকটি প্যান্টের বোতাম আঁটতে আঁটতে বেরিয়ে আসছে। পরমুহূর্তেই মেয়েটি দরজায় এসে দাঁড়াল, ঐটে হল সংকেত এবার পরের লোকটি ঢুকল। এইরকম ক্রমাগত চলতে লাগল।

আমি যার দোরে লাইন দিয়েছিলাম সে মেয়েটি বেশ বড়সড় চেহারার, বোধ হয় পাঠান কিংবা পাঞ্জাবী। কয়েকজন লোক যাওয়া-আসার পর তার চুল এলোমেলো হয়ে বিনুনি লটপট করতে লাগল, ঠোঁটের গাঢ় রঙ মুছে গেল, এখন সে বুকের দোপাট্টা ছাড়াই দরজায় দেখা দিচ্ছে। এদিকে লাইনের লোকগুলো বার বার তাকে দেখে, তার আলুথালু চেহারা দেখে ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছে। লোকগুলো ঘরে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে, থাকবার সময় ক্রমশ কমছে, আর মেয়েটা ক্রমশ আরো বেপরোয়া হয়ে উঠছে। দুই হাত তুলে পালোয়ানের ভঙ্গি করে যেন ডাকছে চলে আও। তার রোখ চেপে গেছে। দ্রুত, অতি দ্রুত টাকা কামাচ্ছে সে। লাইনের একটা লোককেও আজ সে ফিরে যেতে দেবে না। আমার সামনের লোকটি আমার চেয়ে ইঞ্চি ছয়েক লম্বা। কালো টুপির নিচে তার ফরসা ঘাড় দেখছি, তার কানের লতি চুনির মতো টকটকে লাল। দোরগোড়ায় পৌঁছবার আগেই আমি টুপ করে লাইন থেকে খসে প্রত্যুৎপন্নমতি মাছটির মতো সরে পড়লাম।

যখন ব্যারাকে ফিরলাম তখন অন্ধকার হয়ে গেছে, তারা উঠেছে, একটু হাওয়াও দিয়েছে। একটা নতুন কালোকোলো রোগা চেহারার বাঙালি ছেলে ব্যারাকে বসে মিটিমিটি হাসছিল আর তার কীর্তি ফলাও করে বলছিল সে হীরা মণ্ডিতে প্রায়ই যায়, আজও গিয়েছিল। আমি গলির দৃশ্য একটু আগে দেখে এসেছি, এবার তার বর্ণনায় ঘরের ভিতরের দৃশ্য দেখতে পেলাম। খদ্দের ঢোকামাত্র মেয়েরা আর সময় বা বাক্য ব্যয় করে না হাত বাড়িয়ে প্রথমেই টাকাটা নিয়ে নেয়, টাকাটা বাক্সে ভরারও ফুরসত নেই, বালিশের নিচে মুদ্রাগুলি ঠেলে দিয়েই পট করে সালোয়ারের ফিতে খুলে ফেলে। ঢিলে সালোয়ার ঝপ করে পায়ের কাছে পড়ে যায় এবং সে একটানে কামিজটা খুলেই চিত হয়ে শুয়ে পড়ে। বাঙালি ছেলেটা পুরোটাই লক্ষ করেছিল। সেও বিনা বাক্যে মেয়েটার উপর শুতে শুতেই হাত চালিয়ে দেয় বালিশের নিচে। ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক ওঠা নামায় মেয়েটা কিছু বুঝতে পারে না। দু মিনিট পরে আমাদের খদ্দেরটি যেটুকু দিয়েছিল তার চেয়ে বেশি নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়।

ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক। ঝিক ঝিক ইউ এস মেরিনদের মধ্যে খুব চালু শব্দ, যার অর্থ স্ত্রীপুরুষসঙ্গম। শব্দটি শুনতে মিষ্টি, যদিও আমেরিকান সৈন্যগুলো এইসব ব্যাপারে মহা

হতচ্ছাড়া। একবার কর্মব্যপদেশে এক জায়গায় গিয়ে দেখি কতগুলো আমেরিকান সৈন্য একগোছা ফোটোগ্রাফ নিয়ে মজা করছে। কি ব্যাপার? ফোটোগুলি কয়েকটা চীনে মেয়ের, মেয়েগুলোকে পুরো উলঙ্গ করে নানা ভঙ্গিতে তোলা, আর সব ছবিতেই, কী বিচিত্র, ওদের যোনিগুলি লম্বালম্বি নয়, আড়াআড়ি। ব্যাপারটা আরো বীভৎস কেননা কোনো কোনো মেয়ে আবার সে জায়গাটা দু আঙুলে টেনে দেখাচ্ছে। মেয়েগুলো সত্যি, কিন্তু আসল দ্রষ্টব্যটি ক্যামেরার কৌশল।

লোকগুলো এবার আমাকে নিয়ে পড়ল। এই দ্যাখো, চীনে মেয়েদের সুনু আমাদের মেয়েদের মতো ভার্টিকল না, হরিজ। ঠিক কিনা বলল। ক্যামেরা তো আর মিথ্যে বলতে পারে না! হোঃ হোঃ চীনে মেয়েদের সুনু হরিজনট।

মুক্ত নাগরিক আর ছাউনিবাসী সৈনিকদের মিথুনজীবনের তফাত আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যুদ্ধের সময়। অসামরিকদের শান্তির জগতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক সংসারস্বপ্নের, সন্তানস্বপ্নের যেন প্রথমে মধুর লিরিক এবং পরে বিশাল মহাকাব্য জড়িয়ে আছে দুজনকে। যুদ্ধের সৈন্যেরা এই জীবনের একেবারেই বাইরে। একমাত্র প্রাণের ভয়ে বা পেটের খিদেয় বাধ্য না হলে মেয়েরা সৈন্যদের কাছে যায় না কারুর সঙ্গে কারুর বন্ধন তৈরি হয় না, ভালোবাসা তৈরি হয় না। তবু কখনো কখনো একটা বেদনাসন্ধি, একটা ক্ষতমুখ তৈরি হয় নিকষ সন্ধ্যায় বুকফাটা রক্তমেঘের মতো কোনো সৈনিককে দেখে সহসৈনিকেরা হয়তো টের পায়।

ফৌজিদের এই ব্যথার কথা আমি অন্য দিক থেকে এবার একটু বলার চেষ্টা করি। রেল স্টেশনের মেইন লাইন থেকে নিভৃত একটা ট্রাক টেনে আনা হয়েছে একেবারে আমাদের ছাউনির কিনারে। সেখানে একটা নিরিবিলি প্ল্যাটফর্ম। সেই প্ল্যাটফর্ম এমনিতে অব্যবহৃতই পড়ে থাকে, শুধু সৈন্যদল যখন ফ্রন্টে যায় তখন তাদের নিয়ে সেখান থেকে স্পেশাল ট্রেন ছাড়ে। এটা সম্মান, হয়তো খানিকটা আদরও। যারা রইল তারা বিদায় দিতে আসে- একফেরতা ফুলের মালা পরায়, মুহ মিঠা করায়। জায়গাটায় কয়েকটা বড় বড় শিমুল গাছ, শিশু গাছ, কাঁটাগাছ সবুজ পাতার নিচ দিয়ে খাকি পোশাক পরা লোকগুলো মচমচ করে

যায়, বাদামী বা ছাইধূসর রঙের কামরায় ওঠে। কিট ব্যাগ গুছিয়ে রাখে। তাদের সঠিক গন্তব্য কোথায় তখনও তারা জানে না। পোশাকের তখন দুটো মাত্র রং খাকি আর জলপাইসবুজ। খাকি পরা সৈন্যেরা যায় ইরাক ইরানের মরুভূমির দিকে, সবুজ পরা সৈন্যেরা যায় আসাম বর্মার জঙ্গলের দিকে। প্ল্যাটফর্মে কোথাও স্ত্রীলোক নেই মা বোন স্ত্রী প্রেয়সী পড়োশিনী কেউ না। কুকুরের কান্নার মতো নিরানন্দ জয়ধ্বনি ওঠে। ট্রেন ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

এই যে যাওয়ার সময় কয়েকটা আস্ত দল গেল, কয়েক মাস পরে ফেরার সময় ফিরে আসবে ভাঙাচোরা কিছু লোক। এই ফিরে আসা ভাঙা দল, বিশেষ করে ইরাক ইরান থেকে আসা দলগুলিকে, ছাউনির বাইরে তাঁবু খাঁটিয়ে রাখা হয়। বেশির ভাগ লোকই সিফিলিসে আক্রান্ত। ডাক্তারি পরীক্ষার পরে তারা ফৌজি হাসপাতালে চলে যায়, বাকিরা ফিরে আসে তাদের সাবেক রেজিমেন্টে। হাসপাতালেও ভি ডি. ওয়ার্ড জেলখানার মতো আলাদা। নার্সেরা সবাই পুরুষ। তখনও পেনিসিলিন আবিষ্কার হয় নি। রোগীরা অকথ্য কষ্ট ভোগ করে।

মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফেরা সৈন্যেরা কেমন যেন ঝিম মেরে থাকে কোথাও যেন কিছু খুইয়ে এসেছে। রোগ আর মেয়েদের কথা নিয়ে চাপাচাপি করলেও কিছু বলতে চায় না। কিংবা শেষে হয়তো বলে- ‘কী বুঝবে তোমরা ইরাক ইরানের মেয়েদের তত তোমরা দেখ নি। হুরী পরীর মতো। ঐখানে বিমারী কোথায় ছিল?... বিমারীর কথা কে মনে রেখেছিল...’ লোকটা কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে যায়।

আজ, এত বছর পরে তাদের কথা ভাবতে ভাবতে আমার মনে পড়ল বালজাকের ‘প্যাশন ইন দ্য ডেজার্ট’ গল্পটার কথা। নিঃসঙ্গ মরুভূমিতে বাঘিনী আর সৈনিকে মৈথুন। এবং সেই ভয়ংকর ভবিতব্য।

.

শুটিং ও বেয়নেট যুদ্ধ

লড়াইয়ের প্রশিক্ষণ খুব সুচিন্তিতভাবে ধাপে ধাপে এগোচ্ছিল। কুচকাওয়াজ, রাইফেল প্যারেড, কামুফ্লেজ, কাঁকড়া চলন, জঙ্গল লড়াই, নিশা আক্রমণ, খালি হাতে লড়াই, সাঁতার, ম্যাপ পড়া খুঁটিনাটি আরো যেন চৌষট্টি কলা। আমাদের ছাউনির মধ্যেই একটা ছোট্ট রাইফেল রেঞ্জ ছিল। যার যার রাইফেল সরিয়ে রেখে সেখানে আমরা সরু বোরের বন্দুকে .২২ কার্তুজে চাঁদমারি অভ্যাস করতাম। খাওয়াদাওয়ার পর উপুড় হয়ে শুয়ে বালির বস্তার উপর নিশ্চল হাত রেখে পুটপুট করে গুলি করা। ব্যাপারটা ছেলেখেলার মতোই মজাদার। কিন্তু আমার ছিল গোড়ায় গলদ ডান চোখ বন্ধ করে বাঁ চোখ খোলা রাখতে পারি, কিন্তু বাঁ চোখ বন্ধ করে কিছুতেই ডান চোখ খুলতে পারি না। বাঁ চোখ বন্ধ করলে আমার ডান চোখও বুজে যায়। অতএব আমি দু চোখ খুলেই গুলি করি এবং প্রতিবারই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে রাইফেল রেঞ্জের ধুলো ওড়াই।

শুটিংয়ের ট্রেনিং দিতেন আবদুর রহমান। হাবিলদার আবদুর রহমান ছোটখাটো চেহারার মানুষ, তাঁর গোল গোল চোখ, বার বার এ চোখ খুলে ও চোখ বন্ধ করে ব্যাপারটা যে কত সোজা আমাকে দেখাতেন। কিন্তু কিছুতেই আমার হল না দেখে শেষটায় পরামর্শ দিলেন, রুমালের মধ্যে একটা পয়সা জড়িয়ে, রুমালটা বাঁ চোখের উপর দিয়ে জলদস্যুদের কায়দায় বেঁধে রাখো। এতে বাধ্য হয়ে বাঁ চোখ বন্ধ এবং ডান চোখ খোলা থাকবে, এবং শেষে ব্যাপারটা অভ্যাস হয়ে যাবে।

আবদুর রহমান আরো শেখালেন, দুশমন যদি দৌড়ে তোমার দিকে আসে তবে তার মাথায় তাক করলে গুলি লাগবে বুকে, যদি দৌড়ে তোমার কাছ থেকে দূরে পালাতে থাকে তবে কোমরে তাক করলে গুলি লাগবে পিঠে, আর যদি তোমার সমুখ দিয়ে আড়াআড়ি দৌড়য় তবে এক মানুষ আগে তাক করো।

তবে শত্রু খুব কাছে, গায়ের উপর চলে এলে অত বড় একটা রাইফেল আর তেমন কাজে আসে না। দুটো দেহের মধ্যে খানিকটা ফাঁক না থাকলে গুলি করার অবকাশ কোথায়? তখন বেয়নেট চালিয়ে শত্রুকে নিপাত করতে হয়।

বেয়নেট যুদ্ধ শেখাত মহম্মদ তাজ খান। তাজ খান পাঠান, যুবক এবং দারুণ সুপুরুষ। তাজ খানের অধীনে কোনো প্ল্যাটুন নেই- সে স্বাধীনচিত্ত পাঠান। যে-প্ল্যাটুনের যখন প্রোগ্রাম থাকে সে এসে বেয়নেট শিখিয়ে যায়। বিকেলবেলা তাকে দেখি, ঢিলে সালোয়ার, আজানুলম্বা শার্ট আর মাথায় একটি চমৎকার পাগড়ি, আস্তেসুস্থে মুসলমান লঙ্গরখানার দিকে চলেছে। সূর্য দেখা যায় না, কিন্তু বেলাশেষের রোদ্দুর এসে পড়েছে তার পাগড়ির তোোয়গাঢ় রঙ, কড়া মাড় দেওয়া, পাখির ঝুঁটির মতো ভাঁজ ভাজ খাড়া তোরায় অভ্রের কুচি ঝিকমিক করে। তাজ খান কারো সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলে না, কারো সঙ্গে তেমন দোস্তিও নেই। ঐ একটু সাজসজ্জায় তার মন আছে নইলে সে মোটামুটি নিস্পৃহ।

বেয়নেট দুভাবে চালানো হয়। প্রথম পদ্ধতিটি অতি সহজ। বেয়নেট লাগানো রাইফেল সঠিক ভঙ্গিতে দু হাতে শক্ত করে ধরে দৌড়ে গিয়ে একের পর এক শত্রুকে গেঁথে ফেলতে হয়। আক্রমণের সময় রণহুংকার বা বীভৎস চিৎকার করতে হয় যাতে শত্রু ভয় পায়, তার স্নায়ুদৌর্বল্য ঘটে আর অন্যদিকে আক্রমণকারীর মধ্যে বীররস স্ফুরিত হয়, হিতাহিতজ্ঞান লুপ্ত হয়ে মুহূর্তে সে খুনী হয়ে উঠতে পারে। বেয়নেট চালাতে হয় পুরো শরীরের ভার দিয়ে বেয়নেট ছুরির মতো কাটে না, বল্লমের মতো ফোঁড়ে।

আর একটা কথা– বুকে ঢোকাবার পর অনেক সময় বেয়নেট পাজরের হাড়ে আটকে যায়- ভূপাতিত শত্রুকে পা দিয়ে চেপে ধরেও টেনে খোলা যায় না। তখন কালক্ষয় না করে গুলি করো। গুলি করলেই হাড় ভেঙে বেয়নেট খুলে আসবে।

কিন্তু হলই বা ট্রেনিং, তবু মারবে না ধরবে না, পর পর দাঁড়িয়ে থাকবে আর বেয়নেটের খোঁচা খেয়ে যাবে এ রকম শত্রু কোথায় পাব? অতএব মাঠে পাশাপাশি কয়েক সারি খড়পোরা জাপানি সৈন্যের ডামি কাঠের ফ্রেমে আটকানো থাকে। আমরা তাদেরই উপর

বেয়নেট অভ্যাস করি। রোজ বেয়নেটের খোঁচা খেয়ে খেয়ে বেচারাদের খড়ের শরীর ঝাঁজরা, মাথা লটপট করে। মাঝে মাঝে দয়াপরবশ হয়ে আমরা তাদের ঝেড়েঝুড়ে, হাত বুলিয়ে আবার ঠিকঠাক করে দাঁড় করিয়ে দিই।

এই আক্রমণ এমনিতে খুবই সোজা, কিন্তু বিপদ হত যখন ওস্তাদ অতি দ্রুত পর পর ছেলেদের চার্জ করার জন্য ছাড়তে থাকত– খোলা বেয়নেট, শরীরের সব ঝোঁকটা সামনে, আগের জনের পিঠ থেকে পরের জনের বেয়নেটের ডগার দূরত্ব মাত্র ফুটখানেক। একটু এদিক ওদিক হলে নীলচে ইস্পাতের লম্বা ফলায় যে কোনো পিঠ গেঁথে যাবে।

এবার শুনুন বেয়নেট ফাইটিং শিক্ষার দুসরা তরিকা অর্থাৎ দ্বিতীয় পদ্ধতি। এবার দুশমনের ভূমিকায় স্বয়ং ওস্তাদ এবং তার ট্রেনিং স্টিক।

ভরদুপুরে ওস্তাদ আমাদের প্ল্যাটুনকে তপ্ত বালির মাঠে নিয়ে আসে। সূর্য একেবারে মাথার উপরে। আক্রমণের ভঙ্গিতে দাঁড়ালে পায়ের নিচে নিজের বেঁটে ছায়াটাকে জাপানি সৈন্যের মতো গাট্টাগোট্টা দেখায়। আমরা গোল হয়ে মাটিতে বসি আর বৃত্তের কেন্দ্রে ওস্তাদ ট্রেনিং স্টিক হাতে দাঁড়ায় ট্রেনিং স্টিক হচ্ছে একটা বাঁশের লম্বা লাঠি, তার একমাথায় তারের একটি লুপ। ওস্তাদ এক এক করে আমাদের ডাকে। আমরা চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়ে গিয়ে তাকে চার্জ করি- প্রথমে বেয়নেট দিয়ে তার ডান রগে সপাটে মারি: কাট। তারপরই রাইফেলের কুঁদো ডান বাহুর সঙ্গে সাঁটিয়ে নিয়ে, লাফিয়ে উঠে তার বাঁ রগে মারি: বাট। ওস্তাদ মাটিতে পড়ে গেলে তার বুকটা ফুঁড়ে দিয়ে, বেয়নেট টেনে বার করে এগিয়ে যাই। অন গার্ড।

আসলে যা ঘটে তা হল: ডান রগে কাট মারার আগেই ওস্তাদ একপা পিছিয়ে নিজেকে বাঁচায়। পরমুহূর্তেই দ্রুত কদম নিয়ে যখন লাফ দিয়ে তার বা রগে বাট মারি তখন আরো একপা পিছিয়ে ট্রেনিং স্টিক দিয়ে আঘাতটা আলতো করে ঠেকিয়েই লুপের দিকটা নামিয়ে ধরে যেন ঐটে ভূপাতিত শত্রুর বুক। আমরা ঐখানে বেয়নেট চালিয়ে উইদড্র করে চলে যাই।

এতগুলো লাফঝাপের অনুক্রমে কোথাও একটু ভুল তো হতেই পারে। কিন্তু ভুল থাকলে ওস্তাদ ছাড়ে না, শুরু থেকে ফিরে ফিরে করায়। নিজের ডান রগে বা রগে চাপড় মেরে মেরে বলে- য়হাঁ মারো, য়হাঁ মারো।

– লেগে যাবে, ওস্তাদ।

— কই ফিকর নহী। আমার শরীরের জিম্মাদার আমি।

একদিন, এইরকম আমাদের তিন-চারজনের কিছুতেই হচ্ছিল না। ওস্তাদ ফিরে ফিরে করাচ্ছে। পরিশ্রমে রৌদ্রে আমার হাতপা কাঁপছিল। যাদের ঠিকঠাক হয়েছে তারা বসে বসে দেখছে। পাঁচ-ছ বার ফিরে ফিরে করার পর মাথায় যেন খুন চাপে। হাঁ মারো, য়হ মারোE দেব নাকি শালা বা রগে রাইফেলের একখানা বাট জমিয়ে! কিন্তু ট্রেনিং স্টিক বাগিয়ে ধরা ছিপছিপে তাজ খানের রোদে পোড়া মুখ দেখে মায়া লাগে।

পাঠানরা অন্যরকমের লোক। গ্রামের কেউ দেখা করতে এলে কী যে খুশি হয়– চেঁচিয়েমেচিয়ে, বুকে জাপটে ধরে, আনন্দে অশ্লীল কথার বান ডাকায়। তার পর যেখান থেকে পারে উৎকৃষ্ট খাবার কিনে আনে। পাঞ্জাবী মুসলমানেরা একেবারে অন্য গোষ্ঠীর, এই খোলামেলা বিমল আনন্দ তাদের নেই।

.

জলে, ফাটলে সেতু বানানো

এর পর ট্রেনিং সম্পূর্ণ করার জন্য তিন বারে আমাদের তিনটি জনহীন, অন্য স্বভাবের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল।

সৈন্যেরা যুদ্ধ করতে যাবে, জমি দখল করবে, ঘাঁটি গাড়বে তার জন্যে তাদের রাস্তা চাই, নদীনালার উপর সেতু চাই, বাংকার চাই, ট্রেঞ্চ চাই, এয়ারবেস চাই, হেলিপ্যাড চাই। এসব তৈরি করবে, রক্ষণাবেক্ষণ করবে স্যাপার্স অ্যান্ড মাইনার্স।

তাছাড়া, যুদ্ধে সৈন্যেরা তো একা যায় না– সঙ্গে যায় সাঁজোয়া গাড়ি, ট্যাংক, জিপ, ওয়েপন ক্যারিয়ার, বিমানধ্বংসী কামান, গুলিগোলা, অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ, তাঁবু এবং আরও বিচিত্র সব সরঞ্জাম। মূল ঘাঁটি থেকে, এগিয়ে যাওয়া প্রথম দলটি পর্যন্ত, সরবরাহের পথ যাতে কখনও বন্ধ না হয় সেইজন্যে রাস্তাঘাট সুগম এবং নিরাপদ রাখা অত্যন্ত জরুরি।

শত্রুরা যদি কোথাও রাস্তার দখল নিয়ে সাপ্লাইলাইন কেটে দিতে পারে তো অগ্রবর্তী সৈন্যদলের বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

অতএব বেপোট জায়গায় রাস্তা এবং ছোট নদী ও খাদের উপর সেতু তৈরি করা শেখাতে, ছাউনি থেকে বহুদূরে একটা অদ্ভুত ধূ ধূ জায়গায় আমাদের এক সপ্তাহের জন্য নিয়ে যাওয়া হল।

সকালবেলা রওনা হয়েছিলাম, দুপুর পেরিয়ে গেল পৌঁছতে। কোথাও হালকা বসতির পাড়াগাঁ, কিছু কিছু গমের খেত, অনেকটাই ফাঁকা ঘাসহীন মাঠ– এইরকম একটা দেশের রাস্তা ধরে গাড়ি চলল। ষাট বছর আগেকার সেইসব পথের কথা ভাবি আর মনে হয় কত জনশূন্য ছিল পৃথিবী তখন।

যেখানে এসে গাড়ি থামল সেই জায়গাটা যেন মঙ্গল গ্রহের একটা টুকরো শক্ত গাঢ় লাল মাটি, তাতে কয়েকটা গভীর ফাটল, আর অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা এলোমেলো বিস্তীর্ণ ঝিল বা হ্রদ। সেই ঝিলে জল টলটল করছে। তীরের লাল রং আর আকাশের ধোয়াটে রঙের ছায়া পড়েছে জলে। কোথাও একটা গাছ নেই, অতখানি জলে কোথাও একটা জলচর পাখি নেই। জলের কিনারায় কাঠের হালকা জেটি, চার-পাঁচখানা বিদেশী ধরনের নৌকো বাঁধা। লঙ্গরখানার জন্য একটি চালাঘর সমাজ-স্বজনহীন সেই। হু হু করা জায়গার ঐটুকু ঘরেও হিন্দু-মুসলমানের আলাদা হেঁশেল। দূরে দুটো সাদা তাঁবু, সেখানে ওস্তাদেরা থাকে।

দুপুরে খাওয়াদাওয়া শেষ হলে আমাদের ছোট ছোট তাঁবু দেওয়া হল, নিজেদেরই খাঁটিয়ে নিতে হবে। ছোট্ট সরলতম তাঁবু তার মধ্যে মাটিতে বিছানা পেতে দুই সারিতে তিনজন তিনজন ছজন শোব। তাঁবু খাটাবার কয়েকটা নিয়ম আছে- বড় খুঁটিগুলো গভীর করে পুঁততে হয়, টানা দেবার ফিতে শক্ত করে আটকে লোহার খুঁটোগুলি হাম্বর মেরে মেরে মাটিতে শেষ পর্যন্ত সেঁধিয়ে দিতে হয়। সবাই মহোৎসাহে ঘন্টা দেড়েক ধস্তাধস্তি করে তাঁবু

খাটাল, আর আমরা দুজন বাঙালি আগের ব্যাচের ফেলে যাওয়া গর্তে খুঁটি পুঁজে তাঁবুটাকে দশ মিনিটে দাঁড় করিয়ে ঝাড়াহাতপা হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

পরের দিন সকালে আমাদের বেইলি ব্রিজ বানানো শুরু হল। একটা গভীর এবং চওড়া খাদের দুই পাড় লেভেল করে দুটি ফালক্রাম হিসেবে সেখানে বেয়ারিং বসানো হল। তার পর স্ট্রাকচরল সেতুটির টুকরো টুকরো প্রিফ্যাব্রিকেটেড অংশ জোড়া দিয়ে দুই পাড় থেকে সেতুটি বানাতে বানাতে এগিয়ে যাওয়া। ব্যাপারটা সহজ: প্রত্যেক বারে সেতুর যতটা অংশ জোড়া হয় তার অর্ধেকের কম বেয়ারিংয়ের উপর দিয়ে ঠেলে দিই খাদের শূন্যতার দিকে। এইভাবে বার বার জোড়া দেওয়া আর ঠেলে এগিয়ে দেওয়া। ক্রমশ দুই তীর থেকে দুটি ক্যান্টিলিভার এসে খাদের মধ্যশূন্যে যখন মেশে তখন তাদের যুক্ত করে আটকে দিলেই হল। এখন অনায়াসে এর উপর দিয়ে সৈন্যদল মার্চ করবে, ভারী গাড়িও নির্ভয়ে চলে যাবে। এই সেতুর সমস্তটাই আগেভাগে বানিয়ে রাখা লৌহকাঠামো, শুধু জুড়ে দিলেই হল।

বেইলি ব্রিজ বার কয়েক তৈরি করা এবং খুলে ফেলার পর শেখানো হল জলের উপর ভাসমান সেতু বানানো। হুগলি নদীর উপর পনটুন ব্রিজ তো আগেই দেখেছি, এই ভাসমান সেতু প্রায় সেইরকমই। এই কাজে বিকেল পর্যন্ত আমাদের কত বার যে ঝুপঝাঁপ জলের মধ্যে নেমে যেতে হয়। কিন্তু ভালো লাগে। খুব হালকা, নির্মল জল। উঠে এলে এক মিনিটে গা শুকিয়ে যায়, দশ মিনিটে প্যান্ট শুকিয়ে যায়। হাওয়া দেয় হ্রদের ছোট ছোট ঢেউ দূর থেকে ভাঙতে ভাঙতে কাছে এসে ছলাৎ ছলাৎ করে লাগে।

বিকেলটা এখানে ভারি সুন্দর ধূ ধূ দিগন্ত ছাড়িয়ে সূর্যাস্তে মিশে গেছে আরক্ত গিরিমাটি, রেড ওকার। মাটির ঢেউ, দীর্ঘ ফাটল, জলে নেমে যাওয়া পাথুরে রেখাগুলি নরম, ক্রমশ আবছা। সূর্য ঝিলের জলে অর্ধেক ডুবেছে। ফলে এই মুহূর্তে আকাশে জলে আর স্থলে এক অদ্ভুত আভা। এই দিনশেষের আলোয় মন ছিঁড়ে ছিঁড়ে ব্যথিত হতে থাকে।

কিন্তু সকালবেলায়, ঘুম থেকে উঠে, কোনো কষ্ট আর মনে পড়ে না দিন শুরু হয়ে যায়।

তৃতীয় দিনে দুপুরবেলায় একটা মজার ঘটনা ঘটল, আমাদের উচিতশিক্ষা হল। খাওয়াদাওয়ার পরে জলে নেমে কাজ করছিলাম, হঠাৎ দেখলাম দূর দিগন্ত থেকে একটা মেঘের মতন ছায়া এগিয়ে আসছে। এতদিনে আমার এক বার আঁধির অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। ছুট ছুট ছুট জল থেকে উঠে ছুটে গিয়ে তাঁবুতে ঢুকে যে-যার কম্বল মুড়ি দিলাম। আধ মিনিটের মধ্যে আঁধি এসে এক ঝটকায় খাকি তাঁবুটাকে শূন্যে তুলে ফেলল। আলাদিনের জাদু-কার্পেটের মতো সেটা আকাশে উঠল আর আমরা দুজন তার কিনারা ধরে লটপট করে ঝুলতে লাগলাম, যাতে সেটা হাতছাড়া হয়ে না উড়ে যায়। ধুলো আর পাথরকুচির ছররা বর্ষণ করে মিনিট তিনেক পরে আঁধি চলে গেল। আমরা বিধ্বস্ত হয়ে মাটিতে নামামাত্র তাঁবুটা নেতিয়ে ঝুপ করে আমাদের উপর পড়ল। সবাই আমাদের অবস্থা দেখে হেসে আকুল। বুদ্ধিমানের মতো আমরাও তাদের সঙ্গে খানিকটা হেসে নতুন করে এবং এবার শক্ত করে তাঁবু খাটাতে লাগলাম। আমাদের কম্বল, জামাকাপড় এবং মেস-টিন দূরে দূরে উড়ে গিয়েছিল, সন্ধ্যা নামার আগেই আবার সেগুলো খুঁজেপেতে নিয়ে এলাম।

সপ্তাহের শেষদিকে আমরা রেকি বোট চালাতে শিখলাম। রেকি বোট হচ্ছে হাওয়া ভরা রবারের নৌকো। কিছুতেই ডোবে না, কিন্তু একটু এদিক ওদিক হলেই উলটে যায়। বসে বসে বৈঠা বাইতে হয়। আমার বর্ষাকালে তালডোঙা আর কলার ভেলা বাইবার কথা মনে পড়ে।

.

চাঁদমারির মাঠে

রাইফেল ট্রেনিংয়ের শেষ পর্যায়ে আমাদের আবার এক সপ্তাহের জন্য বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে অনেকগুলি দূর চাঁদমারির রাইফেল রেঞ্জ। যখন-তখন গুলি চলার কারণে ঐ বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে লোকালয় উচ্ছিন্ন। ক্রমশ জায়গাটা পোড়ো জঙ্গলের রূপ নিয়েছে। দূরে দূরে গ্রাম। গ্রামের লোকজন ভুলেও এদিকে আসে না। এখানে খাকি রঙের কয়েকটা

বড় তাঁবু, ভিতরে সার সার চারপাই। সব বন্দোবস্ত করাই ছিল। তিনটে তাঁবুতেই আমাদের। পুরো প্ল্যাটুনের জায়গা হয়ে গেল। এই প্রথম, এখানে দেখছি ডিসিপ্লিনের তেমন কড়াকড়ি নেই। এর কারণ কি এই যে সারা দিন আমাদের কাছে রাইফেল আছে এবং সকাল থেকে সন্ধে আমরা চাঁদমারির মাঠে মুড়িমুড়কির মতো থ্রি নট থ্রী কার্তুজ ওড়াই। এখানে গুলির হিসেব কেউ চায় না, খোল জমা দিলেই হল। ফ্রন্টে তাও দিতে হয় না। সুতরাং সেখানে হেঁদো ডিসিপ্লিনের কথা বলবে এমন বুকের পাটা কার!

সেটা ছিল প্রথম শীতের সময়। সকালে উঠে যার ইচ্ছে করে না সে দাড়ি কামায় না, অগোছালো হাফপ্যান্ট বুশশার্ট পরে রাইফেল নিয়ে মার্চ করে রেঞ্জে যায়। মার্চ করা রক্তে মিশে গেছে তাই ঘুমোতে ঘুমোতে গেলেও পা ফেলায় ভুল হয় না। চারদিকে তাকাতে তাকাতে যাই। দেখি, উঁচু নিষ্পত্র গাছে শকুন বসে আছে, ঝোপে ছোট্ট কালো পাখি ইতিউতি নেচে বেড়াচ্ছে। আমার বাঁ চোখ নিয়ে এখনও সমস্যা কখনও বন্ধ হয়, কখনও হয় না।

এই কদিনে অনেক রকম অভ্যাস করা হল। সবচেয়ে প্রশস্ত হল উপুড় হয়ে শুয়ে বালির বস্তার উপর হাত এবং রাইফেল রেখে তাক করা, তার পর আছে হাঁটুগাড়া পজিশন, তার পর দাঁড়ানো পজিশন। চাঁদমারিও কয়েক রকম সাধারণ সহজ চাঁদমারি হল টার্গেটের কেন্দ্রে গুলি করা। কেন্দ্র থেকে গুলি যত দূরে লাগবে তত নম্বর কাটা যাবে। এর পর হল পুঞ্জ গুলিবর্ষণ– এই চাঁদমারিতে প্রথম গুলিটি যদি টার্গেটে কেন্দ্র থেকে একটু দূরেও লাগে তাতে খুব ক্ষতি নেই, কিন্তু পরবর্তী কার্তুজগুলি যেন সেই প্রথম আঘাতের গায়ে গায়ে লাগে। এর পর আছে স্ন্যাপ শুটিং। এতে লক্ষ্যবস্তু এত দ্রুত আবির্ভূত এবং তিরোহিত হয় অথবা এত দ্রুত জায়গা থেকে সরে যায় যে ঝটপট তাক করতে না পারলে মারা যায় না।

এখানে চতুর্থ রাত্রে আমার একটি অভিজ্ঞতা হল। সারা দিন যার যার রাইফেল তার তার কাছে থাকে, দিনের শেষে সেগুলো জমা পড়ে। তাঁবু থেকে একটু দূরে দুটো-বড় গাছের অন্ধকার ছায়ায় বাঘের খাঁচার মতো একটা লোহার খাঁচা- তার মধ্যে শিকল-তালা পরিয়ে

রাইফেলগুলোকে আটকে রাখা হয়। খাঁচার সামনে মাটিতে ট্রেঞ্চ খোঁড়া, বালির বস্তা সাজানো। রাত্রে সেখানে এক-এক জনের দু ঘন্টা করে সান্ত্রীর ডিউটি পড়ে। সে রাত্রে আমার ডিউটি। গভীর রাতে গভীর করে শীত নেমেছে। আমি বাঘের খাঁচাকে এক বার প্রদক্ষিণ করে এলাম। সব ঠিক আছে। আগের সান্ত্রী চলে গেল। এখন কি করি! আমি খাঁচার চার দিকে পা মেপে মেপে ঘুরতে লাগলাম। ঘাড়ে আর কানে শীতের কামড় টের পাচ্ছি। গ্রেটকোটের কলার তুলে ঘাড় আর কান যতটা পারি ঢেকে নিলাম। ট্রেঞ্চে নেমে দেখি ঠাণ্ডা অনেক কম। বালির বস্তায় জুত করে বসি। মাটির গর্তটি সত্যিই বড় আরামের। সময় কাটবে না বুঝেই গ্রেটকোটের পকেট ভরে তিলের রেউড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম। অন্ধকারে গর্তে বসে একটি একটি করে সেই রেউড়ি খাই। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি গাছের ঝুপসি পাতায় গাঢ় অন্ধকার, পাতার ফাঁকে তারাগুলি কখনও নিবুনিবু, কখনও স্পষ্ট। দূরে কাছে কোথাও একটা পোকার ডাকের শব্দ নেই।

ফৌজে গেলে কি হবে, তখনও আমার ভূতের ভয় যায় নি। তাঁদের কথা শুধু মনে পড়ে নি বলেই এতক্ষণ ভয় পাই নি। এখন চমকে উঠে হঠাৎ দেখলাম, আকাশ থেকে কি যেন একটা লাফিয়ে নামল গাছের উপর। উপরের শুকনো ডাল ভেঙে পড়ল নিচের ডালে। কঁ কঁ কঁ কঁ করে অশরীরী কেউ তীক্ষ্ণ স্বরে ককিয়ে উঠল। ভয়ে হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়েই আবার স্টার্ট নিয়ে ধকধক করে চলতে লাগল। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের মতোই আমি কিছু না ভেবে বেল্টের খাপ থেকে এক চার্জল গুলি বার করে ম্যাগাজিনে ভরি, একটা গুলি চেম্বারে ঠেলে দিই। ট্রিগারে আঙুল রাখতে রাখতেই আমার সাহস ফিরে এল। আশ্চর্য! এতটা ভাবি নি গুলিভরা রাইফেল দিনের আলোর মতো, হাতে থাকলে ভূতের ভয় মিলিয়ে যায়।

আস্তে আস্তে আমার স্নায়ু নিরুদ্বেগ হল। দিনের বেলা লম্বা একটা গাছে শকুনি দেখেছিলাম হয়তো সেটাই বা অন্য কোনো রাতচরা পাখি এই গাছের উপর নেমেছিল, ডালটা হয়তো শুকনো ছিল, ভেঙে পড়েছে। আমি সেফটি ক্যাচটা টেনে দিয়ে রাইফেলটি দুই হাঁটুর মধ্যে রেখে পকেট থেকে আবার রেউড়ি বার করে খেতে লাগলাম। অন্ধকারে

তাকিয়ে আছি স্নায়ু শান্ত হয়েছে। শীতে পাতা খসে পড়ে তার হালকা শব্দ, উলটে-পালটে পড়া আমি টের পাই।

.

লড়াই শিক্ষা

অ্যাসল্ট কোর্সের পরে, এবং সবশেষে ছিল ব্যাটল ট্রেনিং। এতকাল ধরে ব্যাটলই তো শেখানো হল, তবে আবার কেন এই পনের দিনের ব্যাটল? হয়তো এটাই লড়াইয়ের পরম শিক্ষা: সাপের মতো, কাঁকড়ার মতো কি করে হাঁটতে হয়, চরম অবস্থায় কি করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু মানুষ মারা? অসম্ভব। দাঙ্গা বা গ্ল্যাডিয়েটারদের আখড়া ছাড়া ঐ জিনিস হাতে কলমে শেখানো যায় না।

যাচ্ছিলাম গাড়িতে, হঠাৎ পাঠানকোটের আশেপাশে কোথাও আমাদের নামিয়ে দিয়ে বলা হল- হাঁটো। রাস্তা দিয়ে ফাঁকা গাড়ি চলল আর আমরা হাঁটতে লাগলাম। যেখানে ট্রেনিং হবে সে জায়গাটা ঢেউ খেলানো উঁচুনিচু, কোথাও জঙ্গল, কোথাও ঘাসে মোড়া ছোট টিলা। নানা খোপে নানা কৌশল ও হরকত করার ফাঁদ পাতা আছে। তখন শীতের দিন। এই বনপ্রদেশে আরো শীত পড়েছে। জামাকাপড় ছাড়া হয় না, স্নান করা হয় না- জলের খরচ খুব কম। তবু তার মধ্যেও দু দিন এক ওয়াটার বটল জল র‍্যাশন করে দেওয়া হল। হাত ধোও, মুখ ধোও, খাও, সবই ঐ এক বোতল জলের মধ্যে। খাওয়াদাওয়া মোটামুটি ছিল, কিন্তু এর মধ্যে তিন দিন আমাদের প্রায় না খাইয়েই রাখা হল। প্রথম দিন লম্বা রুটমার্চ ছিল- পথের মধ্যে, দুপুরে, তৈরি খাদ্যের বদলে প্রত্যেককে কিছুটা কাঁচা আটা আর ডাল দিয়ে বলল- বেঁধে খাও। এই বিভূঁইয়ে কি করে রান্না হবে তারও পদ্ধতি বাতলে দিল- জঙ্গল থেকে শুকনো ডালপালা ভেঙে আনন, মেস-টিনে আটা মাখো, আগুন জ্বালো, মেস-টিনের উলটো পিঠে রুটি সেঁকো, মেস টিনে ডাল সেদ্ধ করো।

কাঁচা আটা কাঁচা ডাল হাতে নিয়ে মনে হল ছুঁড়ে ফেলে দিই। হঠাৎ সত্যনারায়ণের সিন্নির কথা মনে পড়ল। আমি একটা গাছের আড়ালে গিয়ে আটায় জল ঢালোম, প্যান্টের পকেটে মিষ্টি রেউড়ি ছিল, তার গোটা কয়েক সেই আটায় দিয়ে সিন্নি বানিয়ে আরামে বসে খেতে লাগলাম। রান্না না করায় একটু সময়ও জুটেছে। শীতের দুপুরে, ময়লা পোশাকে, ফেল্টে মোড়া জলের বোতল মাথার নিচে দিয়ে গাছতলায় শুয়ে আছি। আঃ আহা, জীবন বড় চমৎকার জিনিস। আঃ, রাস্তার দিক থেকে শিখ জাঠ আর মুসলমানদের গরম রুটি সেঁকার তাজা গন্ধ আসছে।

এর পর এক দিন আধপেটা খাইয়ে রাখা হল। বলা হল, রসদে ঘাটতি পড়েছে। আর এক দিন কুকুরের বিস্কুটের মতো কয়েকখানা বিস্কুট জুটল। এই করে খাবার কষ্টের প্রশিক্ষণ হল। শুনলাম, জাপানিরা নাকি ফ্রন্টে শুকনো ভাত সঙ্গে নিয়ে আসে, খিদে পেলে ভিজিয়ে খায়। আমার তো মনে হয়, এরকম ক্ষেত্রে লোকায়ত চিড়েগুড় বা ছাতুলঙ্কা নিয়ে যুদ্ধযাত্রাই বা মন্দ কি। একটা দৃশ্য কল্পনা করে মনে মনে খুব হাসি : একদল তোক ন্যাংটো, ন্যাড়া মাথা, কাঁধে চিড়েগুড়ের থলে, হাতে রাইফেল– যুদ্ধে চলেছে। তার উপর, তারা যদি আমার মতন বাঁ চোখ বুজে ডান চোখে তাক করতে পারে তো কেল্লা ফতে!

শত্রুর ঘাঁটি বা গুরুত্বপূর্ণ চৌকি দখল করতে গেলে যতদূর পারা যায় দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে বা গা ঢাকা দিয়ে এগোও তার পর অজানিতে অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ করো। কিন্তু বিপক্ষও তো সজাগ অতএব নড়াচড়ার ঢেউ চাপা দিয়ে, মাটিতে শুয়ে বুকে হেঁটে এগোও। শেষে বিপক্ষ সৈন্যকে ঠেলে দূরে রাখতে এবং নিজেদের দলকে নিরাপদে আরও এগিয়ে দিতে পিছন দিক থেকে কাভারিং ফায়ার দাও।

কাভারিং ফায়ারের নিচে আমাদের ক্রল করা শিখতে হল। কাভারিং ফায়ার দিত ওস্তাদেরা। শুরু করার আগে তারা বার বার সাবধান করে দিত- খবরদার, মাথা তুলো না। যদি দ্যাখো মাথা না তুলে এগোতে পারছ না- তো এগিয়ো না, উপুড় হয়ে শুয়ে থেকো। আমরা ক্রলিং শুরু করার পরে হুইসল বাজত, আর তার পরই শব্দ শুনতে পাই মাথার

উপর দিয়ে গুলি ছুটে যাচ্ছে- সক সক সক সক। মাথার উপরে ঘাসের ডগা কাঁপে। খোলা মাঠে গুলির শব্দ তীক্ষ্ণ শিসের মতো শুনি। খানিকক্ষণ পরে আবার হুইসল বাজে অল ক্লিয়ার।

জঙ্গলে সামান্য গাছের আড়ালে বা ঝোপে কি করে নিজেকে লুকোতে হয়, মাইন কিভাবে পাততে হয়, খুঁজে দেখতে হয়, কি রকম ভঙ্গিতে গ্রেনেড ছোড়ে সারা দিন এইসব, তার উপর রাত্তিরেও জ্বালাতন। টিলার মাথায় আমাদের থাকার বন্দোবস্ত। কিন্তু প্রায়ই গভীর রাত্রে টিলার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ওস্তাদেরা হুইসল বাজায়। হুইসল শোনামাত্র ঘুমচোখে দুদ্দাড় করে নিচে নেমে এসে দাঁড়াতে হবে। কোনো জরুরি কিছু না–একটি নিরিমিষ রোল কল হবে তার পর ডিসমিস। আবার উপরে ওঠো, আবার নতুন করে ঘুমোও। নিচে নেমে আসতে এক মিনিট দেরি হলে ওস্তাদ শীতের রাত্রে অন্ধকারে পাঁচ মিনিট দাঁড় করিয়ে রেখে বক্তৃতা দেবে। আমরা সবাই তাড়াতাড়ি নামি, কিন্তু আউধবিহারী সুস্থি লোক, তার দেরি হবেই। একদিন ঘোর অন্ধকারে বাঁশির ডাকে নেমে দেখি, আউধবিহারী সবার আগে এসে গেছে। ব্যাপার কি? আউধবিহারী বলল, অন্ধকারে ঘুমের ঘোরে পা হড়কে গেল আর সোজা গড়িয়ে এখানে চলে এলাম। এর পর থেকে আউধবিহারী রাত্রে এবং দিনেও গড়িয়েই নামত। এই হল কঠিন কাজের সহজ সমাধান।

দু সপ্তাহ এরা এমন খাটুনি খাটাল যে আমাদের মেজাজ ও মন নিজেদের অজান্তেই একটু একটু করে পালটে গেল। এইভাবেই সৈন্যদের নিজস্ব জীবনদর্শন তৈরি হয়, আচরণও বদলায়।

আমাদের তিন নম্বর কনস্ট্রাকশনে পঁচিশ-তিরিশ ফুট উঁচু থেকে হনুমানের লেজের মতো মোটা দড়ি ঝোলানো ছিল সেই দড়ি বেয়ে উঠে, শূন্যে মাত্র দুখানা দড়ির লম্বা সাঁকো, সে সাঁকো পা রাখলেই দোলে। সেই দোলা-সাঁকো পেরিয়ে ওমাথায় আবার লম্বা দড়ি বেয়ে নেমে আসা। তার পর ফুট তিনেক উঁচুতে খুঁটির উপর ছ ইঞ্চি তক্তার জিগজ্যাগ সাঁকো সেই সরু তক্তার উপর দিয়ে বুটপট্টি পায়ে, পিঠে পিঠ্ঠু এবং কাঁধে স্লিং করা রাইফেল নিয়ে

এঁকেবেঁকে দৌড়ে যাওয়া। শেষে ন-দশ ফুট উঁচু বাঁশের দেয়াল এবং ভাঙা কাঁচ ও কাঁটায় ভরা এক চওড়া খানা লাফিয়ে ডিঙোনো। খানাভরতি ভাঙা কাঁচ আর মারাত্মক কাঁটা দেখে আমরা দৌড়ে গিয়ে থমকে যাই। ওস্তাদেরা বলে- লাফাও, লাফাও। খানায় পড়ে যদি হাতপা ভাঙে, কাঁচে যদি বুকপেট কাটে তো তোমার কি? হাড় জোড়া দেবে ডাক্তারসাহেব, সেলাইফোঁড়াই করবে ডাক্তারসাহেব, তনদুরস্তি করে দেবে নার্স মেট্রন। তুমি তো শুধু হাসপাতালে আরামে শুয়ে থাকবে। দেখেশুনে ক্রমশ আমারও বিশ্বাস হতে থাকে আমার শরীরের জিম্মাদার আমি নই, ফৌজ।

.

কসম প্যারেড

ট্রেনিং শেষ হল। একজন কমব্যাটান্ট সৈন্যের মোটামুটি যা যা শিক্ষণীয় সব শেখানো হয়েছে। এবার কসম প্যারেড হবে। যারা শপথ নেবে তারা সেদিন সরস্বতী পুজোর ছেলেদের মতো সকালে চানটান করে, চুলে গন্ধতেল মেখে, কড়া ইস্ত্রি করা পোশাক, আয়নার মতো চকচকে বুট আর ব্রাসো ঘষা পিতল পরে প্যারেডের মাঠে এল। সেই প্যারেডে আমাদের সমস্ত কোম্পানি, সমস্ত ব্যাটেলিয়ান- প্রায় পনের-কুড়ি হাজার সৈন্য এসে অংশ নেয়। ব্যান্ডমাস্টার তার দল নিয়ে সেজেগুজে বাজনা বাজিয়ে মার্চ করে। আমরা যারা কসম নিতে এসেছি তারা খুব সহজ হালকা ছন্দে প্যারেড করি এতদিনে আমাদের পা ফেলা, হাত দোলানো, ডাইনে বাঁয়ে ঘোরা, শোল্ডার আর্ম, প্রেজেন্ট আর্ম যন্ত্রের মতো নিখুঁত এবং মনোহীন হয়েছে।

কি কসম খেয়েছিলাম মনে নেই। তার ভাষা কি ছিল, উর্দু না ইংরেজি তাও মনে নেই।

বিকেলে, ছায়া পড়লে, সেদিন একটি অন্য রকম ঘটনা ঘটল। ওস্তাদ মহম্মদ শফি আর আবদুর রহমান ভাঁজ ভাঙা সালোয়ার শার্ট আর অভ্রের কুচিতে চিকমিকে পাগড়ি পরে,

যেন সামাজিকতা রক্ষা করতে প্রসন্ন লাজুক মুখে আমাদের ব্যারাকে এল। আমরা খুব খাতির করে তাদের চারপাইতে বসালাম।

ওস্তাদেরা আমাদের তুমি করে বলত, এখন হঠাৎ আপনি দিয়ে শুরু করল- এতদিন আপনাদের আমরা কড়া কথা বলেছি, ধমকধামক দিয়েছি, পরিশ্রম করিয়েছি, কষ্ট সইয়েছি শেখাবার জন্যে, ডিসিপ্লিনের জন্যে এসব আমাদের করতে হয়েছে। আজ ওস্তাদ ও ছাত্রের সম্পর্ক আমাদের শেষ হল। এখন আমরা বন্ধু। আমাদের কোনো কথায় যদি কারো মনে কোনো কষ্ট হয়ে থাকে তবে তার জন্যে আমরা মাফ চাই। মনে কোনো রাগ। পুষে রাখবেন না। শফি চমৎকার কথা বলে। আমরা বললাম- আরে না, না, এ কী বলছেন! আপনারা চিরদিনই আমাদের ওস্তাদ থাকবেন। দুই ওস্তাদই এক এক করে প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করল। আমাদের চোখে প্রায় জল এসে গেল।

এর পর আমরা দু মাসের ছুটিতে বাড়ি যাব। নিশ্চয় ওস্তাদরাও যাবে।

.

ছুটির তোড়জোড়

ছোট ছোট চুলের সঙ্গে প্রায় এক বছরের না কামানো কোঁকড়ানো দাড়িগোঁফ- এতদিন পরে এই চেহারা নিয়ে কলকাতায় ফিরব? যাই, আজকেই সদর-বাজারের সেলুন থেকে দাড়িগোঁফটা কামিয়ে আসি গে।

আমার মতলব শুনে ভাগ সিং বলল- এতকালের দাড়িগোঁফ, দেশের লোককে একবার দেখাবে না? তবে যদি নাই দেখাও, এর একটা ছবি অন্তত নিয়ে যাও। এসো, তোমাকে পাগড়ি বেঁধে দিই- পাটিয়ালা স্টাইল না অমৃতসর স্টাইল? ভাগ সিং তার নিজের পাগড়ির কাপড় লম্বা করে ভাঁজ করল। আমার দুই কান ঢেকে পাগড়ি বেঁধে দিয়ে সামনে আয়না ধরল : উনিশ-কুড়ি বছরের কালোকোলো তাজা এক বাচ্চা শিখ!

ভাগ সিং, পাল সিং আর আমি তিন শিখ প্রাণ খুলে হাসতে হাসতে বেরুলাম। প্রথমে সদরের একটা স্টুডিওতে গিয়ে গোটা তিনেক ছবি তোলা হল, তার পর একটু ঘোরাঘুরি, একটু খাওয়াদাওয়া। অতঃপর শেষ দ্বিধা ঘুচিয়ে একটি নিরিবিলি সেলুনে ঢোকা। ষাট বছর আগে, প্রাকস্বাধীন ভারতবর্ষে, খোদ লাহোর শহরে তিনজন শিখ ছোকরা নাইয়ের দোকানে ঢুকল- ব্লাসফেমির এই দৃশ্য অচিন্তনীয়। নাপিত হাঁ করে তাকিয়ে আছে দেখে তাড়াতাড়ি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম দাড়ি কামাব। আয়নার সামনের চেয়ারে বসে পাগড়ি খুললাম- নাপিত তখনও হাঁ করে আছে। যা হোক, আমার নরম দাড়ি ক্ষুরের দুই টানেই সাফ হয়ে গেল।

কিন্তু ফেরার সময়ে এক মুশকিল- দাড়িগোফহীন মুখে শিখপাগড়ি কী যে অশ্লীল কি বলব! আমার মন খারাপ হয়ে গেল লুকিয়ে, কোনোক্রমে গা ঢাকা দিয়ে আমি ব্যারাকে ফিরলাম। পাগড়ি খুলে ফেলার পরে চেহারা খানিকটা ধাতস্থ হল। তবু যে আমাকে দ্যাখে সেই খানিকটা অবাক হয়, তার পর হা হা করে হাসে।

সন্ধেবেলার রোল-কলে সেই বুড়ো সুবাদার এসে আমাকে ধরলেন– কি হল বেটা, তোমার ধর্মের কি হল?

আমি চুপ করে রইলাম।

–চুঃ চুঃ, দাড়ি কামিয়ে তুমি ঠিক কাজ করো নি।

আমি চুপ।

–আগে কেমন শেরের মতো দেখাত, এখন চুহার মতো দেখাচ্ছে।

.

ড্রইং অফিস, ফৌজি স্কুল, যুদ্ধের শেষ পর্ব

দু মাস ছুটি কাটিয়ে ফিরে এলে আমার কাজের শেডিউল পালটে গেল। এখন সকালে প্যারেডের মাঠের বদলে কারখানায় যাই। সেখানে ড্রইং অফিসে দুটো কামরা। একটা কামরায় আমি আর বিল নামের এক ব্রিটিশ কর্পোরাল বসি। ঘরে দুটো মাত্র ড্রইং বোর্ড, দুটো স্টুল, দুটো টেবিলপাখা– সব একটা করে বিলের আর আমার। আমাদের কাজ বেশি নেই। বিল ফৌজি সংস্করণ গল্পের বই নিয়ে আসে। বই পড়ে আর কলাই করা মগে সবুজ আর কালো আঙুর ভিজিয়ে খায়। তার ঠোঁট দুটি মেয়েদের লিপস্টিক মাখা ঠোঁটের মতো লাল। নরম স্বভাব, বেশি কথা বলে না, নিজেকে জাহির করে না, আমার বয়সীই হবে সে। তার কাছ থেকে এইচ জি ওয়েলসের দি ইনভিজিবল ম্যান আর আন্দ্রে মারোয়ার দি এরিয়েল নিয়ে পড়েছিলাম। বিল ঘরে বসে থাকলে কখনও মনে হত না যে ঘরে একটা লোক আছে।

বিলকে যেমন মনে আছে তেমনই মনে আছে সার্জেন্ট জর্ডানকে। জর্ডান দীর্ঘকায়, চওড়া হাড়, সুপুরুষ। বিল আসবার আগে এই ঘরে সে একা বসত। তখন তার সঙ্গে একটু-আধটু পরিচয় হয়েছিল। ছুটি থেকে এসে দেখছি, জর্ডান ওয়ারেন্ট অফিসার হয়েছে, অন্য জায়গায় তার সিট। ওয়ারেন্ট অফিসার সেকেন্ড লেফটেন্যান্টেরও নিচে, তবু জর্ডান এই কদিনেই পালটে গেছে– হুকুম করে কথা বলে। ফ্রন্টে গেলে এরাই নিজের লোকের হাতে খুন হয়।

কারখানা থেকে ফিরে চা পরোটা আলুহেঁচকি খাই। এর পর কিছু শরীরচালনা করতে হয়। পিটি করতে পারি, বক্সিং লড়তে পারি, হকি বা ভলিবল খেলতে পারি। কিন্তু আমি পিটি-ই করি- ঐটেই আমার পক্ষে সুবিধাজনক। এর পর রাতের খাবার খেয়ে স্কুলে যাই।

ফৌজি স্কুল এক অভিনব, কার্যকর ও সহজ শিক্ষাপন্থা। ফৌজি ব্যারাক যেমন সরল নকশার খোলামেলা বাড়ি, ফৌজি পোশাক যেমন মরুভূমির বালিতে, বনের ঝোপে, নদীর কাদায়, বরফান মুলুকে চুটিয়ে পরা যায় ফৌজি স্কুলের সিলেবাসও সেইরকম উজ্জ্বল, সরল ও প্রাকৃতিক। ভূগোল ইতিহাস অঙ্ক ইংরেজি- এই চারটি ছিল প্রধান বিষয়। নতুন ধরনের কয়েকটা ঝকঝকে পাঠ্য বই পাওয়া গেল। পড়াটা যেহেতু পুরোপুরি ঐচ্ছিক অতএব কুড়ি হাজার লোকের মধ্যে মাত্র কুড়ি-পঁচিশজন ছাত্র হল। আমাদের তিন নম্বর কনস্ট্রাকশন গ্রুপে ফৌজি অফিসার হয়ে কিছু অধ্যাপক ও পণ্ডিত এসে জুটেছিলেন। ওঁরাই পড়াতেন। চমৎকার পড়াতেন। ওঁদের পড়াবার গুণে মন ভালো হয়ে যেত, সময়টা ভালো কাটত: কলমের গাছে গাছে যেন ফল ভরে উঠেছে।

কিন্তু শিক্ষকদের একজন ছিলেন অজ্ঞাতকুলশীল। সে আসত শহর থেকে। লোকটা পাঞ্জাবী মুসলমান, চল্লিশের কোঠায় বয়স, নাসপাতির মতো বর্ণ, পাতলা চুল, রোগা, ইনটেলেকচুয়ালদের মতো না-খাওয়া চেহারা। পড়ানোর বদলে সে এসে শহরের উত্তেজক ঘটনা বলত, এই দেশের উপর মুসলমানদের রাজনৈতিক ও নৈতিক হকের কথা প্রচার করত, উদ্ধৃতি দিয়ে দিয়ে দ্বিজাতিতত্ত্ব বোঝাত। আশ্চর্য! ওকে কি ভারত সরকার মাইনে

দিয়ে এইসব প্রচার করার জন্যে রেখেছে? সেটা অসম্ভব। ফৌজে মুসলমানের বিপরীতে হিন্দু ও শিখ মিলিয়ে তোকসংখ্যা অনেক বেশি। নিজেদের মধ্যে কিছু একটা বেধে গেলে ফল হবে মারাত্মক।

এতদিন পরে, এখন সন্দেহ হয়, হ্যাঁ, ওকে বোধ হয় ইংরেজরা মাইনে দিয়ে ঐ জন্যেই রেখেছিল। যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে, এখন পৃথিবী যদি শান্তির মুখ দ্যাখে এই ভয়ে শ্বেতাঙ্গেরা পৃথিবীর নানা জায়গায় মাইন পুঁতে রাখার মতো দেশভাগের ষড়যন্ত্র করে রাখছিল। ১৯৪৭ সালে, যে বছর ভারত ভাগ হল, সেই বছরই ইংরেজরা প্যালেস্টাইনকেও আরব ও ইহুদি বলয়ে ভাগ করার প্রস্তাব দিয়েছিল।

আসলে ফৌজে থেকেও আমরা যুদ্ধের অবস্থা কিছুই জানি না, স্বাধীনতার সূচনায় দেশে যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র চলেছে সে খবরও রাখি না। আমাদের ক্লাবে খবরের কাগজ বলতে শুধু ফৌজি আখবর আসে। রেডিও অবশ্য সব সময়েই খোলা থাকে। কিন্তু ঐ সুদূর যান্ত্রিক গলার কাছে কান পেতে কে বসে থাকবে। ১৯৪৫ সালের অর্ধেকের বেশি চলে গেছে। মুসোলিনি মারা গেছে, হিটলার আত্মহত্যা করেছে, হিরোশিমা নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফেলা হয়েছে। যুদ্ধে মারা গেছে সাড়ে পাঁচ কোটিরও বেশি মানুষ। এসব আমাদের কিছুই জানানো হয় নি। শুধু অগাস্টের মাঝামাঝি একদিন শোনা গেল জাপান আত্মসমর্পণ করেছে। অতঃপর ছাউনিতে সার্কুলার দিয়ে তিন দিন নিয়মকানুন ঢিলে, তিন দিন ধরে লঙ্গরখানায় ভোজের খাওয়াদাওয়া। বি ও আর ক্যাম্পে, শুনলাম, ফুর্তির আর মদের স্রোত বইছে।

অক্ষশক্তির জাপান আত্মসমর্পণ করেছে মিত্রশক্তির সাহেবদের কাছে। এর পর কি হবে না হবে তাও সাহেবরাই জানে। আমরা মাইনে পাওয়া সৈন্য, আমাদের এখনও ফ্রন্টে পাঠানো হচ্ছে, যদ্দিন হবে যাব। ব্যাটল ট্রেনিংয়ের সময় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমাদের শরীর আমাদের না, ভাঙলেচুরলে ওরাই ঠিক করে দেবে। অতএব যুদ্ধ যে থেমে গেল, এবার যে সৈন্যদল ভেঙে দেওয়া হবে এবং বেসামরিক লোক হয়ে যেখানে ফিরে যাব সেই স্বদেশ যে

ইংরেজ-ইয়াংকি ও দেশী নেতাদের ইচ্ছায় দু-ভাগে ভাগ হয়ে যাবে এবং তার পর যে আরো বীভৎস ঘটনার অবতারণা হবে সেসব ছিল আমাদের কল্পনার বাইরে। দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রচারক ঐ পাঞ্জাবী মুসলমানটি ছিল দু বছর পরের দেশভাগ ও খুনোখুনির একজন অগ্রদূত। প্রথমদর্শনে তাকে চিনতে পারি নি।

সৈন্যেরা হুকুমে চলে, সুতরাং ফ্রন্টে যদি কোনোক্রমে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তো মহা মুশকিল। জাপানের আত্মসমর্পণের সময় বিভিন্ন দ্বীপে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা জাপানি সৈন্যেরা খবরও পায় নি, নতুন হুকুমও পায় নি বলে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরেও তারা যুদ্ধ চালিয়ে গেছে। এ বিষয়ে একটা অদ্ভুত ঘটনা বলি।

জাপানি ঘাঁটি প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জগুলির কোন কোন ছোট দ্বীপ ছিল সম্পূর্ণ জনহীন। যুদ্ধ শেষ হবার তিন-চার বছর পরে ছোট একটি ট্যুরিস্ট দল বা সার্ভে পার্টি ঐরকম একটি বিজন দ্বীপে গিয়েছিল। দু-এক দিন থাকার পরই তাদের কেমন একটা অনুভূতি হল- এই ছোট্ট দ্বীপটা পুরোপুরি জনহীন নয়, কেউ যেন আছে, তাদের গতিবিধির উপর নজর রাখছে, লুকিয়ে তাদের ক্যাম্পে এসে দেখে যাচ্ছে। লোকগুলোর অস্বস্তি হয় কিন্তু কাউকে দেখতে পায় না, মনে হয় ঝোপের আড়ালে কেউ বুঝি দ্রুত চলে গেল। ক্রমশ জানা যায় ঐ গোপন লোকটি হল এক মাঝারি থাকের জাপানি অফিসার, তার ফৌজের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা এখানে রয়ে গেছে। তার পরনে ভেঁড়া ময়লা উর্দি, কোমরে তলোয়ার, বন্দুকে গুলি আছে কি না সন্দেহ! সে মিকাডোর নামে একলা এই দ্বীপ আগলাচ্ছে। এই আগন্তুক লোকগুলো তার শত্রুপক্ষ। দূর থেকে সার্ভে পার্টি যত বোঝায়– আরে, চার বছর আগে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা কেউ কারো শত্রু নই। তুমি এসো, আমাদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করো। সে একবর্ণও বিশ্বাস করে না। সার্ভে পার্টি যত বলে চলো, আমাদের সঙ্গে, আমরা তোমাকে দেশে পৌঁছে দেব। সে অসহায় বোধ করে। তার এই সমুদ্রবেষ্টিত নিঃসঙ্গ নির্বাক ঘাঁটি থেকে সে কোথায় ফিরে যাবে? কোন হেরো দেশে গিয়ে হেরোদের দলে মিশবে?

বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আর একটা ঘটনা বলি। এটা আরো রোমহর্ষক।

জায়গাটা বোধ হয় পোল্যান্ড, অবশ্য চেকোশ্লোভাকিয়াও হতে পারে। কাগজে পড়া ঘটনা, এখন আর অত অনুপুঙ্খ মনে নেই। সাত-আট বছর হল ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। জার্মানরা পর্যদস্ত হয়ে ফিরে গেছে। এখন ওখানে চাষের মাঠে চাষীরা চাষ করে। একটা খেতে, কিছুদিন ধরে চাষীরা লক্ষ করছে, মাটির নিচে থেকে কারা যেন ঘা দেয় যেন মাটির নিচে বিরাট লোহার সিন্দুক, তার মধ্যে থেকে যক ডালা ভেঙে বেরুতে চায়। শাবলের ঠং ঠং শব্দ হয়। অবশেষে চাষীরা খেতের মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে দ্যাখে, নিচে এক ঢালাই কংক্রিটের লম্বা বাংকার। শাবল গাঁইতি দিয়ে সেই বাংকারে গর্ত করার পরে ছজন ভূতের মতো কংকালসার লোক বেরিয়ে এসে মাঠের উপর দিয়ে দৌড় দিল এবং কয়েক পা গিয়েই পড়ে গেল। চাষীরা ছুটে গিয়ে দেখল দুজনের মধ্যে একজন মারা গেছে, বাকি পাঁচজন পুঁকছে। লোকগুলো জার্মান, ময়লা নোংরা চেহারা, প্রায় অন্ধ, চামড়ার রং গামলা-চাপা ঘাসের মতো ফ্যাকাশে। ওদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালে একে একে বোধ হয় সবাই মারা যায়।

ব্যাপারটা কি? ঐ বাংকারটি ছিল জার্মানদের একটি রসদঘর। তখন, যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে, দ্রুত পালাবার মুখে কয়েকজন সৈন্য কিছু রসদ নেবার জন্যে ঐ বাংকারে ঢুকেছিল। তাড়াহুড়োতে তালা দিয়ে বেরোবার সময় দশ-বারো জন সঙ্গী যে ভিতরে পড়ে রইল তারা আর সে খেয়াল করে নি।

রসদঘরে প্রচুর খাবার ছিল, পানীয় ছিল, টর্চের ব্যাটারি ছিল, বিশুদ্ধ বাতাস ঢোকার এবং বিষাক্ত বাতাস বেরোবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু নীল আকাশ ছিল না, সূর্য বা তারার আলো ছিল না, মাটি নদী গাছপালা ছিল না। এক বছর বা দুই বছর পরে আলোর ব্যাটারি শেষ হয়ে গেল, তার পরে কুপকুপে অন্ধকার। একজন পাগল হয়ে গেল, দুইজন মারা গেল। মৃতদের ময়দার মধ্যে কবর দেওয়া হল। তার পর একজন আত্মহত্যা করল না অসুখে মরল বোঝা গেল না। তার পর, এত অনন্ত কাল কেটে যাবার পরে এই খোলা

আকাশ-বাতাসের তেজ আর হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা তাদের ছায়ার মতো শরীরে আর সহ্য হল না।

.

প্রত্যাবর্তন

ইউরোপে যুদ্ধান্ত এবং এশিয়ায় জাপানের হার স্বীকার করার পরেও যুদ্ধের জের কাটতে কয়েক মাস লাগল। প্রকৃত অবস্থাটা আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

একদিন সন্ধেবেলা রোল কলের সময় সুবাদার কোনো ভনিতা ছাড়াই অকস্মাৎ বললেন মন দিয়ে শুনুন, আগে আপনারা কেউ কেউ ফৌজ থেকে ছাড়া পাবার কথা ভেবেছেন। তখন হয় নি। কিন্তু এখন যারা ছাড়া পেতে চান তাঁরা ফল আউট হয়ে এক কদম এগিয়ে আসুন।

আমার কি হল জানি না, যা এক পলক আগেও ভাবি নি সেই কথা– এই কঠিন বাধ্যতার জীবন– মনে হল, অসহ্য। আমি আগুপেছু না দেখে, অন্ধের পাশার দানের মতো সেই প্রায়ান্ধকারে এক পা এগিয়ে এলাম। জীবনের অনেক বড় বড় সিদ্ধান্ত নেবার সময়, আমি দেখেছি, হঠকারী প্রবৃত্তি আমার ঘাড়ে চেপে বসে।

পরের দিন ড্রইং অফিসে পাখা চালিয়ে, ডাংরির বোতাম খুলে, বসে দেখছি, বিল আগেই এসেছে যথারীতি আমার মুখোমুখি বসে একটি একটি করে মগে ভেজানো আঙুর তুলে খাচ্ছে। আমি বিলকে ডিমবের কথাটা বললাম। লাল ঠোঁট, নরমসরম বিল দেখছি মেয়েদের মতোই বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন। প্রথমেই সে জিজ্ঞেস করল- ফিরে গিয়ে কি করবে?

– দেখি, একটা কিছু নিশ্চয় করব।

–কি করবে, কী ধরনের কাজ, কিছু ভেবেছ?

— নাঃ, আগে ফিরি, তার পর দেখা যাবে।

বিল বলল- খুব ভুল করলে। এভাবে কেউ চলে যায়? তোমার কিছু ঠিকঠাক নেই, তুমি কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছ! বিলের কথায় আমার মনে মেঘের ছায়া পড়ল ভুলই করলাম বোধ হয়। আমি সেই মেঘ কাটাবার জন্যে দুম করে বললাম- ফিরে গিয়ে আমি পড়াশোনা করব। জীবনটাকে যেমন ইচ্ছে চালাবার চেষ্টা করব।

বিল বলল- তোমার এমন কি কেউ আছে যে তোমার পড়াশোনা করার খরচ জোগাবে?

— না। কিন্তু আমি নিজে কি কিছু রোজগার করতে পারব না?

বিল বলল- কেন, আর্মিতে তোমার অসুবিধাটা হচ্ছিল কোথায়? এখানে ধীরে ধীরে উন্নতি হত, মাইনে বাড়ত। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাচ্ছে, বাইরে এখন চাকরি কমে যাবে। ফিরে গিয়ে তুমি আনসার্টেনিটির মধ্যে পড়ে যাবে।

আমি চুপ করে বসে রইলাম। মনটা যেন চুপসে গেল। অনেক দিন পরে আবার দুর্ভাবনা ঘিরে আসছে। বিল আনমনা হয়ে একটি একটি করে আঙুর খেতে লাগল। আমি ভাবতে লাগলাম।

বিল যা-ই বলুক না, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দেখা গেল বেশ কিছু লোক ডিমব-এ যাচ্ছে। রিক্রুটমেন্টের সময় যেমন হৈ চৈ ডিমোবিলাইজেশনের সময়েও সেইরকম জোয়ারের সময় জলের কলকল শব্দ, ভাটার সময় স্রোতের টানের দীর্ঘনিশ্বাস।

ইতোমধ্যে, সমরবিভাগ থেকে আমাদের ডিমব-পরবর্তী পুনর্বাসনের নানারকম প্রস্তাব এবং বিজ্ঞপ্তি এল। সবচেয়ে মজার বিজ্ঞপ্তিটি এল বিবাহপ্রস্তাব নিয়ে। কোনো ফৌজি যদি ওয়াকাইদের কাউকে বিয়ে করতে চায় তবে সে তিন কপি ফোটো জমা দিক। ফোটো দেখে যদি প্রাথমিকভাবে পরস্পরের পছন্দ হয় তবে পাত্রপাত্রীকে আলাপ করিয়ে দেওয়া হবে।

কথাবার্তা বলে যদি তারা বিয়ে করবে স্থির করে তবে. বরপোশাক, কনেপোশাক এবং বিয়ের খরচ বাবদ হাজার চারেক টাকা দেওয়া হবে।

ওয়াকাইদের অনেকেই বেশ সুন্দরী ছিল। স্মৃতিরেখা বিশ্বাস চিত্রাভিনেত্রী হবার আগে ওয়াকাই ছিলেন। কিন্তু তবু কোনো বীরকে সাহস অবলম্বন করে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে এগিয়ে যেতে দেখি নি।

না এদিক, না ওদিক- মনটা দিনে দিনে নিরালম্ব হয়ে গেল। রোজ যথাসময়ে ড্রইং অফিসে ড্রইং বোর্ডের সামনে গিয়ে বসি রোজ একদিনের করে টাকা বাড়ে, অতএব রোজ নতুন করে হিসেব করি, সাকুল্যে কত টাকা পাওনা হবে। এক ধাপ এক ধাপ করে হিসেব করি, আর দেখি বিল সামনে বসে একটি একটি করে আঙুর খাচ্ছে।

ইতোমধ্যে আমাদের ভদ্রতা, সভ্যতা ও সুসামাজিকতার কয়েকটি ক্লাস হল। ফিরে গিয়ে আমরা সহনাগরিকদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করব সেসব শেখানো হল। আমাদের চলাফেরায়, অন্যের প্রতি ব্যবহারে ফৌজের সুনাম যেন অক্ষুণ্ন থাকে। আসলে আমাদের মধ্যে যে রুক্ষতা, উগ্রতা ও মারদাঙ্গাভাব এসে গিয়েছিল কর্তৃপক্ষ সেগুলোকে একটু ঘষে ভোঁতা এবং পালিশ করে দিতে চেয়েছিলেন। যত দিন চাকরি হয়েছে তার অনুপাত কষে টাকাপয়সারও একটা ব্যবস্থা হল। ফিরে গিয়ে এতে কয়েক মাস গুজরান হবে। যাবার আগে বুশ শার্ট প্যান্ট বিছানা তোয়ালে পুলওভার সম্পূর্ণ নতুন কিটের সঙ্গে পাজামা আর শার্ট বানাবার জন্যে এক থান লংক্লথও দিয়েছিল।

আমার একটা আনকোরা নতুন ওয়াটার বটলের শখ ছিল। যাবার আগে যদি পাওয়া যায় তো বেশ হয়। কোয়ার্টার মাস্টারের ওখানে তখন জিনিসপত্রের পাহাড়। ওরা বলল, পুরনো বটলটা রেখে যাও, নতুন একটা পরে এসে নিয়ে যেয়ো। যাবার আগের দিন আবার গেলাম। ঐ তো নতুন ওয়াটার বটল ডঁই হয়ে আছে। কিন্তু তখনও পাওয়া গেল না। লোকটা হেসে বলল- কাল যাবার আগে তোমার ব্যারাকে পৌঁছে দেব। আমি মনে মনে বললাম হুঁ।

পরদিন আর কিছুই মনে পড়ল না। ডিমবের কাগজপত্র, সার্টিফিকেট, রেলের ওয়ারেন্ট সবই পেয়ে গেছি। দুপুরের খাওয়া হয়ে গেল। কোথাও আর মন লাগছে না। মন যেন ছিন্নভিন্ন উড়ো মেঘ চলে যাব। চলে যাব। ক্যান্টনমেন্টের এই জায়গাটা দূর অতীত দিনের মতো পড়ে থাকবে আর কোনোদিন আসা হবে না। কলকাতার অপেক্ষমাণ ভবিষ্যৎ যেন দূরবীনে দেখা ঢেউভাঙা সমুদ্র। সেই সফেন গড়িয়ে আসা জলে গুপালের, মুমতাজের, শশাঙ্কসুন্দরের মাথা একবার ভাসছে একবার ডুবছে।

সন্ধের পর রাত্রে ট্রেন। আমি বিকেলের আগেই স্টেশনে যেতে চাই। যতক্ষণ গাড়ি না আসে কিটব্যাগের উপর বসে দেখছি শিশু গাছের জটলার নিচে শালিকের চোখের বলয়ের মতো মেটে হলুদ রোদ্র সরে সরে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, গুবরে পোকার মতো অতি ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিতে দিতে যদি আমি ঐ অপস্রিয়মাণের মধ্যে ঢুকে যেতে পারতাম। গুবরেনীর দেখা পেয়ে সংসার পেতে যদি ঐখানে জীবন কাটিয়ে দিতাম তাহলেই বা কি এই জন্ম কম কৃতার্থ হত?

ডামাডোলের মধ্যে একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু গাড়ি ছাড়ার মুখে সেই লোকটি নতুন ওয়াটার বটল নিয়ে হাজির হল। নতুন ফেল্টে মোড়া নতুন বটল। লোকটি হেসে বলল– ভরে দিয়েছি। শেষ মুহূর্তে আধচেনা লোকটি যেন রাভির জলতল থেকে স্নিগ্ধ হাত বাড়িয়ে বিদায়ের করমর্দন করে গেল। বহোত বহোত শুক্রিয়া অনেক অনেক ধন্যবাদ।

এখন শেষ বিকেল। ট্রেন সন্ধেরাত্রে ছাড়বে। সময় কাটাবার জন্যে বড় এক পট চা নিয়ে একটি কোণ-ঘেঁষা টেবিলে বসলাম। টেবিলে রোদ এসে পড়েছে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে রোদের নড়াচড়ার শব্দ কি কেউ টের পায়? আবার বিলের কথা মনে পড়ল বিল সাবধানী। শ্বেতাঙ্গ বিল এই রোদের নড়াচড়ার মতো সাবধানী। কৃষ্ণাঙ্গ আমি স্টেশনের ঐ সিগনাল পোস্টে নামা আরক্ত সন্ধ্যার মতো দুঃসাহসী।

ট্রেন পুবের দিকে ছুটছে মানে ভোর হবার আগেই ভোরের মধ্যে ঢুকছে। ট্রেনে লম্বা রাতের শেষে ভোরে উঠে তেষ্টা পেয়েছে। ঐ তো ভরতি ওয়াটার বটল হুকে টাঙানো রয়েছে সারা রাত হাওয়ার ঝাঁপট লেগে লেগে শীতল হয়ে আছে জল। কিন্তু আমি ছিপি খুলেই চমকে উঠলাম চলকে ওঠা রামের গন্ধে কামরাটা ভরে গেল। জলের বদলে লোকটা রাম ভরে দিয়েছে। কেন? ভালবেসে? মজা করার জন্যে? লোকটা কি গোপন মেফিস্টফিলিস, না কি ছদ্মবেশী ব্যাকাস।

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম– সকালবেলা নির্জলা রাম খাবার মতো প্রতিভা নেই আমার। তাহলে আমি এক সেপাই যে বাঁ হাতে বাঁ চোখ টিপে রেখে শুধু ডান হাতে ফায়ার করে, যে এক বোতল রাম উপহার পেয়ে কী করবে ভেবে পায় না। এইরকমই আমি লেখাপড়া, চাকরি, সংসার, সব যুদ্ধেই বাইরে বীর, কিন্তু ভিতরে খেলনা সেপাইয়ের বেশি নই।

আমাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখে সহযাত্রী সেপাইরা খুশি হয়ে বোতলটি চেটেপুটে সাফ করে দিল। তাদের ক্যানভাসের ছাগল থেকে ঠাণ্ডা ঝকঝকে জল খাওয়াল, ভারী প্রাতরাশ খাওয়াল।

কলকাতায় ফিরে, ধোবার পরেও, বোতলটাতে বহুদিন রামের গন্ধ লেগে ছিল। আমার ভালো লাগত। একটা দূরে রেখে আসা জীবনের কথা মনে পড়ত।

.

প্রাসঙ্গিক

সৃজনশীল মানুষের ছেলেবেলার কাহিনীতে লুকিয়ে আছে তার প্রবণতা, আছে তার মুছে যাওয়া যাত্রাপথের সন্ধান। এই ধারণা থেকে আমি পরমা কাগজের শেষ দিকের সংখ্যাগুলিতে একজন করে কবি বা শিল্পীর বালকবেলার আত্মকথা

ছাপছিলাম। এই পর্যায়ে কয়েকজনের লেখা ছাপার পর মনে হল, আমিই বা না লিখি কেন। আবার শিশুকালের কথা মনে আনাগোনা করতে লাগল কিন্তু কলকাতার আকাশ-বাতাস এইরকম লেখার পক্ষে খুব অনুকূল নয়। এই যখন অবস্থা তখন ১৯৮১ সালে কর্মসূত্রে আমাকে বীরভূমে তিলপাড়া ব্যারাজের কাছে কয়েক মাসের জন্য ডেরা বাঁধতে হল।

আমাদের ক্যাম্পাসটি ছিল দু ভাগে ভাগ করা এক ভাগে কর্মস্থল, অন্য ভাগে কর্মী-আবাসন। জায়গাটা ময়ূরাক্ষীর পারে, ক'বছর আগেও ছিল জনশূন্য, এখন কয়েকটা সরকারী ঘর বাড়ি অট্টালিকা মেশিনপত্তরের শেড হওয়ায় ছোট্ট একটা উপনিবেশের রূপ নিয়েছে।

আমি যখন সেই উপনিবেশে হাজির হলাম তখন শেষ অপরাহ্ন। ঢুকবার আগেই বাঁ দিকে দৃষ্টি গেল ধূ ধূ করছে বিরাট জলাধার। তখন রোদ্দুর ওপারে সরে গেছে, জলের ওপর ছায়া পড়েছে আকাশ কোমল হয়ে এসেছে। পরিযায়ী বিদেশী হাঁসের লম্বা ঝক এসে জলের ওপর রাতের মতো থিতু হচ্ছে। হাতের কাছে এতখানি ফাঁকা আকাশ আর জল দেখতে পাব আমি ভাবি নি।

একা থাকব। সুতরাং স্থানীয় সহকর্মীরা মোটামুটি একটা থাকবার আর খাবার জায়গা ঠিক করে রেখেছিলেন। কিন্তু আবাসনে ঢুকে সেই আসন্ন সন্ধ্যায় প্রথমেই চোখে পড়ল একটি 'এ' ক্যাটিগরির পরিত্যক্ত বাড়ি। দেখেই বোঝা যায় কেউ সেখানে থাকে না। ব্যাপার কি? জানা গেল, বাড়িটা তৈরি হয়েছিল প্রতিষ্ঠানের কর্তার জন্য। কয়েক মাস থাকার পর হঠাৎ বাড়িটার ভিত চৌচির হয়ে ফেটে গেলে কর্তা সেটি ছেড়ে অন্য কোয়ার্টারে উঠে গেলেন। পি ডাবলিউ। ডি দেখেশুনে বাড়িটাকে বিপদজনক ও পরিত্যক্ত ঘোষণা করল। সেই থেকে বাড়িটা জনহীন পড়ে আছে।

আমি আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। আমি তদানীন্তন কর্তার কাছে বাড়িটিতে থাকার অনুমতি চেয়ে নিলাম। তখন সন্ধ্যা হয়েছে। তালা খুলিয়ে বাড়িটাতে ঢুকে

দেখি ঘরদোর মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। একটা লিভিং রুম, তিনটে বেডরুম, বাথ, কিচেন, ডাবলিউ সি, সামনে খোলা বারান্দা। আশ্চর্যের ব্যাপার ঐ পোড়ো বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো পাখা এবং জলের লাইন তখনও সচল। প্রথম শোবার ঘরটাতেই পাশাপাশি দুটো নিরাভরণ খাট পাতা- কোনো বিছানা নেই। একটা টেবিল এবং দুটো হাতলওয়ালা চেয়ার। চমৎকার। এই একটা ঘরই আমার পক্ষে যথেষ্ট। চৌকিদার পাঁচ মিনিটে ঘরটা পরিষ্কার করে, টেবিল চেয়ারে ঝাড়ন বুলিয়ে, আলো জ্বালিয়ে, পাখা চালিয়ে চলে গেল। এই ডেরার সবচেয়ে কাছের গৃহস্থ কোয়ার্টারেই আমার দু বেলা খাবার বন্দোবস্ত।

শেষরাতে পাখির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। ঐরকম একসঙ্গে বত্রিশ জাতের পাখির ডাকের ঝড় আমি জীবনে শুনি নি। শুয়ে শুয়ে শুনতে শুনতে মনে হল পাখিরা বোধ হয় চেঁচামেচি করেই আগন্তুককে তাড়াবার মতলব এঁটেছে। আলো ফুটলে বাইরে এসে দেখি এ বাড়িটা যেন অন্য বাড়িগুলো থেকে স্বাতন্ত্র রক্ষা করে একটেরেতে গড়া। বারান্দা থেকে দশ হাতের মধ্যে মোরামের রাস্তার পারে গমের খেত। বাঁ পাশে ও পেছনে বড় বড় প্রাচীন গাছের জটলায় বনের আভাস। দূরে লোকালয়। নিঃসঙ্গ, একা, অত বড় বাড়ি চারদিকে বীরভূমের গ্রামাঞ্চল সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে ভোর। মাসে দু বার কলকাতার বাড়িতে যাই। জীবনে এমন নিরাময়কারী, নির্ভাবনার বাসস্থান পাই নি। অথচ অযাচিতভাবে সবাই ভয় দেখায়। মেঝেতে এ মাথা ও মাথা লম্বা মোটা ফাটল আমারও চোখে পড়ে। একদিন দেখি দরজার ফ্রেমে একটা সাপের খোলস আটকে একটু একটু হাওয়ায় দুলছে।

তিলপাড়ার ঐ কয়েক মাসে আমি অক্ষয় মালবেরি, প্রথম পর্ব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লিখলাম। ঐ বাড়িটার শান্তি, বৈরাগ্য, নির্জনতা এবং চারদিক ঘিরে থাকা প্রকৃতি আমাকে গভীর সাহায্য করল। প্রথম পর্বের আসল বিষয় ছিল পুববাংলায় আমাদের গ্রাম আর গৌণ বিষয় ছিল আমার জন্ম থেকে বালককাল।

পরমা-র শরৎ ১৩৮৮ সংখ্যায় লেখাটা প্রকাশিত হল। আমি ছাপাখানার সঙ্গে ব্যবস্থা করে দু শো কপি অফ-প্রিন্ট রেখেছিলাম, তার থেকে দু শো কপি বই হল। কেউ কেউ সে বই তিন চার কপিও কিনলেন। দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুল ১৯৯৫ সালে। এবার ক্রাউন সাইজ, চিত্রসংবলিত।

অক্ষয় মালবেরি, দ্বিতীয় পর্ব– বরাক উপত্যকায় আমার কিশোরকালের কথা বেরুল চিৎৰক পাবলিকেশন থেকে ১৯৯৮-এর শীতে। চিত্রকের পার্থপ্রিয় বসু ঘটা করে তার প্রকাশ-অনুষ্ঠান করলেন বাংলা আকাঁদেমি সভাঘরে।

চার বছর পরে ২০০২ সালের শরতে অক্ষয় মালবেরির তৃতীয় পর্বের প্রথমার্ধ বেরুল জলার্ক পত্রিকায় আর শেষার্ধ বেরুল বিষয়মুখ পত্রিকায়।

ইতিমধ্যে প্রথম পর্ব আবার ফুরিয়ে গিয়েছিল। অতএব ২০০৪ সালের জানুয়ারিতে একই সময়ে চিৎৰক পাবলিকেশন থেকে প্রকাশ পেল অক্ষয় মালবেরি, প্রথম পর্বের তৃতীয় সংস্করণ এবং নতুন তৃতীয় পর্ব।

দ্বিতীয় পর্বও ফুরিয়ে গিয়েছিল। অবভাস ছাপাল তার দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারী, ২০০৬ সালে।

এখন তিনটি পর্বই নিঃশেষিত। এবার অবভাসের পরিকল্পনায় তিনটি পর্ব একত্রিত করে এক ভলমে অখণ্ড অক্ষয় মালবেরি প্রকাশিত হল। এতদিন দ্বিতীয় পর্বে কোনো ছবি ছিল না। এই নতুন অখণ্ড সংস্করণে পুরো বইটাই লেখক-কর্তৃক চিত্রালংকৃত।

তিন পর্বে সম্পূর্ণ অক্ষয় মালবেরিতে আছে জন্ম থেকে যৌবনারম্ভ পর্যন্ত জীবনের কথা। কিন্তু এই তিন পর্বের পরেও, অনেকেই আমাকে বলেন, চতুর্থ পর্ব কোথায়? তার পরে কি হল? পর্বে পর্বে আমরা বর্তমান পর্যন্ত আপনার জীবনকথা জানতে চাই।

কী বলব! এই কৌতূহলের জন্য আমি সম্মানিত। কিন্তু মনের মধ্যে এই কাহিনীকে আরো বাড়াবার মতো উদ্যম খুঁজে পাই না। যতদিন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলাম ততদিন অসীম মুগ্ধতা, বিস্ময় এবং অপরিণামদর্শিতা নিয়ে আমি অনন্য ছিলাম। বয়স্ক হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ অন্যান্যদের মতোই হয়ে গেছি। এখন আপনার আমার সবারই তো এক গল্প। অতএব অক্ষয় মালবেরির কাহিনী আমার বাইশ বছর বয়সে এসে শেষ হয়েছে। বাইশ বছরেও নিজেকে অপ্রাপ্তবয়স্ক বলছি- এটা আদুরেপনা নয়। হয়তো অতীতের একটা সময়ে কিছু কিছু মানুষের ছেলেবেলাটা একটু বেশি সম্প্রসারিত ছিল।

আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে নিজের জীবনকে কেউ দেখে দূরবিনে, কেউ দেখে অনুবীক্ষণের লেন্সের তলায়। মণীন্দ্র গুপ্ত দেখেছেন নিজের তৈরি এক ক্যালিডোস্কোপে। আপাত-বাস্তবের নেপথ্যে যেন চিরকাল বইছে এক ঘনগহন অন্য বাস্তবের স্রোত। তাঁর দেখা ছায়া গোধূলি মেঘ হাওয়া জল ফড়িং সরীসৃপ পাখি গাছের মধ্যে আসে মানুষী ব্যক্তিত্ব, আর মানুষের মধ্যে দেখা দেয় গুনবতী প্রকৃতির অজ্ঞান সৌন্দর্য। জগৎপটে জীবনের এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর ভাঙা টুকরো বিন্যাসে বিন্যাসে অন্তহীন ছবির পর ছবি সাজায়। অক্ষয় মালবেরি উপন্যাস নয়, প্রচলিত আত্মজীবনীও নয়, একজন দুঃখী-না সুখী-না মানুষের চিহ্নপত্র। কাঁচা কঞ্চির কলমে বনের সবুজ কালিতে হোগলার পাতায় লেখা—উজ্জ্বল দুরন্ত দুঃখী ক্ষণমধুর অতীত যেন স্তব্ধতা থেকে এসে আবার স্তব্ধতায় ফিরে গেছে।

978-83-908117-4-1

অবভাস